রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বৈশাখ

১৩৮১

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৮১

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

জ্যৈষ্ঠ

১৩৮১

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

আষাঢ়

১৩৮১

প্রবাসী—আষাঢ় ১৩৮১

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

শ্রাবণ

১৩৮১

প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৮১

সূচীপত্র

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৪তমভাগ প্রথম খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৮১ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতার রাজপথের অবস্থা

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যখন বয়স অধিক হয় নাই, আমাদের সখ হইল বাইসিকল্ চড়িয়া কলিকাতা হইতে একশত পঞ্চাশ মাইল দূরের একটি কর্ম্মকেন্দ্রে গমন করিবার। সঙ্গে জুটিয়া গিয়াছিলেন কয়েকজন আমাদের অপেক্ষাও অল্প বয়স্ক তরুণ যাহাদের প্রাণে বিপদ আপদের আশঙ্কা অপেক্ষা আকর্ষণই ছিল প্রবলতর। সেই অভিযান হইয়াছিল খুবই উত্তেজনা-পূর্ণ এবং নানাপ্রকার ত্রাসজনক রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল। ঘোর অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে বাইসিকলের চাকার পরিচর্য্যা, চতুর্দ্দিকে বন্য পশুর চক্ষের জ্বলন্ত আবির্ভাব, কাঠের ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হওয়া, বন্য হস্তিনী ও হস্তি-শাবকদের সম্মুখে গিয়া পড়া ইত্যাদি। সেই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিবার এখন আর কোনও প্রয়োজন নাই। যেকথা বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপনা করা হইয়াছে তাহা হইল সেই ঘটনাবহুল ভ্রমণকালে যে প্রকার রাস্তাঘাট ধরিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহার সহিত বর্ত্তমানের চিরনির্ম্মাণ ও আবহমান সংস্কার জর্জ্জরিত কলিকাতার রাজপথের তুলনা করা। মনে পড়ে আমরা বাইসিকল্ চড়িয়া যাইতে যাইতে প্রায়ই হঠাৎ দেখিতাম সম্মুখে রাস্তা আর নেই, আছে প্রাকারসদৃশ আবক্ষপ্রমাণ উচ্চ আইল, অথবা গভীর করিয়া কাটা চওড়া নালা যাহা পার হইয়া যাওয়া অত্যন্তই কঠিন। কোথাও কোথাও রাস্তা হঠাৎ ধান্য-ক্ষেত্রে লয়প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যে চলিয়া যায় তাহা কেহই বলিতে পারেনা। কলিকাতার রাজপথের যে শোভা ও বৈচিত্র তাহা ততটা নৈসর্গিক নহে; আমরা যাহা বাইসিকল্ চড়িয়া অজানার বিস্তৃতির মধ্যে দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত তুলনীয় নহে; কিন্তু খনকের স্বপ্নের বাস্তব অভিব্যক্তি বলিলে তাহার

স্বরূপ বর্ণনা অনেকটা সত্য আকারে প্রতিভাত হয়। নালা ও আইল সকল রাজপথেই সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু খনকদিগের শুধু খাল কাটিয়া ও আল তুলিয়াই সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। এই কারণে কলিকাতায় কোন কোন রাজপথে হঠাৎ মনে হয় কাহারা যেন কূপ অথবা পুষ্করিণী খনন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষ ত ডুবিয়া মরিতেই পারে এমন কি একটি গহ্বরে অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় একখানা ট্যাক্সিও এক সময় দেখা গিয়াছিল। অপর কোনও এক স্থানে কেহ রাস্তার গর্ত্তে ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়াও জনরব হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে একটা গল্প চলিত ছিল' তাহাতে একজন আমেরিকান অস্ত্রচিকিৎসক একজন রোগীর উদরদেশ অস্ত্রাঘাতে উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার অন্ত্রাদি নাড়াচাড়া করিয়া পুনর্ব্বার শেলাই করিয়া রোগীকে সবকিছু ঠিক হইয়াছে বলিয়া দেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সেই অস্ত্রচিকিৎসক রোগীর নিকট গিয়া বলেন যে তিনি ভুলক্রমে রোগীর উদরে একটি হাতিয়ার থাকিতেই শেলাই করিয়া ফেলিয়াছেন; এখন আবার উদর কাটিতে হইবে। রোগী আর কি করিবেন অস্ত্রবিদকে পুনর্ব্বার অস্ত্রচালনা করিতে দিলেন। ইহার আরও কিছুদিন পরে রোগীর পেটে যন্ত্রণা হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার ডাক্তারের নিকট গিয়া সেকথা বলিলে ডাক্তার বলিলেন হয়ত ভিতরে আরও কিছু রহিয়া গিয়াছে যাহা শীঘ্র বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক। এইবার উদর অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড পাওয়া গেল। ডাক্তার যখন তাহা উদ্ধার করিয়া উদর পুনরায় শেলাই করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন রোগীর পত্নী তখন তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয় আপনি শেলাই না করিয়া যদি আমার স্বামীর পেটে বোতাম লাগাইয়া দিয়া খোলা বন্ধ করার ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে সুবিধা হইত; কারণ সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে আপনি যথেচ্ছা যখন তখন আমার স্বামীর উদর হইতে আপনার যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া লইতে পারিতেন এবং সেই জন্য কাটাকাটি করিতে হইত না।" কলিকাতার রাস্তায় যাঁহারা অস্ত্রচালনা করিয়া থাকেন তাঁহারাও যদি রাস্তার উপরাংশ সিন্দুকের ডালার মত করিয়া নির্ম্মাণ ব্যবস্থা করেন যাহাতে ইচ্ছা হইলেই সকল স্থলেই ডালা খুলিয়া তার, নল প্রভৃতি নাড়াচাড়া করা যায়, তাহা হইলে কোদাল গাঁইথি প্রভৃতি ব্যবহারের আর আবশ্যক থাকেনা। এইরূপ করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করিলে তদ্দ্বারা জনমঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদেরও তাহা হইলে আর ক্রমাগত আইলে ধাকা খাইয়া অথবা খাদে পড়িয়া আহত হইতে হয় না।

মূল্য বৃদ্ধি

মূল্য বৃদ্ধি কেন হয়? অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে মূল্য বৃদ্ধি হয়; এবং হয় যদি ক্রয় করিবার দ্রব্যাদির পরিমাণ কোন কারণে হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত মূল্য বৃদ্ধির আরও জোরাল কারণ হইল খাজনা মাশুল বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়ে আধিক্য, সরকারী নিয়ন্ত্রণে মূল্য বাড়ান ইত্যাদি ও সেই সকল বৃদ্ধির ধাক্কায় অপর বহু বস্তুর মূল্যও বাড়িয়া যায়। দ্রব্য উৎপাদনের খরচ যদি কোনও কারণে বাড়িয়া যায় তাহাতেও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল কারণ যাহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হয় তাহার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইল মজদুরের বেতন বৃদ্ধি, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, মাল আনিবার ও লইয়া যাইবার গাড়ীভাড়া বৃদ্ধি এবং মূলধন ও খরচের টাকা সংগ্রহের সুদ ইত্যাদি বৃদ্ধি। যদি বিচার করা হয় যে কি কি কারণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা হইলে সাক্ষাৎ যে সকল কারণ অর্থ-নীতিতে নির্দ্দেশ করা হয় সেই সকল কারণই এখন এই দেশে প্রকৃষ্টরূপেই উপস্থিত রহিয়াছে দেখা যায়। যথা, মুদ্রাস্ফীতি, ক্রয়বস্তুর অভাব, খাজনা মাশুল রাজস্ব বৃদ্ধি, মজুরের বেতনাদি বৃদ্ধি, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, রেলের মাশুল বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের সুদ বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। বহু বস্তুর মূল্য সরকারী নিয়ন্ত্রণেও বাড়িয়াছে; যথা কয়লা, বৈদ্যুতিক শক্তি, ব্যাঙ্কের সুদ। এই সকল সাক্ষাৎ ও জোরাল কারণ ব্যতীত পরোক্ষ ও গুপ্ত

কারণ হইল দ্রব্য বাজার হইতে সরাইয়া লইয়া কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যাভাব সৃষ্টি করিয়া মূল্য বাড়ান। কালো বাজারে ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে কালো বাজারের প্রভাব অতি প্রবল; কাহারও কাহারও মতে সরকারী অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থাই মূল্য বৃদ্ধির জন্য অধিক দায়ী। ইহার কোনও স্থির নিশ্চয় উত্তর কেহ দিতে পারেন না। সরকারী আমলাগণ নিজেদের "পলিসি" অতি উত্তম ও পূর্ণরূপে জনহিতকর বলিবেন। কালোবাজারওয়ালাগণ বলিবেন সকল দোষই সরকারী নীতির। আসল কথা দোষ উভয়েরই। অভাবে স্বভাব নষ্ট বলিয়া যে কিংবদন্তী আছে তাহা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। স্বভাব নষ্ট হইয়াছে শাসকদিগের ক্রেতা বিক্রেতা, সকলের। কালো বাজার ত সৎস্বভাবের কোনও ধার ধারেনা; সাদা বাজারও সম্ভব হইলে দুইচার টাকা অতিরিক্ত লাভ করিতে কিছুমাত্র নারাজ নহে। শাসকগণ মুদ্রাস্ফিতি, খাজনামাশুল, রাজস্ব বৃদ্ধি, রেলভাড়া, সুদ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁহারা নিজেদের ব্যয়বৃদ্ধি ও যথেচ্ছা টাকা আদায়ের পথ যদি না ছাড়িয়া দেন ও সকলদিন সামলাইয়া চলিতে না শেখেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ আরই অভাবের গভীরে চলিয়া যাইতে থাকিবে। জাতি যে সকল ব্যক্তিদিয়া গঠিত সেই সকল ব্যক্তির সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা জাতিই করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়া থাকেন। কারণ ব্যক্তির জীবন দিয়াই জাতির জীবন গঠিত। সকল ব্যক্তির অভাব ও কষ্ট দিয়া জাতির সমৃদ্ধি রচিত হইতে পারে না কিন্তু এখন জাতির রীতি নীতি কার্য্য পদ্ধতি বলিতে আমরা শাসকগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনৈতিক বিলিব্যবস্থাই বুঝিয়া থাকি। সেই সকল ব্যবস্থা যদি ব্যক্তির পোষণ না করিয়া তাহার শোষণের জন্যই সদা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ অপ্রিয় হইয়া উঠে; যাহা হওয়া কদাপি উচিত নহে। এইরূপ হইলে শেষ অবধি তাহা হইতে হয় ব্যক্তিকে পূর্ণরূপে দমন করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট বা ফ্যাশিষ্ট শাসনরীতি প্রবর্ত্তিত হয়; নয়ত শাসকগোষ্ঠীর শক্তি নাশের জন্য ব্যক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়া শাসন রীতি পরিবর্ত্তিত আকার গ্রহণ করে। একথা বলিতেই হইবে যে রাষ্ট্রীয় দলের ক্ষুদ্র গণ্ডি অথবা আমলাদিগের দলবদ্ধভাবের সমাজশোষণ অধিকার কখনও ব্যক্তিস্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্রকে সুরক্ষিতভাবে শক্তিমান হইয়া উঠিতে দিতে পারেনা। রাষ্ট্রীয় দলের অথবা রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রভুত্ব ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখে।

ঐশ্বর্য্য ও শক্তির আহরণ অধিকার

ঐশ্বর্য্য ও শক্তি থাকা অন্যায়, জন অহিতকর বা দোষাবহ নহে! ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অপব্যবহার অথবা তাহা আহরণের পন্থা দুর্নীতিকর হইলে শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি সমাজ-অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। অপর দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনও করিতে পারেন। যথা রকেফেলার অথবা হেনরি ফোর্ড সমাজকল্যাণ কার্য্যে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা নানাভাবে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের দানের সাহায্যে বহু হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র, আতুরাশ্রম, অনাথাশ্রম প্রভৃতি চলিয়া থাকে। এই দেশেও বহু ধর্ম্মশালা, দানছত্র, মন্দির, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি দানের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করার উদাহরণ সর্ব্বত্র অনেকানেক দেখা যায়। তাহার অসদ্ব্যবহারও প্রচুর হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা অন্যায়ভাবে অপরকে উৎপীড়ন করিতে নিজেদের অর্থবল নিয়োগ করে তাহারা অধিক ক্ষেত্রেই খুব অধিক অর্থের অধিকারী নহে। অধিক সুদে টাকা কর্জ্জা দেওয়া, বস্তি নির্ম্মাণ করিয়া অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা, মুদিখানা হইতে গরীব ক্রেতাদিগকে শোষণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যাহারা করে তাহারা প্রায়ই অধিকবিত্তবান নহে। শ্রমি

আন্দোলনে প্রায়ই শোষণের কথা আলোচিত হয়। শ্রমিকদিগের দ্বারা যে লাভ হয় তাহার ন্যায্য অংশ তাহাদিগকে দেওয়া হয় না এবং শ্রমিক নিয়োগকর্ত্তা অতিরিক্ত লাভ করিয়া থাকার কারণে এই স্থলে শোষণের কথা উঠিয়া থাকে। একটা সময় ছিল যখন শ্রমিকদিগকে এতই অল্প মজুরী দেওয়া হইত যাহাতে তাহারা মহা কষ্টে কালাতিপাত করিত। বর্ত্তমানকালে শ্রমিকদিগকে যথেচ্ছা শোষণ করিতে মালিকগণ আর সহজে পারে না। ইহা নানাপ্রকার আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারে এখনও শ্রমিক শোষণ চলিয়া থাকে। সেই সকল কারবারের মালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রোরপতি নহে। অতএব দেখা যায় যে প্রবঞ্চনা, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, উচ্চ সুদে টাকা কর্জ্জা দেওয়া, অত্যল্প বেতনে কাজ করান প্রভৃতি মানবতাবিরোধী কার্য্য যাহারা করে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধনের ক্ষেত্রে মহারথী নহে। যাহাদের মধ্যে অল্পবিত্ত অন্যায়ভাবে বাড়াইবার অদম্য আগ্রহ প্রকট হইয়া দেখা দেয় তাহারাই ন্যায় অন্যায়জ্ঞান, দয়াধর্ম্ম, মানবিক কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া যথেচ্ছা অপরের অশ্রুজলের স্রোতে নিজেদের আত্মতৃপ্তির তরণী ভাসাইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষ দানধ্যান করে বলিয়াও মনে হয় না। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখা যায় না; কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসাদার, নিয়ন্তরের চাকুরে প্রভৃতিরাই এই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। একটা কথা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই জাতীয় শোষণ বন্ধ করিবার কোনও চেষ্টা সরকারী-ভাবে করা হয় না। ইহা ব্যতীত যাহারা নানা ঘাঁটিতে বসিয়া উৎকোচ আদায় করিয়া থাকে ও যাহাদের কালোটাকার আয় বাৎসরিক বহু কোটি হয় বলিয়া অনুমান করা হয় তাহাদের ধন সম্পদ লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান কেহ করে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল ব্যক্তির উপার্জ্জন অধিক প্রথমতঃ তাহাদের আয়ের অধিকাংশই রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া লওয়া হয়, পরে তাহাদের ঐশ্বর্য্য নানানুভাবে হ্রাস চেষ্টা করা হইয়া থাকে। যথা যাহাদের অর্থ কয়লার খাদে লাগান ছিল তাহাদের সে টাকা এখন সরকারী তহবিলে চলিয়া গিয়াছে এবং সে টাকা কখন কিভাবে যে পাইবে, সে কথাও কেহ যথাযথভাবে বলিতে পারে না। ইহার পূর্ব্বে প্রায় কুড়ি বৎসর গত হইয়াছে যাহাদের টাকা জমিজমাতে ছিল তাহাদের টাকাও জমিদারী উঠাইয়া দেওয়ার ফলে বেহাত হইয়া যায়। তামার কারখানার অংশের টাকাও এখন অনেকটা সরকারী হাতে গিয়াছে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানীতে টাকা যাহাদের লাগান ছিল তাহাদের টাকাও আটকাইয়া আছে। এখন শুনা যাইতেছে সহরে গৃহসম্পদ রাখা লইয়া নিয়ন্ত্রণ হইবে যে কেহ একটা সীমার অধিক গৃহ ও জমি সহরে রাখিতে পারিবে না। আরও কথা হইতেছে যে স্বর্ণ কাহারও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক রাখা চলিবেনা। এই সকল নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের লাভ হইবে কি-না সে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ সরকারী গলার জোর বেশী এবং সরকারী নির্দ্দেশ সকলকে মানিতেই হইবে। কিন্তু গৃহ, জমি, স্বর্ণ যদি কেহ না রাখিয়া থাকে, সম্পদ অপর কিছুতে রাখে; তাহা হইলে তাহার কোন লোকসান হইবে না। এইরূপ রীতি সাম্যনীতি বিরুদ্ধ। স্বর্ণ কাড়িয়া লওয়া হইবে কিন্তু রৌপ্য, তাম্র, দস্তা বা প্লাটিনাম লওয়া হইবে না। পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের গৃহ কেহ রাখিবে না কিন্তু ২০টি বড় বড় বাস অথবা একটা জাহাজ কিম্বা পাঁচখানা মাল বহনের বিমান রাখিতে পারিবে, এইরূপ ব্যবস্থা সকল মানুষের সমান অধিকারের নীতি বিরুদ্ধ। সরকারী-তরফ বলিতে পারেন যে তাঁহারা গৃহ, জমি, কারবারের অংশ অথবা স্বর্ণ, যাহাই লইবেন তাহার জন্য দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহার মূল্য যথাসময়ে যাহার জিনিস তাহাকে ঠিক দেওয়া হইবে। কিন্তু এই কথার জবাব হইল এই যে সম্পদ যাহা তাহা নিজরূপ ধারণ করিয়া মালিকের নিকটে থাকা আবশ্যক; তাহার একটা বিশেষ

যদি ধরাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণের মূল্য দশ বৎসর পরে পাইবার অঙ্গীকার পত্র একই জিনিস বলিয়া ধার্য্য হইতে পারেনা। কোন মূল্যবান বস্তু ও তাহার রসিদ, অথবা তাহার মূল্য সুদ-সমেত ফেরত দিবার অঙ্গীকার এক কথা নহে। সালঙ্কারা কন্যার বিবাহ দিবার সময় কন্যাকে সরকারী "বণ্ডে" সাজাইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত করা চলে না। আগেকার কালে অনেকেই কন্যাকে ৩০।৪০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিয়া সভায় উপস্থিত করিতেন। বরপক্ষ হইতেও কন্যা কিছু পাইতেন। উপহারহিসাবেও নিকট আত্মীয়দিগের দেওয়া কিছু কিছু স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যাইত ইহা ব্যতীত "মুখ দেখার" মোহর ইত্যাদিও সকলেরই দুই চারিটি থাকিত। সুতরাং স্বর্ণ ব্যবহার হঠাৎ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে বলিলেই বহু পুরাতন সামাজিক প্রথা উঠিয়া যাইবে না। কলিকাতা ও বোম্বাই-এ একটা সাধারণ গৃহের যাহা মূল্য হয় সেই মূল্যে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে দুইটি গৃহ হইতে পারে। অপরাপর ক্ষুদ্র সহরে তিনটি চারটি গৃহও ঐ অর্থে নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং সকল সহরের গৃহমূল্যের উচ্চ সীমা এক প্রকার করা সাম্যনীতি বিরুদ্ধ হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী কথা হইল মানুষ স্বোপার্জ্জিত অর্থে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না কেন? এই অর্থনৈতিক অধিকারে শাসকগণ কেন হস্তক্ষেপ করিবেন? শুনা যায় আমাদের দেশে আরও অনেক কোটি গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। গৃহের অভাবে মানুষ অতি উচ্চ ভাড়া দিয়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। গৃহ নির্ম্মাণ যত বাড়িবে ভাড়া ততই কম হইবে। এই অবস্থায় গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে সরকারী সীমা নির্দ্দেশ ইত্যাদি না করাই বাঞ্ছনীয়।

পুরাতন কালে নানাপ্রকার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ও আইন করিয়া মানুষের অধিকার বিলোপের রীতি প্রতিষ্ঠিত হইত যাহা বর্ত্তমান কালে হইলে জনসাধারণ তাহা কখনও বরদাস্ত করিতেন না। যথা আউরঙ্গজেবের জিজেয়া কর, যাহা অমুসলমানদিগকে দিতে হইত। অথবা রাজপুতনার কোন কোন রাষ্ট্রে নিয়ম ছিল যে অনার্য্যজাতির লোকেরা ঘৃত ভক্ষণ করিতে পারিবেনা। আধুনিক কালে অর্থাৎ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও বাল্যবিবাহ, সহমরণ প্রথা নিরোধ ও বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন লইয়া আইন করিতে হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উন্নতি চেষ্টা। অর্থাৎ আইন করিলেই তাহা জনহিতকর কি-না সে কথা উঠিয়া থাকে। যাহা জনহিতকর নহে তাহা সাধারণের পক্ষে কদাপি সহ্য করা সম্ভব হয় না। যাহা মানুষের স্বাধীনতা বা অন্য কোন মূল মানবীয় অধিকার খর্ব্ব করে তাহা আরই কেহ মানিতে চাহে না। কোন শাসকগোষ্ঠীর কখনও এরূপ আইন করা উচিত নহে যাহা দেশবাসী খুসীমনে মানিয়া লইতে চাহিবেন না। কারণ ঐরূপ আইন করিলে তাহা হইতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিবে এবং ফলে কোনও না কোন সময়ে ঐ শাসকদলকে অপসৃত করিয়া নূতন কোন দলকে তৎস্থানে বসাইবার চেষ্টা হইবে।

আত্মম্ভরিতার অভিব্যক্তি

আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। আত্মবিলোপ করিয়া সকলের অজানা অচেনা হইয়া থাকার ইচ্ছা যদি কখন কাহারও কাহারও মনে জাগ্রত হয়, তাহা কোন বিশেষ মানসিক অবস্থার ফল। আত্মপ্রতিষ্ঠা চেষ্টাই স্বাভাবিক এবং মানুষ সর্ব্বদাই চাহে যাহাতে লোকসমাজে তাহার নাম ও খ্যাতি সুপ্রচারিত হয়। এই নিজের নাম জাহির করার আকাঙ্ক্ষা হইতেই মানুষ বৃহৎ গৃহ, গাড়ীঘোড়া, সাজসজ্জা ইত্যাদির আয়োজন করিয়া থাকে। এই কার্য্য যে প্রশংসনীয় নহে তাহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু ইহা যদি অপরের অপকার না করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে ইহাকে সামাজিকতা বিরুদ্ধ বা অপরাধ বলা চলেনা। এবং কেহ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করিয়াছে দেখিলেই তাহা আইন করিয়া বন্ধ করার চেষ্টাও অনুচিত। কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা নানাভাবেই করা

হইতে পারে। বৃহৎগৃহ, গাড়ীঘোড়া, নিমন্ত্রণ করিয়া বহুলোককে ভুরিভোজন করান; মূল্যবান অলংকার ও পোষাক পরিধান ত আছেই ; আরও আছে টাকা দিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে নাম কেনা, সংবাদপত্রে নিজ প্রশংসার কথা প্রকাশ, নানা সভাসমিতিতে নেতৃত্ব করা ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কোনও একপ্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় বিধানে বন্ধ করা হয় তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই ঐরূপ চেষ্টা রহিত করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অর্থ সম্পদবৃদ্ধি অনেক সময়ই নাম জাহির করিবার জন্য করা হয় ; আবার যাহারা কালোবাজারী তাহারা আত্মগোপন করিয়াই সম্পদবৃদ্ধি চেষ্টা করে। শাসকগোষ্ঠী ধনিকদিগের অর্থ "ট্যাক্স" বসাইয়া কিছু কিছু নিজেদের করায়ত্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে নাম জাহির করা বন্ধ হয় না। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও সংবাদপত্রে নাম জাহির করেন তাঁহাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা চেষ্টার উপর রাজকর ধার্য্যকরা বড়ই কঠিন। কারণ অনেক সময়ই এইভাবে নাম জাহির করা সাক্ষাৎভাবে কেহ করেনা, করে বন্ধুবান্ধব চেলাচামুণ্ডার দল এবং সভাস্থলে বা সংবাদপত্রে কাহারও নামকরা অথবা লিখিতভাবে প্রচার করা হইলে সেই ব্যক্তির উপর রাজকর ধার্য্য করা সম্ভব হইতে পারেনা। যথা গান্ধিজীর নাম এতই প্রচার হইয়াছিল ও এখনও হয় যে সেই প্রচারের উপর কর বসাইলে তজ্জন্য শত শত কোটি টাকা কাহাকেও না কাহাকেও দিতে হইত। কিন্তু কেহই বলিবে না যে গান্ধিজী স্বয়ং চেষ্টা করিয়া নিজনাম জাহির করিবার জন্য ঐ প্রচারকার্য্য করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রাজকরদিবার মত অর্থও তাঁহার ব্যক্তিগতভাবে ছিল না। তাহা হইলে লোক দেখান জাঁকজমক রহিত করা (spectacular living) যদিও নীতিবাগীশ ও রাজস্ব বিশারদদিগের অতি আবশ্যক মনে হয় সে কারণে মানুষকে নানাপ্রকার নিষেধাত্মক হুকুমের বাসনে বন্ধন চেষ্টা রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বৃহৎগৃহ, গাড়ী-ঘোড়া অলংকার ইত্যাদির উপর রাজস্ব আদায় করা হইয়াই থাকে ; তাহার উপর নিষেধ বা সীমা নির্দ্দেশে বোঝা চাপাইবার কোনও আবশ্যক হয় না। অপর ভাবে নাম জাহির করা কেহ নিবারণ করিতে পারে না বা তাহার জন্য রাজকর আদায়ও হওয়া সম্ভব নহে।

রুশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য

ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে ঐ বাণিজ্য আমেরিকার পরেই পরিমাণে অধিক হয় রুশিয়ার সহিত। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া মাত্র দশ কোটি টাকার মাল ভারতবর্ষ হইতে আমদানি করিয়াছিল, কিন্তু ঐ আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায় ৩০০ শত কোটি টাকার মালপত্রে। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা আরও বর্দ্ধিত আকার লাভ করিয়া ৪০০ শত কোটি হইবে। রুশিয়ানগণ ভারতবর্ষ হইতে বহুল পরিমাণে পাট, পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্য চা, তামাক ও তুলা হইতে তৈয়ারী বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ রুশিয়া হইতে তৎপরিবর্ত্তে আনাইয়া থাকে কেরসিন তেল, রাসায়নিক সার, অ্যাস্-বেষ্টস্, ডিজেল তেল, সংবাদপত্র ছাপার কাগজ ও লৌহ ইস্পাত হইতে তৈয়ারী বিভিন্ন ধাতব বস্তু প্রভৃতি। ভারতবর্ষ হইতে আরও যে সকল দ্রব্য রুশিয়াতে রপ্তানি করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল চিনাবাদাম, সেলাইকরা পরিধেয়বস্ত্র বৈদ্যুতিক তার, সিগারেট, ব্যাটারী ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস। সোভিয়েট রুশিয়াও কি কি নূতন দ্রব্য ভারতবর্ষে পাঠান যায় তাঁহার সন্ধান করিতেছেন। এই সকল কারণে ভারত-রুশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহার ফলে ভারত ও রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় আদানপ্রদান আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে।

অপরাধের বন্যা

ভারতবর্ষের বহু এলাকাতেই আজকাল নানা প্রকার অপরাধ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোরা দেখাইয়া অথবা পিস্তল সংকেতে নরনারীকে ভয়

দেখাইয়া তাহাদের অলংকার অর্থ প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া বহুস্থলেই হইয়া থাকে। এই জাতীয় লুঠ ট্রেনে, বাসে, পথেঘাটে, সর্ব্বত্রই হইতেছে এবং ইহার কোন প্রতিকার-চেষ্টা কেহ করিতেছে বলিয়া শুনা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ট্রেনে লুঠতরাজ বন্ধ করিবার জন্ত অস্ত্রধারী প্রহরী রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন বলা হইয়াছিল কিন্তু কার্য্যে কিছু করা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। কারণ ট্রেনে লুঠপাট এখনও চলিতেছে বলিয়াই জনরব। তাহা যদি হয় তাহা হইলে প্রহরীগণ হয় নাই, নয়ত সংখ্যায় নগন্য, অথবা তাহারা ট্রেনে চক্ষু নিমীলিত করিয়াই কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ করিয়া থাকেন। রাজপথে অনেক সময় নারীদিগের কণ্ঠ হইতে গহনা কাড়িয়া লইবার কথা শুনা যায়। কখন কখন নির্জ্জন স্থানে তাহাদের ভয় দেখাইয়া হাতের গহনা প্রভৃতিও কাড়িয়া লইবার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই সকল কার্য্য যাহারা করে তাহারা নাকি সকলেই তরুণ অথবা যুবক এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা, চালচলন ইত্যাদি হইতে অনুমান করা যায় তাহারা শিক্ষিত ও সংবংশজাত। ইহা অবশ্র অনুমানের কথা এবং আজ কালো পাতলুন ও সাদা বুশ সার্টের যুগে কে কি প্রকার বংশের লোক তাহা আন্দাজে বলা সহজ কার্য্য নহে। সে যাহাই হউক, লুঠপাট যাহারা করে তাহারা যে সমাজের কোন একটা বিশেষ স্তরের মানুষ হইবেই এমন কথা বলা চলে না। সকল স্তরের মানুষই অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে ও হইয়া থাকে। অনেকে বলেন বেকার যুবকদিগেরই এই কার্য্য। কিন্তু আমরা বহু বেকার যুবকদের জানি এবং দেখি, কিন্তু তাহারা যে লুঠ করিয়া বেড়ায় এরূপ কথা আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না। যে সকল যুবক নেশা করে, জুয়া খেলে এবং অপরাপর দুর্নীতির কার্যে জড়িত হয় তাহাদের মধ্যেই সম্ভবত এই সকল ছিনতাইকারকদিগকে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেন্ট এবিষয়ে কি বলেন জানিতে পারিলে আমরা খুসী হইতাম।

যন্ত্রচালিত কারখানার যুগ ও ইস্পাতশিল্প

আধুনিক কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রগতি বিচার করিলে দেখা যায় যে যত প্রকার কারখানা আছে তাহার মধ্যে লৌহ-ইস্পাতের কারখানাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উৎপাদন কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে লৌহ ইস্পাত ব্যতিত কোন প্রকার উৎপাদন কার্য্যই চালান সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ কোন কারখানাই নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইস্পাতের কড়িবর্গা কংক্রীট ঢালাইএর ছড়, ছাদের জন্ত ইস্পাতের চাদর প্রভৃতি না হইলে নির্ম্মাণ কার্য্য অসম্ভব হয়। ইহা ব্যতীত কারখানার সহিত মাল চলাচলের জন্ত রেল লাইনের সংযোগ থাকা আবশ্যক ও তজ্জন্ত লাইন প্রভৃতি পাতা প্রয়োজন হয়। এইগুলি সব ইস্পাত দিয়া তৈয়ারী হয়। যদি রেল না থাকে তাহা হইলে লরী করিয়া মাল আনা পাঠান হইতে পারে কিন্তু লরীও প্রধানতঃ ইস্পাত দিয়া গঠিত হয়। কারখানার ভিতরে যে সকল যন্ত্রপাতি বসান হয়, সেগুলিও লৌহ-ইস্পাত বর্জ্জিত ভাবে গঠিত হইতে পারে না। তৎপরে প্রয়োজন হয় জলের ও অন্তান্ত তরল ও বাস্পীয় উপকরণের জন্ত নল। এইগুলিও ইস্পাত দিয়াই তৈয়ার করা হয়। বয়লার, বিদ্যুত সরবরাহের যন্ত্রপাতি, পাম্প প্রভৃতিও ইস্পাত না হইলে নির্ম্মাণ করা যায় না। সুতরাং যেখানে কোন দেশ কারখানা বসাইয়া নিজের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করে সেখানে সেই দেশের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন লৌহ ইস্পাতের সরবরাহ যথাযথভাবে ঠিক করিয়া লওয়া। যদি লৌহইস্পাত ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আনাইবার জন্ত বিদেশে ক্রয় ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাহইলে বহু অর্থ অযথা বিদেশে পাঠাইতে হয় ও সেই কারণে কারখানা বসাইবার ব্যয় অযথা বাড়িতে থাকে। এই কারণে দেখা যায় যে যাহারা বিদেশ হইতে লৌহ ইস্পাত ও কলকজা আমদানী করে সেই সকল দেশে আর্থিক উন্নতি সহজে হওয়া সম্ভব হয় না।

পৃথিবীতে বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত উৎপাদক দেশ হইল আমিরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রুশিয়া। এই দুই দেশই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানাসমৃদ্ধ দেশ। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রে এই দুই দেশের

কর্মক্ষমতা আশ্চর্য্যজনক। আমেরিকাতে বৎসরে চৌদ্দ কোটি টন লৌহ ইস্পাত উৎপাদন করা হইয়া থাকে। রুশিয়াতে হয় বাৎসরিক বার কোটি টন। ইহার পরেই হইল জাপান। ঐদেশে আটকোটি টন লৌহ ইস্পাত প্রতিবৎসর উৎপাদিত হয়। জার্মানির (পশ্চিম) ও বৃটেনের লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ হইল যথাক্রমে বাৎসরিক সাড়েচার কোটি ও তিন কোটি টন। ভারতবর্ষ বহু অর্থ কর্জ্জা করিয়া ও নানা দেশের সাহায্য লইয়া পরিকল্পনায় এক কোটি টন লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদন হয় তাহার দুই তৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষে ছয়টি বৃহৎ ক্ষুদ্র লৌহ ইস্পাতের কারখানা আছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া চালাইলে এইগুলি হইতে দেড় কোটি টন লৌহ ইস্পাত উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু সুব্যবস্থার অভাবে তাহার অর্দ্ধেকও উৎপন্ন হয় না। আমেরিকাতে শুধু একটি কারখানাতেই ভারতের সকল কারখানার সমবেত উৎপাদনের পরিমানাধিক লৌহ ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। সেই লৌহ ইস্পাত বহুমূল্যবান ধরনের ও তাহার মূল্য বহুশত কোটি টাকা। পিটসবার্গের ইউনাইটেড ষ্টেটস ষ্টীল কোঃ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ৩১২৫৪০০০০০০ টাকার লৌহ ইস্পাত বিক্রয় করে। মূল্যে ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লৌহ ইস্পাত বিক্রয়ের নিদর্শন। পরিমাণে জাপানের নিপ্পন ষ্টীল করপোরেশন ইহা অপেক্ষা অধিক লৌহ ইস্পাত উৎপাদন করিয়া থাকিতে পারেন। ভারতের পিছনে পড়িয়া থাকার মূলে আছে বিদেশের নিকট কলকব্জা ও লৌহ ইস্পাত ক্রয়, কর্জ্জা করিয়া কারবার পরিচালনা ও অনভিজ্ঞলোকের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করা।

পরলোকগত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে যেসকল বৈজ্ঞানিক ভারতের নাম জগত সভ্যতা, কৃষ্টি ও জ্ঞানের আসরে গর্ব্বের সহিত উচ্চারিত হইতে সাহায্য করিয়াছেন ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ বসু ভারতীয় রেলওয়েতে হিসাব বিভাগে কাজ করিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এস সি, বি এস সি, ও এম এস সি পাঠ করেন ও প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নিজের পারদর্শিতা প্রমাণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহামনীষীগণ শিক্ষকতা করিতেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পরীক্ষান্তে সত্যেন্দ্রনাথ নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ঢাকাতে রিডার হইয়া চলিয়া যান। বোস ষ্ট্যাটিষ্টিকস নামধেয় তাঁহার প্রসিদ্ধ নিবন্ধ এই সময় প্রকাশিত হয় (১৯২৪)। তিনি অতঃপর ইয়োরোপ গমন করেন ও জার্মানী ও ফ্রান্সে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত এইসময়েই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়।

ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকাতে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। পরে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও এমেরিটাস অধ্যাপক পদে অভিষিক্ত হন। ইহার পরে তিনি বিশ্বভারতীর ভাইস চ্যানসেলর নিযুক্ত হন ও ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ বৎসরে তাঁহাকে জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। ইহার পূর্ব্ববৎসরে তাঁহাকে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি ফেলো নির্ব্বাচন করেন।

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অসাধারন প্রতিভা বহুধারায় প্রবাহিত ছিল। তিনি বহুবিষয়েই অতি উচ্চস্তরের

(এরপর ৮৪ পাতায়)

রবির আলোকে

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবি যখন মধ্যগগনে, শান্তিনিকেতন যখন তাঁর উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেইসময় কৈশোরে আমার শান্তিনিকেতনে আসার পরম সৌভাগ্যলাভ হয়।

সকাল সাড়ে ছ'টা হতে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণ তাঁর অব্যবহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গ পেয়েছিলাম।

সকালে তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন, দুপুরে সেই ক্লাসের পাঠ তৈরি করতেন, বিকেলে কখনো কখনো বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সন্ধ্যায় আমাদের দিয়ে নাটকের মহড়া দেওয়াতেন। রাত ন'টায়, পালাক্রমে, ঘরে ঘরে গল্প বলতেন। এর উপরেও যে-কোনো সময়, তাঁর ঘরে, আমাদের অবাধ গতিবিধি ছিল।

বাল্যকালে, তাঁকে বিচার করে বোঝবার জ্ঞান হয়নি, কিন্তু যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে এবং আজ সপ্ত-তোত্তরে, তাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে করতে মুগ্ধ হয়েছি।

প্রথমেই বলে রাখি—আমি অন্ধভক্ত নই। যৌবনে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, তাঁকে কখনো 'গুরুদেব' বলিনি। 'দেব' শব্দের উপরেই আমার আপত্তি ছিল—আজও আছে।

'গুরুবাদ' তিনি নিজেও পছন্দ করতেন না—আমি তাঁর পুত্রসম আশ্রমিকও পছন্দ করিনা।

তাঁর নানাগুণের মধ্যে যে-গুণ আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে তা'হলো "পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা"। যা পৃথিবীতে অতি দুর্লভ।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ স্বপাক-ভোজী ব্রাহ্মণ; জাতিভেদে বিশ্বাসী এবং খাওয়াছোঁওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিপরীত[1], তা সত্বেও ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এবং বিশ্বভারতীতে, তাঁর আসন ছিল—রবীন্দ্রনাথের পরেই। বিশ্বভারতীর প্রথমযুগে, আচার্য বিধুশেখরই ছিলেন বিশ্বভারতীর (বিদ্যা-শিক্ষা-কলা-সঙ্গীত-ভবনের) সর্বাধ্যক্ষ।

বিশ্বভারতীতে এত বড় অধিকার, কবির জীবিত-কালে, আর কোনো অধ্যাপক পান নি।

নানাবিষয়ে মতানৈক্য সত্বেও, তাঁর প্রতি রবীন্দ্র-নাথের যত শ্রদ্ধা, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁরও তেমনি শ্রদ্ধা ছিল।

ছাত্রছাত্রী এবং কর্মীদের মধ্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের মতাবলম্বীর সংখ্যা, রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বীর চেয়ে কম ছিলনা—বরং বেশিই ছিল। তার জন্যে কবির অনেক পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি হতো। কবি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে থাকতেন।

মতবিরোধের জন্যে কোনো (সক্রিয়) ব্যক্তিকে তিনি আশ্রম ত্যাগ করতে বলেননি।

এবিষয়ে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি।

অধ্যাপক তেজেশচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন পুরাণো কর্মী। তিনি উপাসনামন্দিরের পাশেই একটু জায়গা চাইলেন—তাঁর কুটীর তৈরির জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বল্লেন যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং মন্দিরের পাশে থাকলেও মন্দিরে যাবেন না।

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন:

"তাতে কি! তুমি নিজের বিশ্বাস মত চলো।"

ঈশ্বরে বিশ্বাসী কবি, কেবল তাঁর মন্দিরের পাশে নয়, তাঁর কাব্যেরও পাশে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তেজেশ চন্দ্রকে স্থান দিয়ে গেছেন[2]।

এইরূপ বিস্ময়কর বা বিস্ময়করতর ব্যাপার আরো প্রত্যক্ষ করেছি।

[নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক] বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন-রত এক তরুণ, শান্তিনিকেতনের স্বাধীন পরিবেষ্টনীতে মানুষ হয়ে, এমন কতকগুলি কবিতা লেখে—যা ভগবদ্-বিশ্বাসীকে আঘাত দেয়।

সেই কবিতাগুলিই কিনা তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিয়ে এলো।

তার বিশ্বাস কবিতাগুলি পড়ে কবি রাগও করবেন না। তবু অধীর উদ্বেগে তার রাত কাটলো।

প্রত্যুষেই সে উত্তরায়ণে গেল। দেখলো কবি "উদয়ন"-এর দোতলা থেকে নামছেন—হাতে তাঁর তারই কবিতার খাতা।

রবীন্দ্রনাথ তরুণ কবিটিকে দেখেই বল্লেন:

"কবিতাগুলি ভাল হয়েছে হে।"

তরুণ চমকে উঠে বল্লে—"আপনি ভগবদ্ ভক্ত হয়ে একথা বলছেন।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন:

"কবির কী মত, তা তো আমার দেখবার নয়। কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা—এই আমার দেখবার। কবির অন্তরের ভাব, কবিতায় রূপ পেয়েছে, তাই আমার ভালো লেগেছে। তোর সঙ্গে আমার মতের মিল নাই বা হলো।"

সেই কবিতাগুলির সামান্য কিছু উদাহরণ দিলে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় কত উদার ছিল—পরিচয় পাওয়া যাবে:

একমাত্র বেদান্তের কথা জেনো সার।
নির্গুণ ঈশ্বর। কোনো গুণ নাই তার।
নির্গুণ সে। স্থাণু সে যে। অসাড়। অচল।
তার কাছে ফেলো নাকো বৃথা অশ্রুজল।
রাজরাজেশ্বর তিনি। সর্বশক্তিমান।
দীনবন্ধু। পিতা তিনি করুণানিধান।
অনশনে পুত্র যাঁর জীর্ণ-শীর্ণ দেহ,
রাজরাজেশ্বর তিনি নাহিক সন্দেহ।
কর্দমপঙ্কিল পথে ধায় ক্ষুদ্র মন,
নাই কোনো শক্তি তারে করিতে দমন,
এত অসহায় হায়। যাহার সন্তান,
তিনি কিনা পিতা তার সর্বশক্তিমান।
দীনবন্ধু। তাই বুঝি দীন দুঃখী সবে
গগন ভরায়, ওই ঘোর আর্তরবে।
আপন সন্তানে যাঁর করুণা এমন,
করুণানিধান তিনি—বোঝো তা কেমন।
সুরসিক বিশেষণ দিল ব্যঙ্গচ্ছলে,
তাই আজি সত্য ভাবে, সবে, ধরাতলে।
কে সৃজিল মানবের এ মহান প্রাণ?
নিঃশেষে যে আপনারে করে ফেলে দান?
করুণায় গলে যায় অপরের দুখে,
আপন বক্ষের অস্থি দেয় হাসিমুখে।
নিখিলের অবজ্ঞাত দীন দুঃখী তরে
পুণ্যপ্রাপ্ত শুদ্ধ-তনু সঁপি অকাতরে
ক্রুশ 'পরে, তিলে তিলে করে আত্মদান,
সে-প্রাণ সৃজেনি কভু স্থাণু ভগবান।
"দাও তাঁরে সব তব।"—এ মহাবচন
জানি না তা কবে কোন্ অরণ্যভিতরে
কোন্ গুণ দেখে তার আরণ্যকগণ
উচ্চারিল উচ্চকণ্ঠে, ভক্তিমগ্ন স্বরে।
দিই যদি কী পাইব? দিব বৃথা মোর
সব প্রেম, সব স্নেহ, সঁপি তার পা'য়?
ভক্তিনেশা এত মোরে করেনি বিভোর।
কী বলেছে আরণ্যক? পাব শেষে তায়?
নির্গুণ যে, স্থাণু, জড়। অসাড়। অচল।
তারে পেয়ে আমাদের কী হইবে ফল?

এইরূপ গোটা পনের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের মত একান্ত ভগবদ্ বিশ্বাসী মানুষ কাল বিলম্ব না করে 'ধৈর্য ধরে' পড়লেন এবং নিজের মতামতের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে' উক্ত তরুণ কবির প্রশংসা করলেন—এটা তখন আমাদের সকলকেই চমকিত করেছিল।

আশ্রমের বালকবালিকাদের কবি ছিলেন পিতা বা পিতামহের ন্যায়—বা একাধারে পিতা-মাতা পিতামহ-মাতামহের ন্যায়।

পাঁচ ছ'বছরের শিশুরা শান্তিনিকেতনে এসে সপ্তাহ দু'সপ্তাহের মধ্যে গৃহ ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে যেতো। আশ্রমের মনোরম পরিবেশে, সেই অপূর্ব সুন্দর পুরুষের মধুর অন্তরঙ্গ সাহচর্যে এবং গুরু ও গুরুপত্নীদের হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহরসে অভিষিক্ত হয়ে কোনো কোনো শিশু ছুটিতেও বাড়ী যেতে চাইতো না।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে, সেকালের কথা যখন বলি, তারা তখন তা রূপকথার মত মুগ্ধ হয়ে শোনে। সবাই তা বিশ্বাস করে কিনা বলা কঠিন। বড়রা অনেকেই ভাবেন—এর অধিকাংশই অতিরঞ্জন। এযুগে একথা বিশ্বাস করা সুকঠিন।

নববর্ষের-দিনে, বৈশাখমাসে তাঁর কথা বেশি করে মনে পড়ে।

"শান্তিনিকেতনের বাইরে যেখানেই থাকি না কেন, নিতান্ত বাধা না পড়লে নববর্ষে আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি—" কবির মুখে এভাবের কথা, একাধিকবার শুনেছি।

প্রথম প্রথম, শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখেই তাঁর জন্মোৎসব হতো। তখনকার তরুবিরল, মরুসম শান্তিনিকেতনে, সে-সময় অসহ্য গরম। তার উপর নিদারুণ-জলকষ্ট। সবকটি পুরাণো কুয়োর এবং নূতন ইঁদারাটার জলও শুকিয়ে আসতো।

আমার ছাত্রাবস্থায়, কখনো কখনো, স্নানের জলও সকালে "রেশন"-এ দেওয়া হতো। প্রত্যেককে সাধারণ 'মগের' আট মগে স্নান সারতে হতো—দু'পাশে ক্যাপ্টেনরা দাঁড়িয়ে দেখতো—কেউ "আটমগের" বেশি জল খরচ করছে কিনা।

একবার ওই আটমগের "রেশন"ও দু'মগে নামে।"

কোমলহৃদয় কবি বল্লেন :

"আমার জন্মদিন, নববর্ষের দিনেই করো। কেবল আমার জন্মদিন পালন করার জন্যে, শিশুরা এখানে থেকে এইভাবে কষ্ট পাবে—এ আমার পক্ষে অসহ্য।"

সেইথেকে নববর্ষের দিনেই কবির জন্মোৎসব করা হচ্ছে। যাঁরা আশ্রমে থাকেন পঁচিশে বৈশাখ-এ তাঁরা নামমাত্র জন্মদিন পালন করেন।

কবি নিজে গরমকে গ্রাহ্যই করতেন না। রবি কি তাঁর উত্তাপকে সইতে পারবেন না ?

সেকালের শান্তিনিকেতনে, মধ্যাহ্নে, সমস্ত দরজা-জানালা-খোলা-গৃহে, কবি নিদাঘের প্রচণ্ড রূপ, একাগ্রচিত্তে ধ্যানস্থ হয়ে দেখতেন, নিদারুণ উত্তপ্ত ঝোড়ো হাওয়ায়, তাঁর চুল দাড়ি উড়ছে—সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

এইভাবেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, বৈশাখের রুদ্ররূপের জলন্ত বর্ণনায় কাব্য ও সঙ্গীত রচিত হয়।

বাইরের লোকে কি কবির এ জীবনের সন্ধান রাখেন ?

তাঁরা ভাবেন—কবি ধনীর সন্তান। সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে, আরামে দিন কাটিয়েছেন।

"দারুণ অগ্নিবাণে"র আঘাত, তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, হাসিমুখে বুক পেতে নিয়েছেন। তাঁর পঞ্চাশোত্তর বয়সেও তা দর্শন করেছি।

"দেহলী"র দোতলায় ছোট্ট ঘরখানিতে, ছাদ যার 'অ্যাসবেস্টাসের,' সেখানেই তাঁর কত গ্রীষ্ম কেটে গেছে।

তারপর তৃণগুল্মহীন ঊষর ভূমিতে নির্মিত উত্তরায়-ণের খোড়ো কুটীরে, তাঁর বছর কেটেছে।

উত্তরায়ণের প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পরও শ্যামলীর ক্ষুদ্রকুটীরে তিনি দিন কাটিয়েছেন। বিজলীপাখা তো তাঁর শেষজীবনে শান্তিনিকেতনে আসে।

তাঁর যে অনন্যসাধারণ গুণের কথা, প্রথমে বলেছি —যা এই পুরাতন আশ্রমবাসীর বিবেচনায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ—এখন তারই বিশিষ্ট এক উদাহরণের উল্লেখ করে এই স্মৃতিকথা সমাপ্ত করি।

কবির জ্যেষ্ঠ-সোদরোপম সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিধবাপত্নী সপরিবারে শান্তিনিকেতনেই বাস করতেন। তাঁর দুটি পুত্র অকালে চলে গেছেন।

অবশেষে তাঁর অবশিষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্রও ১৯২৬ সালের পূজা-বকাশে মধ্যবয়সেই মারা গেলেন।

অবিবাহিতা কন্যা রমা (নুটু)র উপর সংসারের ভার পড়লো। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শান্তিনিকেতনে অদ্বিতীয়া, সুললিতকণ্ঠি রমা (নুটু) সঙ্গীতভবনের অধ্যাপিকা। তিনি তাঁর কনিষ্ঠা দুটি ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

প্রায় বছর ৪।৫ পরে, সংসারের ভার যখন অনেকটা লঘু হলো তখন তিনিও নিজের বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ

করলেন। তাঁর মনোনীত পাত্র অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কর।

বৈদ্য-কায়স্থে অসবর্ণ বিবাহ। তখন তা উভয়বংশের অধিকাংশস্থলেই অচল। "ছুটুর মা" সেযুগের আচার-নিষ্ঠা বিধবা। এ বিবাহে তাঁর মত হবার কথা নয়। কিন্তু কন্যার প্রতি অপরিসীম স্নেহে, তিনি এ-বিবাহে সম্মতি দিলেন। তবে কেবলোগম রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন—যেন খাঁটি হিন্দুমতে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে এই বিবাহ হয়।

শোকসন্তপ্তা বৌঠানের প্রতি পরম স্নেহশীল সহৃদয় কবি, ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্ধান করতে লাগলেন। সাধারণ গ্রাম্য পুরোহিত তো রাজি হোলই না, তাঁদের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকও কবির অনুরোধ রক্ষা করলেন না।

যাই হোক কবির আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়েই ১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখে শুভদিনে এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং পুরোহিতকে নির্দেশ দেন—শালগ্রাম শিলা আনিয়ে হোম করে সম্পূর্ণ হিন্দুপদ্ধতিতে এই বিবাহ দিতে।

শুধু তাই নয়, কন্যাকর্তার ন্যায়, প্রথম থেকে সেই বিবাহে উপস্থিত থেকে তিনি শ্রদ্ধাভরে ৫ সেই অনুষ্ঠান দর্শন করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রায় শেষেরদিকে রাত্রি অধিক হওয়ায় পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে ক্লান্ত কবি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

একাধারে এইরূপ অসামান্য দরদী হৃদয় এবং পরমতের প্রতি আশ্চর্য শ্রদ্ধা আমি দেখি নাই। হয়ত আমার মত আরো অনেকেই কোথাও দেখেন নি।

১ শাস্ত্রীমহাশয় তথাকথিত 'হরিজন' হস্তের পানীয় পর্যন্ত পান করতেন না—এদিকে আবার এন্ড্রুজ সাহেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেন। এন্ড্রুজকে তিনি বলতেন—ব্রাহ্মণ, বোধিসত্ত্ব। তাই বলে তাঁর হাতের পানীয় পান করতেন না।

২ দ্রষ্টব্য—"কুটিরবাসী" বনবাসী, রচনাকাল, চৈত্র, ১৩৩৩ [রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৬০-৬২]।

৩ ছাত্রদের 'সাহিত্যসভায়' প্রথমে রচিত কবিতাটি পাঠ করে তরুণ কবির বড় তিক্তঅভিজ্ঞতা হয়েছিল। সভাপতি এক বিশিষ্ট অধ্যাপক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

৪। কবিতাটির প্রথম ও শেষ দুটি পংক্তি। এটিই 'সাহিত্য সভা'য় পঠিত হয়। "নবজাতক" পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪) 'লোকায়তশর্মা' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে।

৫। বিবাহের পরদিন সকালে তরুণ পুরোহিত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। কবি রেগে আগুন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন :

"এরা বর্বর। এরা হার্মাদ। বিবাহ যে জীবনের কত বড় পবিত্র অনুষ্ঠান—তা এরা বোঝেনা ;

"আমার নন্দিতার বিয়ে আমি এ বরের জায়গায় দেবনা।"

"সাধুর রাগ জলের দাগ"—নন্দিতার বিবাহ কবি শান্তিনিকেতনেই দিয়েছিলেন—তবে এক প্রীষ্মের বন্ধে।

রবীন্দ্রনাথ যে কত শ্রদ্ধাভরে সেই অনুষ্ঠান দর্শন করেছিলেন—তা বোঝাবার জন্যে—এর উল্লেখ করলাম।

পুনর্যাত্রা—স্মৃতিপথে

পরিমল গোস্বামী

উড়ন্ত চাকির কথা

ফ্লাইং সসার, যার বাংলা নাম হয়েছে উড়ন্ত চাকি, তা নিয়ে মাঝে মাঝে খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হয় ইউরোপ বা অ্যামেরিকায়। সংক্ষিপ্ত নাম UFO, সম্পূর্ণ কথাটি Unidentified flying objects এ জিনিষ অনেকে দেখে, অনেকে দেখে না। অতএব এ নিয়েও দুটি দল আছে। বিরোধী দলের সভ্যসংখ্যাই বেশি। ১৯৫৭ সনের মে মাসে এক অদ্ভুত খবর, বেরিয়েছিল এ বিষয়ে। সেই খবর এবং আমি ঐ বছর ১৯শে তারিখে যে মন্তব্য করেছিলাম তা মোটামুটি এই—

সম্প্রতি উত্তর ফ্রান্সের কোনো স্থানে একটি উড়ন্ত চাকির ও মঙ্গলগ্রহের চারজন মানুষকে সেই চাকি থেকে নামতে দেখা গিয়েছে। তা নিয়ে সেখানে ভীষণ উত্তেজনা। এদের প্রথম দেখে একজন বিদেশী লোক সে এসে খবর দেয়—রেল ষ্টেশনের কাছে চারজন অন্য গ্রহের লোক তার দিকে ছুটে আসতে সে দেখেছে। তাদের পোশাক ধূসর রঙের। আরও কয়েকজন লোক ও রেল ষ্টেশনের প্রহরী দেখতে পায় একটি অদ্ভুত যন্ত্র থেকে লাল ও শাদা রঙের আলো বেরচ্ছে যদিও সে আলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দেখতে না দেখতে যন্ত্রটি উড়ে চলে গেল। সবাই বুঝতে পারল এরই নাম উড়ন্ত চাকি।

স্থানীয় মেয়র প্রচার করলেন যাঁরা এই উড়ন্ত চাকি দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি তাঁদের বললেন, যাকে আপনারা উড়ন্ত চাকি ভেবেছেন সে কোনো যন্ত্র নয়, সে আমার স্ত্রী। তার হাতে একটি লাল লণ্ঠন ছিল, সে ঐ লণ্ঠন হাতে নিয়ে আমাদের চারটি গোরুর খোঁজে বেরিয়েছিল। আপনারা সেই চারটি গোরুকেই মঙ্গল গ্রহের চারটি মানুষ মনে করেছিলেন।

চিরকাল পৃথিবীতে এই জাতীয় মতভেদ আছে। সংসারে যা কিছু দ্বন্দ্ব বিরোধ হানাহানি সবই এই থেকে। এই দুই বিপরীত পক্ষের মধ্যে কার মত গ্রাহ্য তা বলা শক্ত। আপেক্ষিকবাদ যদি সত্য হয় তা হলে প্রত্যেকে সত্যই স্থান কাল ও বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কোনো জিনিষই অন্য—নিরপেক্ষ ভাবে সত্য হতে পারে না। কোন জিনিষ সত্য কি মিথ্যা তা অনেক সময় আমাদের মনের বিশেষ ভঙ্গি বা attitude এর উপরেও নির্ভর করে। তাতে অন্যায় হয় না কিছু। এটা সংসারের নিয়ম। তাই ফ্রান্সের সেই বিশেষ শহরে যে ব্যক্তিরা সন্ধ্যায় মেয়রের স্ত্রীকে উড়ন্ত চাকি এবং চারটি গোরুকে গ্রহান্তের মানুষরূপে দেখেছিল একথা সত্য মনে হয় না। এবং মেয়র যে সেই উড়ন্ত চাকিকে তাঁর স্ত্রী রূপে এবং চারটি মঙ্গলগ্রহের লোককে গোরু রূপে দেখেছেন, সেটিও মিথ্যা নয়। বলেছি, সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক এবং তা স্থান কালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় এই যে—ফ্রান্সের লোকেরাই অন্য সব দেশের চেয়ে উড়ন্ত চাকি ও গ্রহান্তরের লোক বেশী দেখে কেন। এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে একবার আলোচনা করেছিলাম। সে সময় সেখানে এত বেশি লোক উড়ন্ত চাকি দেখতে আরম্ভ করেছিল যে আমি একটু হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ফরাসীজাতটা খুব কল্পনাপ্রবণ জানতাম, কিন্তু সবারই কল্পনা যদি একটি বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন আর তাকে কল্পনাপ্রবণতা বলি কি করে। তাই হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই ফ্রান্স সম্পর্কে আরও একটি খবর প্রকাশিত হয় যা থেকে জানতে পারি ও জাতির কল্পনাপ্রবণতা কমেনি, উপরন্তু ওদের মধ্যে শুধু মদ্যপান অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে।

এমন ইঙ্গিত উড়ন্ত চাকিপক্ষীয়দের মনোমত হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ থেকে মানুষ আসা বহুদিন বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫৭ সনেও আসতে পারে এমন কল্পনা কিকরে হল বোঝা যায় না। সম্ভবত এইচ, জি, ওয়েলেস্ এর "ওয়র অভ দি ওয়ার্লডস' বই (১৮৯৬) প্রকাশ হওয়ার পর থেকে এ-বিষয়ে মিথ্যা গুজব পল্লীগ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত ১৯১০ সনের কাছাকাছি সময়ে দূরে পল্লীতে এ ঘটনা সত্য বলে প্রচারিত ছিল। ঐ বইয়ের ঘটনা ও বর্ণনা কি তা কিছুই না জেনে মঙ্গলগ্রহের লোক এসেছিল এইটুকু মাত্র গ্রাম্য জীবনের গুজবে অনুপ্রবেশ করেছিল। শুনেছিলাম মঙ্গলগ্রহের মানুষের নাক খুব লম্বা এবং তারা নাক দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে।

মনের ওষুধ

এই সময় ট্রাংকুইলাইজার নামক উদ্বেগ ভোলানো ওষুধের খুব প্রচলন আরম্ভ হয়। এ ওষুধের কুফল সম্পর্কে আমার চিকিৎসক পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া আমি কোনো ওষুধই খাই না, এমন কি অ্যাসপিরিনও না। আত্ম চিকিৎসার বিপদ বিষয়ে আমি অত্যন্ত সচেতন এবং সতর্ক। তাই আমার পক্ষে নিচের এই কাহিনীটি লেখায় উৎসাহ এসেছিল। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ ২৬শে মে :

গত ১৫ই মে তারিখে রাত্রিবেলা জনৈক চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম একটি প্রয়োজনে। সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধু একবার মাথা ঘোরার কষ্ট পাচ্ছিলেন, সে সময় এই চিকিৎসকই তাকে সারিয়ে তোলেন।

আমার কাজ শেষ হলে চিকিৎসক আমার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন মানসিক উত্তেজনা কমানোর একটি ওষুধের নমুনা এসেছে তাঁর কাছে: দুটি বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের দুটি নমুনা একই ওষুধের। বলে তিনি নমুনা দুটি সামনে বের করলেন। সম্পর্কিত বিবরণ-সাহিত্যও ছিল তার সঙ্গে। আমাদের দুজনেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়ল দুটি প্যাকেটের উপর। আমরা প্রায় একই সঙ্গে দুটি নমুনা প্যাকেট ছোঁ মেরে নিলাম চিকিৎসকের টেবিল থেকে এবং কালবিলম্ব না করে উঠে পড়লাম। চিকিৎসকের শেষ কথাটি কানে গেল, বেশি খেলে সংসারে বিরাগ হতে পারে, একটু সাবধানে থাকবেন।

ঘরে ফিরে কিছু শান্ত হওয়ায় পরে মনে একটি প্রশ্ন জাগল। একটি গুরুতর প্রশ্ন। মনে হল—গিয়েছিলাম এক কাজে কিন্তু নিয়ে এলাম স্নায়ুব্যাধির ওষুধ, এর মধ্যে কার্য কারণ সম্পর্ক কিছু আছে কি? চিকিৎসকের মনে ঠিক ঐ ১৫ই তারিখেই স্নায়ু-উত্তেজনা নিবারক ওষুধের কথা কেন এলো? এবং আমরাও নিজ নিজ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে দুটি নমুনা প্যাকেট কেন নিয়ে এলাম? দুশ্চিন্তাজাত স্নায়ুব্যাধির anxiety neurosis ওষুধের কথা ১৫ তারিখের আগে মনে পড়েনি কেন? আগেও চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ঘটনার কোনোটাই বানানো নয়। ঐ ওষুধ ওষুধের প্রসঙ্গ, এবং তারিখ নিয়ে কোনো রসিকতাই করছিনা, কেন না যা বলছি তা প্রায় আমার নিজের মনের সঙ্গেই বোঝাপড়া। অনেক ঘটনারই তো আমরা ব্যাখ্যা জানিনা। সব কিছুর কার্য্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বেড়াই উন্মাদের মতো। "আগে ও পরে" চিহ্নিত করতে পারি যে কোনো দুটি পর পর ঘটা ঘটনাকে। কিন্তু তারা পরস্পর কার্য কারণ সম্পর্কে বাঁধা কি না তা সব ক্ষেত্রে জোর করে বলতে পারি না। এমন অনেক দুটি ঘটনা ঘটে, যেখানে একটি ঘটলে অপরটি তাকে নিশ্চিত অনুসরণ করে, অথচ তাদের একটি অপরটির কারণ কিনা জোর করে বলা যায় না। আবার যেখানে সম্পর্ক নেই মনে হয়, সেখানে দেখা যায় তারা কার্যকারণ সম্পর্কে বাঁধা।

বাড়িতে ফিরে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোর বেলা জেগে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দু চার লাইন পড়তেই চট করে মাথাটা ঘুরে উঠল। চারদিক অন্ধকার। টলতে টলতে উঠে এসে কোনো রকমে সেই নমুনা বড়ির একটি মুখে দিয়ে

কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম, তারপর উঠে বাকী খবরটুকু পড়ে ফেললাম। ভারতের অর্থমন্ত্রী আমাদের সবার উপরে নতুন ট্যাক্স ধরেছেন। এ ট্যাক্সের হাত থেকে এবারে কারো পরিত্রাণ নেই। ভারতে এমন পপুলার ট্যাক্স সম্ভবতঃ এই প্রথম। প্রথমে পড়ে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম, কেননা মধ্যবিত্ত আমি এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত, মানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যবিত্ত। তাই এই ভয়।

অ্যাংজাইটি নিউরোসিসের ক্রিয়া। চারিদিকে কাল্পনিক সব শত্রু দেখতে লাগলাম, তরোয়াল ঘোরাতে লাগলাম তাদের বিরুদ্ধে।

আমি একা, সাঙ্গোপাঙ্গহীন একা। উত্তেজনায় কাঁপছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, মিনিট পনেরো যেতে না যেতে মন ক্রমে শান্ত হতে লাগল। আরও কিছু পরে আরও শান্ত, এমন কি খবরের কাগজের উত্তেজক সব খবর পড়ে প্রতিদিন যেমন স্ফূর্তিবোধ করি, ট্যাক্সের খবরেও ঠিক তেমনি স্ফূর্তিবোধ করতে লাগলাম।

উৎসাহিত হয়ে দুপুরে আরও একটি বড়ি খেলাম। এবারে ফল ফলল আরও বিস্ময়কর। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল ট্যাক্স অত্যন্ত কম ধরা হয়েছে। আরও বেশী ধরা উচিত ছিল। কেন ধরবে না? ট্যাক্স ধরার আগে কি খুব সুখে ছিলাম?—এই জাতীয় সব দার্শনিক তত্ত্ব এবং প্রশ্ন জাগল মনে, তারপরে মন সহসা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। মনে হল যেন অর্থমন্ত্রী সম্মুখে এসে গান ধরলেন "সব দিবি কে, সব দিবি পায়, আয় আয় আয়।"

সাধু সাবধান!

সাধু কথাটা বর্তমানে অনেক সময় বিদ্রূপের ভাষা হয়ে পড়েছে। কেন এমন হল তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। ১৯৫৭ সনের ২ রা জুন আমি লিখলাম

বাংলা ভাষার একটি কথার অর্থে সম্প্রতি বদল ঘটেছে। সেইটে লক্ষ্য করে চমৎকৃত হচ্ছি। কথাটা "সাধু সাবধান।" এর অর্থ, অসাধু লোক সংসারে আছে, তাদের হাতে যে কেউ যখন তখন প্রতারিত হতে পারে, অতএব তাদের হাত থেকে সাবধান। ধ'রে নেওয়া হয়েছে, যারা প্রতারিত হয় তারা সাধু বা 'অনেষ্ট'। এই সাধু সাবধান কথাটির সাধু শব্দটি সম্বোধন পদ। হে সাধু সাবধান।

কিন্তু সাধু সাবধান কথাটি তৎপুরুষ সমাসে রূপান্তরিত হয়েছে—পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসে। এর ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে সাধু থেকে সাবধান। অর্থাৎ সাধুর হাতে পড়ো না, তার হাত থেকে সাবধান থেকো। সাধুদের চরিত্র পরিবর্তনেই হোক, অথবা অসাধু সাধু সাজার দরুনই হোক, সাধুরা এখন সমাজের চোখে ক্রমেই বিভীষিকাপূর্ণ মূর্তি ধারণ করেছে। খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিন সাধুদের নানা অপকীর্তির কথা পড়া যাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেদের উপর তাদের দৃষ্টি। অজ্ঞান করে অথবা সম্মোহিত করে কি সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? জানিনা। তবে ছদ্মবেশী সাধুর সংখ্যা এদেশে অনেক দিন থেকেই বাড়তে আরম্ভ করেছে।

আমার বিশ্বাস, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর একটি ব্যঙ্গ কবিতায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রথম। সাধুর খুব প্রশংসা হচ্ছে। বিশ্বাসও হচ্ছে প্রকৃত সাধু বলেই তবু বক্তা গোপনে বলে দিচ্ছেন, যাইহোক তোরা ঘটিবাটি সামলা। দ্বিজেন্দ্রলালের এ উপদেশ মহামূল্য উপদেশ। এ শুধু ভণ্ড সাধু সম্পর্কেই নয়, এটি সকল জাগতিক বিষয়ে মনের একটি দিক মুক্ত রাখার জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ। রাষ্ট্রীয় আইনে যেমন অপরাধীকে তার অপরাধের সম্পূর্ণ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী না হতেও তো পারে এমনি চোখে দেখার নির্দেশ আছে, সমাজে তেমনি যে কোনো সাধুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার আগে সাধু না হতেও তো পারে এই রকম সন্দেহ মনে জাগিয়ে তোলা ভাল।

কোনো জিনিষ চট করে বিশ্বাস করার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। বিশ্বাস করার ক্ষমতাও সবার আছে। প্রকারন্তরে সন্দেহ করার ক্ষমতাও আমাদের অনেকেরই নেই। নিজে যা করে যাচ্ছি তাই

ঠিক, একথা ভাবাও সম্ভবত ঠিক নয়। নিজের কাজেও মাঝে মাঝে সন্দেহ করা উচিত। লেখার সময় বানান সম্পর্কে যেমন অনেকের সন্দেহই হয় না যে, ভুল করেছেন। এই সন্দেহের অভাবে তাঁরা অভিধান খোলেন না। লেখকদের অনেকের এ বানান বিষয়ে সন্দেহ হয় না বলে বাজারে অভিধান এত কম বিক্রি হয়। সন্দেহ করা মানুষের একটি বড় ক্ষমতা। সন্দেহ করার ক্ষমতাকে পুষ্ট করা দরকার, সন্দেহের ক্ষেত কর্ষণ করে তাতে সন্দেহের বীজ বপন করা দরকার। এর জন্য জাতিগতভাবে প্রচণ্ড প্রয়াস প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা শুধু সন্দেহের জোরে এত বড় শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তাঁরা এই পৃথিবীর এবং আকাশের ভৌগোলিক সীমা বহু বিস্তৃত করেছেন শুধু সন্দেহ শক্তির বলে। যিনি যা জ্ঞান প্রচার করেছেন, আর একজন এসে সে জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন জ্ঞান প্রচার করেছেন। ধাপের পর ধাপ এইভাবে চলেছেন তাঁরা এগিয়ে। কখনও কোনো একটা জায়গায় এসে পূর্ববর্তীদের সব কথা বিশ্বাস করে তাঁরা থেমে থাকেন নি।

আমরা জাতিগতভাবে যে আজ এত দুর্বল তার একমাত্র কারণ সব বিষয়েই আমাদের কেমন যেন একটা অন্ধ বিশ্বাসের ভাব। আমরা সব কিছু বিশ্বাস করার জন্য সদা প্রস্তুত। আমাদের মনে সন্দেহ সহজে জাগে না। আমরা জাতিগতভাবে সকল সন্দেহের দায় সরকারের সি আই ডি বিভাগকে সমর্পণ করে সুখে আছি। যেন ওরা থাকতে আর কেন মিছিমিছি খেটে মরি।

বিবাহ ব্যাপারটা যে কোন্ শ্রেণীতে পড়ে তা নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়ে আসছে পৌরাণিক কাল থেকে, কিন্তু কোনো মতেই বিবাহকে কোনা বিশেষ একটা নাম দেওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলেন এটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কেউ বলেন এটি চুক্তিমাত্র, কেউ বলেন এটি বিশুদ্ধ ব্যবসা। একটি খবর থেকে আমি এ বিষয়ে যেভাবে চিন্তা করেছিলাম তার বিবরণ দিচ্ছি। বলা বাহুল্য আমার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত খুব যে উচ্চশ্রেণীর হয়েছে অথবা এ বিষয়ে যা বলেছি তা যে শেষ কথা হয়েছে এমন আমার মনে হয় না। কিন্তু ১৯৫৭, ৩০ শে জুন যা বলেছিলাম তার অংশ এই—

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেসব আইন তৈরী হয়েছে তাতে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এই সব ত্রুটি মাঝে মাঝে ধরা পড়ে প্রয়োগের ক্ষেত্র এলেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

গত সপ্তাহে হুগলি থেকে পি টি আই একটি খবর পরিবেশন করেছেন। সেখানে কোন গ্রামে এক যুবক একজায়গায় বিয়ে ঠিক করে এবং পণ্যস্বরূপ কিছু টাকা অগ্রিম নেয় (রসিদ দিয়েছিল কিনা উল্লেখ নেই)। ইতি মধ্যে সে দ্বিতীয় আর এক জনের বাড়ি থেকে আরও বেশি টাকা পণ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেদিকেই আকৃষ্ট হয় এবং শেষোক্ত স্থানেই বিয়ে করবে বলে নিমন্ত্রণ পত্রাদি বিলি করে। প্রথম জনের পক্ষ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আদালতে নালিশ করেছে এবং বিবাহ বাণিজ্যপথের অভিযাত্রী যুবকটিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিবাহকে বানিজ্যপথ বলছি কারণ অন্যান্য বাণিজ্যের মতোই বিবাহ একটি বাণিজ্য। এতে মূল্যের বদলে সামগ্রী লাভ হয়। এরই নাম পণ। রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিবাহ করেছিলেন তখন থেকেই এই পণের প্রচলন। তখন দাবি ছিল কন্যা পক্ষের। সীতার ক্ষেত্রে এই পণ ছিল হরধনু ভঙ্গ। নগদ টাকা নয় শুধু ধনুভঙ্গের শক্তি-পণ বিনিময়ে স্ত্রী লাভ। এখনও পণ আছে এবং তার নামও ধনুক ভাঙা পণ, কিন্তু সেটি প্রতীক অর্থে, এই ধনুক ভাঙা পণ হচ্ছে নগদ টাকা ও আনুষঙ্গিক দানসমগ্রী।

অর্থাৎ বিবাহ খাঁটি বানিজ্যের স্তরে উন্নীত। বাণিজ্য সামগ্রী বিক্রয়ের নিয়ম হচ্ছে যিনি বেশি দাম দেবেন তাঁকে বেচা to the highest bidder, এটি আদৌ বে-আইনি নয় তবে শর্তভঙ্গ বে-আইনি বটে। এইখানে ওঠে আইনের ত্রুটির কথা। শর্ত ভঙ্গ কিসের? যে ছেলে

কোনো মেয়েকে যখন বলে তোমাকেই বিয়ে করব, তারপর যথাসময়ে সরে পড়ে, তাতে আইনতঃ শর্ত ভঙ্গ হয় না। কোনো মেয়ে যখন বিয়েতে রাজি হয়ে ছেলেকে শেষ পর্যন্ত বোকা বানায়, সেখানেও আইনতঃ শর্ত ভঙ্গ হয় না। বিবাহকে পবিত্র অনুষ্ঠান মনে করলে এই শর্ত ভঙ্গ গুরুতর অপরাধ-রূপে গণ্য হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রীয় আইনে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে মতবদলাবার অথবা floor crossing এর অধিকার এবং স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাই যে শর্ত ভাঙার শুধু হৃদয় ভাঙে, তাকে রাষ্ট্রীয় আইন গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু কোনো মেয়েকে বিয়ে করব বলে যদি কোনো ছেলে চারটি পয়সা অগ্রিম নিয়ে থাকে এবং তারপর মত বদলায় তা হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর অর্থ হচ্ছে বিবাহকে ব্যবসা হিসেবেই দেখা হয় মোটামুটি ভাবে। এবং আমার মতে এইটিই ঠিক দেখা। কারণ আমাদের দেশে মেয়েরা যতদিন না আত্ম-মর্যাদায় সচেতন হচ্ছে এবং পিতারা যতদিন মেয়েদের অতি মমত্ব বশতঃ তাদের জন্য যে কোনো দামে স্বামী সন্ধানে ব্যস্ত থাকছে এবং ছেলেদের পিতারা সেই সুযোগ নিয়ে দর কষাকষি করছে ততদিন বিয়েকে ব্যবসায় দৃষ্টিতে দেখা মোটেই দোষের নয়। দোষের হচ্ছে এটিকে পুরো স্বীকৃতি না দেওয়া। আমার মতে বিবাহকে ট্রেডইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। স্বামীরা মালিক স্ত্রীরা শ্রমিক, এই স্বীকৃতিতে কোনো বাধা হবে না মনে হয়। কেউ যদি বিপরীতটা চান তাও হতে পারে।

বয়সের বিদ্যা বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে শ্রেণী বিভাগ ও দর নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত রাষ্ট্র হতে। একই সঙ্গে ব্যবসা করায় ও আত্মিক ধর্ম অনুষ্ঠানে আধুনিক যুগ বাধা দেয় না। এ যুগে পরমাণু বোমা ফাটানো হয় ক্রিসমাস দ্বীপে যে দ্বীপে যীশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের স্মৃতি বহন করছে—ক্রিসমাস্ নাম ধারণ করে। এ যুগে ধর্ম ও বিক্রয়বিভার কম্বিনেশন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যায়। অতএব এ যুগে কোনো মেয়ে যদি তার হৃদয় দেবতাকে, লাভের উদ্দেশ্যে মুনাফা শিকারের সুযোগ দেয় এবং সেজন্য আপন পিতাকে পথে বসায়, তা হলে আত্মিক ধর্ম বা বাণিজ্য ধর্ম কোনটিতেই তার অপরাধ হবার কথা নয়।

একটি দুর্লভ বস্তুর মূল্য হ্রাস

টালিগঞ্জ বালিগঞ্জের জংশন হলে ট্রামে আসতেই দেখি—প্রকাণ্ড এক বিজ্ঞাপন ঝুলছে। ঐ বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠলাম। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কারণ সেটা ১৯৫৭ সনে ও যখন সব জিনিসের দাম বৃদ্ধির মুখে, তখন একটি বস্তুরও দাম কমল, এ কথায় বিস্ময় জাগা স্বাভাবিক। আমি ২৯ শে জুলাই তারিখে অনেকটা এই রকম লিখলাম—

একটি দোকানে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে 'গাঁজার দাম কমিল।' হয়তো সব স্থানের গাঁজার দোকানেই এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে আমি দেখিনি। এমনকি বাগবাজারে চলা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও এ জিনিস আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ট্রামে এমন একটি বিজ্ঞাপন দেখা-মাত্র আমার উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা মনে নেই। মনে হয় হৃদয়-বীণার সহস্র তার ঝঙ্কৃত হয়ে থাকবে। আমি কি দেখে এমন বিচলিত, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার সহযাত্রীরাও সে বিজ্ঞাপন দেখলেন, এবং হঠাৎ দেখি যাত্রী বোঝাই ট্রামের অর্ধেক খালি হয়ে গেছে কে জানে এ কিসের ইঙ্গিতে। দাম কমে যাওয়া বস্তুর সাহায্যে দাম বেড়ে যাওয়ার দুঃখ তোলাই কি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল।

হরিজন উন্নয়ন কোষ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

বাল্মীকি ভবনের সামনে ঘরে আছে 'চরকী' ভর্তি তাঁত এবং খদ্দর প্রদর্শনী। অর্থাৎ সাজানো আছে বিদেশী দর্শকদের কাছে বোধহয় 'উন্নয়ন প্রচারে'র জন্য। কিংবা বছরের দু'বার গান্ধীজীর জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রাদ্ধ তর্পণ দিনে দর্শনের ও স্পর্শের জন্য। গুরুবাদী দেশে গুরু পূজার প্রতীক। তবু সেখানে হরিজনদের জন্য একটা বড় দালান আছে। সেখানে সকাল-বিকাল-দুপুরে একটু শিক্ষার বা বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠশালা বসে। সকালে শিশু, বালক-বালিকারা 'পহেলী' আর 'দুসরী' কিতাব নিয়ে বসে এবং 'পাহাড়ী' (নামতা) পড়ে। তাদের বড়দের কোলে নোংরা নাক-চোখ-মুখ শিশু ভাই-বোন। যাদের হাতে রুটীর টুকরা অথবা মুড়ির চাক। মলিন জীর্ণ জামা নাকে-চোখে জল ও পিঁচুটি-ময়লা। যাদের জননীরা পুরোণো দিল্লীতে সদর বাজারের আল-গলিতে ময়লার টিন মাথায় করে কাজ করতে যায়। ফেরে বেলা দু'টোর সময়। তখন এসে স্নানাহার করে; হয়ত রান্নাও করে তখনই যদি ঘরে কোনো নিকর্মা বুড়ী কাজ করার মত না থাকে এবং দুপুরে বসে তাদের জন্যই বয়স্ক শিক্ষার পাঠশালা।

কিছু মেয়ে ১৪।১৫ বছর বয়স থেকে ৬০।৭০ বছর বয়স্কারা তাঁদের 'পহেলী ও দুসরী কিতাব' নিয়ে পড়তে আসেন। সরল লজ্জিত মুখ রঙীণ শাড়ী পরা বিহার মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ধাঙড়-ভাঙ্গী দুহিতোরা আসে পড়তে। মনে সলজ্জ সাধ লেখাপড়া শিখে স্বামীকে খত (চিঠি) লিখবে। বাপের বাড়ীতে চিঠি দেবে...। গৃহিণীরা বলেন—পুত্রের 'খত' (চিঠি) এলে নিজে পড়তে পারবেন। কারুকে খোসামোদ করে পড়াতে হবে না। এই সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কোনক্রমে ৬০।৭০ জন।

আর সন্ধ্যায় বসে পুরুষ 'হরিজন ভাঙ্গী' জমাদারদের ক্লাস। নিতান্তই যারা 'কলালের' দোকানে (শুঁড়িখানায়) খুব যায় না। 'রামা হো রামা' গান নিয়ে ঢাক ঢোল নিয়ে রামচরিত মানসের কথায় আসরেও পুণ্যলাভের আশায় এসে বসে না। তারা জনকয়েক আঙ্গুলে গোনা যায় অর্থাৎ কিছু লেখাপড়া করতে চায় এমন জনকতক ঐ সাতশো ঘর 'হরিজন কলোনী'র বাসিন্দা শ্লেট বই খাতা পেনসিল নিয়ে বসে এবং লেখাপড়া করে—'পাহাড়ী' মুখস্থ করে। পহেলী কিতাবের ছাত্ররা "নল, নালা, সলা, খলা, কালা, মালা, বাল, বালা" মুখস্থ করে। বয়স্ক পাঠ বর্ণপরিচয় করে করানো হয় না বা শব্দ পরিচয় করে সে পড়া।

'দুসরী' কিতাবের ছাত্ররা পড়ে "শেঠজী বগ্গী চড়কে সয়েল করনে চলে"; "উয়ে বক্‌রী কী চার বাচ্চা হুয়া হায়" (শেঠজী গাড়ী চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। ঐ ছাগলটির চারটে ছানা হয়েছে।) তারা ঘন্টাখানেক করে পড়ে। তারপর কর্মশ্রান্ত অনভ্যস্ত পড়াক্লান্ত দেহে নিজের ঝোপড়ীর ঘরে নয়ত দোতলা বাড়ীর ঘরে গিয়ে খেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। স্ত্রী হয়ত 'গোড়' (পা) টিপে দেয় একটু। নয়ত দু-চারটে কথা বলে ছেলে কোলে নিয়ে বসে পাশে।

ঐ পড়ার লক্ষ্য কি—উদ্দেশ্য কি—শেষ অবধি কি সেই ধন—যাহা কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে'—সেই লক্ষ্যের কথা তারা জানে না। ভাবতেও জানে না। ভাবতেও শেখায় নি কেউ।

ঐ কচি কচি কিশোর ও বালক বালিকাগুলিও সেখানে তিনবেলাই একটু আধটু বসে। কত কি ভাবে যেন। ভাবে 'শেঠজী বগগী চড়ে', বেড়াতে যাবার মত তারাও কোনোদিন ঐ বাবুর বৌদিয়ার মত (আজও

বৈশ্ব) শেঠজীর মত লেখাপড়া শিখে কাজ করবে—চাকরী করবে—বেড়াতে বেরুবে মোটরগাড়ী চড়ে। মন্ত্রী —কোন্ এক সজহীবারাজীর মত।

আরও কার কার মত—সব নামও ত তারা জানে না।

রামধারী বলে রামসুখকে—'দেখ, আমি এখানকার ইস্কুল শেষ হলেই বড় ইস্কুলে পড়তে যাব, মাষ্টার সাহেবকে বলে রেখেছি। ও 'ঝাড়ু চমৃমচ কুলো আমি ছোঁব না কভি।'

সমবেত ছেলেমেয়ে—'রামসুখ, গিরীধারী, কানাহাইয়া এবং মেয়েদেরও রামপতিয়া, বুধিয়ার চোখ জল জল করে ওঠে।—তারা সবে দুসরী কিতাব ধরেছে। একটু ভাবে, তারপর বলে—'আমরাও ত চম্‌মচ, ঝাড়ু ছোঁব না তাহলে?'

তাদের চোখের সামনে ভেসে আসে ভরত রামজীর গাড়ীতে বসা সুন্দর কাপড় পরা বালক বালিকা দুটির চেহারা।

আর নিজেদের গায়ের দিকে—জামাকাপড়ের দিকে তাকায়।

ওদের কি সুন্দর ইস্ত্রি করা নতুন দামী জামা, ধুতী, টুপী—আর নিজেদের।

রামসুখ বলে, 'কিন্তু ওরা কি করে অত বড় লোক হোল ভাইয়া? হরিজন হয়েও।'

কিষণ বলে, 'লিখাপড়া করেছে কত। শেঠ-হরি-বামুনদের মত।'

রামপতিয়া বলে, 'কি করে করল? আমরাও ত করতে পারি। কোথায় কোন্ মাদ্রাসায় পড়েছে?

এক তাদের চেয়ে বড়দিদি বুধিয়া বলে, 'আমাদের বাপ দাদারা কেন লিখনা পড়না শেখে নি ভাইয়া? আজ ঘর গিয়ে পুছব (জিজ্ঞাসা করব)।

দাদা পরদাদা থেকে সবাই ঝাড়ুদার হয়ে কেন রইল আর বত গন্ধা (নোংরা) কাজ শিরমে নিয়ে রোদ্দুরে পুড়ে বর্ষায় ভিজে শীতে কেঁপে কাজ করে গেছে জনমভোর। আমাদেরও করাবে। হমিস ও কাম না করব (বিহারী ভাষায় আমরা ও কাজ করব না)।

সবাই চিন্তিত—নীরব। মেয়েরা ভাবে মেয়ে স্কুল—ছেলেরা ভাবে ছেলের স্কুল কোথায়? তাদের মুগ্ধ মূঢ় কচি চোখের সামনে ভেসে আসে সব বড় বড় লোকের গাড়ী চড়ে আসা—বেড়াতে যাওয়া। শুভ্র বা রঙীণ সাজে সাজা 'বড়া বড়া আদমী' এবং গহনা, দামী কাপড় পরা নারী। তাদের কোলে ও পাশে সুন্দর বসন পরা বালক ও শিশু। তাদের মা, ঠাকুমা, বোনেদের মত নয়।

কত লেখাপড়া শিখে ওরা 'বড়া আদমী' হয়েছে।

অথবা কত টাকা ওদের আছে—ছিল। কোথা থেকে টাকা পেল ওরা। তা ওরা বামন বেনিয়ারা না হয় পেয়েছে, বাপদাদার টাকা ছিল।

কিন্তু ওই ভরতরামজী, মলসুখজী, লছমনদাস ভাইজী ওরা বড়া আদমী হল কি করে। ওরা ত হরিজন ভাই। 'ভাঙ্গী' জমাদার, 'মেহতর' (মেথর)।

আশাতুর হতাশামূঢ় বিহ্বল শিশু বালকবালিকারা জল্পনা করে—ভাবে।

"বাল দিবস" (নেহেরু জন্মজয়ন্তী)

নবেম্বর। আবার ওরা শুনতে পায় কার মুখে আজ পণ্ডিত নেহেরুজীর জন্মদিন। এ দিনটি হল 'বাল দিবস' (শিশু দিবস)।

দিল্লী সহর ভরে উৎসব, সব ঘরের শিশুরা সাজে গুছিয়ে নানারকম পোষাক—ধুতি, পিরিহান (জামা), সালোয়ার, কামিজ, চুড়ীদার পাজামা, কুর্তা, গরারা (মেয়েদের ঘাগরা), শাড়ী, জামা, ফ্রক, বিদেশী সুন্দর ছাঁটের ফ্রক—মণিপুরী, আসামী, বাঙালী, পাহাড়ী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী নানা প্রদেশীয় পোষাকে জরী, জড়োয়া, গহনা, বেশভূষায় সেজে বাবার আয়োজনে সারাদিন সব অভিভাবকেরা ব্যস্ত। বিকালে 'তিনমূর্তি ভবনে' আরও কোথায় কোথায় ছোট বড় সমাবেশ হবে। তবে নেহরু ভবনেই আসল সমারোহ। প্রাইজ পাবে। আদর পাবে। খাদ্যদ্রব্য

বাস পাবে। চকোলেট, লজঞ্জুস পাবে। ফুল পাবে—মালা পাবে। কোন ছোট মেয়ে বা ছেলে বারা নেহরুজীকে ফুল দেবে।

উৎসবের দু'দিন আগে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের হরিজন কলোনীতে কয়েকজন শিক্ষিকা জড় হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মসূচী কি হবে কোন্ পাঠশালা থেকে ক'টি বালকবালিকাকে ওই তিনমূর্তি নেহরু ভবনে যেতে অনুমতি সংগ্রহ করতে পারবেন।

তাদের চেহারা, স্বাস্থ্য, রূপ, বসনভূষণে মনোহারী করে তুলতে হবে। তাদের হাসতে, কথা কইতে, এগিয়ে যেতে (কুর্নিশ ?) পিছিয়ে আসতে শেখাতে হবে।

তারা কারা কোন্ কোন্ স্কুলে অথবা বড় বড় লোকেদের রূপবান্, রূপবতী সন্তান দেখে তাদের নির্বাচন করা হবে জল্পনা-কল্পনা করছেন।

এরা সকলেই টিচার বটে। কিন্তু এখানে বাল্মীকি ভবনের স্কুলের টিচার নন ঠিক—পরিদর্শিকা। এখানে মাঝে মাঝে দেখতে ও পড়াতে আসেন।

করুণা রায়, রূপা গুপ্ত (বাঙালী), সন্ত কত্তর (পাঞ্জাবী), জানকী ভার্গব, সুমিত্রা দেশাই চার পাঁচজন ছিলেন। এসেছেন দরিয়াগঞ্জ, চাঁদনীচক, বিজিমারন, গোলমার্কেট সদর বাজার থেকে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে নির্দেশ অনুসারে।

স্কুল বসলেও সেদিন সকালের হরিজন বালক-বালিকাদের পড়াটা স্থগিত রয়েছে। যদিও স্লেট, কাঠের স্লেট (পাটি), পেনসিল ভুষো কালি, দোয়াত, কলম, বালির কাগজ, সাদা কাগজ নিয়ে তারা এসে বসেছে প্রতিদিনের মত।

এখানকার নিত্য শিক্ষিকা হচ্ছেন—সৌম্য মেহেরা, লক্ষ্মী নারায়। কিন্তু সেদিন সকলেই গল্পে ও আয়োজনের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে গেছেন। দু'একটা সুন্দর মেয়ে চাই।

যদিও সবচেয়ে সুরূপ চাই বেশ কিন্তু চটুল তৎপর (স্মার্ট) হওয়া চাই। এমন মেয়ে কবে কাকে দেখেছেন। গাবেন সবাই। সবল হওয়া চাই ৫।৭ বছরের মধ্যে। নানা জায়গায় উৎসব। প্রধানমন্ত্রী—মন্ত্রী সম্প্রদায়কে—রাষ্ট্রপতিকে মালা, ফুল দেওয়াতে হবে তার হাত দিয়ে। এবং হাসতে শেখাতে হবে 'সেলাম' ও 'নমস্তে' করতে শেখাতে হবে।

লোকের ভীড়ে ভয় না পায়—কেঁদে না ফেলে—পালিয়ে না আসে। এবং হাসি গল্পের মধ্যে তাঁরা গত গত কয়েক বছরের সমাবেশ ও অভিজ্ঞতার কথাও হেসে হেসে বলেন।

'আরে বহেনজী ও (উয়ো ছোরী রো পড়ী)' ওই মেয়েটি কেঁদে ফেলল ভয়ে। কিন্তু এত সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটী। ক্ষত্রিয়াণীদের মেয়ে ত। কিছুতেই তাকে রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যেতে পারলাম না।...তবে এ বছর একটু বড় হয়েছে। কিন্তু দুধে-দাঁত পড়ে গিয়ে আর তেমন দেখতে নেই।...

আর একজন। সেবারে একটা মেয়ে ভয়ে লুকিয়ে পড়ল তার মা'র কাছে। গুজরাটী মেয়ে। খুব ভাল নাচতে পারে। কিন্তু সামনেই এল না। খুব বড় শেঠ-ভাটিয়াদের মেয়ে। অনেক টাকা সরকারকে চাঁদা দেয় ওরা।

তাঁদের চারদিকে হরিজন সন্তানের দল বসে আছে। যে যার কথা ভুলে গেছে। বড়লোকের গল্প তারা অবাক হয়ে শোনে। আর নিজেদের কাপড়-চোপড় এবং চেহারার কথা ভাবে। তারা কি ভাল ভাল জামা-কাপড় পরলে, সাবুন দিয়ে মেখে স্নান করলে ওই রকম সুন্দর হবে না ? ভাল রঙিন রঙের জামা এবং শাদা পাজামা, টুপী তাদেরও আছে এবং সুখমতি, ফুলমতিয়া, লছমীয়া, জানকীদেরও 'গরারা', গুজরাটী ঘাঁগরী, ওড়না-চুন্নী আছে। 'আড বাধা'ও আছে।

সহসা সুখমতিয়া—মেয়েটী ৭।৮ বছরের—পড়া-শোনায় ভাল, বলে উঠল। 'বিবিজী আমাদের নিয়ে যাবেনা ? আমাদেরও ভাল জামা-কাপড় আছে। সাবুনও আছে অস্নান (স্নান) করার। এবারে কি এই স্কুলেও সবাই আসবেন ? আমরাও দেখব ?

সরলা ৪।৫জন বিবিজী একেবারে চকিত হয়ে উঠলেন। ওরা যে ওঁদের কথা শুনছে এবং ভাবছে, তা

ওঁরা অত ভাবেননি ত ? বালদিবসে ত বাল্মীকি ভবনে হরিজন (ভাঙ্গী) কলোনীতে গান্ধী-জয়ন্তীর মত উৎসবের কোন বড় কর্মসূচী ত নেই। সবই ভেঙে পড়ছে উৎসবের সাজে নতুন দিল্লীর মন্ত্রীভবন এবং বাগান ও রাষ্ট্রপতি-ভবনে। আর সহরের ছোট-মাঝারি বড় বড় স্কুলে—এখানে ওখানে সেখানে।

বিব্রতভাবে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন করুণা রায়—সন্ত কত্তর—লক্ষ্মী নারায়ণ।

এখানকার সীতা মেহেরা বললেন—ঠিকই ত বলেছে বিবিজী। ওদের জন্য কোন প্রোগ্রাম আছে কি ? না হলে কৃপা বিবিজী আপনি ত একজন সেক্রেটারী আমাদের বয়স্ক কেন্দ্রের, আপনি একটু কিছু আয়োজন করুন।'

মলিন বসন, কর্সা, কালো কালো শ্যাম মুখগুলি উজ্জ্বল আশাময় চোখগুলি তাঁদের দিকে চেয়ে দেখছে।

সুখমতিয়ার দুটি ভাই, ৭।৫ বছরের বালক ওরা, একজনের নাম সুভাষ আর একজনের নাম রেখেছে বিজয় জমাদার (ভাঙ্গী নয়, হরিজনও নয়)। তাদের বেশ ভাল করে সাজিয়ে দিলে বড়টা পণ্ডিতজীকে নয়ত জগজীবনরামজীকে ফুল দিতে পারবে। খুব চটপটে ছেলে।

সুখমতিয়া ভাবছিল। বললে বিবিজী আমাদের মেলায় নিয়ে যাবার জন্য একটা গাড়ী আর সব কি করতে হয় শিখিয়ে দিন না ?

ওদের আগ্রহে এরা সকলে একটু থমকে গেছেন। ওখানে বড় বড় ভবনে কি ওদের জন্য প্রোগ্রাম আছে—করা হয় কি ?

এখানকার শিক্ষয়িত্রীর দল সীতা বিবি আর লক্ষ্মী নারায়ণ বিবিজীর মত করুণা রায়, কৃপা বিবি, সন্ত কত্তর সব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তোমরা কাপড়-চোপড় কেচে পরিষ্কার করে রেখো। আমরা কি হয় কি করতে পারি দেখব। তখন গাড়ী পাঠাতে পারি কি না আর কতজনকে নেওয়া যাবে দেখব। কার্ড লাগবে হয় ত ?'

কার্ড ? (কার্ড ?) কার্ড কাকে বলে। তারা ভাবে।

সাফাই' যর হরিজন বা 'বাল্মীকি'দের ছোটবড় কালো শ্যাম 'গোরা, ফর্সা সন্তানগুলি বিভ্রান্ত দুরাশায় উৎসবের প্রাঙ্গণের কার্ড ও আহ্বানের জন্য আকুল হয়ে কাপড়-জামা, সাবান, গহনা, টুপী, ওড়নার জন্য তাদের ছোটবড় পাকা ঘরের ও ঝোপড়ীর বাকস্-পেঁটরা দেখতে বসল। হ্যাঁটকাতে লাগল।

আর তাদের মা বাবারা সভ্য নতুন দিল্লী নোংরা, নোংরা পুরোনো দিল্লী এয়ারপোর্ট-এর দিল্লী—লাল-কেল্লার পথঘাট ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করার আদেশে দিনভোর, রাতভোর ঝাঁটা ঝুলো ঠেলাগাড়ী নিয়ে পথে পথে বিব্রত ও ব্যস্তভাবে ঘুরতে লাগল।

'নেহরু বাল দিবস'। বিদেশী স্বদেশী বড় বড় লোকের সমাগম হবে।

আশার ছলনা

নাঃ কোন প্রোগ্রাম তাদের জন্য করা হয় নি—করা যায় নি। তারা জানে না। সুখাতি, ফুলমতিয়া, রামপিয়ারী, সুখদেবী, রাধাপিয়ারী ভগবতীরা খুব ভাল করে কেউ তেল মেখেছে মাথায়-গায়ে—কেউ সাবান দিয়ে স্নান করেছে। আর 'গরারা' ঘাগরা সেলোওয়ার কামিজ ছোট রঙীণ জামা (আঙিয়া) চুমকী টিকলী কপালে সেঁটে চক্‌চকে মুখে সারা সকাল সেজে বাল্মীকি ভবনে বসে রইল।

আর রামধারী, রামসুখ, বিষুণ, কানহাইয়া, কিষুণ, সোমমঙ্গল অথবা সোমার মংপুরাও নানা রঙের জামা, খাসা ধুতি বা চুড়িদার পাজামা, মাথায় টুপী; কেউ একটু বেশী সভ্য সে একটা খাকি হাফ প্যান্ট শার্ট (কোন মনিবপুত্রের) যোগাড় করেছে। এককথায় যার যা বেশভূষা সেরা মনে হয়েছে সবাই তাই পরেছে।

বেলা হল। দুপুর হল। বিকেল হল। তাদের খিদে পেল। ক্লান্ত হল। ঘুম পেল। কাপড় জামায় ধুলো লাগল।

কিন্তু গাড়ী এল না। এবং কার্টও (কার্ড) এল না। স্থানীয় দারোয়ানও বিবিজীরা বললেন 'কার্ট নেহি মিলা বাচ্চা লোগ।'

পড়াশোনা

সুখমতিরা খুব ভাল করে তিনটে বই আর 'পাহাড়ী' শেষ করে যোগ-বিয়োগ-গুণ শিখে ফেলেছে।—

এবং রামধারী, রামসুখদের দলেও ওরা ক'খানা বই পড়েছে ত বটেই। মাষ্টারসাব এবং বিবিজীরা বলেছেন রামসুখ আর রামধারী 'ফার্ষ্ট সেকেণ্ড নম্বর' পেয়েছে।—তারা ক'জন কোন স্কুলে ভর্তি হতে চায় মাষ্টারদের বিবিজীদের বলছে। সুখমতিয়াদেরও ইচ্ছা হাইস্কুলে পড়ে। আংরেজী মাদ্রাসা স্কুলে পড়তে চায় তারা। ইংরাজীর সম্মান তারা বুঝতে পেরেছে। যদিও তাদের বাবা-মাদের মামা, নানা (মাতামহ, পিতামহ) দের ইচ্ছে এবারে বিয়ে দেয়। সুখমতি, ফুলমতিরও ৯।১০ বছর বয়স হ'ল। এবং রামধারীদের পিতামাতার ইচ্ছে ছিল ১ টাকা রোজের নয়াদিল্লীতে কয়েকটি কাজ খালি আছে। পথের জঞ্জাল ঠেলাগাড়ীতে তুলে দেওয়া। খুব হাল্‌কা কাজ। ক্রমে দেড়টাকা রোজ হবে। পরে দু'তিন টাকা রোজও হবে। এবং 'ভাতা', মাগগী ভাতা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড সব মিলিয়ে বেশ বাঁধা একটা কাজ এবং আয়। আর নয়াদিল্লীর জমাদারপদ পুরোণো দিল্লীর চেয়ে মান্যগণ্য পদ।

লেখাপড়া? পড়ে কি হবে? ওইতো বাবুদের শেঠ বেনে বামুনদের ছেলেদের পড়াশোনা করেও 'নোকরী' মেলে না। তাদের বিজ্ঞ গুরুজনদের পড়ায় বিশেষ মত নেই। খত্‌ লিখতে শিখেছিস ত, আবার কি।

কিন্তু রামধারী আর রামসুখ পড়বেই। যদিও তারা জানে তাদের বিয়ের ঠিক হয়ে আছে জন্মের আগে থেকেই সুখমতি আর ভারতীয়ার সঙ্গে। ওদের নানী (দিদিমা) দের তখনি লেকথা দেওয়া আছে। মেয়ে হলে 'বৌ' করে নেবে আর ছেলে হলে দামাদ 'জামাই' হবে। তারা দু'জনে সাহেলী (সই) ছিল।

এবং ওদের অনেকের কুল মর্য্যাদা কন্যাপণ লাগে। সুখমতিয়ার বাবা মেয়ের জন্য বেশ টাকা নেবে। আর 'দারু সালন' (মদ, মাংস) দিয়ে বন্ধু, স্বজনদের ভুরিভোজ করাবে। রামধারীর বাবার ওই কন্যাপণ দিতে হবে তিনশ' টাকা। মেয়ে আরও বড় হলে আরও বেশী টাকা নেবে সুখমতিয়ার বাবা।

রামধারী, রামসুখদের মাবাবা ছেলেদের বোঝায় বিয়েটা এবং চাকরীটা হয়ে যাক। কাজেও উন্নতি (তরক্কি) হবে। এখন হলে টাকাও কম দাবী করবে সুখমতির বাবা। এবং দু'জনেরই নানা নানী দাদা দাদীরা বেঁচে আছেন। তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন, ওদের বিয়ে দেখতে চান।

আর স্কুলে পড়তে খরচাও লাগবে। আজ অবধি বিনা বেতনের স্কুল ওদের হয়নি।

*

স্কুল প্রাঙ্গণে

যাহোক ওরা কথা শুনল না, চারটি বালক রামধারী, রামসুখ, সমরু ও কিষণ, মাষ্টার সাহেব আর বিবিজীদের ধরে বলে কয়ে কাছাকাছি একটি স্কুলের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। পরিধানে অর্দ্ধমলিন ধুতি, ফর্সা জামা, ফর্সা টুপী আর পায়ে কাঁচা চামড়ার দেশী নাগরা পরে চারটি বালক এসে দাঁড়াল স্কুলের ভর্ত্তি হবার ঘরের দুয়ারে।

কাছাকাছি আরও কয়েকটি বালকও রয়েছে ব্রাহ্মণ বেনে ছাত্র শেঠদের। এদের কাপড় চোপড় তাদের বেশভূষায়, বইখাতায় অনেক প্রভেদ। মুখ চোখ তাদের জলজলে। হাত পা চটপটে। তাদের সঙ্গেও বড়রা এবং মাষ্টার আছেন। মাধ্যমিক স্কুল এটা।

রাজনারায়ণজী এদের মাষ্টারসাবও এসে দাঁড়ালেন ভর্ত্তির ঘরে। ভর্ত্তিকর্ত্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন। তিনি তাঁর পালা এলো।

ক'জন? কতদূর পড়া হয়েছে কোন্ ক্লাস অবধি, নাম, বাস, পিতার নাম বা অভিভাবকের নাম।

মাষ্টারসাহেব সব বললেন। নাম, পল্লী জাত ও

শোনা হল। ভর্তিকর্তা স্তব্ধ। জমাদার। হরিজন। রাজাপীরভবনবাসী।

"বিবাদিত ভাবে হেডমাষ্টার মশাইকে একবার জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। ভাবেন, হরিজন কলোনীর কোনো ছাত্র আমাদের এখানে আগে এসেছে কিনা, আর আছে কিনা, নজীর আছে কি? অর্থাৎ সংশয়। নেওয়া হয় কি? হবে কি? হয়েছে কি? নজীর আছে কি? যদিও স্কুল মানেই স্কুল। ছাত্র মানেই মানুষ এবং তার পড়াশোনায় দক্ষতা। জাত-পাঁত (পংক্তি) গোত্র মেনে নিমন্ত্রণ খেতে হয় করতে হয়। কিন্তু পড়ার স্কুলে? পাঠশালায়ও কি জাত সম্প্রদায় শ্রেণী মানতে হয়। মানেন নাতো?

হেড মাষ্টার মহাশয়ের ঘরে গেলেন। সকলেই বর্ণ-হিন্দু। 'ব্রাহ্মণ' 'ছত্রি' 'লালা' (ক্ষেত্রী কায়স্থ) বৈশ্য, শেঠ, রাজপুত ইত্যাদি। অর্থাৎ কেউই অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁরা নন্।

পুরোণো নতুন ইতিহাস দেখতে বড় বড় খাতা খুলে ছাত্রদের নাম ধাম জাতি সম্প্রদায় দেখা হল এবং স্কুলের নিয়মাবলী। যাতে জাতি, গোত্র, সম্প্রদায়ের বিধি-নিষেধ আছে কি-না?

নাঃ সেসব নির্দেশ বা তথ্য বিধি বিধানের কোনো উল্লেখ নেই।

'তবে?'

হেডমাষ্টার।—'নিয়ে নিন্'।

বর্ণ-হিন্দু অন্ত শিক্ষক। 'কিন্তু বর্ণ-হিন্দু কমিটীর বর্ণ-হিন্দু সভ্য বা ঠিক সম্মত হবেন কি?

আর একজন, 'ওরাও টিফিন্ ঘরে টিফিন্ খাবে তো। জলের 'সোরাহি' (কুঁজো) ছোঁবে......। ঝামেলা হবে বাবুজী।

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কপালে সকাল বেলার পূজা-ঘরের চিহ্ন রোলীর (সিঁদুরের) লম্বা তিলক। কারুর স্বল্প আড়া তিলক। কারুর শুধু ফোঁটা। অনেকেরই কিছু তিলক বা টিপ পরা নেই। তবু...? সকলেই উচ্চ বর্ণীয়।

চিন্তিত শিক্ষকদের একজন চিন্তিতভাবে বললেন, আগে ঐ অন্ত সব ছেলেগুলোকে ভর্তি করে নেই। তারপর দেখাযাক না যদি সিট থাকে না থাকে হয়...।

'অর্থাৎ'—

হেডমাষ্টারজী বুদ্ধিমান। তাঁর কথার মানে বুঝলেন। "তথাস্ত" বললেন।

প্রতীক্ষিত অনেক নাম ধাম লেখার পরে ভর্তিকর্তা এসে বললেন 'নিচুক্লাসে সিট খালি নেই। কেউ কি উঁচুক্লাসের আছে? উঁচুক্লাসের ছাত্র হলে নিতে পারা যেত।

এরা বুঝতে পারল না। বিশ্বাস করে ফিরে গেল।

একেবারে অসত্যও তো নয়? অর্দ্ধসত্য ও অসত্য-সত্যে মিশ্র ব্যাপার।

তারপর দিন ভোরে ভোরে সকাল করে বেরুতে হবে।

আবার অন্ত এ স্কুলের জন্ত। সর্বত্রই সবাই চেয়ে দেখে তির্য্যক চোখে। হরিজন...। অচ্ছুৎ...। তিন দিন কেটে গেল। জায়গা নেই সিট খালি নেই।

নাঃ "ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট এ তরী। ওহোরে সোনার ছেলে রয়েছে ভরি"।

সেণ্টষ্টিফেন্স কলেজ ক্রিশ্চান স্কুল

আদর্শবাদী নিয়ম রাজনারায়ণজী একটু বুঝতে পারছিলেন। ভাল করে বুঝলেন ক্রমে।

বালকদের কচি শিশুমুখ লেখাপড়া শেখার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মনে উদার দয়া মমতা জেগেছিল। যদিও তিনি ছত্রি সন্তান—

কিন্তু লেখাপড়া—ইংরেজী পড়া আধুনিক মানুষ। সংস্কারযুক্ত মন, আবার সংস্কারযুক্ত মন দুয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাত হয় মনে।

তবু আহা। পড়ুক। পড়তে চায় তো পড়তে পাক। 'আচ্ছা চল্ তোদের দরিয়াগঞ্জের একটি সাহেব-দের ক্রিশ্চান ধর্মের স্কুলে নিয়ে যাই। দেখি যদি ভর্তি করে নেয়।' শিক্ষক সংঘ সাদামুখ শ্যামবর্ণ মুখ সবই আছেন। ছাত্ররা অবশ্য প্রায় সবই কৃষ্ণকায় ভারতীয়।

বাঙালী শিক্ষকও আছেন খ্যাতনামা সুশীল রুদ্রের, দীনবন্ধু, সি-এফ এনড্রুজ-এর সময়ের'। শিক্ষক সম্প্রদায় প্রায় সকলেই ক্রিশ্চান।

নাঃ। এ পর্য্যন্ত হরিজন সম্প্রদায় থেকে কোনো ছাত্র এসে পড়েশুনে পাশ করে গেছে কি? আগে? আর এখনো আছে কি? অত আর ভাবেন না তাঁরা।

রামসুখ আর কিষাণ লালরা ভর্ত্তি হয়ে গেল। 'নাম'ডাকের খাতায় শুধু 'নাম'টুকু রইল। নীতিসূচক কোনো সংস্কার রইল না এবং তাঁরা জানেন—ক্রিশ্চান স্কুলের বর্ণহিন্দুদের সন্তানদেরও তো নানারকম শ্রেণী ও জাতপাত বিধিনিষেধ আছে, ছিল।

তাই তাদের ভীতমুখ রামসুখ, কিষণলালের রাম-ধারীর সেজন্ত বেশী ঝামেলা পড়ল না স্বভাবতঃই।

জাতের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলো না। আন্দাজও করলেন ও বুঝে নিলেন। প্রকাশ্যে কিন্তু কেউই কিছু বললেন না।

মেয়ে স্কুল

নাঃ সুখমতিয়ার বিয়ে দিতে তার বাপ চেষ্টা করলেও বাল্মীকি ভবনের তার টিচাররা আর সে নিজে মিনতি করে সে বিয়ে স্থগিত রাখল। মাত্র তো ১০ বছর বয়স।

কিন্তু স্কুল? কোথায় কোন্ মেয়ে স্কুল?

পরিদর্শিকা সবকথার নীরবে কি ভাবেন। কিছু বলেন না।

মেয়েস্কুল! সব বড় বড়—ওদের জন্ত কোনও স্কুল নেই? স্বাধীনতার এত পরেও। করুণা রায় শুনে খুব বিরক্ত ও দুঃখিত হন।

বাল্মীকি ভবনের শিক্ষিকা সীতা মেহেরু বললেন, বিবিজী ভগবতীয়া, রামদুলারী, জানকী সবই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এক সুখমতিয়া ছাড়া। তা' ওটির পড়ার এত ইচ্ছে, পড়া হবেনা?' কিন্তু কোথায় কোন্ স্কুলে কি করে ভর্ত্তি করা যাবে তাঁরা ভাবেন।

ইংরেজী, বর্ণ-পরিচয়ই হয়নি। শুধু হিন্দী আর পাহাড়ী (নামতা) শিখেছে। তাদের আকুল আগ্রহ ইংরেজী পড়ে চাকরী করবে তাঁদের মত। বিবিজীদের মত কাজ করবে। বড় বড় মেয়ে স্কুলে কি তাদের নেবে?

কৃপা গুপ্ত একটু ভেবে বললেন, 'মিস্ রায় ওকে যদি আমাদের কুইন্স্ পার্কের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে তো পড়ানো হয়। ঐ শিক্ষাকেন্দ্রে একটু প্রাথমিক পড়ার তালিম দিই?

তারপর দেখা যাক্ পারে কিনা। তখন ২।০ বছর কাটবে ছোটখাটো একটি হাইস্কুলের জন্ত চেষ্টা করা যাবে। 'ইন্দ্রপ্রস্থ' কিংবা নাম করা স্কুলে 'সিট' পাওয়া যাবেনা। যা বুঝছি……।

—ক্রমশঃ

বিস্মৃত কবি তরু দত্ত

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বঙ্গদেশে কোনও দিনই মণীষার অভাব হয় নাই, বিশেষতঃ কাব্যে ও কবিতায়। মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত খ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি কবিতা লিখিয়া বাঙালী সমাজের সকল স্তরের লোকদিগকে যে অনাবিল আনন্দদানের প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন।

তরু দত্তও একজন বিস্মৃত কবি। তবে তাঁহার কবিতা লেখা ইংরাজী ভাষায়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম বিদেশী ভাষায় কবিতা লেখেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজ কবি কীটস্ ব্যতীত এত অল্প বয়সে মনে হয় আর কোনও কবির মহাপ্রয়াণ ঘটে নাই।

সকলপ্রকার প্রতিভা স্ফুরণের একটা পরিবেশ আছে। প্রতিভাদীপ্ত কোন মানব বা মানবীর জীবনালেখ্য আঁকিতে হইলে সেই পরিবেশের পরিচয় দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার বংশেরও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দরকার।

তরু দত্ত যেকালে ও যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে কাল ও সে বংশ ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের অনুকূল আবহাওয়ায় সংবর্দ্ধিত। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য, ইংরাজী আদবকায়দা, মিশনারী পাদ্রীদিগের আপ্রাণ প্রচেষ্টা তখন বাঙালীদিগকে পাশ্চাত্যাভিমুখী করিয়া তুলিতেছে। ইংরাজ জাতির অনুসরণ ও ইংরাজী সমাজের অনুকরণ করিতে এদেশের প্রায় সকলেই তখন ব্যস্ত। ফলে বুদ্ধিমান্ ও মনস্বী লোকদিগের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, সূর্য্যকুমার চক্রবর্তী, যিনি উত্তর জীবনে ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত, অধ্যাপক লালবিহারী দে প্রমুখ বাঙলাদেশের কৃতবিদ্য ও স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ—ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেছিলেন। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসও ব্রেজিলে গিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া সে দেশের মেয়েকেই বিবাহ করেন।

তবে আধুনিককালে দেশের মেধাবী যুবকেরা যেমন মানমর্য্যাদা ও অর্থের লোভে এবং দেশে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা ও সম্মান না পাইয়া বিদেশে গিয়া বিধর্মী না হইয়াও দেশের প্রতি মায়া মমতা বিসর্জন দিতেছেন, সে কালে তাহা ছিল না। বিধর্মী হইয়াও দেশের সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাবধারা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেশের প্রতি মমত্বচ্যুতও হন নাই। সেই কারণেই কৃষ্ণমোহন বাংলা ভাষার শব্দকোষ সংকলন করিতে পারিয়াছিলেন, মধুসূদন নূতন ছন্দে বঙ্গভাষার শিরে নূতন মুকুট পরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইংরাজী সনেটকে (sonnet) বাংলা চতুর্দ্দশপদী কবিতায় নবরূপ দিতে ভুলেন নাই; বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক তিনিই রচনা করিয়াছিলেন বলা চলে। সেভাবেও লালবিহারী দে বঙ্গীয় কৃষকদিগের জীবনকাহিনী (Bengal Peasant's Life) এবং বাংলার রূপকথা (Folk Tales of Bengal) লিখিয়া অমরত্ব লাভ করেন। দেশের প্রতি তাঁহার কতটা মমতা ছিল বই দুইখানিতে প্রকাশ করিয়া যান। জ্ঞানেন্দ্রমোহনও দেশের প্রতি অপূর্ব মমতা এবং নিজদেশের সংস্কৃতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি একবার এক সভাতে বক্তৃতা দিবার সময় বলেন "আমি ব্রাহ্মণ খৃষ্টান"। খৃষ্টান হইয়াও তাহার ব্রাহ্মণত্ব ভুলিতে পারেন নাই। সূর্য্যকুমার চক্রবর্তী, যিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার গুডইভ (Dr. Good Eve) এর নামানুসারে ডাক্তার

ভক্তিত চক্রবর্তী হইয়াছিলেন, তিনিও একবার কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জানকীজীবন ভট্টাচার্য্যের টোলবাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতার চিকিৎসার জন্ম আহূত হন। রোগী দেখিবার সময় তিনি যখন বুঝিলেন যে ইহা সে-যুগের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ এক অধ্যাপকের বাড়ী, তখন তিনি তাঁহার প্রাপ্য দর্শনী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না, যদিও তখন সেই অধ্যাপকের অবস্থা সচ্ছলই ছিল এবং তাঁহার উপযুক্ত দর্শনী দিতে প্রস্তুতই ছিলেন। ডাক্তার চক্রবর্তী তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"যাঁহারা দেশের ছেলেদের বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান দিয়া মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি কোনওরূপে অর্থাদি লইতে পারিবেন না।" দেশের প্রতি অকপট ভালবাসা না থাকিলে এইরূপ কথা কেহ কখনই বলিতে পারেন না।

উত্তর কলিকাতায় রামবাগানের দত্ত বংশ বিশেষ সুপরিচিত। ইঁহাদিগের আদি নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় অজপুর গ্রামে। নীলমণি দত্ত বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। হিন্দু কুলধ্বজ মহারাজ নন্দকুমার হইতে প্রসিদ্ধ পাত্রী কেরী সাহেব পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধু হইয়া উঠেন। নিয়মিত ধ্যানজপ ও আহ্নিক এবং দীন-দুঃখীকে দান ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্ম।

ঈশ্বর নীলমণি দত্তের তিন পুত্রের মধ্যে রসময় দত্তই ইংরাজ মহলে বিশেষ পরিচিত হন। তাহার ফলে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে তাঁহার আরও পদোন্নতি হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পরলোক গমন করেন।

রসময় দত্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পাঁচটি পুত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের নাম—কৃষ্ণচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, হরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্র। তাঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার দুইজন নিজেদের নামগুলিও ইংরাজী ধরণে করিয়া লন, যথা—কিষেণ চুন্দর (Kisen Chundur), ও গোবিন্ চুন্দর (Gobin Chundur)।

গোবিন্দচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ও মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি ইংরাজ সরকারে বড় চাকুরী করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাহা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, কারণ তাঁহার স্বাধীন চিত্ত সাহেবদের সকল কথা মানিয়া লইতে পারে নাই। বাকী জীবন সাহিত্য চর্চায় অতিবাহিত করেন। শেষ বয়সে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি সপরিবারে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

মজার কথা—পুরুষেরা সকলেই ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের পত্নীরা সহধর্মিণী হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বাহ্যিক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও মনে-প্রাণে হিন্দুই থাকিয়া যান। শুধু দত্ত পরিবারে নহে, বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঠাকুর পরিবারেও একইরূপ ঘটনা ঘটে।

সাহিত্যচর্চা ক্রমে ইহাদিগের বংশগত হইয়া দাঁড়ায়। গোবিন্দচন্দ্র নিজে ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন। সমাজে কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। হরচন্দ্র দত্ত নানা মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। গিরীশবাবুও নিজে সাহিত্য চর্চা করিতেন এবং স্ত্রীকেও ফরাসী ও ইংরাজী শিখাইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় লেখা এবং ইংরাজীতেই কথাবার্তা বলা ইহাদিগের সংসারে রীতি হইয়া উঠিয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের খুল্লতাত পুত্র শশীচন্দ্র দত্ত 'কেরানীর জীবন' নামে একখানি সরস পুস্তিকা লিখিয়া সুনাম অর্জন করেন। সেই বংশেরই উমেশচন্দ্র দত্ত ফরাসী ও জার্মানী ভাষায় লিখিত কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। স্বনামধন্য, সুসাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত ইঁহাদিগেরই সুযোগ্য বংশধর। ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় লেখক কর্তৃক রমেশচন্দ্রের জীবনকাহিনী আলোচিত হইয়াছে।

উত্তর কলিকাতার ১২ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান সতীন সেন ষ্ট্রীট) ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ পিতা গোবিন্দ দত্তের বাড়ীতেই তরু দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই তিনি তীক্ষধী ও অসামান্ত স্মৃতিশক্তি সম্পন্না ছিলেন। পিতার নিকটেই তাঁহার লেখাপড়া শুরু। স্নেহময়ী জননী ও সন্তানবৎসল পিতা উভয়েরই প্রভাব তরুর জীবনে সমভাবে পড়ে। মায়ের নিকটেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির আখ্যায়িকা শিশুকাল হইতেই শুনেন। ধর্মই যে মানবজীবনের পরম আশ্রয় তাহা তরু দত্ত মায়ের কাছেই জানিতে পারেন। সাহিত্যপ্রীতি, সৌন্দর্য্যবোধ এবং কবিতা লেখার ঝোঁক তিনি পান তাঁহার পিতার নিকট হইতেই।

গোবিন্দ দত্তের তিনটি সন্তান—অরু, তরু আর অবজু। অবজুই তাঁহাদের একমাত্র পুত্রসন্তান।

কলিকাতার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মানিকতলা খালের পূর্ব পারে বাগমারী। সেখানে দত্তদের বাগানবাড়ীতেই তরুদের শিশুকাল কাটে। এই উদ্যানের শান্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক শোভা শিশুদিগের মনে বিশেষ দাগ কাটিয়া দেয়। এই বাগানবাড়ীই তরু দত্তের কয়েকটি কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়।

আরও কিছু বড় হইলে ইঁহাদিগের শিক্ষার ভার পড়ে গৃহশিক্ষক শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তিনিও একজন গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। এই শিক্ষকটির সম্বন্ধে তরু দত্ত লিখিয়া গিয়াছেন—"ছোটবেলা থেকেই তিনি আমাদের ইংরাজী শিখাইতেন। আমরাও শিশুকালে তাঁহাকে খুব ভালবাসিতাম এবং বড় হইয়া বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম।

শুধু লেখাপড়াই নয়, সঙ্গীত শিখাইবারও সুব্যবস্থা ছিল। মিসেস্ সাইনাক্স (Mrs. Sinacs) তরুকে গান শিখাইতেন। গান গাইতে তিনি ভালই শিখিয়াছিলেন এবং গান শিখাইবার পটুতাও ছিল তাঁহার।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া পুত্রকন্যাসহ গোবিন্দ দত্ত বোম্বাই শহরে গমন করেন। এক বৎসর সেখানে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহার একমাত্র পুত্র অবজুর মৃত্যু হয়। তদবধি কন্যা দুইটিই তাঁহার জীবনের সাথী হইয়া উঠে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ দত্ত তাঁহার পত্নী ও কন্যা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ইউরোপ যাত্রা করেন। ইহার পূর্বে কোন ভারত-মহিলা ইউরোপের ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক ইংলণ্ডে যান। শশিপদ বাবুই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি বাঙলাদেশ হইতে তাঁহার স্ত্রীকে ইউরোপে লইয়া যান। শশিপদবাবুর জীবনী ১৩৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহাও এই লেখকের লেখা।

তাঁহারা জাহাজ হইতে প্রথমে মারশাই বন্দরে নামিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের নিস্ শহরে কিছুদিন বাস করেন। তরু ও অরু একটি ফরাসী পাঁপিয়ানাতে ভর্তি হইয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন। তাঁহাদের জীবনে ইহাই প্রথম ও শেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ইহার পূর্বে বা পরে তাঁহারা আর কোনও স্কুলে পড়েন নাই। তাঁহাদের পড়াশুনার সকল ব্যবস্থাই গৃহশিক্ষক বা গৃহশিক্ষিকার দ্বারা সুসম্পন্ন হইত।

নিস্ শহরে ইঁহারা চারিমাস মাত্র ছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পিতার একান্ত যত্নে কন্যা দুইটি ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ফরাসী সাহিত্য-সমুদ্রে অবগাহন করিতে শিখেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চের তরুর একখানি পত্রে জানা যায় তাঁহারা আর স্কুলে যান না, পিতার ফরাসী শিক্ষয়িত্রী মাদাম স্বয়ারের নিকট ফরাসী শিখিতেছেন। শুধু ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্যালোচনায় নয়, ফরাসী-সমাজে মিশিবার সুযোগও তাঁহারা এইসময় পান। মিসেস্ মার্টিনের একখানি পত্রে ইহার সাক্ষ্য মেলে। তাহাতে লেখা হয়—"We introduced them to several residents of Nice and they all soon learnt French: "আমরা তাঁহাদিগকে নিসের কতিপয় অধিবাসীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিই, এবং তাঁহারা সকলেই শীঘ্র ফরাসী ভাষা শিখিয়া ফেলেন।"

তরুরা যে সময় ফরাসীদেশে ছিলেন, সেই সময় ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমাজ ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশ কয়েকপদ পিছাইয়া ছিল। মেয়েদের স্বাধীনতা-আন্দোলন তখন মাত্র সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত লেখিকা জর্জ স্যাঁদ "ইণ্ডিয়ানা" নামক উপন্যাসের মাধ্যমেই স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শুরু। Socialism (সমাজতন্ত্রবাদ-এর ভাবধারাও স্যাঁ সিমন দ্বারাই ফ্রান্সে প্রথম প্রবর্তন। এই পরিবেশ তরুর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী কবি মুসে, লামার্তিন, ও ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর লেখার মধ্যে তরু তাঁহার প্রাণের অনেক খোরাক খুঁজিয়া পান। সে যুগটা ছিল Romanticism বা নব ধারণার যুগ। মানুষকে আইনের নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিলেই যে, তাহার অন্তর্নিহিত গুণ-রাশি ফুটিয়া বাহির হইবে—এই ধারণা রুসো (Russeau) ইতঃপূর্ব্বেই ভাঙিয়া দেন। যে রঙিন কল্পনা ও মুক্তির স্বাদ তরুর মত তরুণীদিগের হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তাহা ফরাসী সাহিত্যে তখন প্রচুর।

ফ্রান্সকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়া তরু একজন প্রকৃত ফরাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের কালে জার্মান জাতি যখন ফরাসীদেশ আক্রমণ করে, তরু তখন তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছিলেন "আমি অদমনীয় ফরাসী. খাঁটি কথা বলিতে গেলে বলা চলে আমি পাচলা ফরাসী রমণী। ফরাসী জাতির পরাজয় ঘটিলেও আমি অপরাজিতাই থাকিব। আমি যে তাহাদেরই একজন। মনপ্রাণ তাহাদের জন্যই কাঁদিবে।"

কয়েক মাস পরে তরু তাঁহার পিতা মাতা ও ভগিনীর সহিত প্যারী (Paris) নগরে আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে ইংলণ্ডে চলিয়া যান।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া তাঁহারা চেয়ারিং ক্রস" হোটেলে উঠেন। পরে ব্রম্টনে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেই তরু ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতে, এবং ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। তরু উপন্যাস পড়িতেও ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল— ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাসই মানুষের সত্য পরিচয় বেশী দিতে পারে।

ঠিক এই সময়েই তাঁহাদের নিকটআত্মীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, ইংলণ্ডে "সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যান। তিনি তরুদিগের সহিত প্রায়ই দেখা করিতেন। রমেশ চন্দ্রের একখানি পত্রে জানা যায়—"গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কাজের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কাজ ছিল ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চা। বহু ধর্ম্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের সহিত ইঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে।"

তরু তখন বই পড়িয়া এবং খ্রীষ্টভক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপআলোচনা করিয়া দিনপাত করিতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরু কিন্তু সকল বিষয়ে তরুর পশ্চাদগামিনী হইয়া পড়েন। দুই ভগিনীকে একত্রে দেখিয়া বলিয়া না দিলে কেহই স্থির করিতে পারিতেন না উঁহাদিগের মধ্যে কে বড় কে বা ছোট। আলাপ করিয়াও ঠিক বুঝা যাইত না।

বিলাতে গিয়াও তরুর ফরাসী শিক্ষা চলিতে থাকে। এই স্থানে মিসেস্ লসেস্ তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। মিষ্টার পাওয়ার নামে আর এক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে গান শিখাইতেন। তরু ভাল গান গাহিতে ও পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। আর অরু শিখিয়াছিলেন সুন্দর ছবি আঁকিতে।

ফরাসী ভাষা শিখিবার, এবং ফরাসী ভাষায় কথোপকথন করিবার অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগিয়াছিল তরুর মনে। এই সময় তিনি তাঁহার এক আত্মীয়কে লেখেন—"আমি ভাল ভাবে ফরাসী ভাষা বলিতে চাই। আমাদের একটি ইতালীয় ভৃত্য আছে, সে ভাল ফরাসী বলিতে পারে। আমি তাহার সহিত ফরাসীতেই কথা বলি।"

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহারা কেম্ব্রিজ শহরে চলিয়া যান। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যেসকল উচ্চমানের বক্তৃতা দেওয়া হইত, অরু ও তরু সেই সকল বক্তৃতা নিয়মিতভাবে ও সানন্দে শুনিতেন ফরাসী ভাষা শিক্ষা ও ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা

প্রথমে আসিয়াও কেহ ত্যাগ করেন নাই। বোকেন সাহেবের নিকট তখন তাঁহারা ফরাসী শিখিতেন, ইংলণ্ডেও মসিয়ে জিবার নামে একজন ফরাসী তাঁহাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

ঠিক এই সময় অরুর শরীর খারাপ হইতে থাকে। গোবিন্দ দত্ত স্ত্রী কন্যা সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তৎপূর্ব্বেই মিস্ মার্টিনের সহিত তরুর বন্ধুত্ব দৃঢ় হইয়া উঠে। তাঁহাদের সেই সখীত্ব আজীবন স্থায়ী ছিল উভয়ের মধ্যে প্রায়ই পত্রালাপ চলিত।

ফ্রান্স তরুকে যেরূপ আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিল, ইংলণ্ডের কোন কিছুই তাঁহাকে সেরূপ নিজের করিয়া লইতে পারে নাই। জন্মগত হিন্দু-সংস্কারও তাঁহাকে কোনও দিন ত্যাগ করে নাই। স্নেহময়ী মাতার নিকট হইতেই তরু হিন্দু ভাবধারা প্রাপ্ত হন। কর্তব্যপরায়ণ পিতা কিন্তু তাঁহাকে খাঁটি ইংরাজ রমণী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে কিন্তু চাহিয়াছিলেন ফরাসী হইতে। এই কারণেই জেমস্ ডার্মেস্টেটরকে বলিতে শুনা যায়—এই বাঙালী মেয়েটির ক্ষমতা অদ্ভুত। জাতিতে সে হিন্দু, সংস্কারেও হিন্দু, শিক্ষায় ইংরাজ, কিন্তু গত লেখা তাঁর ফরাসী কবি-কুলের ও ফরাসী সাহিত্যিকদিগের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজী কবিতার সুষ্ঠু ছন্দে। তিনটি আত্মার তিনটি ভাবধারা যেন ত্রিবেণী সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে।" তাহা হইলেও তরু দত্তের লেখনীতে ভারতীয় সংস্কৃতির ও উহার বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হইয়াছে দেখা যায়।

দেশে ফিরিয়া শুনা যায় তরুর জীবনের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দিন কখনও বাগমারীর বাগান বাড়ীতে কখনও বা কলিকাতার পৈত্রিক-গৃহে কাটে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্টে বড় বোন অরু যক্ষ্মারোগে মারা যান। তরু তখন একেবারে সঙ্গীহীনা হইয়া পড়িলেন। বড়ই একাকিনী বোধ করিতে লাগিলেন। এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও তিনি সাহিত্য-সমুদ্রে ডুব দিলেন। তাঁহার ফরাসী শিক্ষাও চলিতে লাগিল। এই সময় তিনি ফরাসী কবি লেকঁত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহারই কয়েকটি ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদও করেন। এই লেখাগুলি তদানীন্তন বেঙ্গল ম্যাগাজিন (Bengal magazine) পত্রিকায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কবি লেঁকত দেলিলের প্রতি তরুর মনোযোগ আকর্ষণের প্রধান কারণ—তাঁহার কবিতাগুলিতে ভারতীয় ভাব ধারারই বেশী প্রকাশ;

এই সময়েই পিতার নিকট তরুর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল কিনা ঠিক জানা নেই। তবে প্রাচীন সংস্কৃত কবিদিগকে যে তরু বিশেষ ভালবাসিতেন, এবং রামায়ণের সীতা চরিত্র যে তাঁহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল একথা তরুরই লেখা কয়েকখানি পত্রে দেখা যায়।

দুইটি সন্তান অকালে হারাইয়া তরুর পিতার সকল স্নেহ তাঁহারই ওপর আসিয়া পড়ে। তাঁহাকেই তিনি মনপ্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ সুখটুকুও বেশী দিন স্থায়ী হইল না। তরুও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনেও দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে তিনিও শীঘ্র যক্ষ্মারোগেই মারা যাইবেন।

ঈদৃশ রুগ্ন শরীরেও তরু অনেক ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। মাদমোয়াজেল ক্ল্যারিস বাডার "প্রাচীন ভারতে নারী" নামে একখানি পুস্তিকার তরু কর্ত্তৃক ইংরাজী অনুবাদ এই সময় প্রকাশিত হয়; অনুবাদার্থে অনুমতি প্রাপ্তি নিমিত্ত ক্ল্যারিস বাডারের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ হয়। তাহাতে উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুতা গড়িয়া উঠে তাহা জীবনাবধি বর্তমান ছিল।

বিলাতি সভ্যতার পক্ষপুটে শহরে জীবনে মানুষ হইয়াও তরু তাঁহার সহজাত কবি-মানসিকতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সহজ সংস্কার কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ শে এপ্রিল একখানি পত্রে তিনি লেখেন—'সকাল-বেলা বাগানের অভ্যন্তরভাগ কি আনন্দোজ্জ্বল! অতি প্রত্যূষেই ভীমরাজ পাখীর গান শুরু। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই

কোকিল ও বো-কথাকও এর ডাক আরম্ভ। সকাল দশটা পর্য্যন্ত বাগানের ভিতরটা কি শীতল, কি মধুর। তাহার পরই উত্তাপ বাড়িতে থাকে। দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকল পাখিই চঞ্চল হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও বেশ বুদ্ধি সহকারে তাহারা নিজ নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।"

কুমারী মার্টিনকে লেখা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্রে জানা যায় যে এই সময় তরু "A Sheaf gleaned in the French fields" নামক পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন। উহা প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ। পুস্তকখানি বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা তরুর পত্রাদিতেই প্রকাশ পায়।

"Bianca"র আটটি পরিচ্ছেদ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Bengal magazineএ প্রকাশিত হয়। "Ancient Ballads and Legends of Hindusthan," প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট লণ্ডনে। একখানি মাত্র উপন্যাস Le journal de mille d' Arvers তরু লিখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ডিডিয়ারে পুস্তকখানি তাঁহারে পিতার প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়।

সে যুগে ইউরোপে অনেক ঔপন্যাসিক নিজের জীবন-কাহিনী তাঁহাদের রচিত উপন্যাসের মাধ্যমে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তরুর জীবন-কাহিনীও এই উপন্যাস-খানিতে প্রকটিত হইয়াছে।

রোগ শয্যাতেও তরুর লেখনী বন্ধ ছিল না। ধীরে ধীরে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইতেছিল। তিনিও তখন যক্ষ্মারোগেই আক্রান্ত। অবশেষে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। আপার সার্কুলার রোডের সি. এম. এস. সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার মরদেহের সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। তরুণ কবির স্মৃতিসৌধের প্রয়োজন এখনও কি বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিবে না? স্বাধীনতা শুধু কথায়, কথাই থাকিয়া যাইবে? দেশের সংস্কৃতি ও গৌরবরক্ষায় প্রচেষ্টা কি শুধু ভোটাভুটিতেই সীমিত থাকিবে?

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তরু দত্ত তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন সত্য কিন্তু তিনি মনে প্রাণে হিন্দুই থাকিয়া যান। ভারতীয় ভাবধারাই ছিল তাঁহার সাহিত্যকর্ম্মের উপজীব্য বিষয়। তাঁহার মাতার চরিত্রই তরুর ব্যক্তিসত্তাকে প্রভাবান্বিত করে। তাঁহার রচিত বিখ্যাত কবিতা "যোগস্তা উমা" পাঠ করিলেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কবিতাটির বাহিক সাজ-সজ্জা ইংরাজী হইলেও উহার অন্তরে ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র গুলিরও যদি বাংলা নাম দেওয়া হইত, উহা বিদেশী ভাষায় লেখা হইলেও উহাকে বিদেশী বলা চলিত না। কারণ ভারতের নারী-চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ উহার মধ্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর অপূর্ব্ব স্বামীভক্তি, সুনিপুণ গৃহিণীপনা, ও মধুর মাতৃত্ব উপন্যাসখানির নায়িকার চরিত্রে সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

তরুকে ফরাসীরা ফরাসী কবি বলিয়াই দাবী করুন, আর ইংরাজরা তাঁহাকে ইংরাজ কবি বলিয়াই গর্ব্ব করুন, তিনি যে ভারতের, বিশেষত বাঙ্গলা দেশেরই একজন কবি সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অথচ বাঙ্গলাদেশ তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। ইহাই কি বাঙ্গালীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যাইবে?

সীমানা

দেশপ্রিয় মৌলিক

রাত থাকতেই হরিমোহন পথে বেরিয়ে পড়ল। খুব আস্তে বাইরের দিকের দরজাটা খুলে পথে পা রাখল, হাতের পুঁটুলিটার দিকে একবার তাকাল, পকেটে হাত দিয়ে টাকা পাঁচটায় স্পর্শ নিল, তারপর পেছন ফিরে আর একবার বাড়ীটার দিকে তাকাল। সারা বাড়ীটা এখনও গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। দেওয়াল-গুলো, বারান্দাটা, বারান্দার সামনের কামিনীফুলের গাছটা সবই যেন ঘুমোচ্ছে অঘোরে—খালি রাস্তার ধারে বাড়ীর লাগোয়া তাল গাছটা অন্ধকারে ভূতের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেন ধমকের সুরে বলছে—এই এই হরিমোহন, বাড়ীথেকে চলে যাচ্ছিস কেন রে?

একটা নিশ্বাস ফেলল হরিমোহন; আগের দিনের নিজের হাতে লাগানো বেড়াটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। এখন আর দা' দিয়ে পাকা বাঁশ কাটবার সামর্থ্য নেই তার, তবু বাড়ীর সব কাজ সেইতো করে। পুকুরের পাঁক তোলা, বাড়ীর উঠোন পরিষ্কার করা, আগাছা তুলে ফেলা, বেড়া দেওয়া—অন্য বাড়ীর গরু এলে তাড়িয়ে দেওয়া,গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে গোবর ফেলে পচিয়ে সার করে গাছের গোড়ায় দেওয়া, এছাড়া বাজার-হাট সব—তবুও সে নাকি অকেজো লোক। নাঃ আর দেরী করা নয় এবার হাঁটা যাক নয়তো ষ্টেশনে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

পা চালাল বৃদ্ধ হরিমোহন। সারারাত খাওয়া হয়নি, গত বিকেলে একটা রুটি আর এক কাপ চা খেয়েছিল—সেই খেয়েই এতক্ষণ। পেটে খিদে চন্ চন্ করছে, দাঁতে দাঁত চেপে হরিমোহন হাঁটতে লাগল। ষ্টেশন ছাড়া এত ভোরে দোকান খোলেনি কোথাও, ষ্টেশনে গিয়েই কিছু খেয়ে নিতে হবে। সারাটা গ্রাম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, কেউ জানেওনা হরিমোহন কোথায় যাচ্ছে—এক চাঁদটা ছাড়া। চাঁদটাই তার পেছন নিয়েছে গ্রামের চৌকিদারের মত। মাথা তুলে সে তার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটা আসছে কিনা দেখে নিল এক-বার। রাস্তা ছেড়ে এবার মাঠে নেমে পড়ল সে, ছেঁড়া ফাকসার্টের বাঁ দিকের পাশ পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বার করে ধরাল তারপর ফের হাঁটতে লাগল আল দিয়ে। বৈশাখের প্রথম, ধান তোলা হয়ে গেছে, হাড়-জিরজিরে মাঠটা অনাদরে শেষ রাতের অন্ধকারে যেন অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদছে। হরিমোহনের বিড়ি নিবে গেছে, আবার ধরাতে গেল বিড়িটা, প্রচণ্ড হাওয়ায় দেশলাই জ্বলছে না, যাও বা দু'এক বার জ্বলল বিড়িটার ঠিক সামনে এসেই নিবে গেল, বিরক্ত হয়ে আধপোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে মারল একদিকে। পথ চলতে চলতে একটু যেন হাঁটুটা টন্ টন্ করে উঠছে মাঝে মাঝে। এই হয় তার বেশী হাঁটলে। বয়স তো কম হলো না, তিন কুড়ি পার হয়েছে কবে, কোমরেও ব্যথা হয় একটু একটু। হাঁটুতে নিজে নিজেই সে মালিশ করতে পারে, কিন্তু কোমর কি করে মালিশ করবে? কমলাকে বললে খিঁচিয়ে ওঠে—আবার মাজায় ব্যথা। কোন্ কাজটা কর সারাদিনে যে রাত হলেই ন্যাকামি। নিজে ব্যথা বানিয়েছ নিজে মালিশ কর, আমি কি তোমার ব্যথার ভাগী।

নাঃ কমলা বড় খিট্‌খিটে। বিয়ের সময় ছিল এক-রকম, কথায় কথায় রাগ করত, চোখের জল ফেলত আর এখন হয়েছে একেবারেই উল্টো, ছেলে-মেয়েদের কথায় ওঠে বসে। এতখানি যে বয়েস হয়েছে হরি-মোহনের তা যেন বুঝতে চায়না কমলা। এখন সে কাজ করবে কেন, কাজ করবে তার ছেলেরা, সে শুধু ধম্মো-কম্মো করবে। আর বসেই কি সে থাকে? বাড়ীর যত কাজ সবইতো তার করতে হয়। পঁচিশ তিরিশ বছরের ছেলে দুটো একগাছ কুটোও ভাঙবেনা।

চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে। দুবেলা চায়ের হাতখরচের পয়সা সব দিতে হবে এই বুড়ো বাপকেই। কাজ করবে না কিছু, সংসারে এক পওসাও দেবে না, পুকুরের মাছ বিক্রি করে যে কটা পয়সা আসবে তা দিয়ে বাবুগিরি করবে। কাজ করতে বল্লে বড়টা মুখ ঝামটা দেয়, ছোটটা উঠে চলে যায়, নালিশ করে মার কাছে—শেষ পর্য্যন্ত ঝামেলা বাধে কমলার সঙ্গে। বুড়ো হয়ে কোন কাজ তো করবেই না শুধু বাড়ীর মধ্যে ঝামেলা বাধানো,—বক্ বক্ করতে করতে রান্নাঘরে যায় কমলা। খিদে পেলে খেতে দেবে এক ঝুড়ি কথা শোনাবার পর। এইতো কাল দুপুরেই গণ্ডগোল লেগেছিল মেয়েটাকে নিয়ে। সোমত্ত মেয়ের অমন একলা একলা কি ঘুরে বেড়ানো ভাল, তাছাড়া হরিমোহনের মত লোকের মেয়ের অত সাজগোজই বা কিসের? আর সাজ পায়ই বা কোথায়। বাপ হয়ে এর বেশী ভাবতে ভালও লাগেনা না বলেও পারা যায় না। এই নিয়েই কথা হয়েছিল, কমলা বলেছিল—চাকরী ছেড়ে খালি খুনসুটি মেরে বেড়াও কেন। বাড়ীর কথা তো ভাবতেও দোখনা একটু।

—হায়রে কপাল, বাড়ীর কথা আমি ভাবিনা তো ভাবে কে? যার দু দুটো খাসির মতন ছেলে, তার বাপ সাত মাইল হেঁটে গিয়ে রোজ লালার দোকানে খাতা লিখবে কেন? এ বয়সে রোজ চোদ্দ মাইল হাঁটা কি সোজা ব্যাপার। দুঃখের মধ্যেই হাসে হরিমোহন।

এত কথাও বলতে হয়নি। এই জন্যই বোধহয় দুপুরে ভাত পায়নি হরিমোহন। কমলাকে খেতে দিতে বলায় সে বলেছিল—ভাত কোত্থেকে দেব। সারাদিন বাড়ীর উঠোন ঝাঁট দিয়ে পুকুর সাফ করে ছেলে বউ এর সঙ্গে মুখ চালিয়ে যদি ভাত আসতো তবে কেউ আর চাকরী করতো না। হাতের কোদালটা ফেলে দিয়ে হরিমোহন বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরেছিল গভীর রাতে। তার পর এই এখন চলছে সে তার বোনের বাড়ী। বনপাশ। দোকানদার শিবু সব শুনে বলেছিল— হরি-কাকা, আপনে বুইনের বাড়ীই যায়েন গিয়া। না খাইয়া তো আর মরবেন না তাইলে। যাতায়াত বাবদে গোটা পাঁচেক টাকা না হয় আমিই দিমু হানে।

একটা হোঁচট খেয়ে হুঁশ হয় হরিমোহনের। অনেকটা পথ চলে এসেছে সে, আরও মাইল তিনেক। রোদ উঠেছে, কটা বাজে কে জানে। ন টার গাড়ী ধরতে পারবে তো। হাতের পুঁটলিটা খুলে ফেল্ল হরিমোহন—একটা ছেঁড়া ফতুয়া, একখানা ধুতি একটা গামছা আর এক বাণ্ডিল বিড়ি। শিবু দিয়েছিল বিড়ির বাণ্ডিলটা। পকেটের টাকাটা পুঁটলির মধ্যের ফতুয়ার পকেটে রেখে গামছাটা হাতে নিয়ে ফের বেঁধে সেটা হাতে ঝোলালো সে। মাঠের মাঝখানে একটা ডোবা, হরিমোহন সেখানে নেমে হাত পা ধুলো, হাতের গামছাটা দিয়ে কিছুক্ষণ বাতাস করল। বোনের বাড়ী গিয়ে কি বলবে বোনকে?—বৌ ছেলেরা খেতে দেয়না? কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল এমন কথাও তাকে বলতে হবে। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ হরিমোহন। তাছাড়া আর কিইবা বলার আছে। তার বোন অবশ্য খুবই ভালো, নিশ্চয়ই কথা শুনে মায়া হবে দাদার উপর। বিশ্বেশ্বরও বড় ভালো ছেলে দুবেলা দুমুঠোর জন্য নিরাশ করবে না হরিমোহনকে। বাড়ীর কথা মনে পড়ল—নিতাইটার পঁচিশ বছর বয়স এখনও কিছুই করছে না। আয় প্রায় না থাকলেও গাছের আয় পুকুরের টাকা মিলিয়ে ডাল ভাত একরকম জুটবে তাও তো এবার বন্ধ। সে না থাকলে পুকুরতো মজে যাবে, গাছগুলোর পরিচর্য্যা আর কে করে। নারকোল গাছ তিনটের খেজমৎ করা নিতাই আর হারান এর কম্ম নয়। বেলা গেলে হাঁস কটাকে কে যে ডেকে আনবে তা ভগবানই জানে। আর লেবু চারা গুলো যে ষণ্ডা গরুটা এসে বেড়া ভেঙেই খেয়ে যাবে—বুড়ো বাপটা যে কত কাজ করত মায়-পোয় টের পাবে তখন। নিজকে বেশ দামী, কাজের বলে মনে হয় হরিমোহনের। তখনি চট্ পট্ উঠে পা চালায় সে, আরও মাইল তিনেক। বুড়ো হাড়ে আর যেন হাঁটতে পারে না। হারামজাদা মাঠটাও শেষ হয়না,—গামছাটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সেটা মাথায় জড়িয়ে নেয় সে।

.. গতরাত্রে না খেয়ে খিদেটা মরে গিয়ে যেন পেটের মধ্যে একটা শক্ত ডেলা হয়ে রয়েছে। গরম বাড়ছে; ধুতিটা হাঁটুর ওপরে তুলে নেয় হরিমোহন, আর একটা বিড়ি ধরিয়ে একবার কাশল সে। মাঠ ছাড়িয়ে পাকা রাস্তা পেল বুড়ো হরিমোহন এতক্ষণে। আর মাইল-খানেক মাত্র, বেলা বোধহয় এখনও বেশী হয়নি, বড়জোর সাড়ে সাতটা কি আটটা—তার আগে একবার লালার সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়? লোকটার কাছে এতদিন খাতা লিখেছি, বড় ভাল লোক লালা, মার শ্রাদ্ধের সময় দেড়শ' টাকা অমনিই দিয়েছিল। হরিমোহন বাঁদিকে ঘুরল, দু পা এগোতেই ডানদিকে লালার আড়ৎ—লালাজি রাম রাম। ঢুকতে ঢুকতে বলল সে।

বুক আর ভুঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় গেঞ্জিটা তুলে পেটে হাওয়া খাওয়াচ্ছিলেন লালাজি। ধবধবে পৈতেটা দেখা যাচ্ছিল। বস্তার আড়ালে মোটা খাতা বাগিয়ে কলম দিয়ে লিখছে বসে একটা কম-বয়েসি ছেলে। এইখানেই আগে হরিমোহন বসতো। বয়স হয়ে গেলে আর সাত মাইল রোজ হেঁটে এসে খাতা লিখতে পারতো না সে, চাকরী ছেড়ে দিতে হলো। লালাজি একটা একশ' টাকার নোট হাতে দিয়ে বলে-ছিলেন—লিন হরি বাবু, আর কি দিব আপনাকে। হামার বহুৎ কাম করিয়েছেন বিশ বরষতক। নিতাই বা হারানটা যদি মানুষ হতো তবে এখন লালাজির দোকানে ওরাই একজন খাতা লিখতো।

নিঃশ্বাস ফেলে হরিমোহন—তোমার নাম কি বাবা?

খাতা থেকে মুখ তোলে ছেলেটি, হুবহু হারানের মত দেখতে ছেলেটাকে—সেই রকমই কালো, পাতলা গোঁফ, রামছাগলের মত। চমকে ওঠে হরিমোহন—অস্ফুট-ভাবে বলে ওঠে—হারান।

লালাজিই উত্তর দেন—ওর নাম সুধীর আছে। আপনি বলেন হরিবাবু, কেমুন আছেন।

টাইমপিসটার দিকে চোখ ফেলে হরিমোহন—আটটা বাজে। কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে নিশ্চিন্তে।

—ভাল। বস সে।

—তবিয়ৎ আচ্ছা। আপনাকে একটু গম্ভীর লাগছে।

—না: এমনিই, আপনি কেমন আছেন লালাজি।

—রামজি কি কিরপা। ওরে দুলাল, দো চায় দে ভাই, তা কুথায় চলিয়েছেন হরিবাবু।

—বনপাশ। বোনের বাড়ী।

—বহিন্ কা ঘর—কেঁও।

—ওখানেই থাকব।

—ঘর ছোড়িয়ে যাচ্ছেন। লালাজি বিস্মিত হয়।

—হ্যাঁ;

লালাজি জানে নিতাই আর হারান এর-কথা। মজুতদার বলে দলবল নিয়ে এসে লালাজিকে চোখ রাঙিয়েও গেছে তারা অনেকবার। লালাজি বোধহয় সেই জন্যই বল্লেন—তা হারান নিতাই কি কোরে এখোন। মাথা নাড়ল হরিমোহন।

চায়ে চুমুক দিয়ে লালাজি বল্ল—রামজি সব চলা যায়গা হরিবাবু।

—কেন?

—মেরা লড়কা আছে। ও সব কাম শিখে লিচ্ছে। চার ছে মাস কে বাদ ছুটি—সীতারাম—

পেছনের ঘর থেকে কুড়ি বাইশ বছরের একটা ছেলে বেরিয়ে এল। তাকে দেখিয়ে লালাজি বল্লেন—ইয়ে মেরা লড়কা। সবসে ছোটা।

ছেলেটা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হরিমোহন দেখতে লাগলেন ছেলেটাকে। এ একদিন আড়তে বসবে, লালা হবে। এখনকার লালা দেশে চলে যাবে। —কবে ফিরবেন? হরিমোহন প্রশ্ন করল।

—নোহ্ নেহি, লোট নেহি আয়গা। বুঢ়া হয়েছি আর কি করবো বলেন। আচ্ছা তু যা—

সীতারাম চলে গেল।

—আচ্ছা আমি উঠি লালাজি, আর তো দেখা হবেনা আপনার সঙ্গে।

—আচ্ছা আসেন হরিবাবু, রামজি আপকো সুখী করে।

ষ্টেশনে এল হরিমোহন। বাইরের কলে জল খেল

পেট পুরে। খালি পেটে জল পড়তেই পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। শুকনো পেটে চা খেয়ে জল খাওয়াটা ঠিক হয়নি। টিকিট কাটলো হরিমোহন। টাকা দুয়েক এখনও আছে, কিছু খেলে মন্দ হয় না আস্তে আস্তে ষ্টেশনের খাবারের দোকানটার পাশে এসে দাঁড়ালো ভয়ে ভয়ে। অনেকেই খাবার কিনছে, ছোকরা চাকরটা ঠন্ ঠন্ করে কাপ ডিস ধুচ্ছে, হরিমোহনকে খেয়ালই করল না কেউ। দোকানের আয়নায় নিজেকে দেখল হরিমোহন, পাকা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো শীর্ণ মুখটার উপর জঙ্গলের মত গজিয়ে উঠেছে, ঘাড় গলা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। শিরাগুলোই বেঁধে রেখেছে মাথাটাকে। কুঁচকে গেছে চামড়াগুলো। গর্তে বসা চোখ আর টাক মাথাটা একটা শকুনের মত লাগছে। সাদা হয়ে যাওয়া পুরোনো কার-বাঁধা মাদুলীটা নেমে এসে কনুই-এর কাছে আটকে রয়েছে। টেনে টুনে সে ওপরে তুলল মাদুলিটাকে, নোংরা ছেঁড়া জামাটার তাকে একটা ভিখরীর মত দেখাচ্ছে। —ভিখরীই তো, হাসল হরিমোহন, দু দুটো জোয়ান ছেলের বাপ হরিমোহন ঘোষ ভিখরী। গামছার খুঁটে চোখের জলটা টুক্ করে মুছে ফেলল তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগতেই পাশ ফিরল হরিমোহন—লালার ছেলে। চোখে চোখ রাখতেই হাসল একটু—এক শালা মাল লে গিয়ায়া, রূপেয়া তো নেহি দিয়া, ফির বাবাকো বুরা বাৎ শুনায়া, শালা হারামী।

গালাগালিটা বড় ভাল লাগল হরিমোহনের। সীতারাম চলে যাচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে রইল সে—ফির বাবাকো বুরাবাৎ শুনায়া। শালা হারামী,—মনে মনে আওড়ালো কথাগুলো। বড় ভালো ছেলেটি লালার—লালার চাইতে সুখী আর কে আছে। এই বুড়ো কি করছিস্ কি এখানে। দোকানের বয়টা খিঁচিয়ে উঠল।

হরিমোহন ভয়ে ভয়ে বল্ল—খাব।

—কি খাবে?

কি খাবার পাওয়া যায় হরিমোহন জানেনা। দোকানদারই তার পোষাক দেখে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা পাঁউরুটি আর একগ্লাস চা দিল।

রুটি চিবোতে চিবোতে ভাবতে লাগল সে—বোনের বাড়ীতে মুখ ঝামটা করার কেউ নেই। বোন তো সাত চড়েও রা করেনা। শেষ জীবনটা যদি একটু সুখে কাটে। কিন্তু সেখানে একেবারে বসে খেলে তো চলবে না। একটু কাজ করতেই হবে। বোনের গরুটরু গুলোকেও তো দেখতে হবে, সেগুলো যদি সে করে তবে বিশ্বেশ্বরেরও একটু কাজ কমে। তার নিজেরও হাড় জিরজিরে একটা গরু আছে, বেলা গেলে একপো দুধ দেয়। তা দিক, বড় লক্ষ্মী গরুটা, খেতে না পেয়েই অমন চেহারা হয়েছে। খেতে পেলে গরুটা আজ একটা পোয়াতী মেয়ের মতনই হত। প্রথম যখন হাট থেকে কেনা হয়েছিল তখনই কেমন একটা লক্ষ্মীশ্রী ছিল মুখে। খিদের খিদের চেহারাটা গেল। খিদে পেলে গোয়ালটার ভেতর থেকে শান্ত চোখ দুটো তুলে তাকিয়ে থাকে রান্নাঘরের দিকে। ভূষি খোল কেনার পয়সা নেই, নিজে নিজেই চরে খায়। তবুও হরিমোহন না থাকলে বোধহয় মারাই যেত গরুটা আর গরুটাও যেন তার মায়া কাটিয়েই চলে যেতে পারছেনা, সে যতদিন থাকবে ওটাও ততদিন বাঁচবে। এখনই তো ছেড়ে দেবার সময় হয়েছে, হয়তো ডাকছে, শূন্য গামলাটা চাটছে —কমলার হুঁশ নেই। নিতাইটা হয়তো তালঠুকে লাফে লাপ্পা গান গাইছে, অবলা জীব কাকেই বা বলবে ওর মনের কথা।

হাঁসগুলোর ঘরের দরজা আজ সে নেই বলে হয়তো খোলাই হবে না। পুকুর ধারের ঝোপগুলো মাঝে মাঝে দেখতে হয়—ডিম পেড়েছে কিনা। কে দেখবে। লেবু চারাগুলো বেশ হয়ে উঠেছে, টানের দিন দুবেলা জল না দিলেই ঢলে পড়বে। কে জল দেবে? তার ওপর নাপিতবাড়ীর ষণ্ডা গরুটার বড় লোভ।

শূন্য চায়ের গ্লাসটা সে নামিয়ে রাখল বেঞ্চের ওপর। হরিমোহন না থাকলে বাজার করবে কে? সেইতো নন্দের জমিদারীর বাজার সরকার। শেষ বেলায় ভাঙা বাজারে গিয়ে শুকনো ডাঁটাটা শুঁটকো বেছে বেছে কেনে।

পুবধারের বেড়াটা এখনও শক্ত আছে কিন্তু ঘরের পেছনের খুঁটিগুলো আলগা হয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে—একটা ঠেলা লাগলেই পড়ে যাবে। সারারাত আমপাতা পড়ে পড়ে উঠোনটা নোংরা হয়ে রয়েছে, ঝাঁট দেবার লোকও তো নেই—মেয়েটা বাইরে বাইরে, আর বউতো। নরককুণ্ড হয়ে যাবে যে বাড়ীটা। তারপর এই নতুন বৃষ্টি হলেই আগাছা হবে উঠোনের আনাচে কানাচে। নারকোল গাছগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। শুকনো পাতাগুলো কাটিয়ে না ফেললে গাছ-গুলো খারাপ হয়ে যাবে, বেড়া দেবার জন্ম যে বাঁশ কটা পুকুরে ফেলে রাখা আছে সে খবরও বোধ হয় জানেনা কেউই।

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল হরিমোহনের। সারা প্ল্যাট-ফর্মও জেগে উঠল—গম্ গম্ করতে করতে বিশাল ট্রেনটা এসে ঢুকল ষ্টেশনে। পিল পিল্ করে লোক নামতে লাগল। চা, পান, বিক্রি হচ্ছে কামরাগুলোর জানলার জানলায়। বনপাশ—বনপাশ হয়ে ট্রেণটা চলে যাবে বারৌনী। হাতের টিকিটটা দেখল হরিমোহন; বোন লক্ষীর বাড়ী বাকী জীবনটা সুখেই কাটানো যাবে। শিবু মুদির কথাটা মনে পড়ল হরিকাকা। আপনে বুইনের বাড়ীই যায়েনগিয়া। না খাইয়া আর তো আর মরবেন না তাইলে। আচ্ছা হারানটা কিছু করবে না? নিতাইটা যে হাতের কাজ শিখে কেন বসে আছে।

হুইস্‌ল্ বাজল, গার্ড ফ্ল্যাগ নাড়ল, আস্তে আস্তে প্রাণ পেয়ে ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। চায়ের দাম দিয়ে হরিমোহন বেরিয়ে এল দোকান থেকে, বাড়ীর দিকে পা চালাল। পুকুরটা জেলেদের দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে কামার-দের গরুটা কিনলে মন্দ হয় না। দুধেল গাইটা—এবার নারকোল বেচলেই শিবুর টাকা পাঁচটা দিয়ে দেব। কিন্তু শিবু যদি রাগ করে, করলেই বা হরিমোহন না খেয়ে মরলেই বা শিবুর কি? আদিখ্যেতা।

মোড় ঘুরতেই দেখা গেল লালা হন্ হন করে আসছে এই দিকেই, পেছনে সীতারাম। বোধহয় সেই হারামী লোকটাকে শায়েস্তা করতেই যাচ্ছে বাপ আর ছেলে। তাড়াতাড়ি হরিমোহন খড়বোঝাই গরুর গাড়ীটার পাশে সরে গেল। লালাজি যাতে না দেখতে পায় তারপর অপসৃয়মান লালা আর সীতারামএর দিকে তাকিয়ে রইল সে।

মাঠে নামল হরিমোহন। দু মাইল হেঁটে গিয়ে তবে বাড়ী। বেলা প্রায় দশটা। রোদ চড়্ চড়ে হয়ে উঠেছে, চাঁদী ফেটে যাচ্ছে—অসম্ভব রোদ। মাথাটা ঘুরছে মনে হচ্ছে, একটু বসতে পারলে হত কোথাও, একটু ছায়ায়। নাঃ বাড়ীর কি হাল হয়ে রয়েছে কে জানে। লেবু চারাগুলো, গরুটাকে বোধহয় কেউ খেতেও দেয়নি এখনও। তাড়াতাড়ি পা চালায় হরিমোহন, বৈশাখের রোদ আজকে যেন একটু বেশী রকমই তেতে উঠেছে, সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে তার। পিঠ, বগল, কাঁধ বুক ঘামে জবজবে হয়ে উঠেছে, তবু পা চালাতে লাগল হরিমোহন। মাঠ যেন আর ফুরোয় না। ঘাস ওঠা মাঠটা তেতে উঠেছে—পা ফেলাই দায়। জলতেষ্টা পেয়েছে ভীষণ, ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জল কোথায়, সেই মাইল দুই দূরে একটা ডোবা—একেবারে নীচু কিছু কাদা জল, তবু ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে মাথা ঘুরছে, তবু বুড়ো হরিমোহন হেঁটে চলেছে, চল্লিশ বছর আগেকার যুবকের শক্তি ফিরে পেতে চাইছে সে।

আর পারে না হরিমোহন, চোখের সামনে ঝোপ-ঝোপ কালো কালো কি যেন, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ভীষণ ভয় পেল সে—তবে কি বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে না। এই মাঠে এই দুপুরে কে দেখবে তাকে? দুর্বল পা দুটো কাঁপছে, পায়ের তলার মাটিটাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে—রাস্তাটা কি একপাশে কাত হয়ে যাচ্ছে? বুকের বাঁ পাশটা ব্যথা ব্যথা করছে, নিঃশ্বাসটাও যেন আটকে আটকে যাচ্ছে, চোখের সামনে—একি অন্ধকার কেন?

হরিমোহনের পায়ের তলার মাটিও দুলে উঠল।

মহাস্বর্গকথা

সন্তোষকুমার ঘোষ

জন্মেজয় কহিলেন—হে বৈশম্পায়ন, তারপর?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তারপর, বঙ্গ, পঞ্জাব আর আসাম—এই তিন বিধাতার মধ্যে স্বর্গটি ভাগাভাগি হইয়া গেল। শুধু স্বর্গই নয়—সেই সঙ্গে স্বর্গের লেজুড় মর্ত্য, পাতাল; নরক আর শূন্য-মহাশূন্যও ত্রিখণ্ড হইয়া তিন বিধাতার এলাকাভুক্ত হইয়া গেল। ফলে ব্রহ্মের স্বর্গটিতে সে এক মহাসমস্যার উদ্ভব হইল। ভাগাভাগি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাবিনিময়ও হইয়া গেল। ব্রহ্মের খাস প্রজাদের যেভাবে নাস্তানাবুদ হইতে হইল—সে আর বক্তব্য নয়। তেত্রিশ কোটি দেবতা তো ছিলেনই। তাহা ছাড়া, পুণ্যের জোরে আবহমানকাল ধরিয়া হদোহদো মর্ত্যবাসী মরিবার পর স্বর্গে ঠাঁই পাইয়া আসিতেছিল। তাহারা তখন সংখ্যায় দেবতাদেরও ছাপাইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মের সেই একফালিমাত্র খাস স্বর্গ। তাহার মধ্যে সকলের স্থান সংকুলান হইবে কেন? ঠাসিয়া গুঁজিয়া চিঁপিটকবৎ চ্যাপটা হইয়া দেবতারা সব ত্রাহি-ত্রাহি করিতে লাগিলেন। চাপের চোটে স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মাদেরও আত্মারাম খাঁচাছাড়া হইবার দাখিল হইল।

জন্মেজয় কহিলেন—বলেন কি ঋষিবর!

বৈশম্পায়ন বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ। ভাগাভাগির ফলে শুধু কি স্থানাভাবই ঘটিল! আলো বাতাসের অভাব, দানাপানির অভাব, যাবতীয় নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব। তাহা ছাড়া, কাজকর্মেরও একান্ত অভাব হইল। অভাবে অভাবে ব্রহ্মের স্বর্গটি জড়জড় হইয়া পড়িল। শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগ দেবতা বেকার আর বাউণ্ডুলে হইয়া পড়িলেন। চুরিচামারি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন-জখম—এই সব মহামারীর মত ব্যাপক হইয়া উঠিল। উৎকোচগ্রাহী এবং চারিশত-বিশ-মার্কা দেবতাতেও স্বর্গটা ভরিয়া গেল। এক কথায় ব্রহ্মের স্বর্গটুকু একেবারে নরকের বেহদ্দ হইয়া উঠিল।

জন্মেজয় কহিলেন—সে কি ঋষিবর! ব্রহ্ম বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাঁহার স্বর্গের এমন অবস্থা হইল! তিনি কি কোনরকম ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—স্বর্গের এমন অবস্থা হইবার পূর্বেই তিনি ত্রিভুবনের যাবতীয় হেপাজতের দায়িত্ব ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া অবসর লইয়াছিলেন। কোন দিকে আর চক্ষু-কর্ণ প্রয়োগ করিতেন না। এই ব্যাপারে ত্রিমূর্তিরই মাথা ঘামাইবার কথা। কিন্তু ওনাদের তো সহজে তন্দ্রাঘোর কাটে না। গাত্রও সহজে উত্তপ্ত হয় না। গড়িমসি এবং গয়ংগচ্ছ করাই উঁহাদের চির-কালের স্বভাব। উঁহারা যখন কষিয়া কটিদেশ বন্ধন করিয়া তৎপর হইয়া উঠিলেন—স্বর্গের তখন পুরাপুরি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। দেবতাদেরও ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, ত্রিমূর্তি যথাসত্বর স্বর্গের মহামন্ত্রণালয়ে মিলিত হইলেন। অবিলম্বে গোপন বৈঠক বসিল। তিন জনেরই এক চিন্তা।—স্বর্গটিকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। দেবতাদের দেবত্ব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু কী উপায়ে? ত্রিমূর্তির মধ্যে বিষ্ণুই সেরা ফিকিরবাজ। তিনি ব্রহ্মার উদ্দেশে বলিলেন—পিতামহ, আপনি আবার কোমর বাঁধিয়া লাগুন। বহুকাল হইল প্রথমশ্রেণীর কিছুই সৃজন করেন নাই। সাবেক ধরনের আর একটি স্বর্গ রচনা করুন। দেবতারা সেখানে গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইতে ও বসিতে পাইবে। খাবিখাওয়া অবস্থা হইতেও রেহাই পাইবে।

পরক্ষণেই মহেশ্বরের উদ্দেশে বলিলেন—দেবাদিদেব, আমাদের পুরাতন খাস স্বর্গটিকেও ঢালিয়া সাজিতে হইবে। সুতরাং আপনাকেও আবার প্রলয়-নাচন নাচিতে হইবে।

পিতামহ বলিলেন—এই বয়সে নূতন একটা স্বর্গ বানাইবার মত হিম্মৎ আর আমার শরীরে নাই। তাহা ছাড়া, সাবেক ধরনের একটি স্বর্গ বানাইবার মত স্থানই বা কোথায়? শূন্য এবং মহাশূন্যের যে অংশটুকু আমাদের ভাগে পড়িয়াছে, তাহা এখন মনুষ্যাদি মৃতজীবদের সূক্ষ্মশরীরে শরীরে ঠাসিয়া ভরিয়া আছে। নূতন স্বর্গ বানাইলে তাহারা কোথায় গিয়া অবস্থান করিবে?

মহেশ্বরও মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আমারও কটিদেশে ও জানুদ্বয়ে বেয়াড়ারকমের বাত ধরিয়াছে। এখন আর তাণ্ডবে মত্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, নাচনকোঁদনের ফলে পুরাতন স্বর্গটুকু ভাঙিয়াচুরিয়া তচনছ হইয়া গেলে পুত্রকলত্রদের লইয়া দেবতারাই বা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে—বসিবে?

অতএব বিষ্ণুর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। অতঃপর প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উঠিতে লাগিল। মাসাধিক কাল ধরিয়া স্নানাহার ত্যাগ করিয়া বিস্তর আলোচনা চলিল। কিন্তু কোন প্রস্তাবই ধোপে টিকিল না। ত্রিমূর্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মস্তকে করতল স্থাপন করিয়া অষ্টাহকাল ধরিয়া নির্বাক অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। শেষে আলোচনায় কোন ফল হইল না দেখিয়া তিন জনে একমত হইয়া সাবেক পন্থাই অবলম্বন করিলেন। তিন জনেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিলেন। যোগাসনে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে ত্রিমূর্তি তাতিয়া ঘামিয়া একাকার হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে তিনজনেরই মস্তক ও ললাট হইতে কলকল নিনাদে স্বর্দস্রোত নামিতে শুরু করিল। দেখিতে দেখিতে স্বর্দস্রোতে মহামন্ত্রাণালয় প্লাবিত হইল। সেই স্বর্দস্রোতের মধ্য হইতে আকস্মাৎ অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী নূতন এক দেবীর উদ্ভব হইল। উদ্ভূত হওয়ামাত্রেই দেবী সুধামিষ্টস্বরে কহিলেন—উপবিধাতাগণ, আপনাদের আর মিছু ঘামাইতে হইবে না। অনুগ্রহ করিয়া চক্ষু উন্মোচন করুন।

কর্ণকুহরে অপূর্ব কণ্ঠস্বর প্রবিষ্ট হওয়ামাত্রই উপ-বিধাতারা চর্মচক্ষু উন্মোচন করিলেন। সম্মুখে পরম রমণীয় দেবীমূর্তি দেখিয়া তিনজনেই মোহাবিষ্ট হইলেন। তিনজনেই গদগদকণ্ঠে সমস্বরে বলিলেন—অয়ি লাবণ্য-পুঞ্জে তুমি কে? তোমার আবির্ভাবের হেতু কী? কীদৃশ উপায়ে আমরা তোমার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব?

মৃদু হাসিয়া দেবী কহিলেন মহামহিমগণ, আমি আপনাদেরই মানসকন্যা। আমার নাম পরিকল্পনা। আমার মধ্যে স্বর্গের সকল সমস্যারই সমাধানের উপায় নিহিত আছে। আপনারা মোহবশে দিব্যদৃষ্টি হারাইয়াছেন, তাই আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না আমি আপনাদের চর্মচক্ষে দিব্য অঞ্জনের প্রলেপ লাগাইয়া দিব। তাহার মহিমায় সর্ববিধ সমস্যা-সমাধানের উপায়ই আপনাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। আপনারা নিমীলিত নেত্রে স্থির হইয়া উপবেশন করুন।

দেবী আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পিতামহ ব্রহ্মার চারিজোড়া চক্ষু, বিষ্ণুর নয়নযুগল এবং মহেশ্বরের লোচনত্রয় অঞ্জন লাঞ্ছিত করিয়া দিলেন। অঞ্জনাঙ্কিত চক্ষু উন্মোচন করিয়া ত্রিমূর্তি দেখিলেন—দেবী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। হাসিতে হাসিতে সেই দেবী মূর্তি সহসা সহস্র মূর্তিতে পরিণত হইল। সহস্র মূর্তির হস্ত সহস্র রকমের মাল্যদ্বারা শোভিত। মাল্যগুলি নানারকম উপায়-পন্থার খসড়া ও নক্শাদ্বারা রচিত। মূর্তিগুলি হাসিতে হাসিতে ত্রিমূর্তির কণ্ঠদেশ খসড়া ও নকসার মালায় মালায় ভরিয়া দিল।

জন্মেজয় নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিলেন—তারপর?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অতঃপর উপ-বিধাতারা উপায়ের খসড়া ও নকশাগুলিকে সাদরে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দেবীর নামে

উপায়গুলির নাম দিলেন—পরিকল্পনা। কত রকমের পরিকল্পনা। শতবার্ষিকী পরিকল্পনা—পঞ্চশত বার্ষিকী-পরিকল্পনা। সহস্রবার্ষিকী পরিকল্পনা—লক্ষবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রত্যেক পরিকল্পনার লেজুড় হিসাবে আবার সহস্রপ্রকারের উপ-পরিকল্পনাও গজাইয়া উঠিল। শেষে পরিকল্পনার খসড়ায়-খসড়ায় আর নকশায় নকশায় ভরিয়া গিয়া ব্রহ্মের ঘরটির ঠাসা পাটের গুদামের মত অবস্থা হইল। পরিকল্পনাগুলিকে যথাশীঘ্র কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার নির্দেশ দিলেন। দেবরাজ সঙ্গে সঙ্গে আমাত্য মহলে এবং দপ্তরে দপ্তরে জরুরী হুকুম জারি করিলেন। হুকুম জারি হওয়া মাত্রই পরিকল্পনা মন্ত্রক নামে নূতন একটি মন্ত্রক গড়িয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই মন্ত্রকের অধীনে গণ্ডা গণ্ডা দপ্তরও গজাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করিবার জন্য দপ্তর-গুলি কোমর বাঁধিয়া উন্মত্ত হইয়া মাতিয়া উঠিল। স্বর্গের অন্যান্য দপ্তরগুলিতেও সমানতালে সাজো সাজো রব উঠিল। কিন্তু ভোলা মহেশ্বর সব ভণ্ডুল করিয়া দিলেন। মূল পরিকল্পনাটির সকল ব্যাপার গোপন রাখা হইবে—এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বৈঠক শেষ হইলে ভোলানাথ আপন আবাসগৃহে ফিরিয়া ভরপুর ভাঙ খাইয়া একেবারে বেসামাল হইয়া পড়িলেন। নেশার ঘোরে তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ প্রমথদের নিকটে মূল পরিকল্পনাটির সকল তত্ত্বই ফাঁস করিয়া বসিলেন।

প্রমথগন জানিতে পারিল—স্বর্গে যত পুণ্যাত্মা ঠাঁই পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগই নাকি মেকী। এই সব মেকী পুণ্যাত্মাদের একটি তালিকা বানাইয়া স্বর্গ হইতে ভাগাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। বিভক্ত মহাশূন্যের যে অংশটুকু ব্রহ্মের ভাগে পড়িয়াছে—সেখানেই এইসব মেকীদের ক্ষেপে ক্ষেপে চালান দেওয়া হইবে। তাহার ফলে স্বর্গটুকু অনেক ফাঁকা হইয়া যাইবে। দেবতারা এবং আসল পুণ্যাত্মারা হাত পা ছড়াইয়া বসিতে ও শুইতে পারিবেন এবং হাঁপ ছাড়িয়াও বাঁচিবেন। দেখিতে দেখিতে গোপন তত্ত্ব-গুলি গোপনপথ দিয়া মেকী পুণ্যাত্মাদের মহলেও ছড়াইয়া পড়িল। মেকীরা ক্ষেপিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল।

জন্মেজয় কহিলেন—হে বৈশম্পায়ন, মেকী পুণ্যাত্মা কাহারা?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ, মর্ত্যবাসীদের মধ্যে যাহারা সারাজীবন নানাধরণের অসামাজিক কার্য করিয়া শেষ বয়সে শুধুমাত্র গুরু ভজিয়া অথবা তীর্থদর্শন করিয়া মহাপুণ্যের অধিকারী হইয়া মরিবার পর স্বর্গে ঠাঁই পাইয়াছে—তাহারাই মেকী পুণ্যাত্মা। যাহারা আজীবন গোহত্যা নরহত্যা হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় জঘন্য পাপকর্ম করিয়া শেষ জীবনে কোন রকমে একবার কুম্ভাদি যোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে অথবা গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া বিধিসম্মত পুণ্য অর্জন করিয়া মরিবার পর স্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইয়াছে—তাহারাই মেকী পুণ্যাত্মা। যাহারা জীবনভোর ভেজালের কারবার করিয়া কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ ঘটাইয়া শেষ বয়সে মন্দির, মঠ, ধর্মশালা-অতিথিশালা প্রভৃতি বানাইয়া দিয়া মোটা রকমের পুণ্য অর্জন করিয়া মরিবার পর স্বর্গে যাইবার অধিকার পাইয়াছে—তাহারাই মেকী পুণ্যাত্মা। যাহারা মহাঅমাত্য, অমাত্য, উপ-অমাত্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজাসাধারণের মঙ্গল-বিধানের নামে রাজভাণ্ডার হইতে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ বাহির করিয়া আপন আপন আখের গুছাইয়া লইয়া শুধুমাত্র ঢাকপিটানোর জোরে মহাপুণ্যবান বলিয়া গণ্য হইয়া স্বর্গে যাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে—তাহারাই মেকী পুণ্যাত্মা।

জন্মেজয় কহিলেন—মেকী পুণ্যাত্মা কাহারা বুঝিলাম তা তাহারা ক্ষেপিয়া উদ্দাম হইয়া কী করিল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া একজোটে মতলব করিয়া মহাঅনর্থ ঘটাইয়া বসিল। মহারাজ, মেকীদের আত্মাগুলি আসলে প্রেতাত্মা। তাহারা সকল মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য ও উপ-অমাত্য-দের মাথায় চাড়িয়া বসিল এবং প্রত্যেক দপ্তরের অধিকর্তা হইতে শুরু করিয়া চাপরাসী পর্য্যন্ত সকলেরই স্কন্ধে কায়েমীভাবে ভর করিল। পরিকল্পনাগুলিরও ব্রহ্মে

যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া ভুতুড়ে কাণ্ড বাধাইয়া দিল। ত্রিমূর্তি এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা দেবরাজের স্কন্ধে সকল দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নাসারন্ধ্রে সর্ষপ তৈল প্রদান করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

জন্মেজয় কহিলেন—তারপর?

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তারপর, পরিকল্পনার নামে গড় গড় করিয়া অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। ব্যয়ের হিসাব রাখিতে রাখিতে হিসাব রক্ষকরা গল গল করিয়া ঘামিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বর্গের অর্থভাণ্ডার একেবারে শূন্য হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া দেবরাজ তখন যক্ষরাজ কুবেরের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কুবেরের ভাণ্ডারও ফতুর হইয়া গেল। আরও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আরও অর্থ কোথায়। শেষে আমাত্যবর্গের পরামর্শে দেবরাজ নূতন বিধাতা গড়ের দ্বারস্থ হইলেন। গড মহাধনী। ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁহার নিকট হইতে মোটারকমের ঋণ লইয়া পরিকল্পনার কাজ চালিতে লাগিল। তমসুকে খতে আর কাঁড়িকাঁড়ি অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিতে করিতে দেবরাজ ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে ঋণের দায়ে ব্রহ্মের স্বর্গটুকু বিকাইয়া যাইবার দাখিল হইল। একদিকে পরিকল্পনার নামে হড়হড় করিয়া অর্থব্যয় হইতে লাগিল বটে—কিন্তু সকল অর্থই চোরাপথ দিয়া বাহির হইয়া ভূতপ্রস্ত দেবতাদের তহবিলে—তহবিলে ও সিন্দুকে সিন্দুকে প্রবেশ করিয়া জমিয়া জমিয়া পাহাড় প্রমাণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে কোন পরিকল্পনাই পুরাপুরি আকার লাভ করিতে পারিল না। কিম্ভূত-কিমাকার অবস্থায় একএকটি পরিকল্পনা শেষ হইতে লাগিল। এইভাবে একে একে শতবার্ষিকী পরিকল্পনা, পঞ্চশত বার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং সহস্রবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য শেষ হইয়া গেল। স্বর্গের অবস্থা কিন্তু পূর্ববৎই রহিয়া গেল। দেবতারাও বিন্দুমাত্র দেবত্ব ফিরাইয়া পাইলেন না। কাণ্ডকারখানা দেখিয়া দেবরাজ প্রথমে প্রমাদ গণিলেন। পরে উন্মাদের মত কাণ্ডজ্ঞান-হীন হইয়া স্বর্গটিকে পুরাপুরি বন্ধক রাখিয়াও আরও ঋণ করিয়া মহা আড়ম্বরে ঢোলকাঁসি বাজাইয়া লক্ষ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু করিয়া দিলেন। ভূত-প্রস্ত দেবতারা এবং মেকী পুণ্য আত্মারা পোয়া বারো হইল দেখিয়া আরও উৎফুল্ল হইয়া নাচিয়া উঠিলেন। নিরীহ গোবেচারী গোছের দেবতা এবং খাঁটিপুণ্যাত্মারাই শুধু অভাবে অভাবে জরজর হইয়া নাকাল হইতে লাগিলেন।

জন্মেজয় কহিলেন—শুনিয়াছি আমার পূজ্যপাদ পিতৃপিতামহগণ সকলেই পুণ্যবলে স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন। হায়, তাঁহারা এখন কিরূপ অবস্থায় আছেন তাহা পরমেশ্বরই জানেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদের বর্তমান অবস্থার কথাও আমাকে শুনাইয়াছেন। অপরদের কথা ছাড়িয়া দিন। স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—যিনি মহা-পুণ্যবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—তিনিও এখন তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত স্বর্গের এক রাজ-সড়কের ধারে পড়িয়া পড়িয়া খাবি খাইতেছেন। তাঁহার এবং তদীয় অনুজগণের শরীরে আর মাংস নাই—ধমনীতে রক্ত নাই—চক্ষে জ্যোতি নাই—পরণে কৌপীন পর্যন্ত নাই। মহারাজ, আপনি বৃথাই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে মাসে মাসে তাল তাল পিণ্ড এবং ঘড়া ঘড়া গঙ্গোদক দান করিতেছেন। পিণ্ড ও উদক মাঝপথে লুট হইয়া যাইতেছে। মেকী পুণ্যাত্মারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া লইতেছে। অধিক কি—আপনার পরমারাধ্যা প্রপিতামহী যাজ্ঞসেনী—যাঁহাকে দুরাচার দুঃশাসন বহু কসরত করিয়াও বিবসনা করিতে সক্ষম হয় নাই—তিনি একখণ্ড মাত্র টেনার অভাবে লজ্জা-নিবারণে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে স্বর্গলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জন্মেজয় আর কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই বৈশম্পায়ন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মহাস্বর্গকথা সেদিনের মত শেষ হইল।

অধ্যাপক শান্তনু মুখোপাধ্যায় স্মরণে

"দিব্যদর্শী"

ভগবান বুদ্ধ মনুষ্যদের চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। দেব মনুষ্য, মনুষ্য মনুষ্য, মনুষ্য অপায়, অপায় মনুষ্য। পূর্বজন্মের সঞ্চিত শুভ সংস্কার ও কুশল কর্মফলের সমন্বয়ে ইহজন্মে যারা সুকর্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় তাঁরা দেব চরিত্রের লোক অর্থাৎ দেব মনুষ্য। শুভ ও অশুভ সংস্কার ও কর্মফলে যাহারা ইহজন্মে মনুষ্য-সুলভ সু-কর্ম ও দুষ্কর্ম করিয়া যায় তারা মনুষ্য মনুষ্য শ্রেণীর। সংস্কার ও সুকর্মের ফলে যারা ইহজন্মে মনুষ্যদেহ লাভ করেও দুষ্কর্ম শীল তারা মনুষ্য-অপায় অর্থাৎ পরজন্মে ইতর যোনি লাভ করে। পূর্ব পূর্ব জীবনের অশুভ সংস্কার ও কর্মফল সত্ত্বেও যারা ইহজন্মে শুভকর্মের অনুশীলনে উচ্চতর মনুষ্যত্ব লাভ করে তারা অপায়-মনুষ্য।

জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে নানাজাতি, নানাবর্ণ, নানাধর্মের লোকের মধ্যে যে ক'জন আমার স্মৃতিপটে দেব মনুষ্যরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক শান্তনু মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। দেবোপম আকৃতি দেবোপম প্রকৃতি মিষ্টভাষী—এই স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে এই স্মরণাঞ্জলি লিপিবদ্ধ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রথম দর্শন পুরীতে। গাড়ি লেট ছিল। হোটেলে পৌঁছুলুম মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। পাশে একটি পরিবার বৈশিষ্ট্যের ছাপ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পরদিন পরিচয় হল প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত পদার্থ বিভার আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর সহধর্মিণী পুষ্পদেবী, কন্যা তপতী, জামাতা সচ্চিৎ কুমার। ভদ্রলোকের সহৃদয়তার আভাস পেতে দেরী হলনা। জ্বরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম। তিনি চললেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে দূর বাজারে ওষুধ কিনতে। সেই পরিচয়ের অঙ্কুর পল্লবিত হল কলকাতায়। যদিও

অধ্যাপকের ও আমার বয়সের দূরত্ব বেশি নয় তবুও চরিত্রগুণে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। আমাদের দুজনের স্ত্রীদের ভেতরও গড়ে উঠলো একটি নিবিড় প্রীতির বন্ধন। আপনি থেকে তুমি মম, মম সুখে দুঃখে সহভাগিনী।

শান্তনু বাবু দুটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন দুটি বিভিন্ন উচ্চ সরকারী চাকুরীর জন্য। কৃতকার্য্য হয়েও স্বাস্থ্যের জন্য মেডিকেল বোর্ডে বিফল হয়ে পরে হলেন শিক্ষাব্রতী। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিলেত গিয়ে ডক্টরেট-টা নিয়ে এলেন না কেন? বললেন সেই অধ্যাপকই ত হতে হল, তবে বিদেশী ছাপের কি দরকার? এটা খেদোক্তি নয়, জীবনের সর্বাবস্থায় সন্তোষ যা অনেকেরই থাকে না। ভগবান বুদ্ধ বলে গেছেন, সন্তোষটা পরমং ধনং; সন্তোষই জীবনের পরম ধন। আমরা ক'জন এই ধনের অধিকারী হতে পেরেছি যা এই স্বর্গত ব্যক্তিটি পেয়েছিলেন।

মৃত্যু হলো মধ্যমা কন্যার। সেই অবস্থায়ও ধীর স্থির প্রশান্ত বদন। এ যেন স্থিতধী অবস্থা, গীতায় যার বর্ণনা আছে—দুঃখেষ্বনু দ্বিগ্নমনাঃ। সহধর্মিণী যখন সরস্বতী ভক্তিভারতী দুটি উপাধিতে সম্মানিত হলেন তখনও শুনিনি কোন আনন্দের অভিব্যক্তি। যখন রোগশয্যায় কাতর তখনও দেখিনি কোন চঞ্চলতা।

বিদ্যার অহংকার একেবারেই ছিলনা এ কীর্তিমান অধ্যাপকের বরং নিজেকে উপহাস করে বলতেন—বুঝেছেন ডাক্তার রায় মাষ্টারি বুদ্ধি ত? আর একদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম বিলেত গিয়ে ডক্টরেট-টা নিয়ে এলেন না কেন বলুন ত? মৃদুহাস্যে জবাব দিলেন—বাবা ছিলেন অধ্যাপক, আমিও অধ্যাপক হলুম এটাতো ভালই হল।

এই নিরহঙ্কারতার সঙ্গে যুক্ত ছিল নিবিড় ধর্মভাব। বিদুষী স্ত্রী পুষ্পদেবীর এগারোখানা উপনিষদ ও অমৃত-গীতা গ্রন্থাবলীর আগাগোড়া প্রুফ তিনিই সংশোধন করেছিলেন। সেই ধর্মপ্রেরণা তাঁর অন্তরে ব্যবহারে প্রতিফলিত দেখেছিলাম গভীরতম উজ্জ্বলতায়। মহা-মানবদের বাণী যখন মূর্ত হয়ে ওঠে কারু-জীবনে তখন দিব্য-শ্রীমণ্ডিত সেই অন্তরের বহিঃপ্রকাশ অন্যদের চোখে ধরা পড়ে।

মুখুজ্যে মশায়ের পৈত্রিক অবসর ভবনেও গিয়েছিলাম মিহিজামে। ফলে পুষ্পেভরা সুন্দর পরিবেশ। পিতা ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। গণিতের সঙ্গে সুন্দরের পূজা। সেই আশ্চর্য্য সমন্বয়ের ফলশ্রুতি এই পুত্র। তুলে ধরেছিলেন এই সন্তানের কৈশোর বয়সে জিজ্ঞাসু নেত্রের সম্মুখে একটি সুন্দর আদর্শ। ফুলের সৌন্দর্য্য ফলের দাক্ষিণ্য যুক্ত পবনের প্রসারতা।

পওহারি বাবার একটী তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি মনে পড়ে সদা শুভ্রা রহনা। সেই সাদা মন নিয়ে যে ব্যক্তি এসেছিলেন পুষ্পদেবীর পতিদেবতা ও জীবনসহচর হয়ে তিনি সাদা মন নিয়ে চলে গেলেন। সংসারের আবিলতা সেখানে এতটুকু দাগ কাটতে পারেনি।

সস্ত্রীক অক্সফোর্ডে গিয়েছিলাম একবার। সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড। দর্শকদের খাতায় নাম সই করবার অনুরোধ এলো। সুবিখ্যাত বহু লোকের কাছে আমাদের স্বাক্ষর। ইতঃস্তত করলাম আরও এক কারণে। মনে পড়লো প্রাচীন ভারতের তপোবনে ব্রহ্মবিদ ঋষিদের ব্রহ্মবিদ্যা দান। আর কোথায় এ বিরাট অট্টালিকাবহুল বিদ্যাক্ষেত্রে জাগতিক বিদ্যাচর্চ্চা ও গবেষণা। ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনেছিলুম মুখুজ্যে মশায়ের কণ্ঠে! কি আর শিখিয়েছি ছাত্রদের? পদার্থ বিদ্যা? সে তো তুচ্ছ—যাঁকে জানলে সব জানা যায় সে বিদ্যাতো লাভও করিনি, দিতেও পারিনি। পূর্ব্বেই বলেছি উনি খুব প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি ছাত্ররা পরোক্ষে ওঁকে বলতো জামাইবাবু। ধুতি পাঞ্জাবীতে কি সুন্দরইনা মানাতো। বিদেশী পোষাক তিনি কোন-দিন পরেননি। অর্থাৎ দাসত্বের চাপরাশ কখনও বহন করেননি। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি কখনও তিনি পরচর্চ্চা করতেন না। যে নিজে ভাল সে অন্য-কেও ভাল দেখে। শেষ বয়সে কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতী ওঁর ভার নিয়েছিল। এই পুণ্যকর্মের সুফল সে নিশ্চয় ভোগ করবে। পুষ্পদেবীর কথা আর কি বলবো? অল্প বয়স থেকেই বহু রোগগ্রস্থ এই ব্যক্তিটিকে মাতার অধিক স্নেহে, ভার্য্যার অধিক সেবায় দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর যিনি এই সংসারে ধরে রাখতে পেরেছেন। কিন্তু যখন জীবন-দীপ নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয়ে যায় তখন সব চেষ্টাই নিষ্ফল। শ্রীমতী পুষ্পদেবীকে কি সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারি? তিনি নিজে গীতা ও উপ-নিষদের সমুদ্র মন্থন ক'রে বহুজনকে অমৃত পান করিয়েছেন। যোগীরাজ শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা হয়েছেন। "ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিৎ ন হন্যমানে শরীরে" ভগবানের এই শাশ্বতবাণী তাঁর অন্তরে শান্তি বর্ষণ করুক।

স্বতপা

(উপন্যাস)

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

ওরা দালানের ভেতর এল। স্বতপার টুথব্রাস, সাবান, ছোট পাউডার, আর কয়েকটা জিনিষ কেনার ছিল। ও দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছিল। আনন্দবাবু দোকানের দরজায় লাগানো জিনিষগুলো থেকে সুরু করে শো-কেস পাশের আলমারী আর ওপরে টাঙানো যত কিছু ছিল সব কটি ভাল করে দেখে আর দোকানের এক কর্মচারীকে একে একে জিনিষগুলোর দর জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যতক্ষণ না কর্মচারিটা একটা ছুতো করে একটা অলমারীর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

আনন্দবাবু আপনমনে দেখছিলেন জিনিষগুলো, খেয়াল হ'ল স্বতপার ডাকে।

'তাইত। আমার ও যে কিছু কেনার ছিল' বলেন উনি। কিন্তু কি কেনা যায় ভাবতে গিয়ে চোখ পড়ল কাঁচের জারে ভর্ত্তি মোটা মোটা নেস্‌ল্‌স্ চকোলেট-গুলো। ওরই দু'টি চাইলেন উনি আর মনে পড়ে একপ্যাকেট ব্লেড্ ওর সঙ্গে।

পথে বেরিয়ে একটা চকোলেট স্বতপাকে দিয়ে বলেন, 'নিন্ খান, বেশ খেতে।'

স্বতপার আপত্তি—'সঙ্গে রাখছি কিন্তু রাস্তায় খেতে খেতে যাওয়া আমার হয় না।'

আনন্দবাবু ততক্ষণে কাগজ ছাড়িয়ে এক টুকরো মুখে পুরেছেন। 'কেন হাটতে খেতেই ত' মজা। দিন জিনিষগুলো আমার প্যান্টের পকেটে রাখছি, ধরে যাবে আমার পকেট বড় আছে।

'না না আমিই রাখছি। রাস্তায় খাওয়া আমার একেবারে ভাল লাগে না।' আনন্দবাবু নিরুপায় হয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে চলেন খেতে খেতে। বলেন—

'আপনার কথাগুলো কেমন হেঁয়ালীর মত লাগল, কেন বলুন ত'? জীবনটাকেই হেঁয়ালী বলবেন ত'?

হ্যাঁ বিশেষ করে মেয়েদের জীবন। কেন জানেন? আমাদের জীবনের আবার দু'টি দিক সামলাতে হয়। একটা বাইরের, আর একটা ঘরের।'

আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, বুঝলেন, এমনিতে বেশ থাকি, কিন্তু যখন ভাবতে শুরু করি তখন অন্য জগতে চলে যাই। জীবনটা যে একটা গোলমেলে ব্যাপার এটা বেশ বুঝি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় আলাদা আর ছেলেদের বেলায় আলাদা, এটা আর এযুগে চলে না। আগে হয়ত ছিল যখন মেয়েদের ঘরের মধ্যে থাকতে হ'ত। এখন ত বাইরের জগতের আলো পেয়ে ছেলে-দের সঙ্গে মেয়েরা সমান তালেই চলছে। তাই এখন আপনার যা সমস্যা আমারও তাই, আর সকলেরই সেই একই ব্যাপার কেবল অবস্থা বা পরিবেশ যাই বলুন তাতেই যা আলাদা।' আনন্দবাবু আর এক টুকরো চকোলেট মুখের মধ্যে পুরে দিলেন।

স্বতপা বললে, 'দেখুন আমাদের দু'টো দিকের কথা বললুম আপনাকে, আমাদের মত মেয়ে যারা বিয়ে করে ঘর বাঁধে তাদের দু'দিক সামলাতে হয় নাকি বলুন।

'সেত ছেলেদেরও। আজকালকার মেয়েরা চাকরী করছে বলে ঘর করছে না?'

স্বতপা একটু নীরব থেকে বলে—'আপনি আমার থেকে বয়সে হয়ত কিছু বড় কিন্তু আমার চেয়ে গভীরে বোধহয় এখনও যেতে পারেননি।'

আর গভীরে গিয়ে কি হবে বলুন, উনি হেসে ফেলেন, সেই ত' পুরোনকাসুন্দি ঘাঁটা। সুখদুঃখ ভাল মন্দ নিয়ে ত' সেই এক গোলকধাঁধার ধান্দায় ঘোরা,

ওঁদের দার্শনিকতা ফলিয়ে কোন লাভ আছে? বলুন।'

এবার দু'জনেই হাসে।

'বলেছেন ভালই, তবে কি জানেন, ও দার্শনিকতা আপনা থেকেই ফলবে। ওকে আর ডাট করে ফলাতে হবে না।'

'ও বুঝেছি। বলছেন এক এক সময়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার বড্ড দরকার হয়ে পড়ে।'

'সান্ত্বনা কেন বলছেন? তার চেয়ে বলুন আত্ম-বিশ্লেষণের দরকার পড়ে।' 'কি জানি আমি ত' দেখি যত বিমর্ষ প্যাটার্ণের লোকগুলোই দার্শনিক টাইপের হয়। আমাদের অমলকে লক্ষ্য করেছেন?'

'কে? অমল চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। ওটাকে দেখলে আমার দুঃখও হয় আবার হাসিও পায়। ও সর্ব্বঘটে আছে কিচ্ছু ছাড়বে না, কিন্তু আবার জগৎ-জীবন সম্বন্ধে এমন মায়াবাদ সুরু করবে যে আপনার মেজাজ খিঁচড়ে যাবে। সুতপা হাসতে থাকে। ওকে থামাতে না পেরে আনন্দবাবু নিজেও হাসতে থাকেন।

'ভদ্রলোক কিন্তু বেশ, আমার ভালই লাগে।'

'আপনার ত' দেখছি দুনিয়ার লোককেই ভাল লাগে। এটা কিন্তু আবার ভাল নয়। কিছু কিছু লোকের ওপর একটু বিরূপ থাকবেন, নইলে মহাবিপদে পড়ে যাবেন, বলে দিচ্ছি।'

সুতপা প্রাণখুলে নিঃশব্দে হাসতে লাগল তাই দেখে আনন্দবাবুও বেশ খুশিমনে চকলেট চিবোতে চিবোতে চলতে লাগলেন।

'আপনি দেখছি শুধু হাসতেই পারেন না হাসাতেও পারেন।

'কি জানি, এক এক সময়ে দেখেছি আমি যা বলি তাতে সবাই হাসে। আমার ভয়, হয় এত কাণ্ড করে ডাক্তারি পাস করে শেষে একটা ভাঁড়ে পরিনত হচ্ছি নাত।'

সুতপা বলে—'আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি খুব পপুলার ডাক্তার হবেন। পেসেন্টরা আপনাকে পছন্দ করবে খুব। অবশ্য তার প্রমাণ আপনি এখন থেকে দিতে সুরু করেছেন।'

'ওসব কথা ভাবলে এখন অনেক কিছু এসে যায়। পোস্টগ্রাজুয়েটটা পাশ করে নিয়ে কখনো যাব না এখানেই প্র্যাকটিস করব এখনও ত' কিছু ঠিক করলুম না। দেশের যা অবস্থা চাকরী লাইন কেমন হবে বলা শক্ত। অবশ্য আপনাদের বোধহয় একটু সুবিধে। মেয়েদের ভেকান্সি ছেলেদের মত পাওয়া এত শক্ত নয়।'

'কি জানি।' সুতপার মুখে চিন্তার রেখা ফোটে।

'আপনিও পোস্টগ্রাজুয়েট করবেন ত'?

'এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে আমার কিছু আরনিং দরকার। বাবার বেশ কিছু লোকসান করেছি ত'। ফ্যামিলিতে কিছু না দিলে ভাল দেখায় না, তার ওপর এই পড়ার খরচ।'

ওরা হাসপাতালের চত্বরে পৌঁছে গিয়েছিল।

আনন্দবাবু বলে ওঠেন—যাকৃগে ওসব ভেবে লাভ নেই এখন। চলি'

'আচ্ছা আসুন।'

আনন্দবাবু ধাঁ করে পেছন ফিরে হোস্টেলের দিকে হন হন করে চলে যান। সুতপাও মেয়েদের হোস্টেলের দিকে পা বাড়ায়।

এর কিছুদিন পরে একদিন সুতপা সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীথেকে ফিরে সবে হোস্টেলে নিজের ঘরে এসে বসেছে, হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে হাসি ঢুকে পড়ল। ও এইভাবেই আসে আর এসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ওর সামনে বসে পড়ে। ওর এই সদাচঞ্চল ভাবটা বেশ ভাল লাগে সুতপার। একটা আনন্দের আভা যেন ওর মুখে সব সময় লেগে আছে। ওকে দেখে খুসী হ'ল সুতপা।

'তারপর? হঠাৎ এখানে? কি ব্যাপার ঘটল নাকি কিছু?

'নারে বাবা, ঘটবার মত কিছুই নেই এখন। ঘরে কেউ নেই, তাই চলে এলুম তোর ঘরে। সত্যি তোর সঙ্গে ছাড়া এতটা কারোও সঙ্গে বনেও না।

'সুতপা হাসল। সত্যি তোরা এমন এক প্রকৃতির মেয়ে যাদের সঙ্গে আমার বেশী খাপ খায়। অথচ দেখ আমি তোদের মত অত ছটফটে নই। তবুও আমার সঙ্গে মেলে। কিন্তু মিলটা ঠিক কোথায় বলতে পারিস?'

'আছে নিশ্চয়ই। তবে কোথায় বলা শক্ত। হয়ত মনের কোন গভীর লুকিয়ে আছে।' হাসি বললে।

'সেদিন ছুটিতে বাড়ী গেলিনা। বাড়ীতে তোর কিছু ভাববে না?' সুতপা জিজ্ঞেস করে।

'না আমি বলেই এসেছিলুম।' ও একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে।

কিন্তু গেলিনা কেন? পড়ারও ত' এখন চাপ নেই। হোষ্টেলেও বিশেষ কেউ ছিল না।'

'ও বাবা গেলেই ধরবে, ও হাসে। সবই ত' জানিস।'

'ধরলেই বা খেয়ে ফেলত? বেশ ভালই কাটত।' সুতপা ইচ্ছে করেই একটু খোঁচা দেয় মজা দেখার জন্য

'হ্যাঁ ওই করি। দু'চক্ষে দেখতে পারি না, কেবল যত এক ঘেঁয়ে কথা, আর আমার পড়াটা যেন পড়াই নয়। নিজের ইচ্ছেটাই সব। যত এড়িয়ে যেতে চাই তত যেন পেয়ে বসে। বাড়ী ফিরলে কোত্থেকে যে খবর পেয়ে যায়.........'

সুতপা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ওর হাসি দেখে হাসিও হাসে।' বলে—

'তুই হাসছিস এখন, কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে বুঝতিস।'

'দেখ তোকে অন্তর দিয়ে হয়ত ভালবাসে, আর তুই পালিয়ে বেড়াচ্ছিস। সুতপা একটু রসিকতা' করে।

'ওরকম ভালবাসায় পালানই শ্রেয় বলে জানবি। তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি, হয়ত পরে তোর কাজে লাগবে।

'ভালবাসা স্বর্গীয় জিনিষ যে তাকে অবহেলা করা পাপ।'

'ওরে বাবা ওসব তত্ত্ব কথা। ভালবাসা অমনি হলেই হ'ল না। ওরও একটা দিক আছে।'

সুতপা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে পড়ে অনিতার কথা। সেও ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েও ছি...

শুধু বলে,

'কেন? ভালবাসা বলে কি কিছুই নেই? একথাটা কি ঠিক?'

'আহাহা থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে।

'তবে একথা কেন বললি?'

হাসিও কেমন যেন একটু ভাবুক হয়ে পড়ে, বেশ গম্ভীরভাবে বলে—

'ভালবাসা আছে, নেই তাত বলিনি। তবে কি জানিস, নিজের ইচ্ছাতে ভালবাসা এক জিনিষ আর পরকে ভালবাসা আর এক জিনিষ।

সুতপা বেশ কৌতূহলী হয়ে, উঠল।

'বারে, বেশ কথাটা বললি ত'। ভাল করে বলত শুনি।'

'ওই একই কথারে বাবা। ওই স্বর্গীয় মর্গীয় ভালবাসা যা বলছিস, সে ভালবাসা যাকে দোবো তার ভালমন্দ খুসী অখুসী দিয়ে তাকে দেখবো। সে কি করলে আমার ভাল লাগে তাই দিয়ে তাকে চাইব না। সেটা যে চায়, আসলে সে নিজেকেই ভালবাসে।'

সুতপা ফিক্ করে হাসল।

ওঃ এই এনাটমি ফিজিওলজি আর মড়া কাটা নিয়ে দিন কাটিয়েও তুই দেখছি ভালবাসার তত্ত্বেও কম যাস না।'

'কেন মরা মানুষের ভালবাসার কাঁপন থেমে গেছে বলে কি তার অস্তিত্বই চলে গেছে জগৎ থেকে? ভাল-বাসা না থাকলে বাঁচব কি নিয়ে?

'ভালবাসা নিয়েই বেঁচে থাকা? সুতপা বলে

'নয় কি? বল।'

'কিন্তু যারা পেল না, তাদের কি হয়? বাঁচে না তারা?'

'ভালবাসা দেওয়ার জিনিস। যে দিতে পারে সেই সুখী। ভালবাসার ভিকিরি হয়ে কোন সুখ নেই... যাকগে ওসব যেতে দে। আমাদের লাইনে ওসব কোন কাজেই লাগবে না। এখন বল আমায়, কিছু সাজেশন

[illegible] পারিস ? কি যে পড়ব ভেবে পাচ্ছি না কিছুই পড়া নেই, সবই নতুন ঠেকছে।'

আমিই' বা কি জানি বল, আমারও ত' সেই।'

'ইস্ তোর কথা আমার জানতে বাকী নেই। তোকে এখন বসতে দিলে এখনই পাস করবি।'

'ওরে বাবা না, সুতপা একটু লজ্জা পেয়ে যায়, তোরা যতটা ভাবিস ততটা নয়। তবে বলতে পারিস তোদের থেকে একটু বেশীই করি।'

'তা হলেই ত' হল, পড়লেই পড়া তৈরী হয়। আমাদের ছাই এত মনও বসে না। তুই ত' দেখি দিব্যি নিবিষ্ট মনে ঘন্টার পর ঘন্টা বই মুখে কাটাতে পারিস। আচ্ছা এত পড়ার রুচি পাস কোত্থেকে বলতো ?

'আমার কি জানিস ? সুতপা ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তিতভাবে বলে—আমার পুরোণ দিনটাকে ভোলার একটা উপায়ে হিসেব পড়ায় মনটা পাই আরও একটা জিনিষ আছে।'

'সেটা কি ?

'সেটা কি জানিস, ঠিক কিরকম বলব, মানে পুরোনো দিনের পুরোন জীবনের যে, কি রকম, ঠিক হয়ত তোকে বোঝাতে পারব না, একটা গণ্ডি ভেঙ্গে যেন বেরিয়ে আসছি যা হয়ত কোন দিনই' জানতে পারতুম না, এখন জানতে পারছি, নিজের ভাবনা কতদূর ছড়িয়ে গেছে এই যে একটা ভাব এতে বেশ একটা আনন্দ পাই। অবশ্য আমার অবস্থায় পড়লে হয়ত সবারই এটা হয়। এটা পুরণো একটা জঞ্জালকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পাওয়ার আনন্দ।'

'তা' হলে তোর ওটা ভালই হয়েছে বল।' হাসি হেসে ফেলে। সুতপা হেসেই জবাব দেয়—হয়ত তাই, কি জানি পরে কি হবে জানি না কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ত' খারাপ কিছু হয় নি।

আচ্ছা এরকম একটা অবস্থায় কি সবারই এরকম হয় ?' হাসি বলে,

'যেমন আমার মেজদির ব্যাপার।'

কোন মেজদির কথা বলছিস বিনি টিচার ?'

হ্যাঁহ্যাঁ আবার কোন মেজদির কথা বলব ? আর একদিনের জন্যেও শ্বশুরবাড়ী গেল না। তারপর সেই যে ধরে একটু একটু করে এম, এ, পাস করল, তারপর মাষ্টারী। বেশ আছে এখন।'

'কেন ব্যাপারটা কি হয়েছিল ?

'হয়েছিল কিছু একটা কিন্তু মেজদিও ভীষণ অভিমানী। দেখ মন নিয়েই যেখানে কাজ সেখানে একটা অভিমান থাকলে চলে ? বাড়ীতে প্রথমে কেউই ভাল বলেনি তারপর যখন নেহাৎই হ'ল না তখন কি আর করা যায়, ছ'মাসের মধ্যে সব পরিষ্কার, একেবারে ছাড়াছাড়ি। এই কি ভাল ? কি বলিস তুই ?

সুতপা একটু ভাবে তারপর যেন একটু আমতা আমতা করে—

'মানে কি জানিস, আমার সে সময় হলে হয়ত কিছুই বলতে পারতুম না, এখন যেন একটু বুঝতে পারি—ও হেসে ফেলে।

হাসিও হাসে।

সুতপা আস্তে আস্তে বেশ ভাবুকের মত বলে—'দুদিন বাদে ডাক্তার হয়ে বেরোবি। মনে আর অভিমান নিয়েই ত' কাটাবি না। আসলে ঘর-সংসার সব চরিত্রে পোষায় না। কেবল আশ্রয়ের জন্যেই অনেকে ঘর খোঁজে। আর দু'জনের সম্পর্ক ত' শুধু মান অভিমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

'মেজদি কিন্তু সে রকমের নয় বলেই ত' জানতুম। ওর চরিত্রে যে ঘর সংসার পোষায় না, এটা কিন্তু মেনে নিতে পারি না। কোন মেয়ের আবার ঘর-সংসার পোষায় না, তুই নতুন কথা শোনালি।'

'কি জানি কেমন যেন মনে হয়, হয়ত আমারই মনের ভুল।' দূরে কোথায় সময় সঙ্কেতের ঘন্টা বাজতেই সুতপা চমকে উঠে হাত-ঘড়ির দিকে তাকায়।

হাসি বলে উঠে, ওরে তোর ত' আবার ডিউটি আছে, আমি পালাই।' বলেই ও ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুতপা আর বসল না। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে লাগল। চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েই ও কলঘরে

চলে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই সব চুকিয়ে হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডের দিকে। আজ ওর নাইট্ ডিউটি পড়েছে। গিয়ে দেখে করবী মনীষা, শঙ্করবাবু আনন্দবাবু ওরা এসে গেছে। বোধহয় একটু দেরী হয়েছে ওর, ঘড়িটা দেখে নেয় একবার। ওরা এসে টেবিলটা ঘিরে জমিয়ে বসেছে। ওকে দেখে ওরা হৈহৈ করে উঠল।

'আরে আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনি নাকি পড়াশুনোর ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন।

সুতপা হাসে। নাঃ বাড়াবাড়ি কিছু নয়। তবে সবই ত' বোঝেন, একটু একটু চর্চা না রাখলে ত' চলে না। আর তা' ছাড়া সময়টাও ত' কাটাতে হবে।'

'যাই বলেন পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের পড়াটা এখন থেকে তৈরী করতে গেলে কিন্তু ঠকবেন।, বলেন শঙ্করবাবু। ওরা জোরে হেসে ওঠে, সুতপাও যোগ দেয় হাসিতে, বলে—

'না না সে ভয় পাবেন না পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের পড়া পড়ে নিয়ে আপনাদের ডিঙিয়ে যাবার কোন অভিসন্ধি নেই আমার।

কিন্তু ওর বক্তব্য বেশী দূর এগোল না। ওয়ার্ডের ঝি এসে বললে,—

'সুতপাদি নিচে পেসেন্ট এসেছে, আপনাকে খুঁজছে।'

'আমাকে? সুতপা একটু অবাক হ'ল।

'হ্যাঁ আপনার নাম বললে, অবশ্য ওখানে ওরা আছে দেখছে, তবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

আনন্দবাবু বললেন—যান দেখুন, বোধহয় আপনার চেনা-জানা কেউ হবে।' সুতপা উঠে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চেষ্টা করল এই ওয়ার্ডে আসবার মত পরিচিতদের মধ্যে কে হ'তে পারে। মনে ত' পড়ে না তবে এমন হ'তে পারে আত্মীয়দের কারও হয়ত জানাশোনা তারাই হয়ত বলে দিয়েছে যাতে অযথা হয়রানিতে বা অসুবিধের না পড়ে। চেনা ডাক্তার হাসপাতালে থাকলে অনেক সুবিধে। কিংবা হয়ত নামটাই ভুল বলেছে বা শুনেছে যাএমনও হতে পারে। ও কিছু ভেবে ঠিক করার আগেই ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 'বর্ত্তমানটা' যেন এক নিমেষে একটা ছেঁড়া পর্দার মত ওর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গিয়ে, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত চেতনা এক অনির্বচনীয় অতীতের আলোয় ঝলমল করে উঠল।

সেই ঘিয়ে ভেজে খাওয়ার রাত, সেই বাড়ীভর্ত্তি আত্মীয় পরিজন, মা বাবা, অনিমা আর সব আত্মীয়া বান্ধবীরা সেই কলহাস্য মুখরিত পরিবেশের নির্ম্মম পরিণতি, সেই বন্ধ দরজা আর সুতপার অভিমান। শেষে ওর অভিমানই জয়ী হ'ল। পাত্র-পক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। ওদের তরফ থেকে সেই রাতেই আবার অনুরোধ এসেছিল,কিন্তু কন্যাপক্ষকে আর মত করান যায় নি। লোকসান বেশ কিছু হয়েছিল, কিন্তু সুতপার বাবা অনুপমবাবু মর্য্যাদার ওপর আঘাতের প্রতিবাদ হিসাবে সেটাকে তিনি সামলে গিয়েছিলেন। বরপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তা' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে কন্যাপক্ষই শেষে আপত্তি করেছে, অতএব শোধবোধ।

তারপর অনিমা বেশ কয়েকদিন আসেনি, বোধহয় ওরও একটু অভিমান হয়েছিল সুতপার ব্যবহারে। এরপর বাড়ীশুদ্ধ সবাই একটু মানসিক অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় সুতপার বড় মেসোমশাই এলেন বোম্বে থেকে। ব্যাপার স্যাপার দেখে তিনি আর কথা না বাড়িয়ে তাঁর স্ত্রী আর পুত্র কন্যার সঙ্গে সুতপাকেও বেশ কিছুদিনের জন্য বোম্বেতে নিয়ে যেতে চাইলেন। বাড়ীর লোকেরাও আপত্তি করে নি। বড়দাবাবু বুদ্ধিমান লোক, তিনি এযুগের ছেলে-মেয়েদের হালচাল বোঝেন ভালই। বলেছিলেন—

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন আর দরকার নেই, সুতপা আমাদের সঙ্গে চলুক, ওখানে গেলে ওর মনের একঘেয়েমিটা ত' কাটবে অন্তত।'

তারপর সুতপার বোম্বেবাস বড় মাসীর কাছে নয় নয় করেও প্রায় তিনটি মাস। এর মধ্যে ঘটল এক অঘটন।

হ্যাঁ তাকে অঘটন ছাড়া আর কিই বা বলা যায়। অনিমার অভিমানে বোম্বে আসার আগে দেখাও হ'ল না সুতপার সঙ্গে অথচ সেই অনিমার বিয়ে লেগে গেল ওর বোম্বে আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই। অনিমার বিয়ের চিঠি এল, তার সঙ্গে অনিমার মিনতি ভরা নিজের চিঠি ওর যাওয়ার জন্য। সে চিঠির প্রতিটি ছত্রে ছিল যেন অনিমার চোখের জল মেশানো। সুতপা পড়ে কেঁদে ফেলেছিল, কিন্তু যাওয়ার উপায় ছিল না। বরদাবাবু তখন বোম্বেতে ছিলেন না। শুধু বান্ধবীর বিয়েতে নেমন্তন্ন যাওয়ার জন্য একটি মেয়ের ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়ার যুক্তিটা বড় মাসীকে বোঝাতে যাওয়ার দুঃসাহস তার ছিল না। বড় মাসী চিঠিটা পড়ে মুদ্ধ বলেছিলেন—'আহারে মেয়েটা অনেক করে লিখেছে, কিন্তু এখন আর উপায় কি?'

সুতপা অনিমার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিল তারপর যখন কলকাতায় ফিরে এল তখন অনিমা স্বামীর সহগামিনী হয়ে চলে গেছে হায়দরাবাদ, স্বামীর কর্মস্থানে। এরপর কিছু দিন চিঠিপত্রের লেনদেনের মাধ্যমে জ্ঞান, উপদেশ ইত্যাদির বিনিময় হয়েছিল, পরে সেটাও ক্রমশ ভাটা পড়ে গিয়েছিল সুতপার ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া আর পড়াশুনোর চাপের সঙ্গে সঙ্গে। পড়াশুনো, ক্লাশ লেকচার আর শব-ব্যবচ্ছেদের মাঝে যখন অন্যমনস্ক হয়ে যেত অনিমার কথা মনে পড়ে, সহপাঠিনিরা ওকে ঠেলা দিয়ে মনগড়া কল্পনা করে হাসাহাসি করত।

দীর্ঘ ছটি বছর পরে সেই অনিমা আজ ওর সামনে দাঁড়িয়ে সলজ্জ মুখে মুচকে মুচকে হাসছে। মাতৃত্বের সম্ভাবনার চরম পরিনতি অবস্থা, একটা বেদনার ছায়া মুখে এসে থেকে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর চেহারা হয়েছে ওর, যেমন গড়ন-পেটন তেমনি গৃহিনী-পনার ছাপ সারা দেহে মুখে। যেন অভিজাত-ঘরের আদরিনী বধু।

'একি তুই' সুতপা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁরে আমি', খুব অবাক হয়েছিস না?

ওর ব্যথাতুর হাসিমাখা কণ্ঠস্বর সুতপাকে আকুল করে দিল। ওর ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে অনিমাকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু স্বাভাবিক সংযমকে ও কোনদিন হারায়নি, আজও হারাল না। হাসপাতালের সবাই ওদের দেখছিল, কি ভাবছিল কে জানে। কিন্তু আর নয় সুতপা যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। সবকিছু যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থায় লেগে গেল। অনিমার মা আর কাকিমা সঙ্গে এসেছিলেন, তাদের অভয় দিয়ে, নিজে সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ার কথা দিয়ে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

তারপর ক'দিন বাদেই অনিমার কোলে এল একটি ছেলে। সুতপার যত্নের বা সাহচর্য্যের কোন ত্রুটি ছিল না। অনিমার বাড়ীর লোকেরা সুতপাকে হাসপাতালে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল।

অনিমা বলত, 'সুতপা, তোকে পেয়ে মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই, ছেলে মেয়ের আর কাজ নেই শুধু তুই আর আমি থাকি।'

সুতপা বলত, হ্যাঁ এখন যা বলার বলে নে, কদিন বাদে কি বলবি তা'ত আর জানি না। ও মুখ ফিরিয়ে নিত সেটা চোখের জল মুছতে না হাসি চাপতে, অনিমা ঠিক বুঝে উঠতে পারত না। শুধু দেখত তার ছেলেকে কোলে চেপে ধরে সুতপা আর একজগতে চলে যায়, তার কচি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন ওর রূপান্তর ঘটে আবার।

এক রূপান্তর সে দেখেছিল সুতপার তার বিয়ে ভাঙার দিনে, এযেন আর এক রূপান্তর। কেন কে জানে, কি তার মনের কথা এখন অনিমা তাত জানে না। হাসপাতালে এসে দেখেছিল এক নতুন রূপে। সেই লজ্জা রাঙা ভিরু ভিরু চাউনির সুতপা, ঘরের পরিবেশটুকুর মধ্যেই যার নিজের জগৎ, বাবার শাসনের গণ্ডির বাইরে যে শুধু আজকেই দেখতে পায়। সেই রাত্রে তার অসম্ভব পরিবর্তন ক্ষণিকের মধ্যে। কিন্তু আজকের সুতপা সব কিছু ছাড়িয়ে চলে গেছে এক অন্য মানুষে, যা অনিমার জগতেই অজ্ঞাত। সুতপা ওর সামনে

এসে দাঁড়াল, চোখে কাল মোটা ফ্রেমের চশমা, গলায় স্টেথিস্কোপ, দু'টি উজ্জ্বল চোখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। সপ্রতিভভাবের মধ্যেও একটা বিজ্ঞোচিত মানসিকতার ছাপ ওর মুখের কিশোরীসুলভ কচি ভাবটাকে যেন আমাল দিতে চাইছেনা। তার সেই পরিবেশের মধ্যে সে শ্রদ্ধা সমীহের পাত্রী। এক পলকে দেখেই অনিমা বুঝেছিল সুতপা অভিমানিনীই নয়, সুতপা বিজয়িনী। একটা ছোট নমস্কার ওর অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে চেতনায় এসেই মিলিয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যারে ছেলে হওয়ার খবর তোর বরের কাছে পৌঁছেছে?'

'টেলিগ্রাম করা হয়েছে ত' সেই দিনই, পৌঁছেছে নিশ্চয়ই, তবে জবাবটা এখনও পাওয়া যায় নি।

'জবাব আবার কি? আনন্দের প্রকাশটা বলছিস, সে না এলেও ক্ষতি নেই, ও চাপা থাকাই ভাল।'

কি রকম হবে কে জানে, এখন ত' আনন্দ করছি' একটু যে উদাসভাবে বলে অনিমা।

ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জটা আলোর দিকে তুলে ওষুধের মাপটা ঠিক করতে করতে সুতপা বলে—কেমন আবার, ভালই হবে। তারপর অনিমার হাতটা টেনে নিয়ে ছুঁচটা ফুটিয়ে নিয়ে, সিরিঞ্জের হাতটা টিপে আস্তে আস্তে ছুঁচটা বার করে নেয়। অনিমা মুখটা একটু কুঁচকে থাকে।

'ছেলে কেমন হবে বা হবে সেত আর তোর হাত নয়, সে যে-যেমন নিয়ে আসে। তবে ভাল করে মানুষ করবি.........

'তা বটে যে যেমন নিয়ে আসে। আচ্ছা এটা আগের জন্মে কি ছিল বলে মনে হয় তোর?

সুতপা যেন বিজ্ঞের মত তাকায় খানিকক্ষণ, তারপর বলে—।

'হুঁ বুঝেছি আগের জন্মে বোধহয় কোন ডাকাত দলের সর্দার ছিল, চেহারা দেখে তাই মনে হয়। তারপর বোধহয় ডাকাতি ছেড়ে পড়াশোনা শুরু করেছিল, চোখ দেখে তাই মনে হয়।'

দু'জনেই হাসে। সুতপা চলে যায়, ওর অনেক কাজ, তবু রোজ দু'তিন বার করে অনিমাকে দেখে যায় আর ইন্‌জেক্‌শনগুলো ও নিজে দেয়। অনিমার তাই ইচ্ছে।

ওর কেবিনে বসে সুতপা অনিমার ঘর-সংসারের কথা শোনে সময় পেলেই। ওর বিয়ে ভালই হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে শাশুড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে থাকে। শাশুড়ির সঙ্গেই এসেছে ও হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরেও যাবে তাই। বিদেশে ঝুঁকি পোয়াতে ওরা কেউই চায় নি। এর মধ্যেই যা সুতপার সঙ্গে সাক্ষাৎ। অতীতের স্মৃতির রোমন্থনে দু'জনে বিভোর হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে ভবিষ্যতের বাস্তব পরিবেশে।

হ্যাঁরে আনন্দবাবু আজ সকালে আসেনি কেন রে? অনিমা জিজ্ঞেস করে।

'তুই ত' আর তার পেসেন্ট নস্‌। আসার ত' কথা নয়, তবে খেয়াল খুসি হল একটু দেখে গেল এই যা। শুনেছে আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'যাই বলিস লোকটি কিন্তু খুবই ভাল, দেখলে মনে হয় বেশ বড় ঘরের ছেলে।'

'তা যা বলেছিস। ওরা চার পুরুষ ডাক্তার। ওর বাবার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা, বাবা আর তারপর ও। সেই নিয়ে আমরা ওঁকে ঠাট্টা করে বলি যে মশাই, আপনার পেট টিপলে বোধ হয় দেখা যাবে পেটের নাড়িগুলো সব স্টেথিস্কোপের নল হয়ে গেছে। ওরা দুজনেই হাসে।

'ওর এই গুনটা খুব আছে। আমাদের কারও যদি চেনা জানা কেউ আসে ত' উনি খুব ইনটারেস্ট নেন, সে জন্য সবাই ওঁকে ভালবাসে। তা'ছাড়া লোক হিসাবে ভাল।'

'চেহারাটিও কেমন সুন্দর, লম্বা চওড়া।'

'হ্যাঁ, তাত আছে কিন্তু আমায় ত' লজ্জায় ফেলে দিলি ওঁর কাছে। কি করে ম্যানেজ করেছি।' সুতপা একটু কাষ্ঠ হাসি হাসে।

অনিমা লজ্জা পায়।

'সত্যিই লজ্জাই বটে। আগে এসে কয়েকবার

বখন দেখতে গেছি, তোকে জানাইনি। একটু লজ্জাও ছিল, আর সত্যি কি একটু অভিমানও হয়েছিল। শেষকালে আর থাকতে পারিনি।'

'আমিও সেরকমই বুঝিয়েছি। আমার ওপর তোর একটু অভিমান ছিল তা'হলে।

'যা ছিল তা' এখন যে কোথায় ভাসিয়ে দিলি, অনিমার চোখ ছলছলিয়ে উঠছে দেখে সুতপা বলে—

'তোর বরের চেহারাও বোধহয় বেশ ভালই না? ছেলেকে দেখে ত' তাই মনে হয়।'

'তা বলতে পারিস, তবে ছেলেদের চেহারার চাইতে মগজটা বেশী দরকার। ওর মত মাথাটা যদি পায় তবেই, নইলে আর কি হল।'

'পাবে পাবে সব পাবে, দেখিস ছেলে তোর ভালই হবে।'

হ্যাঁ বল শুনি তবু। তোর ত' আর এসব চিন্তা এখনও আসেনি মাথায়। পরে জানবি এও আর এক ভাবনা।

'তবু দেখ এর জন্যে কত না আশা-আকাঙ্ক্ষা। বল সত্যি কি না।'

'নয় আবার। অনেকেই ত' ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল বোধহয় ছেলে মেয়ে হবে না। সে ছিল আর এক জ্বালা। কত দিন আর মান অভিমান নিয়ে কাটানো যায় বল?

হেসে ওঠে সুতপা। অনিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'তোর বিয়ের কি হবেরে। ডাক্তার ত' হয়েই গেলি। আর ত' ক'মাস। তারপর কি ঠিক করবি? ডাক্তারীই করবি না ঘর বাঁধবি, নাকি দু'টোই।

সুতপা বলে—ডাক্তারি পাস করে ডাক্তারি না করার কথা ত' ভাবাই যায় না, ওটাত করবই তবে বিয়ের ব্যাপারে শেষে কি দাঁড়াবে তা এখন কিছু বলি কি করে বল? সব জিনিষ যে নিজের ইচ্ছের হয় না সেত দেখতেই পেলি।'

'বাড়ীতে তোর বিয়ের কথা হয় না কিছু?'

'সে আবার হয় না? কত আসছে, তার ওপর আমার অনুরোধ উপরোধ, সে যদি দেখতিস একবার। হেসে ফেলে ও। অনিমাও মুখটিপে হাসে। বলে 'ওঃ জিতেছিস বটে। তোর মনের জোর যে এতটা তা' কোনদিন কি কল্পনাও করতে পেরেছি?'

'নারে ওকথা বলিস নি। এ একটু কেমন অবস্থার পরিবর্তন বলতে পারিস। আমি নিজেও অনেক ভেবেছি, কিন্তু নিজেকে যেন সব বলে ভাবতে পারি না। কোনদিন কি ডাক্তারি পড়ার কথা ভেবেছি? নাকি এই জন্যেই বিয়েতে আপত্তি করেছিলুম?

তা' এটাকে তোর মনের জোর বলবি না?'

'কি জানিস? মনের জোর যে ছিল না বা এখন নেই তা' নয়। আসলে যে জোর মনের ভেতর লুকিয়ে থাকে, তা' জেগে ওঠে একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে। হয়ত তোর মনের জোর আমার চেয়ে বেশী, কিন্তু ভগবান না করুন কোন একটা অসহায় অবস্থার ভেতর পড়লে তখন নিজের ক্ষমতা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাবি। যখন পাঁচ জনের কথা নিয়ে ভাবি দেখি একটা বিশ্রী অবস্থার পরেই অনেকের মনের গতি একেবারে পালটে গিয়ে তারা নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। আমার ব্যাপারেও তাই ঘটল।'

'আচ্ছা পড়াশুনার সময় তোর আগের কথা ভেবে মনটা অস্থির হত না? কষ্ট হত না?' জিজ্ঞেস করে অনিমা।

'সেত হত পড়াশুনার সময় ছাড়া, অন্য সময়ে। কিন্তু পড়ার মনটা কখনও ডিস্টার্বড হয় নি এটাই আমার ভাগ্য। তা'হলে সবই পণ্ড হত। এমন বুঝি বিধাতা-পুরুষ যে আমায় ডাক্তার করবে সে কথাটা আমাকে শুদ্ধ সবায়ের কাছেই চেপে রেখেছিল।'

দু'জনে হাসে, কিন্তু সে হাসি দুটোর মধ্যে যেন কেমন গভীরতার ছাপ। দৈনন্দিন চিরাচরিত জীবন-যাত্রার উর্দ্ধে সে যুগল-হাসি।

ক্রমশঃ

রূপবান রবীন্দ্রনাথ

শৈলেনকুমার দত্ত

কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক পরিচয়। তিনি ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক; তিনি চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী এবং একজন নিপুণ অভিনেতা। কিন্তু এত গুণের আধার, তাঁর দেহখানিও যে কত সুন্দর ছিল, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর ভাষায় যথার্থভাবে বলতে গেলে—"যে-দেহ তিনি পেয়েছিলেন সে তাঁর চেতনার ও জ্ঞানের উপযুক্ত আধার।"

রূপ বিধাতার দান, তাই মানুষের কৃতিত্ব এখানে গৌণ; তবুও বিধাতার এই অকৃপণ দান যাঁরা পান, তাঁদের সৌভাগ্যের কথা আমরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারি। ইংরেজি সাহিত্যে কবি মিল্টন, শেলী ও বায়রণ খুব সুন্দর ছিলেন। মিল্টনকে তাঁর রূপের জন্যে সহপাঠিরা 'লেডী' আখ্যা দেন। ঠাকুর পরিবারের ওপর বিধাতার হয়তো কিছুটা অকৃপণ পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাই রূপেগুণে এই পরিবারকে হয়তো তিনি উজাড় করে দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেদিক থেকে সর্বাধিক ভাগ্যবান ব্যক্তি।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দেহ শক্তি ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা ছিল। তাঁর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, তরঙ্গায়িত চুল, দীপ্ত চোখ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং সর্বোপরি একটি অনমনীয় ব্যক্তিত্বের মহিমা তাঁকে এমন রূপময় করে রাখত যে, কোনো ব্যক্তিই তাঁর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'র একস্থানে অসংকোচে লিখেছেন—"আমি ছেলেবেলা থেকেই রূপের ভক্ত। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখি, তখন তাঁর অসামান্য রূপই আমাকে মুগ্ধ করে।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী যিনিই যা কিছু লিখতে চেয়েছেন তার আগে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য রূপের কথা তাঁর নিশ্চয়ই বার বার মনে হয়েছে। তিনি শৈশবে হীরা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী পালোয়ানের কাছে কুস্তী শিখতেন—এ তথ্য তিনি নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিতে পরিবেশন করে গেছেন। সেদিক থেকে তাঁর আশী বছরের কর্মবহুল জীবনের উপযুক্ত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার কারণও আছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবান সবসময়েই রূপবান হন না। রবীন্দ্রনাথ এদিক থেকে একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য তাঁর রূপের মহিমায় এতটুকুও কাঠিন্য এনে দেয়নি।

কবির অগ্রজা সৌদামিনী দেবী কবিকে আদর করে 'কালো' বলে ডাকলেও রবীন্দ্রনাথের রং মোটেই কালো ছিল না। তাঁর অন্যান্য ভাইবোনেদের চেয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত কম রঙের অধিকারী হলেও, তাঁর গায়ের রং অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে অনেকে তাঁর এই উজ্জ্বল রঙের জন্যে তাঁকে অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই রূপময় দেহের বর্ণনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি কলমের তুলিতে রবীন্দ্রনাথের একটি কালজয়ী চিত্র এঁকে রেখেছেন। তাঁর বর্ণনায় যৌবনের

রবীন্দ্রনাথ যেন জীবন্ত হয়ে আছেন—'কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জল গৌরবর্ণ, ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ শোভা; কুঞ্চিত অলকা শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জল ললাট, ভ্রমর-কৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব শ্মশ্রু শোভায়িত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষ-যুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃষ্টের মুখ মনে পড়ে।"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর স্মৃতিকথায় এক-স্থানে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রূপবান পুরুষ জীবনে আমি অল্পই দেখেছি।' দীর্ঘ সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, প্রতিভা-বিচ্ছুরিত দুই আয়ত নেত্র, উন্নত নাসিকা, ঘন কুঞ্চিত কেশ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দেহের বর্ণ। দৈহিক সৌন্দর্যের যত কিছু উপকরণ বিধাতাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সকলই জুগিয়েছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের আকৃতির সঙ্গে যীশুখৃষ্টের আকৃতির যে-মিল ছিল, আজও ছবি দেখলে সেটি মনে হয় পাশ্চাত্য দেশের দ্রষ্টারাও সেটি অনুভব করেছিলেন। ১৯২১ সালে বার্লিন শহরে রবীন্দ্রনাথকে যে-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে দেখে তৎকালীন বার্লিনস্থ ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ভাইকাউন্ট ডি, এবারনন লেখেন—"যীশুখৃষ্টের যে মূর্তি আমাদের কল্পনায় গড়া তার চেয়ে মনোহর।"

কবির এই অলোক-সামান্য রূপ দেখে রূপমুগ্ধ শিল্পী রোদেনষ্টাইন কবির প্রথম ছবি আঁকতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন—'আপনাকে আঁকা যায় না।' সত্যি সত্যিই নিখুঁত স্রষ্টার মত তিনি নিজেও একটি নিখুঁত সৃষ্টি ছিলেন। তাঁর প্রতিভার প্রসন্ন দাক্ষিণ্যভারে আমরা গর্বিত এবং আলোকিত, কিন্তু নানাবেশে নানা-রূপের সজ্জিত তাঁর একটি মনোরম প্রতিকৃতি আমাদের প্রত্যেকের কাছেই পারিবারিক সম্পদ বলে সম্মানিত।

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

মোটর বোটে উঠেই বন্ধুদের হাতে আমাদের ক্যামেরাটা দিয়ে একটা সট্ নিতে বল্লাম। সট্ নিয়ে বন্ধুটী আমার হাতে ক্যামেরা দিতেই আমাদের মোটর বোটটী আমাদের নিয়ে হাকুনি হ্রদের মধ্যে তীরবেগে ছোটাছুটী করতে লাগল। হাকুনির জল খুব পরিষ্কার কোথায় একটা পাতা ভাসছে দেখতে পেলাম না। নীল জল, মনে হয় খুব গভীর এই হ্রদটী। কিছুক্ষণ জলের ওপর মোটর বোটটী ছোটাছুটী করে একজায়গায় থেমে গেল। চালক আমাদের জানালে যে এবার যেন আমরা বোটটীর ধারটা জোর করে করে আঁকড়ে বসে থাকি বোটটী এবার হাইজাম্প করবে। জোর করে বোটটীকে ধরে না থাকলে জলে ছিটকে পড়ে যাবার ভয়। আরোহীদের মনে বেশ উৎসাহ ও ভয় দুই রয়েছে দেখলাম। শক্ত করে বোটটাকে আমরা সকলে ধরে রাখলাম। বোটটী আবার তীর বেগে ছুটতে ছুটতে পরপর দুবার হাইজাম্প দিলে। তারপর ধীর মন্থর গতিতে আমাদের ডাঙ্গায় নিয়ে এসে হাজির করলে। আমাদের বোটে করে ঘোরা দেখে আমাদের প্রায় সকল বন্ধু বান্ধবেরা মোটর বোটে ভ্রমন করলেন। মিঃ চেং আর তাঁর যুবতী বধূটী বোটে উঠে ঘুরে এলেন। মিঃ চেং এর ছেলেমেয়েরাও পরে গেল। ছেলেমেয়েদের মা আর গেলেন না হ্রদের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে বসে আমাদের মোটর বোটে বেড়ানো দেখছিলেন। অনেকগুলি মোটর বোট জলের ওপর ছোটা ছুটী আরম্ভ করে দিয়েছে। এমন ভাবে তারা ঘুরছে, মনে হ'ল একটা এ্যাকসিডেন্ট যেন করে ফেলবে। কিন্তু তারা মোটর বোট চালনায় এত পটু যে বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিপদ কাটিয়ে চলে গেল।

আমরা বসে বসে আশেপাশের দৃশ্য দেখছি আর মুভি ও স্টীল ক্যামেরায় ফটো তুলছিলাম। দূরে ফুজিয়ামা যেন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে আমাদের দেখছে। আমাদের মত কত দর্শকদের যুগ যুগান্তর ধরে সে দেখে আসছে ঐ ভঙ্গিমায় ঐ গর্ব্বিত চোখ দিয়ে আমরা যেখানে বসে আছি সেটীর নাম **Fuji-Hakone-Izu National Park**। এই পার্কটী ২৩৪২৯০ একর জমির ওপর অবস্থিত। জাপানের মধ্যে এটী সব চেয়ে বড় পার্ক আর লোকেরা সারাবছর ধরে সব সময়েই এখানে এসে আনন্দ করে যায়। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও দৃশ্যগুলির পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। এই পার্কটীর মধ্যেই রয়েছে ফুজিয়ামা (ফুজি পর্ব্বত) অনেকগুলি বড় বড় হ্রদ, জলপ্রপাত, হাকুনি পর্ব্বতের ঘন গভীর জঙ্গল আর রয়েছে অগনিত উচ্চ প্রস্রবন। এমন সুন্দর পরিবেশ জাপান দেশে কেন বোধহয় সমস্ত দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় চোখে পড়বে না। তাই এটীর নাম পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। দেশে বিদেশ থেকে লোকেরা এসে এখানে বেড়িয়ে যায়। এজায়গাটীতে টোকিও থেকে সরাসরি ট্রেনে আসা যায়। তার জন্যে সময় লাগে দেড় ঘণ্টার ও কম। আর মোটরকারে এলে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। আর কামাকুরার প্রসিদ্ধ বুদ্ধ দেখে কেউ যদি এদিকে মোটরকারে করে আসে তার সময় লাগে প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওদিকে থেকে একেবারে যাতায়াতের মোটরকার ভাড়া করা উচিৎ।

এখানে ১৩১১ ফুট উঁচু পাহাড় **Miyanoshita** তে অনেক বিদেশীদের বাস ভবন রয়েছে। আর পৃথিবী-খ্যাত ফুজিয়া হোটেলটী এইখানেই রয়েছে। সব সময়েই এটী টুরিষ্টে ভর্ত্তি থাকে। কয়েকমাস আগে থেকে এখানের ঘর সংরক্ষিত করে রাখতে হয়। তা না

হলে পাওয়া বড় কঠিন। এখানে মাত্র ১৬৬টা ঘর আছে। এখান থেকে সমস্ত পার্কটাকে ভালভাবে উপভোগ করতে পারা যায়। আমাদের এখান থেকে এই হোটেলটা সাত মাইল দূরে অবস্থিত।

তার পর ১২০ মাইল লম্বা একটা সুন্দর প্রশস্ত সড়ক যেটা ফুজিয়ামাকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই দেবতাটীর চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখবার জন্যে জাপানীদের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই রাস্তাটার পাশে পাশে সুন্দর অপরূপ দৃশ্যগুলি মনকে মুগ্ধ করে। মোটর আর মোটর বাস শুধু এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। ফুজিয়ামাকে প্রদক্ষিণ করতে ছয় থেকে আট ঘণ্টা সময় লাগে। ফুজিয়ামার নীচে পাঁচটা হ্রদ রয়েছে তারা যথাক্রমে Yamanaka, Kawaguchi, Saiko, Shoji ও Motosu এই পাঁচটা হ্রদের মধ্যে মোটর বোটে ভ্রমন সে এক বিচিত্র পরিবেশ। Yamanak হ্রদের কাছে রয়েছে Fuiji New Grand Hotel আর Kawaguchi হ্রদের কাছে রয়েছে Fuji View Hotel।

আর একটা সুন্দর দৃশ্যবহুল রাস্তা হয়েছে যার নাম Jukkoku Pass। এটা হাকুনি পাহাড়ের শ্রেণীর ওপর দিয়ে আতামীতে যাওয়া যায়। এখান থেকে তার দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল। আমরা এই পথ দিয়েই আতামী থেকে হাকুনি হ্রদের পাশে এসে বসে আছি। এই ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল।

কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের ডাক পড়ল। কাছাকাছি আমার স্ত্রীকে আমি খুঁজে পেলাম না। সকলেই জড়ো হয়েছেন বাসে উঠবে বলে। কিন্তু আমার স্ত্রীটী না আসা পর্য্যন্ত অন্যদের অপেক্ষা করতেই হয়। আমার ধারনা যে তিনি নিশ্চয়ই দোকানের মধ্যে স্মৃতিচিহ্ন কেনবার জন্যে দর কসাকষি আরম্ভ করে দিয়েছেন। দোকানের মধ্যে যেতেই দেখতে পেলাম তাঁর হাতে পুঁতির হার ছোট ছোট পুতুল আংটী ইত্যাদি। দোকানী প্যাকেট করে ওঁনার হাতে দিচ্ছেন আর উনি জাপানী টাকায় শোধ করেছেন তাঁর মুখ দেখে যেন মনে হ'ল তিনি খুব সন্তুষ্ট, ঐ অল্প জিনিষে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমিও খুব সন্তুষ্ট ছিলাম। অন্য গৃহিনীরা একটুতে সন্তুষ্ট হন না। দামী দামী জিনিষের পেছনে পেছনে তাঁদের ঘুরতে আমি অনেক বার দেখেছি। আমার স্ত্রীকে বিবাহ করে আমি এখন নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি। তাঁর কেনাকটা শেষ হতেই তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে বলতে তিনি তাড়া তাড়িই চলে এসে বাসে উঠে পড়লেন। তারপর মহিলাদের মধ্যে জিনিষ পত্রের দাম নিয়ে যাচাই করা আরম্ভ হয়ে গেল। বাসটা ছেড়ে দেয়। বাসটা এখন আমাদের হাকুনি জাহাজের ডেকে নামিয়ে দিয়ে ফুজি ভিউ হোটেলের কাছে rope way ষ্টেশনের ধারে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমরা জাহাজে করে rope way station এ যাবো। সেখান থেকে আমরা rope way-র কেবিনে বসে ফুজি-হাকুনি-ইজু-জাতীয় পার্কের ওপর দিয়ে নৈসর্গিক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে ফুজি ভিউ হোটেলের কাছে station এসে নামবো। এই সমস্ত টুরের খরচ টুর কোম্পানী প্রথমেই নিয়ে নিয়েছে। জাহাজের টিকিট কাটানো একটা বিরাট ব্যাপার। সেদিন ছিল ছুটীর দিন, শত শত ছেলে-মেয়েরা সুন্দর সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে এসেছে। কেউ কেউ বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। আর কয়েকটা দল এসেছে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে। ছোট ছোট সুন্দর ছেলে মেয়েরা যেন সব বড় বড় পুতুলের মত দেখাচ্ছে। একে তারা সকলেই ফর্সা তার ওপর তারা নানা রকমের পোষাক পরে এসেছে। কারোও গায়ে লাল, কারোও গায়ে নীল, কারোও গায়ে কয়েকটা রংএর সংমিশ্রনের পোষাকপরা। কারোও পরনে মেয়েদের কারোও সাদা ফ্রক, কারোও রঙিন ফ্রক, আর ছেলেদের প্যান্টগুলি নানা রংয়ের তৈরী। তাদের দেখে মনে হল যেন আমরা একটা ফুলের বাগানের মধ্যে রয়েছি। আর জাহাজটাও রঙীন। ঐ একটা জাহাজে কয়েক শতযাত্রী নিয়ে হাকুনি হ্রদের ওপর দিয়ে ভাসতে

ছাড়তে হবে। আমরা দেড় ঘন্টা পরে বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হলাম। স্ত্রীকে লাউঞ্জে বসিয়ে কি একটা দরকারে আমি কিছুক্ষণের জন্য ভেতরে গিয়ে ছিলাম। এসে দেখি একজন জাপানী মহিলা স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে তাঁর ছবি আঁকছেন। আমি আর তাঁদের বাধা না দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দেখতে লাগলাম। প্রায় আধঘন্টা পরে জাপানী মহিলাটি সায়োনারা জানিয়ে বিদায় নিলেন। স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বল্লাম "তুমি ভাগ্য করেছিলে বটে। কেউ নেয় তোমার ফটো আর কেউ আঁকে তোমার ছবি। যুগ যুগ ধরে তুমি আজ জাপানের ঘরে ঘরে শোভা পাবে।" আমার স্ত্রী শুনে হাসতে থাকেন।

আমার বন্ধুর ছেলেটি এয়ার পোর্টে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে অভিবাদন জানাল। আমার মালয় দেশের চীনা বন্ধুটী তাঁর ছেলের জন্যে দুচারটে জিনিষ পাঠিয়ে ছিলেন? আমি সবগুলো তার হাতে দিলাম। সেও আমাকে একটা জাপানী পুতুল উপহার দিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে বিমান বন্দরের রেষ্টুরেন্টে লাঞ্চ খেলাম। সময় হয়ে গেছে আর দেরী করতে পারি না। পাশপোর্ট কাষ্টমস অফিসারের গণ্ডি পার হয়ে আমরা সকলে একটা বড় SAS প্লেনে উঠে পড়লাম। এই প্লেনেই আমরা শ্যামদেশ থেকে হংকং এ এসেছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেনটী টোকিও রানওয়ের ওপর ছুটতে ছুটতে টোকিও বিমান বন্দরটী ছেড়ে আকাশ পথে ধাবিত হল। তার পর আমরা সকলে জাপানকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম সায়োনারা—সায়োনারা জাপান।

ক্রমশঃ

দেবহূতি ও চিত্ররথ

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

শুভ্রা সরস্বতীর শুভতটে পুণ্য প্লক্ষ প্রস্রবণে সমুন্নতশীর্ষ এক শৈলোপরি অবস্থিত ছিল সেই সুন্দর আশ্রমপদ। তমাল ও বকুলে, চূত ও কোবিদারে, চম্পকে ও কাঞ্চনে, কুরুবাসনে ও কর্ণিকারে এবং অন্যান্য নানাবিধ পাদপে রমণীয় সেই আশ্রমসংলগ্ন বনাভ্যন্তরব্যাপী পুণ্যতোয়া সরস্বতীর প্রবাহে মন্দস্নিগ্ধ কলস্বরে কূজন করে সারসবর্গ। কোকিলকুলের কলালাপে, মধুব্রতবর্গের গুঞ্জনে ও শুকসারিরন্দের কথোপকথনে সদা মুখরিত হয়ে থাকে সেই কাননস্থলী। সেই উত্তম আশ্রমের যত্রতত্র নিরাপদে ও নির্ভয়ে বিচরণ করে অহিংসক শ্বাপদসকল। ফলে-পুষ্পে ও পরাগকণাপুঞ্জে সদাধূসরাভ সেই বনানী চতুর্দিক হ'তে সমাচ্ছন্নপ্রায় হয়ে থাকে মধুব্রতে। তপোবিনিষ্ঠা আশ্রমস্বামিনীর শাপভয়ে ত্রস্ত হয়ে প্রিয়াকর্তৃক সদালিঙ্গিত প্রিয়জনের মতো নবপল্লবজাত মঞ্জরীভরবল্লীতে সদাশ্লিষ্ট সেই রম্যকাননের সর্বদিকে সঞ্চরণশীল হয়ে থাকেন পবন। ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণা কাননাধিকারিণীর অমিত যোগবলে প্রীত হয়ে শুধু সেই কাননসীমার বহির্ভাগেই শিলাবর্ষণে ক্ষান্ত হয়ে থাকেন জলদ; সেই রম্যকাননের কোথাও পরিদৃশ্যমান হয় না ভাস্করের শোষণ। সকল প্রকারের উপদ্রবহীন সেই কাননের সেবায় তৎপর হয়ে থাকেন সিদ্ধবর্গ, অপ্সরাবর্গের শুভাগমনে চৈত্ররথ কাননের মতো নিত্যাহ্লাদজনক হয়ে থাকে সেই বনস্থলী।

শুভদা পুণ্যদা সেই আশ্রমের কর্ত্রী ছিলেন সত্যধর্মাত্মিকা স্বয়ং দেবহূতি।

গ্রীষ্মে সূর্যস্তনয়নে পঞ্চতপা হয়ে থাকেন তিনি, বর্ষায় বর্ষণের মাঝে উন্মুক্ত আকাশের তলে থাকেন উপবিষ্টা হয়ে। প্রকৃষ্ট বায়ুপ্রবাহে নিষ্কম্পা থাকেন তিনি, হিমালয়ের মতো দুঃসহা হয়ে থাকেন বসন্তে, সারস্বত হ্রদনীরে নিমগ্না থাকেন হেমন্তে ও শীতে। কালে কালে বারত্রয় নির্মল বারি উপস্পর্শ করেন মহাতাপসিকা দেবহূতি, নিত্য অমিত শ্রদ্ধাসহ তর্পণ করেন পিতৃ, দেব ও ঋষিবর্গেরা নিত্য সত্যযজ্ঞাপরায়ণা, ব্রহ্মবাদিনী ও জিতেন্দ্রিয়ারূপে ভূতলে লব্ধবিশ্রাম হয়ে প্রার্থনাপূর্বক হরিধ্যানে তৎপরা হয়ে থাকেন মহাযোগিনী দেবহূতি। নিত্য অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠান করেন, তিনি বহু উপকরণসামগ্রীর সংগ্রহে, শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পাদন করেন অতিথি সৎকার। সদা চান্দ্রায়ণ বিধানে কালযাপনকারিণী সেই মহিয়সী নারীঋষি জীবনধারণ করেন শুধু স্বয়ংপতিত পত্রফলে। সর্বক্ষণে অস্থিরা হয়ে, সর্বকালে তপোনিষ্ঠা থেকে ও সর্বমুহূর্তে বেদবেদাঙ্গপরগারূপে জীবনাতিবাহনকারিণী সেই অনুপমা রমণী শিরাকরাল অস্থিমাত্র দেহে অবস্থিতা হয়ে থাকেন সেই আশ্রমপদে। বিবর্ণবর্ণা, সংকুচিতা হয় সেই সাধিকার চক্ষে বিস্ময়কর জ্যোতিরাশি বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে সকল সময়ে।

তাঁর তপস্তেজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল পর্বত। মহাত্মিকা রমণীর তেজঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল ভূতবর্গের কাছে। বৈশ্বানরবৎ প্রতিভাতা তপোদ্দীপ্তা সেই রম্যাতিগা অবশেষে সর্বকল্যাণেই সংযত করেছিলেন আপন তেজোরাশি।

তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী স্বয়ং নবনীরদকান্তি, চতুর্বাহু, বিশালনেত্র ও সর্বালঙ্কারভূষিত গরুড়বাহনকেও দর্শন ক'রে ধন্যা হয়েছিলেন সাধনসিদ্ধির মুহূর্তেই। কৃতকৃত্যমনা দেবহূতির জটায়িত মস্তক সর্বভূতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশেই সদাবনমিত হয়ে থাকে ভূতলে। তাঁর শ্রুতিযুগে আপনা-আপনিই সদাগীত হয়ে থাকে বিষ্ণুবিবরিণী কথাবতারণা, কণ্ঠে উদ্গীত হ'তে থাকে অধ্যাত্মগর্ভ মহোদয়কর ও স্বাত্মজ্ঞানদ স্তোত্রসমূহ।

দেবদুর্লভা অমিতা ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না এই হেন দেবদ্যুতির সেই দেবসেবিত আশ্রমপদে নানা অসম্ভাব্যের সম্ভাবনার মতোই একদিন সমুপস্থিত হয়েছিলেন পিশাচত্বের পরিণামলাভী চিত্ররথ। একদিন যে দৈবদুষ্টার দিষ্টকে নিয়ে আপন প্রবৃত্তির কৌতুকে উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন চিত্ররথ, আজ তাঁরই কাছে আপন নিয়তির নির্ধারণ প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে।

আজ আর স্পষ্ট মনে পড়েনা সেদিনের স্মৃতি। মনে করতেও ইচ্ছা জাগেনা দেবদ্যুতির। আজ আর কোন ভয় নেই তাঁর, কোন ঘৃণাতেও অম্বিত হয়ে উঠতে চায় না মন। তাই সেদিনের সকল অভিজ্ঞতাকে বিস্মৃতির গর্ভেই আরোপিত রেখেও সুখী তিনি। কোন প্রতিশোধ নয়, কোন জিগীষা বা জিঘাংসাও নয়,—আজ শুধু ক্ষমাতেই ক্ষান্ত হয়ে আছে সাধিকা দেবদ্যুতির প্রাণ।

পরমা করুণার মতো, মূর্তিমতী মমতার মতো, অসীমা অনুকম্পার মতো, অমিতা মাতৃত্বে পিশাচদেহী রাজা চিত্ররথের আনত শিরে করার্পণ করেন তাপসিকা দেবদ্যুতি। পরোপকারিণী প্রীতিতে পরিপূর্ণান্তরে ব'লে ওঠেন তিনি ঃ

—শ্রেয়ঃ তে ভবতু সর্বথা।

বলেন ঃ

—আমার আশীর্বাদে দূরীভূত হোক তোমার সকল অকল্যাণ! অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হয়ে যাক সকল কল্মষ, অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের মতো, সুকালজ সর্পের মতো, জন্ম নিক একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পূত হৃদয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণসীমা সমীপস্থ ম্লেচ্ছাধ্যুষিত সমগ্র দ্রাবিড়াঞ্চলকে পরাজিত ক'রে সেখানে আপন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চন্দ্রবংশজ রাজা চিত্ররথ।

আস্থারকাধিকারের মূলে ছেদ ক'রে আর্যসভ্যতার বিস্তার করতে গিয়ে নিজেই উন্মাথাবদ্ধ হয়ে পড়লেন আর্যসেনাধিপতি। রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী এক আর্যকুলোদ্ভব হয়েও দ্রাবিড়ের রাজভোগে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কুলীনসভ্যতার ধারক হয়েও আর্য-রীতির বিবাদীরূপে সুবর্ণ ও দুর্বর্ণের আভরণে সজ্জিত হয়ে, বহু আড়ম্বরের মধ্যে আপন রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করলেন চিত্ররথ।

পরাভূত অসুর শূদ্রকুল—যারা বিধর্মীয় শাসকের বিরুদ্ধে সংগুপ্ত বিদ্রোহের আয়োজনে তৎপর হয়ে উঠেছিল, অতি সহজেই বশ হলো তাঁর। আর্যপরিমুক্ত বৈরীসেনানী যখন অসুরেই পর্যবসিত হয়ে গেলেন, তখন আর বিদ্রোহের প্রয়োজনই বা কি?

আর্য চিত্ররথ সত্যই অবিশ্বাস্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন অসুররাজে। আত্মসুখোন্মত্ত, ভোগপরায়ণ অনার্যের সকল দোষই একে একে আয়ত্ত ক'রে নিলেন তিনি। সাদরে স্বীকার ক'রে নিলেন আর্যবিরোধী দাসেয়ের ব্যবসায়ও।

মহাবীর, শূরোত্তম, শস্ত্রাস্ত্রপারগ, গজবাজি-রথবাজি-সম্পন্ন, সুবিক্রমশালী ও মহাধন হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই স্বস্তি পেতেন না চিত্ররথ। নানাবিধ স্বর্ণরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর কোষাগার, তবু ক্লান্তি ছিল না সম্পদাবলুণ্ঠনে।

ক্রীড়াসক্তরূপে সহস্র নারীর মধ্যে ক্রীড়া করতেন তিনি, তবু তিলেকের তরেও বিগত করনি তাঁর বনিতা-পহরণের লোভ। প্রমদা বা রামা, কোপনা বা বরারোহা, মহিষী বা ভোগিনী, পাণিগৃহীতী বা পুরন্ধ্রী, কন্যা বা কৃতসাপত্নিকা, সাধ্বী বা পাংশুলা, কুলপালিকা বা অজ্ঞাতকুলা—নিষ্কামা বা বৃষস্যন্তী, সকল নারীর সংগ্রহেই সদামতি হয়ে থাকতেন রাজা।

স্ত্রৈণ ও কামী, সদারুষ্ট ও প্রচণ্ডকোপ এই হেন চিত্ররথের সকাশে ধর্মসঙ্গত প্রস্তাব নিবেদনে উৎসাহিত হতেন যে সকল আর্যামাত্য, অসুর-সচিব নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের ভীম ভল্লের আঘাতে ছিন্নশির ও ভগ্নশ্রীরূপে দেখা যেত তাঁদের রাজবর্ত্মের আশেপাশে।

অসুরবর্গের মধ্যে আপন আসন ও অধিকারকে দৃঢ়-স্থায়ী করেছিলেন তিনি অবিরত বিষ্ণুনির্বাদে ঃ

—কোঽহসৌ বিষ্ণুঃ ক রুদ্রোঽসৌ ক চান্তে কেন কীর্ত্যতে ?

দৈবমোহিত আর্যসন্তান বিষ্ণুমাহাত্ম্য সহ করতে পারতেন না কখনও। দেবোপাসকবৃন্দের প্রতি প্রযোজ্য হতো ভীষণ পীড়ন। দ্রাবিড়ে আর্যশাসন প্রবর্তিত হয়েছে ধারণা ক'রে সেখানে বসবাসের ইচ্ছায় আগত আর্য স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি তীব্র হয়ে উঠত তাঁর শাসন। বেদ বা ব্রাহ্মণ, বৈদিককর্ম বা ব্রতাবলী, দান বা দয়া, কোন কিছুই মনে ধরত না তাঁর। সর্বথা পাষণ্ডপথাবলম্বী চিত্ররথ প্রচণ্ড দণ্ডে পীড়ন করতেন প্রজাদের। নিষ্ঠুর ও নির্দয় চিত্ররথ শিশু ও নারী-ঘাতনেও হর্ষানুভব করতেন। ক্রূর ও পুণ্যকার্যপরাঙ্মুখ আর্যতনয় আনন্দিত হতেন দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাবৃন্দের দর্শনে। আচারহীন ও দেবদ্বেষী রাজা উৎফুল্ল হতেন আর্তের বিলাপে। অগ্নিক্রিয়াবর্জিত ও সৎক্রিয়ারহিত দ্রাবিড়বিজেতা প্রমোদোৎসবে প্রমত্ত হয়ে উঠতেন যখন প্রবল জলপ্লাবনে ভেসে যেত করভারজর্জরিত অক্ষম ও অসমর্থ প্রজাবৃন্দের সংবৎসরধনরাশি, অথবা দাউদাউ শব্দে প্রজ্বলিত হয়ে লোকালয়ের পর লোকালয় গ্রাসিত হয়ে যেত সর্বগ্রাসী দহনমালায়। দ্বিতীয় কালমূর্তিসদৃশ সেই দুঃসহ দুঃশাসকের বিরোধী হবার দুঃসাহসকে পরিত্যাগ করেছিল একে একে সকলে।

দিকে দিকে বিঘোষিত হলো চিত্ররথের অনুগ্রহধন্য সর্বমাত্র বিজ্ঞবৃন্দের কূটসর্বস্ব নবপ্রজ্ঞান :

—পার্থিবের ভোগ্যরূপেই সৃষ্ট হয়েছে সকল অধিকৃত, তাঁরই তুষ্টিতে অথবা বিরক্তিতে প্রহিত হয়ে আছে তাদের সৃষ্টির স্থিতি কিংবা অস্থিতি। মণ্ডলেশ্বরই প্রকৃত ঈশ্বর, তাঁরই ইচ্ছায় নির্ধারিত হয় সকল জগৎনিবাসীর ঐহিক বা পারত্রিক পরিণতি।

ঘোষিত হলো :

—রাজচরণে সর্বস্ব নিবেদনের নামই ঈশ্বরোপাসনা, বিনাদ্বন্দ্বে তাঁর জন্য প্রাণার্পণের অর্থই মরণোত্তর প্রেতত্ব হতে চিরমুক্তিলাভের একমাত্র উপায়কে বরণ করা।

আর্যদের চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠতর দ্রাবিড়ের জনাম্ব-শাসনের সভ্যতাকে নির্মূল ক'রে ইন্দ্রত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন চিত্ররথ। সর্বত্র স্বীকৃত হলো তাঁর ঐ ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা :

—অর্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বিধিনা রাজসত্তমম্।
তৎ প্রসাদসেবাঞ্চ কুর্য্যাদ্বিত্যমতন্দ্রিতঃ॥

স্বীকার্য হলো নবরচিত বেদবাণী :

—মর্ত্যলোকে দেহাশ্রিত রাজারই আবরণপূজায় অর্চিত হন কল্পলোকের ঈশ্বরও। রাজরূপী সেই অনুত্তম পুরুষোত্তমের উদ্দেশ্যেই হোম করো, দান করো এবং তাঁরই মন্ত্র জপ করো সতত।

দ্রাবিড়েশ্বরের ঈশ্বরসত্তে প্রতিদিনের মতো সেদিনও নারীপণ্যের আপণ বসেছিল। রাশি রাশি হাটকের সঙ্গে সেদিনও বহু আর্য নরনারীকে লুণ্ঠন ক'রে তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল সমুদ্র-সমুত্থান লিপ্ত অসুরশূরবৃন্দ। বার্ধক্য ব্যতীত সকল বয়ঃক্রমের স্ত্রীপুরুষ ছিল সেই সমষ্টিতে, তবে আধিক্য ছিল যৌবনোপনীতা বলিষ্ঠদেহা রমণীদেরই।

এরা আনীত হয়েছিল দাসেয়র ব্যবসায়িক পণ্যস্বরূপেই। সুতরাং অধিক অধিগমের বিবেচনায় যাদের মূল্য যত বেশী, লুণ্ঠনকালে তাদেরই সংগ্রহ করা হয়েছিল ক্রমানুসারে। অবশিষ্ট বিনির্জিতদের স্বপুরে হত্যা ক'রে রেখে এসেছিল বাল ও বৃদ্ধঘাতী সুরদেবী অসুরবৃন্দ।

সিংহাসনের সম্মুখে প্রায়বিবসনা হয়ে নতমস্তকে অশ্রুপ্লাবিত গণ্ডে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল বীর্যশুল্কা শুক্লাবর্ণার দল। উন্মুক্তকেশা, ছিন্ন-কঞ্চুলিকা, বহির্বাস-বিহীনা, সুগঠিতদেহা সেই স্বজাতীয়াবর্গের বিপন্নতা সন্দর্শনে বিন্দুমাত্র কারুণ্যও সঞ্চারিত হয়নি চিত্ররথের মনে।

আরো সম্ভোগবাসনায়, আরো ধনলাভের সম্ভাবনায়, তুমুল আলোড়িত তাঁর চিত্তদেশ। এত নারীদেহের সংসর্গে আসার সুযোগ, এত নারীপণ্যের বিক্রয়ে প্রভূত সম্পদার্জনের আনুকূল্য এর আগে এত সমষ্টিগতভাবে আয়ত্তাধীন হয়নি তাঁর।

আপন বীভৎসে উদ্ভাসিত শতসহস্র বিকিরের সজ্জ-সুকতার প্রতি যে লোলুভতায় দৃষ্টিক্ষেপণ করে নির্দয় শাকুনিক, সেই দৃষ্টিতেই সমবেতা ভীতিপ্রত্তাদের নিরীক্ষণ করছিলেন রাজা চিত্ররথ। সপ্তার্চিসদৃশ তাঁর দুটি চক্ষু হ'তে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অনমুক্রোশান্বিত রাশি রাশি বিকৃতি।

সহসা সেই অপহৃতামণ্ডলীর মধ্য থেকে এগিয়ে এসেছিল এক অপরূপ রূপান্বিতা ষোড়শী। এমন অন্ধ-প্রায়প্রয়াসী উজ্জ্বল সৌন্দর্যের সম্মুখে বিহ্বল হয়ে পড়ে-ছিলেন চিত্ররথ।

সকাতর রোদনধ্বনির মতোই উৎসারিত হয়ে উঠে-ছিল তার ব্যাকুল প্রার্থনা :

—আপনি আর্যকুলাবতংস, আপনি মহৈশ্বর্যশালী বরেণ্য। আমাদের মুক্তি দান করুন রাজা। আপনার করতলগত অসীম ভোগের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি সাধিত হবে না, আমাদের প্রতি আপনার এই করুণায়।

পরম কৌতুকে উচ্চ অট্টহাস্যে সভাস্থল প্রকম্পিত ক'রে বিদ্রূপাত্মক ও তাচ্ছিল্যস্বরে ব'লে ওঠেন দুর্দান্ত চিত্ররথ :

—রমণীরত্নস্বরূপা অয়ি বিম্বাধরে! তোমার দেহের বিনিময়ে আমি সকল ক্ষতিকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত।

পারিষদবৃন্দের মধ্যেও কৌতুক সঞ্চারিত ক'রে আপন উৎসঙ্গে আসন সজ্জার কৃত্রিম ভঙ্গীমা প্রদর্শিত ক'রে ব'লে ওঠেন পুনরায় :

—এসো, প্রকাশ্য এই সভাস্থলে কোটবীরূপিনীরূপে এই অঙ্কে স্বেচ্ছায় স্থাপিতা হয়ে তোমার সপিণ্ড ও সনাভিবৃন্দকে, সগর্ভ ও সহজকুলকে, স্বজন ও জ্ঞাতেয়-বর্গকে পরিত্রাণ করো।

পদ্মকলিসদৃশ নীল চক্ষুদুটিতে অশ্রুর প্লাবন নিয়ে, কম্পিতকণ্ঠে ব'লে চলেছিলেন রূপান্বিতা আর্যকুলজা :

—যদি আমার প্রাণের বিনিময়ে মুক্তি পায় আমার আমিরা, তবে আমি প্রস্তুত, রাজা। শুধু একটি বারের মতো আমাদের গৃহের কথা স্মরণ করুন দ্রাবিড়েশ্বর। আমাদের পিতামাতা ও ভ্রাতৃভগ্নীহীন অনাথ ও অনাথায় পরিণত না ক'রে নিজেকেও দেবরোষ হ'তে পরিত্রাণ দান করুন, রাজা।

—এবার ভয়ঙ্করী অসূয়ায় উদ্রিক্ত হয়ে উঠেছিলেন চিত্ররথ। তাঁকে দেবরোষের ভয় দেখায় এই নারী! দেবদেবী চিত্ররথ দেবরোষে ভীত হয়ে বহু আয়াসলব্ধ এই প্রায়দুর্লভ পণ্যগুলিকে অলাভগর্তে বিসর্জিত করবেন শেষে।

ভ্রূকুটি-করাল বদনে সেই বরবর্ণিনীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করতে থাকেন চিত্ররথ। তারপর আদেশ দান করেন যমকিঙ্করসদৃশ আপন রক্ষীবৃন্দকে :

—নিয়ে যাও পণ্যাঙ্গনাদের। পুরুষদের বিক্রয় করো এখনই। আর, এই নারীকে রজনীযোগে প্রেরণ করো আমার সকাশে।

মধ্যাহ্নের গগন হ'তে যেমন সর্বত্র সম্পাতিত হয়ে পড়ে অসহনীয় উষ্ণোপগমের আতপমালা, তেমন ভাবেই সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল বিষম সাধ্বস।

দাসীশিবিরস্থ রক্ষীদলের সতর্ক চক্ষুতে ধূলি নিক্ষিপ্ত ক'রে রমণীদল হ'তে কখন্ পলায়ন করেছে সেই ভীরু, এই রজনীতে রাজসম্ভোগের ভোগ্যারূপে নির্বাচিতা হয়েছিল যে সুতনু বরবর্ণিনীর নিয়তি।

প্রত্যহশিবিরেও বহু অনুসন্ধান করেছে সকল রক্ষী, কিন্তু তার কোন সন্ধানই পায়নি কেউ।

তার সন্ধানে সমগ্র দ্রাবিড়মণ্ডলে দুরন্ত ঝটিকার মতো ছুটে ছুটেও তাকে দেখতে পায়নি কোন অনুসন্ধানী সাদী!

কোন উপায়ন্তরেরও সন্ধানে ব্যর্থ হন্ মহামাত্র; হতাশ হন্ স্বয়ং অধিকৃত। বিপন্ন-পাণ্ডুরাননে গোপন সভা হ'তে বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে যান স্থায়ুক ও গোপবৃন্দ। রাজরোষের অবশ্যম্ভাব্য পরিণতির পরিমাপ করতে থাকেন ভৌরিক ও নৈচিক এবং সকল অন্তর্বংশিক। প্রতীহারবৃন্দের এই সুভীষণ বিপত্তির কোন প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনা বর্ষবর ও সেবকের দলও।

অবশেষে সেই দুর্বার্তা গিয়ে পৌঁছায় চিত্ররথের কর্ণকুহরে।

—সেই রমণী পলায়িতা হয়েছে, প্রভু। তার চেয়েও সহস্রগুণে রূপকল্যাণময়ী দাসীর ভাক্য আপনাকে বরণ ক'রে নিতে প্রস্তুত। আদেশ করুন।

একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেমন বিদীর্ণ হয়ে যায় আগ্নেয়াদ্রির শিখরদেশ, প্রখর বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করা মাত্রই যেমন কর্ণবধির আরাবে মর্ত্যাভিমুখে পতিত হয় বজ্রাগ্নির পিণ্ড, মুহূর্তের প্রবল প্রকম্পনে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার কালে মৃত্তিকাবক্ষের গভীর হ'তে উৎসারিত হয় যেমন গম্ভীর গর্জন,—তেমনভাবেই ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ চিত্ররথের মধ্য হ'তে উদ্গীরিত হ'তে থাকে ভীষণ তর্জন। তাঁর আদেশে সেই মুহূর্তেই বধ করা হলো বন্দিনীশিবিরের চারজন, ম্লেচ্ছ-রক্ষীকে।

রাজরোষের হাত থেকে সামান্য চারটি প্রাণের বিনিময়ে পরিত্রাণ লাভ ক'রে প্রশমিত হলো আচাভুয়া অসুরসেনানীর পরিত্রাস।

রাজসকাশে প্রেরিতা হলো আর এক রমণীয়দর্শনা বন্দিনী আর্যনন্দিনী।

নারীপিশাচের পৈশাচিক সম্ভোগের বিন্দুপরিমিতও ক্রটি হলো না, কিন্তু তথাপি অতৃপ্ত রইলেন রাজা। আপন স্বভাবের আভোগে পাশবিক প্রসভপ্রয়োগে একটুও লব্ধ হলো না প্রার্থিত প্রসাদ।

প্রতি রজনীর অবসানে রুধিরাপ্লুতবেশা রাজশয্যা-সঙ্গিনীর শব অপসারিত হলো, তবু তৃপ্তমিতকাম হলেন না চিত্ররথ।

চতুর্দশী অবস্থাতেই ঋষিসত্তম দধীচের কাছে ওঙ্কারে দীক্ষিতা হয়েছিল সেই তিরোহিতা ষোড়শী। দুরাপ ও দুর্বক্ষ্য বিস্ময়মন্ত্রপ্রভাবে সকল রক্ষীর সতর্ক প্রহরার মধ্যেও সকলের অলক্ষ্যে নিজেকে নিষ্ক্রান্ত ক'রে এনেছিল সে দ্রাবিড়নগরী থেকে।

জানত বরভাষিণী, অসুরলুণ্ঠিতা আর্যকন্যাকে কিছুতেই পুনর্গ্রহণ করবে না তার জনমণ্ডলী, অবশ্য আসুরিক আক্রমণের পরেও যদি তার কোন অস্তিত্বও থাকে।

স্বর্ণপ্রতিমার মতো সক্রন্ত পদসঞ্চারে বনবর্ত্ম ধ'রে উত্তরাভিমুখে ছুটতে আরম্ভ করেছিল সে। এবং অবশেষে একদিন ঋষি দধীচের চরণচ্ছায়ায় আশ্রয়ও লাভ করেছিল সে।

এরও পরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বহু বৎসর। বহু যুগান্তরে সাধিত হয়ে গেছে তাঁর নিজেরও বহু রূপান্তর।

অসুরের অকল্যাণী শক্তির বিনাশকল্পে মহাযুধ নির্মাণে কৃতকার্য হয়েও তারই পরীক্ষাকালে আত্মাহুতি দিয়েছেন সাধীয়স্ পারিকাঙ্ক্ষিন্। যাবার কালে আপন আশ্রমের দায়িত্ব সমর্পণ ক'রে গেছেন যোগ্যতমা মন্ত্রশিষ্যার হাতে।

এরই মধ্যে অভাবিত পরিবর্তন সমাধিত হয়ে গেছে ত্রিলোকেও। কত সঙ্কীর্ণ ও প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসান্তরে উদ্গত হয়ে উঠেছে কত নতুন নতুন সমাজের অঙ্কুর। কত শিশুসভ্যতার ঘটেছে অপমৃত্যু, কত অভিনবোদ্ভিদ্ পরিণত হয়েছে প্রকাণ্ড শাখিনে। কত নিরালোকিত মহারণ্যে স্থাপিত হয়েছে কত প্রাসাদশোভিত নিগমরাশি, কত কোলাহলমুখরিত পত্তনের পতনে সৃষ্ট হয়েছে নিষ্প্রাণ মরুস্থলী।

পরিবর্তিত হয়েছে আর্যস্থলীও।

অনার্যের যে দাসব্যবসায় ও অসুরলোকের যে রা
তন্ত্রের বিরুদ্ধে বহুবার অস্ত্রধারণ করেছে জনশা
সুসভ্য আর্যকুল, অবশেষে সেই রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ক
ছিল তারা, গ্রহণ করেছিল সেই দাসপ্রথার।

ইন্দ্র নামধেয় এমনই এই রাজতন্ত্রের রক্ষাবান
আপন অস্থি দান করেছিলেন গুরু দধীচি। তাঁ
ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে আপন তেজঃপ্রভাবে দূরস্থা
থেকেও ইন্দ্রকে বলসঞ্চারের বরদান ক'রে চলে
দধীচের উপযুক্তা উত্তরসাধিকা। এই তেজঃপ্রভা
তাঁর আশ্রমের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ও অপূর্ণ রাখেননি কি
কিছুই।

জনসমাজে আর কখনও যাননি তিনি, তথাপি
যুগলব্ধ অমিত যোগবলে সর্বত্রের সকল ঘটনা প্রত্য
ভূত হয়ে গেছে তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে। আশ্রমবাসি
যোগনেত্রের সম্মুখেই সংঘটিত হয়েছে বাস্তবের স

সংঘটনা ; এমন কি তাঁর সেই মনশ্চক্ষে বিস্তৃত হয়েছে লোকচক্ষুরও অন্তরালবর্তী সকল যোজন। দেখেছেন তিনি :

মঘবান ইন্দ্রের আক্রমণে একে একে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে সকল অসুরশাসন, একে একে পতন হয়েছে সকল অসুরদুর্গের।

চন্দ্রবংশজ চিত্ররথ সন্ধির প্রার্থনা করেছিলেন মহাবল ইন্দ্রের সমীপে। আর্যসন্তানের পক্ষে অসুরলোকে একচ্ছত্র আধিপত্যকে অস্বীকার করেননি, বরং তাঁর সঙ্গে অকৃত্রিম সন্ধিস্থাপনা করেছিলেন আর্যাধীশ বাসব। আর এরই মধ্যে সংগুপ্ত ছিল কূটকৌশলী অসুররাজের কপটতা।

কিন্তু ততদিনে কূটনীতিতে অনেক বেশী পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন আর্য-রাজতন্ত্র। সন্ধি ও বিগ্রহে, যানে ও আসনে, এবং দ্বৈধে ও আশ্রয়ে আরও বেশী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁরা, অর্জন করেছিলেন প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রজের শক্তি। অনেক বেশী বিস্রম্ভে অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা ভেদ, দণ্ড, সামন্ ও দণ্ডের উপায় চতুষ্টয়। অগণিত অপসর্পের দ্বারা বিদেশী ও বিদ্বেষী রাজ্যের নিরবগ্রাহিতাকে বিপন্ন করার যে কৌশলের প্রবর্তন করেছিলেন আর্যগুরু বৃহস্পতি, তার তুলনা ছিলনা। সেই নিয়োজিত গূঢ়পুরুষের সহায়তায় দ্রাবিড়েরও সকল উদ্যমের গোপন সংবাদ অবগত হতেন পুরন্দর।

দ্রাবিড়ে সংগুপ্ত প্রজাবিদ্রোহের উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন ইন্দ্র চিত্ররথেরও বহু আগেই। খাদ্যাভাবে, করভারে, ও যথেচ্ছ রাজাত্যাচারে জর্জরিত দ্রাবিড়ীবৃন্দ রাজহত্যার কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছিল—এ সংবাদও অজ্ঞাত ছিলনা শতক্রতুর কাছে।

এক সময় সকল অশুভবুদ্ধির পুঞ্জীভূত প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে নিজেই দেবভূমি আক্রমণ ক'রে বসলেন চিত্ররথ। যত সামান্যই হোক, যেটুকু নীতিবন্ধনে আবদ্ধ থেকে এতদিন দ্রাবিড় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সম্মুখরণে অবতীর্ণ হ'তে পারেন নি ইন্দ্র, এবার আপনা-আপনিই সমুপস্থিত হলো সেই সুযোগ। নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহূত ক'রে বসলেন দুর্মতি চিত্ররথ।

নীলনয়ন গৌরদেহী সহস্র আর্যভটের হাতে ভীষণভাবে পর্যস্ত হলো দ্রাবিড়পক্ষের অনুক্রমী বেতনভুক সৈন্যদল। তাদের অর্ধাংশ বিগতায়ু হলো আর্যভূমিতেই, এক চতুর্থাংশ বন্দী হলো আর্যদলের হাতে ; এবং স্বলোকে পলায়নপর অবশিষ্টকে দ্রাবিড়সীমান্তেই নিঃশেষে নির্মমভাবে হত্যা করল দ্রাবিড়ের মুক্তিকামী বিদ্রোহী জনমণ্ডলী।

পলায়নপর অসুরসেনার পশ্চাদ্ধাবনকারী দ্রাবিড়াগত আর্যদের সাদরে ও সাগ্রহে অভিনন্দিত করল বিগৃহীত অসুরসাধারণ। হর্ষিত আর্যসেনানীর হাতে হাত মিলিয়ে চিত্ররথের প্রাসাদাভিমুখে পরমোল্লাসে ধাবিত হলো শ্রেয়ঃলাভীর দল।

তখনও ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে ছিলেন চিত্ররথ। কৃত্রিম সুর নির্ঝরের বেষ্টনবেদিকার পাশে বহু বন্দিনীর নগ্নদেহ-পরিবৃতা হয়ে আর্যপত্তনের সংবেশাবেশে বিভোরাত্মা হয়ে বসে বসে ঝিমাচ্ছিলেন দ্রাবিড়াধিপ আর্যপুত্র।

তাঁর আসন্ন বধের সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে এল বিশ্বস্ত এক অনুচর।

মুহূর্তমধ্যে ক্রটিত হয়ে গেল স্বপ্নবিব্বোক। তীব্র রোষে লাফিয়ে উঠলেন চিত্ররথ।

সতর্কতাদানপ্রয়াসী অনুচরেরই কটিবিলম্বিত অসিটি ছিনিয়ে নিয়ে তারই বক্ষে সেটি আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়ে অট্টহাস্যে বিস্ফোরিত হয়ে পড়লেন বিভ্রান্ত রাজা। নৃপানুগত্যের পরম গতিস্বরূপ চরম পুরস্কার লাভ ক'রে রক্তাপ্লুত দেহে ভূলুণ্ঠিত হলো রাজভক্ত অনুচর।

বামাকণ্ঠের তুমুল আর্তরবে পরিপূরিত হয়ে গেল বিলাসকক্ষ। ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ ও উন্মাদ চিত্ররথের যথেচ্ছ অসি সঞ্চালনের ফলে ভূতলশায়িনী হলো অসংখ্য বন্দিনী।

আপন প্রাসাদে আপন রক্ষকবৃন্দের হাতেই শৃঙ্খলিত চিত্ররথ সমর্পিত হলেন আগত আর্যসেনাধিপতির হাতে।

প্রভূত কূটকৌশলী ছিলেন রণকুশলী আর্যযোদ্ধা।

…ত্রের পূর্ব নির্দেশানুযায়ী রাজবিক্ষুব্ধ দ্রাবিড়জনের …তেই চিত্ররথকে প্রত্যর্পণ করলেন তিনি।

…জনতার হাতে খণ্ডে খণ্ডে বিকর্তিত হলো জীবিত …ার্যকুলগ্লানির দেহ। তাঁর উচ্ছিন্ন মাংসভক্ষণে পরিতুষ্ট …লো উচ্ছিষ্টভোজী সারমেয়ের দল। তাঁর অবলগ্নে …নিক্ষিপ্ত হলো জলন্ত অঙ্গাররাশি।

অশেষ দুর্গতির অন্তে এক সময় মৃত্যুকে বরণ ক'রে …ত্র্যশাস্তি হ'তে রক্ষা পেল পাপাত্মা। বৈদিক-বিধানে …তা নয়ই, বেদবিরোধী কোন বিধানেও তাঁর ঔর্দ্ধ- …দৈহিক ক্রিয়া সমাধায় কিংবা কোন প্রকারে সৎকার …রবারও ছিলনা কেউ।

একটি মৃত্যু সহস্র সহস্র প্রজার অন্তরে হর্ষোৎসবের …উৎসরূপে প্রতিভাত হয়েছিল দীর্ঘকাল।

সহস্রাভিবিরক্ত নিরয়লোকে অধিবাসিত হয়ে পুনঃ পুনঃ বায়ুবিগঠিত-দেহের বিনষ্টি ও সম্প্রাপ্তির পরেও …খন শুদ্ধতম সত্তায় পর্যবসিত হ'তে বাধাপ্রাপ্ত হলো চিত্ররথের বায়ুস্তরাশ্রয়ী বিরাজন। একসপ্ততি যুগ যাবৎ …ানলদগ্ধ ও দুঃখমূর্চ্ছিত হয়েও মহাদুঃখপ্রদ পিশাচত্বের …প্রাপ্ত হলেন তিনি। শোকপীড়িত হৃদয়ে গিরিরাজ …ক শৈলছায়ী প্রস্রবনারণ্যের এক বিভীতচ্ছায়ায় আশ্রিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনাতুর হয়ে উঠলেন পিশাচ :

—হা! হতোঽস্মি।

মহাতাপসিকা দেবদ্যুতির আশ্রমবায়ুস্পর্শে অজ্ঞাত- …সারে সঞ্জাত হলো মুক্তিপদ অনুশ্লোক :

—হে ঈশ্বর! সর্বভূতহিংসক আমি, এই দুরন্ত …দুঃখের মুক্তিদান দান করো আমায়। পরমা প্রার্থনায় …আকুল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর :

—আদৌ পাপসমুদ্রেঽস্মিন্ দুঃখকল্লোলমালিনী।
কথাবলম্বনং কোঽত্র নিমগ্নস্য প্রদাপ্নুতি॥

…দীনচেতা পিশাচের এই সকরুণ রোদনস্বর শ্রুত …সৌ-অধ্যয়নরতা দেবদ্যুতির শ্রবণে। আসন পরিত্যাগ …ক'রে আশ্রমকুটিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন জ্যোতির্ময়ী …সাধিকা।

পিশাচ চিত্ররথকে দর্শন দান করলেন মহীয়সী জ্ঞান-তপস্বিনী—মহাতপা দধীচির সকল সাধনশক্তির পুঞ্জী-ভূতা পরিণতি।

বিকটবদন, ভীষণদর্শন, পিশঙ্গনয়ন, কৃশদেহ, ঊর্ধ্ব-কেশ, কৃষ্ণাঙ্গ, লোলজিহ্ব, লম্বোষ্ঠ, দীর্ঘজঙ্ঘ, শিরাকুল, দীর্ঘাঙ্ঘ্রি, শুষ্কতুণ্ড, কোটরাক্ষ ও শুষ্কপঞ্জর সেই পিশাচের দর্শনে বিন্দুমাত্র সন্ত্রাসে বিচলিতা হলেন না কারুণিকা দেবদ্যুতি।

অমৃতবর্ষী স্বরে জগতের যত্তেক করুণাকে সংগৃহীত ক'রে ধ্বনিত হয় পরমা জিজ্ঞাসা :

—কে তুমি ভীষণাকার? কি জন্য দারুণ রোদন-তৎপর হয়েছে তোমার আত্মা?

সেই বাক্যে প্রীত হলো পিশাচাত্মা। মেঘ যেমন পর্বতোপরি বর্ষণ ক'রে হরণ করে গ্রীষ্মকালীন দাবানল-তাপ, তেমনই ভাবে সেই বাক্যপ্রভাবে হৃত হয় সর্বাঙ্গ-ব্যাপী সন্তাপ।

বহু প্রয়াসেই বাক্যস্ফূর্ত হলো না বিস্মিত ও বিহ্বল পিশাচের কণ্ঠে।

কিন্তু তৎক্ষণে অমেয় যোগশক্তির প্রয়োগে তার পরিচয় প্রচেতিতা হয়ে যান যোগময়ী দেবদ্যুতি।

সুস্পষ্ট না হলেও জীবনের সেই অন্ধকারাবৃতপ্রায় সূচনাকালে সভয়দৃষ্ট দ্রাবিড়াধিপের রাজসভায় নিত্য বহু বন্দিনীর দুর্ভাগ্যনির্ধারক একক চিত্ররথকে চিনতে পারলেন দেবদ্যুতি, কিন্তু বহুর মধ্যে দেখা একটি নিঃসহায়া দেবদ্যুতিকে চিনতে পারলেন না পিশাচ।

পিশাচের প্রকৃত পরিচয়ে কোন বিরূপতা কিংবা বিকৃতি সঞ্জাত হলো না দেবদ্যুতির হৃদয়ে। কোন রোষ কিংবা বিদ্বেষের লেশমাত্র সংযোগও সম্ভাবিত হলো না তাঁর চিত্তে। কোন প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, কিংবা প্রতিকূলতায় অন্বিত হলো না তাঁর অতীন্দ্রিয়-দেশ। কোন অপক্রিয়া বা অপক্রোশের, কোন অবজ্ঞান বা অবজ্ঞুষ্ঠতার কিংবা কোন নিগ্রাহ বা নিন্দাবাদের প্রশ্রয়মাত্র প্রাপ্ত হলো না তাঁর বিবেক।

পরমা মমতায়, মঙ্গলময়ী তিতিক্ষায়, ঐকান্তিকা

প্রিয়তায়, সহজাতা অনুকম্পায়, মাতৃসুলভা বাৎসল্যে ও মুক্তিদা উৎকলিকায় পরিপূর্ণাত্মা হয়ে উঠলেন দেবদ্যুতি।

—আহা, সকল দুঃখরাশির অবসানে নিরবচ্ছিন্ন প্রমোদ প্রাপ্ত হোক অকৃত্তিকন নায়কী। বিচ্ছিন্ন হোক সকল অপকর্মবশতার সূত্র, নিশ্চিহ্ন হোক পৈশাচী যন্ত্রণার দুর্ভোগ ?

পরমা করুণার মতোই অসীম মমতায় পিশাচরূপী রাজা চিত্ররথের শিরে করার্পণ করেন তাপসিকা দেবদ্যুতি। বিষ্ণুভক্তিরূপ তনুত্রাণযুক্তা নারায়ণ-পরায়ণা সাধিকাকণ্ঠে উৎসারিত হয় কল্যাণী বাণী :

—আমার আশীর্বাদে দূরীভূত হোক তোমার সকল অকল্যাণ। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাক সকল কল্মষ ; অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের মতো জন্ম নিক পূত হৃদয়।

দেবদ্যুতির অধরকমলগলিত অমৃতায়মান বাণী-ধারায় ও তাঁর সর্বপাপহর পূতস্পর্শ লাভের সৌভাগ্যে সর্বাপূরিত হয়ে প্রমুদিত হলেন চিত্ররথ। বৈষ্ণবী-শক্তির অমোঘ প্রভাবে দুঃখার্ণব হ'তে মুহূর্তে নিস্তীর্ণ হয়ে পৈশাচী তনু পরিত্যাগে সক্ষম হলেন পিশাচাত্মা।

মাতৃচরণে ভক্তিনতশীর্ষ তনয়ের মতো সাধিকা দেবদ্যুতির প্রপদ-কোকনদে বারংবার প্রণতি জানিয়ে তাঁরই পূতেচ্ছায় গগনাঙ্গনোর্ধ্বের মহালয়ে লয়প্রাপ্ত হ'তে চলে যান প্রণায্যাত্মা চিত্ররথ।

অশেষ আশিসদান ভঙ্গীমায় দক্ষিণ করতালিকা মেলিত ক'রে আনন্দাশ্রুগলিত চক্ষের দর্শনে সেই যাত্রা-পথপানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দিব্যরূপিণী কল্যাণী।

যেন সন্তানের যাত্রামাঙ্গল্যের কারণে নিরন্তরা কামনা নিয়ে গৃহদ্বারে সন্তোৎকণ্ঠিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিদায়দাত্রী এক চিরন্তনী জননী।

শোষিত সমাজ আত্মা ফুঁসিছে আক্রোশে

সুশীতল দত্ত

সকাল বেলায় এক প্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেছে গিন্নির সঙ্গে—রাঁধুনী ঠাকরুণের মুখে তার বাজারের সওদা পছন্দ মত হয়নি—এ জিনিষে তিনি কাউকে খুশী করতে পারবেন না। বাবু যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছেন, বাজার সওদায় আর যেন মন নেই। গিন্নিও রাঁধুনী-ঠাকরুণের সঙ্গে একমত, খুব আরো একটু চড়া অঙ্ক জিনিষে তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের পেট ভরাবেন কি দিয়ে। তারপর আছে জল খাবার, সকাল সন্ধ্যায়। যে দিন কাল তাতে জলই পাওয়া যাবে কয়েক গ্রাস গিলতে; খাবার পাওয়া ভার। মুড়ির দাম পাঁচ টাকা, চিড়াও তাই ছত্রিশ পয়সায় পাউরুটী দাম দিতে হয় পঞ্চাশ বা ষাট পয়সা, কলা কিনতে যাবেন তারও দাম উঠে রয়েছে ষাট পয়সা জোড়া, চিনি তারও দাম সাড়ে চার টাকা কেজি কালোবাজারে—আরে না মশাই, এটাই আজকের দিনের ন্যায্য বাজার পাচ্ছেন যে তাই বাপের কপাল ভাল। কলা যা খাবেন মনে হয় না খেয়েছেন গাছের কলা বা ছোট বেলায় খেতেন—মনে হয় যেন পয়সা দিয়ে খেয়েছেন একটি কলা। সব জিনিষেই ভেজাল ভরা দামে চড়া ওজনে চুরি - ঘরে বউয়ের মুখনাড়া এই নিয়েই আমরা ঘর করছি স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে। বাজারের এ অবস্থা গিন্নিও জানেন কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া না করলে তার মনে তৃপ্তি নেই। প্রেমটাও পুরোনো হয়ে গেছে—এই সংসার পাতার সব দায়িত্বটাই তখন আমার একার। তার পরই সকালের ডাকে একখানা চিঠি। বৈবাহিকা লিখেছেন গিন্নির মেয়ে সিন্দুর দেবার কথা—সেখানেও খরচ আছে মিষ্টি ও মায়ের সঙ্গে একখানা শাড়ী দিতে হবে এটাই আমাদের রীতি। শাড়ী কিনবো? আট পৌরে একখানা শাড়ী সেদিন কিনেছিলাম আমার তবে বাঁচবে এক বছর—ত্রিশ টাকা দিয়ে। ভেবেই দুঃখ একবার মেয়ের বাড়ীতে শাড়ী পাঠাতে হলে, দোকানীর পেট ভরাতে হবে, মেয়ের মন খুশী করতে হবে বৈবাহিকার মনেও রঙ ধরাতে হবে সবার উপর আবার পরিবারের মান ইজ্জত। তার সবটার ভার বইতে হবে এই মাথার উপর। ভেবেই একবার বুঝুন এই এক ঠেলায় গিয়ে কোথায় দাঁড়াবো—তারপর এই ডিসেম্বর মাস—ছোট মেয়েটার পরীক্ষা হয়ে গেছে, নূতন ক্লাশের বইপত্র কিনতে হবে। এর উপর স্কুলের বড় দিদিমণির ইচ্ছামত স্কুলের শাড়ী যোগাতে হবে নইলে নাকি স্কুলের ডিসিপ্লিন নামক পদার্থটা নষ্ট হয়ে যাবে—আমার গলা কাটলেও স্কুলের ডিসিপ্লিনটা বাঁচাতেই হবে। আমি এক মেয়ের ধাক্কাই সইতে পারছিনা, আর যাঁর হ'চারটা আছে তাঁর উপায়?

এতো প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ঘটছে আমার ঘরে আর আমারই বলি কেন প্রতি ঘরে ঘরে মেয়ের নিমন্ত্রণ না হলেও জীবন যাত্রায় যে গ্লানি আছে প্রতি ঘরে ঘরে—প্রতি মানুষেরই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন সংসার কি জালা, আর এজীবনে কত যন্ত্রণা পদে পদে—তাও মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারছিনা, এক বিপ্লবী সম্পাদকের তিরস্কারের ভয়ে আর পাড়ায় পাড়ায় স্বয়ংসিদ্ধ খোঁজে নেতাদের ভয়ে।

অফিস কাছারীতে যাবার পথের বাদুড় ঝোলার বা গা ঠেলাঠেলির কথাটা নাও যদি বা বলি টের পাই মনে প্রাণে। ব্যথা হয় সর্বাঙ্গে সন্ধ্যায় যখন ক্লান্ত শরীরটাকে বয়ে এনে বাড়ী ফিরি—তাও যানবাহনের যে অবস্থা বা ব্যবস্থা তা কোন দিন যে কে কখন রাত কাটাবো তাই বা কে জানে? তারপর আবার ভাড়া বাড়ছে—যাহা ভাতো বাড়াতেই হবে- কয়েক জনের পেটের ভাত যোগাতে-আর দু'এক জনের পকেট ভরাতে বাকী নিরা-নব্বই জনের পকেট তো কাটতেই হবে, এটাই সহজ

ব্যবস্থা অন্ত ব্যবস্থা করতে গেলে ভুল থাকবে কিন্তু তাস থাকবেনা। দিনে দিনে বাড়ছে দাম শাক সবজির, তেল নুন, ডাল মসলার দাম, পরিধেয় বস্ত্রের দাম—বিজুলীর দাম অর্থাৎ দাম বাড়ার প্রতিযোগিতার চাপে মরছি আমি আপনি অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণ—আমরা আজ বাজারে গেলে পাগল—ঘরে এসে হই বোকা।

সেদিনও বাজার ছিল ক্রেতার আজ তা হয়েছে বিক্রেতার সকল অর্থ নীতির হয়েছে বদল যিনি যা ইচ্ছা দাম হাঁকছেন আমরা দিচ্ছি বিনা প্রতিবাদে। ভিতরে পুড়ছি আর ঘরে অশান্তিতে ভুগছি। সব বিক্রেতাই সাধু তিনি দাম চাইবার আগেই বৃহৎ ব্যবসায়ী আর পাইকারদের শ্রাদ্ধ করবেন, আর তিনি একেবারে তুলসী ধোয়া সাধু। আগের দিনে কোন দ্রব্যের দাম মন প্রতি দু আনা তিন আনা বাড়লেই জনসাধারণের মধ্যে একটা আতঙ্ক যেন দেখা যেত। এখন দেখছি কেজি প্রতি পচিশ পয়সা ত্রিশ পয়সা বাড়লেও আমরা সেগুলি কিনছি, কোন আপত্তি না করেই—এমন কি সরকারী রেশনও যখন দাম বাড়ে কেজি প্রতি ত্রিশ পয়সা তখন প্রতিকার আর চাইব কার কাছে। রেশনে চিনি পাবেন না—কালোবাজারে পয়সা দিলে পাবেন। সরষের তেল যদি বা সরকার রেশনে পরিবেশন করেন দাম নেন ৮.৪০ পয়সা কেজি দরে—অথচ বাইরের তেলের দাম কমাতে পারেন না—ব্যাপারখানা একবার বুঝুন তা হলে। জিনিষের অভাব ঘটেছে—উৎপাদনে ঘাটতি, পরিবহনে অসুবিধা এগুলি প্রতিকার সুষ্ঠ বন্টনের সুব্যবস্থা করা কি মানুষের অসাধ্য কাজ? যদি প্রশাসনে থাকে সততা আর বিভাগে বিভাগে সমন্বয়, সহযোগিতা কেন্দ্র রাজ্যে ও রাজ্যে রাজ্যে—আর থাকে যদি নির্লোভ কর্ণধার। সরকারী মালিকানাধীন ব্যবসাগুলির দিকে চেয়ে দেখুন শুধু অপচয় আর লোকসান, আর বেসরকারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাবেন উৎপাদন সংকোচনের সুনিপুণ ব্যবস্থা—একে ত নেই বিজুলী সরবরাহ, তার উপর লোভী ব্যবসায়ীদের কারসাজ। বাজার থেকে মাল উধাও—মজুত করে একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বাজারে ফটকা খেলছে। দেশের অর্থনীতির কাছে বানচাল—মরছে ক্রেতা সাধারণ—দেখছে চেয়ে প্রশাসন, মাঝে মাঝে ফেলছে চোখের জল কুমীরের মাতৃস্নেহের মতন। এরই নাম—রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তি।

দেশে সরকার বা শাসন আছে বলে মনে হয়না। তবে তার অস্তিত্ব দেখি খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বাৎসরিক বাজেটের সময়—যেমন প্রত্যক্ষ করে অপ্রত্য আবগারী শুল্কের গুঁতায়। —আর প্রান্তিক কর ও অতিরিক্ত করের বেলায়। এরপর আছে বৎসরের মস্তানী কর যার উপর পড়বে না, দিলে তার ফল বুঝতে হয় হাড়ে হাড়ে। শুনেছি এ খবর নিয়ে থানায় গেলে থানার কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ সাহায্যে করতে চান না—পরামর্শ দেন আপোষে মিটিয়ে নিতে। আইন বা সামাজিক নিয়মকানুন কেউ মানছেন না। আইনের শাসনের উপর আজ আর কারু শ্রদ্ধা নেই—কারণ আইনের রক্ষকরাই তা ভাঙছেন—জনসাধারণের একটা অংশ হয়েছেন চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অত্যাচার করে চলেছে অবাধে—আর বাকী জনসাধারণ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য বিচার চেয়ে পায় না বলে আজকাল এসব নিরবে সহ্য করে যাচ্ছে-কিন্তু মনে মনে চটছে প্রশাসনের উপর—সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এসব খবর রাখেন কিনা জানিনা কারণ রাজপুরুষেরা দেখেন কাণে বা ক্ষমতার-আত্ম-প্রসাদে। আগামী দিনের কথা ভুলে যান। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় মনুর সমাজ যেন ভেঙে হয়েছে হনুর সমাজ। অত্যাচার অনাচার চলছে সমাজে, প্রশাসন দেখছেন যেমন সদ্য বিধবা স্ত্রী স্বামীর শবশয্যার দিকে শাড়ী পরে চেয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি করে।

আমাদের মনে হয় এই সার্বিক অবক্ষয়ের ক্রিয়াকে বন্ধ না করতে পারলে এক ভীষণ বিপর্যয় আমাদের সব সৎ সম্ভাবনাকেই সমূলে ধ্বংস করবে এক ভীষণ অরাজকতা সমাজকে গ্রাস করবে। দুর্বল শাসন হৃদয়হীন ব্যবসায়ী শ্রেণী—বেকারদের কালোপাহাড় শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সামাজিক চিন্তায় স্বার্থপর জাতিকে করছে পঙ্গু—

মানুষ হয়েছে হৃদয়হীন, জীবনধারণের তাগিদে হয়েছে একান্ত স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে না করতে পারে এমন কাজ নেই, তার ভয় নেই—কারণ সমাজ ভেঙে গেছে ভেঙেছে পরিবার—ভাঙছে শান্তির ঘর। ওঁরা বলছেন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে সারা দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে দ্রুতগতিতে—কাজেই এদেশেও এই মূল্য বৃদ্ধি। কিন্তু আমরা যারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে প্রাণ ধারণে কষ্ট পাচ্ছি আমরা প্রতিকারের আশা করবই প্রশাসনের কাছে। এত ভেজাল কালোবাজারী লুণ্ঠনকারীদের প্রাধান্য অন্য কোন দেশে আছে কি? এমন সর্ব্বাত্মক অব্যবস্থা আছে কি কোন দেশে? এদের মৃত্যু দণ্ড হয় রাশিয়াতে—আমাদের দেশে কি হতে পারে না এই সমাজ শত্রুদের চরম বিচার? সেদিন খবরের কাগজে দেখেছি লোকসভার সদস্যদের বেড়ানোর ও অন্যান্য খরচের খবর সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে লোকসভায় ঝড় উঠেছে। সেখানে যোগ দিয়েছেন মাননীয় স্পীকার মহাশয় পর্য্যন্ত। অন্য দেশের সদস্যরা অনেক বেশী টাকা পান বলে তিনি বলেছেন—কিন্তু কথাটা জানা গেল না যে আমাদের মত শতকরা চল্লিশ জন লোক সে দেশগুলিতে দারিদ্র সীমানার নীচে আছে কিনা—মানুষ এমন উলঙ্গ থাকে কিনা, গৃহহীন জনজীবন রাস্তায় রাস্তায় বিপুল সংখ্যায় ঘর সংসার পেতে বৎসরের পর বৎসর কাটায় কিনা। ছিঃ আমরা লজ্জায় মাথা খেয়ে বসে আছি।

বাজারে দোকানে রেস্তঁরায় ট্রামে বাসে অফিসে কাছারীতে যেখানেই যাই মানুষের মধ্যে একটা অভাববোধ চোখে পড়ে। রাস্তায় লোক চলছে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—যেন একটা উন্মত্ত মাদকতার শিকার হয়ে গেছেন সবাই। সর্ব্বত্রই একটা অবিশ্বাস পথ জুড়ে বসে, আছে মানুষ দিশেহারা, প্রতিকারের পথ নেই। সাধ আহ্লাদ পুরাবার রাস্তা নেই আনন্দ নেই আশা নেই; রঙ নেই জীবনে।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি শরীর ক্লান্ত মেজাজ ভাল নেই সেই সকাল থেকেই আছি শুধু একটু চা খেয়েই ঢুকলাম গিয়ে আসবাবহীন বসবার ঘরে। বইয়ের ভিতর ডুবিয়ে যদি বা মনটাকে সুস্থির করতে পারি মনে করে। কোন বইখানা পড়বো এমনি ভাবছি এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাক দিল—বিমলেন্দু ঘরে আছো হে। চোখ ফিরিয়ে দেখি আমার গ্রাম্য বন্ধু স্বপেলানন্দ ভট্টাচার্য্য এসেছেন আমার ঘরে। এই স্বপেলানন্দ আর আমি একই গ্রামের অধিবাসী একই স্কুলে পড়তাম দুজনে—একসঙ্গে বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছি সহরের কলেজে। স্বপেল ছিল বড়লোকের একমাত্র ছেলে, লেখাপড়ায়ও খুব ভাল ছিল বি, এ পাস করে আমি ঢুকলাম সরকারী অফিসে স্বপেল গেল কলকাতায় পড়তে। সে দিন থেকে দুজনে ছাড়াছাড়ি। শুনেছিলাম স্বপেল তার বাপের সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা পয়সা ত্যাগ করে দেশের কাজে লেগে গেছে—কত যুবকই তো সর্ব্বস্বত্যাগ করে প্রাণ দিয়েছেন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কেমন করে পঁচিশটা বৎসর কেটে গেছে প্রতিশ্রুত প্রাচুর্য্যের ও সুষ্ঠু শাসনের পরিবর্তে এসেছে দরিদ্রতা আর দুর্নীতিগ্রস্ত অপশাসন।

স্বপেলকে বললাম, বল হে স্বপেল কেমন আছ? বহুদিন পর দেখা। বলতেই স্বপেল বললো, ভাল আছি তবে মনে আছে কষ্ট। আমি ঘুরেছি সর্ব্বত্র এই এই ভারতবর্ষের। বিদেশে ঘুরে ঘুরে সমস্ত পৃথিবীটাই দেখা হয়ে গেছে তাই এবছর ফিরে এসেছি দেশে। এসেছিলাম বড় আশা নিয়ে কিন্তু দেখে শুনে হয়েছি নিরাশ। "কেন হে" আর কেন ভাই দেশের অবস্থা দেখে মানুষের কষ্ট দেখে কর্ম্মহীন যুবকের উদ্দেশ্যহীন মিছিল দেখে ভীত হয়ে গেছি মানুষের চোখ দেখে, চোখে মুখে ফুটে উঠছে বিভীষিকার নিশানা ইসারা এক সার্ব্বিক সঙ্কটের দিকে অতিক্রত গতিতে যাচ্ছে যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। যাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি, দিয়ে মসনদে বসেছেন তাঁরা জানেন না এ কাজ বিলম্বিত হলে কি হবে। তার পরিণাম আর যাঁরা বিপ্লব চাই বিপ্লব চাই করে খেলছেন ঐ পুতুল খেলা তাঁরাও জানেন না বিপ্লবের সঠিক চেহারা।

বিপর্য্যয় যখন ঘটবে এবং এ ঘটবেই, জেনো ঠিক তখন রাজনীতির গণিকাবৃত্তিও ভবে যাবে সার্থক বিপ্লব শেষে প্রতিষ্ঠিত হবে সহজ সরল জীবন ভারত সমাজ মানে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক সমাজে। নেতায় আসবে দেখবে তখন সমাজতান্ত্রিকদের যাঁরা জেনেছেন সমাজতন্ত্রকে। আজকের এই মেকি কাগজ-বাঘেরা তাদের বাজার মত উবে যাবে, ধ্বংস হবে পুঁজিবাদী শকুনীর দল যারা সমাজের রক্ত শোষণে ভর্তি করছে নিজেদের উদর। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি তার মুখের উপর। ওঁর চোখ জলছে, নিরাশার যে মুখ দেখেছিলাম ক্ষণিক আগেও ক্লান্ত সে মুখে দেখছি দৃঢ় প্রত্যয়ের ছায়া। সে বলছে দুর্নীতিগ্রস্ত আর লোভা-তুর নেতৃত্বের মাঝখানে পড়ে আছে—আত্মপ্রত্যয়হীন জনসাধারণ।—এদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই প্রধান কাজ।

সরকার খাদ্যে রেশন করছেন শুধু শহরের লোকের জন্য আর শহরতলীতে যা দেয় তার নাম রাজভিক্ষা। এরা ফসল সংগ্রহ করেন মিল মালিকরা করেন সংগ্রহ করার আছে এদের এজেন্ট। নির্ধারিত মূল্যে অথচ সকলের সংগৃহীত এক নহে। ফলে সরকার নির্ধারিত খাদ্য সংগ্রহই করতে পারে না এবং লোক পিছু ন্যূনতম খাদ্য রেশনে পাওয়া যায়না। ফলে রেশনে যে পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাতে প্রত্যেকটি লোকের সপ্তাহ হয় না—তারপর চাউলের মূল্য চড়া, গম-এর মূল্য অত্যন্ত নিম্নমানের। রেশনে চিনি আছে তা পাবেন না এদের মর্জিমতে কিন্তু বাজারে যান পাবেন যত খুশী পকেট থেকে এ বাড়তি দামটা বিনা বাক্যব্যয়ে দিন। এর ফলে চড়া দাম দিয়ে চাউল আটা এনে মুখে নিম্নবিত্ত জন সেটা সে করে অনায়াসে প্রকৃতির নিয়মে। এরমধ্যে তার ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ নেই। খেতে দেব না খাওয়াবো কি দিয়ে। তারই ফলে বাইরে থেকে লুকিয়ে চাউল নিয়ে আসছে প্রতিদিন স্ত্রী পুরুষের দল। তাদের মধ্যে মেয়েরাই বেশী। এদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এবং বুঝেছি বাড়ুনায় ঘরের মেয়েরা যা শাস্ত মেয়েরা আজ কত দুর্মুখ হয়ে উঠেছে ঐ চাউলের চোরা কারবারে। এমনি করেই সরকার সৃষ্টি করেছেন একদল চোরা কারবারীর। গৌরবও যে তাদের সাঁঝে বাতি জ্বালাতো ঘরে ঘরে, পুত্র কন্যাদের পোষণ করতো মাতৃস্নেহে তাদেরই একটা বিরাট অংশ সব ছেড়ে দলবেঁধে লেগেছে চোরা কারবারে।

রেশন করতে হলে সমগ্র দেশের করা প্রয়োজন গ্রাম নগর সকলকে নিয়ে। দিতে হবে প্রয়োজন-ভিত্তিক খাদ্য তবে তো বন্ধ হবে ঐ চোরা কারবার। তা করতে হলে দেশের সমগ্র শস্য সংগ্রহের ভার নিতে হবে সরকারের। চাষীর প্রয়োজনভিত্তিক ভাণ্ডার রেখে জোতদারদের ঘর তুলে দিতে হবে, মজুত বন্ধ করতে হবে তবেই সার্থক হবে রেশন প্রবর্তন। কিছু অংশের জন্য রেশন অন্যত্র অবাধ ব্যবসা ইহা অবিবেচনাপ্রসূত নীতি। সরকার পারবেন কি করতে?

নয় তো রেশন উঠিয়ে দিয়ে সমগ্র দেশে খাদ্য চলাচলের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্বউচ্চ ও সর্ব নিম্নদর বেঁধে দিন মজুত করা বন্ধ করুন তা হলে সুস্থ প্রতিযোগিতার হাওয়ায় মূল্যমান স্থিতিশীল হতে বাধ্য হবে।

সরকারের বর্তমান নীতি লোক দেখানো কাজ। ইহাদ্বারা সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় না। বৎসরের পর বৎসর দেশের ছেলেরা ওয়াগান ভাঙছে। কাজটা অন্যায় দেশের সম্পত্তি চুরি হচ্ছে প্রতিদিন। কাজটা অনুচিত তবু এগুলি ঘটছে কর্মহীন যুবকরা এটা করছে অভাবের তাড়নায় কর্মের অভাবে। কিন্তু এরাই মূলপাণ্ডা এসব কর্মের ? ব্যব-সায়ীরা দাম চড়াবার জন্য ঘাটতি ঘটাবার জন্য দেশের মাল পাচার করেছে—এর নাম কি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা? সরকার এগুলি শক্ত হাতে বন্ধ করেন না কেন? এ কাজ বন্ধ করতে বর্তমান আইন পরিবর্তন করতে কোন অসুবিধা আছে কি? কেন এদের শাস্তি হয় না লোকে তা জানে। খবরের কাগজে ছাপা হয় অমুক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 'কিন্তু'

বিচারে কি সাজা হয়েছে সে কথা কেউ জানে না। এইতো বিচার এইতো শাসন। বিচার বিভাগও নিরপেক্ষ থাকতে পারছেনা এতে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের পরিধি সঙ্কুচিত হয়েছে, মানুষের অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে জাগ্রত হচ্ছে ঘৃণা। তার নীতিজ্ঞান লোপ হয়ে গেছে—মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়কারীদের ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রয়োজন। যুবমন থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে হবে—অথচ মজার কথা এদের উৎসাহ দিচ্ছেন তাঁদের স্বার্থের প্রয়োজনে জনস্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে। অথচ প্রয়োজন হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা—যুবকদের কর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা কিন্তু এর জন্য চাই দুর্নীতি দূর করা। কিন্তু এ কাজ ছিল কঠিন হয়েছে এখন কঠিনতর।

আজকে দেশের প্রধানশত্রু সামাজিক দুর্নীতি ও দারিদ্র্য। তার জন্য দায়ী সামাজিক ব্যবস্থা ও লোভী মানসিকতা। ক্ষমতা লোভে নেতৃত্ব হয়েছে বিপথগামী; আদর্শের দিয়েছে বলি, নীতিকে দিয়েছে বিসর্জন—ব্যক্তি বিশেষের বিবেকের নামে—ফলে নিঃস্বার্থতার বন্ধন হয়েছে শিথিল সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে। এর পরিণাম ভয়াবহ।

১৯৬৭ ইংরাজী থেকেই দেশের প্রশাসনিক স্থায়িত্বের ঘটেছে অভাব-নেতৃত্বের বিড়ম্বনা। এখন দেখা দিয়েছে আত্মকলহ নিজেদের মধ্যে একই আদর্শের দ্বন্দ্ব? না নীতি বা উদ্দেশ্যের বিরোধ? না ব্যক্তি প্রাধান্যের সংগ্রাম? বা লোভাতুর রাজনীতির ছেলেখেলা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুরাপুরি মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র বাদ প্রতিষ্ঠা করতে তখনকার নেতাদের সঙ্গত কারণেই কুণ্ঠা ছিল আর বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর ভরসা রাখাও সম্ভব নয়' এরই ফলে নেহেরু প্রভৃতি নেতারা Socialistic Pattern of Society প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন আর তিনি গ্রহণ করেছিলেন মিশ্র অর্থনীতিকে আমাদের বৈষয়িক ক্ষেত্রে। যদিও বা কেহ কেহ সেটাকে [illegible] করেছেন তবু সেটা ছিল লক্ষ্যের দিকে ভাল আগামী দিনের উন্নত সমাজ ইহা সাধনে [illegible] ভারতের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে তার বর্তমান অবস্থায় বিড়ম্বনা বাড়াবে মাত্র। দেশের মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজ কল্যাণ বোধ যাদের চিন্তায় গৌণ রাজনৈতিক মতবাদ স্বার্থ বোধে আচ্ছন্ন রাজনৈতিক হানাহানিতে প্রশাসন যেখানে দুর্বল আমলারা প্রবল ও দুর্নীতিগ্রস্থ সেখানে বিভ্রান্ত হচ্ছে দেশের জনসাধারণ।

মার্ক্সীয় দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ মুক্তিকে খর্ব করা হয়েছে এখানেই তাঁর মূল একটা অথচ সেখানে মানুষের বন্ধন মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ মুক্তির কথা স্বীকৃত হয়েছে শাসক সমাজতন্ত্রে, ব্যক্তি স্বাধীনতার অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র স্থাপিত হতে হবে। কিন্তু—

জনশিক্ষার বিস্তার না হলে গণতন্ত্র সার্থক হতে পারে না। অধিকার সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা না থাকলে স্বাধীকারের সংগ্রাম ফলপ্রসূ হতে পারে না তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তারের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্য্যে রূপায়ণ করার কাজ পুরাদমে আরম্ভ করা। শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দিতে হবে শিশুর খাদ্য ও বইপত্র বিনা মূল্যে স্কুলে, স্কুলে এবং সেখানেই জাগাতে হবে আত্মচেতনা গণচেতনা ও দেশাত্মবোধের মহামন্ত্রকে কিন্তু না হবে রাজনৈতিক নিরপেক্ষ।

আজকের দিনে যারা দেশ শাসন করছেন এঁরা গান্ধী মতবাদে মুখর কিন্তু গান্ধীজীর আদর্শকে এঁরা কর্মে-গ্রহণ করছেন না—এর কারণ নৈতিক চরিত্রের অবনমন। যে আত্মশক্তির অধিকারী হলে পর মানুষ সত্যাশ্রয়ী হতে পারে—ততটুকু শক্তি এঁদের নেই—নেই এঁদের সৎসাহস।

তাই কোন সমস্যাকে সমাধান না করে কেবল গোঁজামিলের খাড়া করে যাচ্ছেন ফলে একটা সার্বিক বিশৃঙ্খলতা সমাজমনকে গ্রাস করে বসে আছে। অর্থনীতির দিক থেকে দেশটা হয়েছে ছারখার। খাদ্যের ব্যাপারে দেশময় আজ হাহাকার। শান্তি নেই [illegible]

মাঝে তারুণ্যের উজ্জ্বলতা আজ নেই আছে এক বিভীষিকাময় উশৃঙ্খলতার উন্মাদ মানসিকতা। তারই মর্মান্তিক প্রতিফলন। বিদ্যালয়ে ছাত্র নামধারী যুবকেরা করছে অশালীন অসভ্য ব্যবহার, ওরাই যেন আজ হয়েছে কর্ণধার শিক্ষাজগতের অথচ পরিতাপের কথা রাষ্ট্র কর্ণধারেরা একাজের করে না নিয়মতান্ত্রিক কঠোর শাসন—তার পরিবর্তে করেন আবেদন অত্যাচারীর কাছে, এর পরিণাম ভয়াবহ। কেন এমন হয় কারণ ঐতিহ্যবোধ নেই, নেই দেশ প্রেম—সমাজসেবার ঠিকাদারী জোর করে পাওয়া গেছে, এই সমাজসেবীদের "গরিবী হঠাও" স্লোগানের মাঝে গরিব হটছে দারিদ্র্যতা আছে ঘিরে সর্ব্বদিক থেকে। আদর্শহীন নীতিহীন লোভী নেতৃত্বের কাছে কি আর প্রত্যাশা।

আমাদের সম্মুখের বাকীপথ অন্ধকারময়। এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে চাই নির্লোভ নির্ভীক বুদ্ধিমান নেতৃত্ব সৎ আমলাতন্ত্র স্বাধীন বিচার বিভাগ। আর জনসেবী পুলিশবাহিনী। আর চাই জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের উত্তোলন, তার জন্য চাই ন্যায়ের বিচার। আর মানুষের দারিদ্র্যতা মোচন।

খাদ্যের অভাবপূরণের জন্য সার্বিক কর্মপন্থা গ্রহণ। ফসলের সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থা, মূল্যমান স্থিতিশীল রাখবার কাছে সার্থক প্রচেষ্টা প্রয়োজন সকলের আগে। মজুতদারীদের কঠোর হাতে শাস্তি ও সামাজিক বর্জ্জনের ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারলে এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। খাদ্যে ঔষধে যারা ভেজাল করে এরা সমাজের শত্রু। কালো বাজারীদের কর ফাঁকিদারদের, ফটকাবাজদের হাত কঠোর হাতে ভাঙতে হবে আর যারা এদের সাহায্য করে এদের করতে হবে সমূলে উৎপাটন এই সমাজ-দেহ থেকে। কিন্তু যদি নির্ব্বাচনের ভোটের লোভে কেহ এদের গায়ে হাত না লাগায় তবে জনতার ক্রোধের আগুনে এরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, সে দিনগুলি হবে অতি ভয়ঙ্কর। মানুষ স্বাধীকারের কথা আজ জেনে গেছে এই অবস্থার উপর সকলের ঘৃণাবোধ প্রবল হয়ে উঠছে—বাকী শুধু বিপ্লবী চেতনার জাগরণ। —আমরা যদি আমাদের প্রতিশ্রুত সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার কাজকে গতিশীল না করতে পারি ঐ ফাঁকটুকুর মধ্যে আমরা যদি নির্লোভ চিত্তে আমাদের ঐ ব্রত উদ্যাপনের কাজে এগুতে না পারি তবে দুর্ব্বল অপক্ক অশক্ত হাতে পড়ে দেশে ঘটবে বিপ্লব—বিপ্লবের ক্ষেত্র আজ প্রস্তুত হয়ে তা ঘটছেনা শুধু নেতৃত্বের অভাবে। যদি ঘটে তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। কারণ একটি সুষম অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি, বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শনের পিছনে যদি জন-সমর্থন না থাকে—আজ যার একান্ত অভাব ঐ রাজনেতাদের তবে সে বিপ্লবের পরিণাম মঙ্গলকর হতে পারে না ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে।

নচিকেতার উপাখ্যান

(অনুবাদ)

ডাঃ অমল সরকার

একদিন পিতা নচিকেতাকে আদেশ করিলেন, পুত্র, আজ আমাদিগকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হইবে, তুমি কন্দ-মূল-ফল যাহা পাও শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস।

ইহা শুনিয়া নচিকেতা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এক ঘন জঙ্গলে যাইয়া প্রবেশ করিল। ঐ স্থানে সে হংস সারস সুশোভিত এক সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইল, এবং ঐ সরোবরে নির্মল জল, তাহাতে নানারকম পদ্মফুল ও তীরের বৃক্ষগুলিতে অমৃত সমান ফল দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। নচিকেতা উৎফুল্ল হইয়া তীরে আসিল এবং বিধিসম্মতভাবে স্নান সন্ধ্যাদি [illegible]রিয়া শিবের পূজা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইল।

এইভাবে একশত বৎসর নচিকেত ঐ স্থানে ইয়া ছিল। পরে যখন ধ্যানভঙ্গ হইল তখন কন্দ ল, ফল-মূল, কুশ-ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া পিতার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। নচিকেতাকে দেখিবামাত্র উদ্দালক াধে রক্তচক্ষু হইয়া পুত্রকে বলিলেন।

এতকাল ছিলি কোথা। তোর কারণ কত দুঃখ ল॥

মোর অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। সেও তোর কারণ বিফল ল॥

উদ্দালক আরও বলিলেন—লোক পুত্র অভিলাষ রে সুখের জন্য, নচেৎ অপুত্রক থাকাই বাঞ্ছনীয়, এখন তেই পিতামাতাকে কষ্ট দিতেছিস, জানি না ভবিষ্যতে আরও কত কষ্ট দিবি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মাদি দেবতা এবং পিতৃকুল সন্তুষ্ট হন। আমারা তোর কারণ ই যজ্ঞ সমাপনে অসমর্থ হইলাম।

পিতার কথা শুনিয়া নচিকেতা উত্তর দিল, পিতা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কেবল সংসার বন্ধনের জন্য, কিন্তু আমি জানাইয়াছি যে, যোগ-তপস্যার ন্যায় অন্য কোন ক্রিয়া মুক্তি আনিতে পারে না এবং এইজন্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তপস্যাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দালক বলিলেন, 'বেদ পঠন করিয়া অগ্নিহোত্র সমাধা করিলে কোটি বৎসর ধরিয়া স্বর্গধামে নানারূপ ভোগবিলাসে অতিবাহিত করা যায়। ইহা যোগাভ্যাস দ্বারা কি করিয়া সম্ভব।

নচিকেতা উত্তর দেয়, বেদ পঠনাতে অগ্নিহোত্র সমাপনে বারবার সংসারে আগমন করিতে হয়। যোগ সাধনে এই পার্থিব দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দ-রাজ্যে বিহার করা যায়।

তদনন্তর বৈশম্পায়ন মুনি রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন, পুত্রের বারবার এইরূপ উত্তরদানে উদ্দালক ঋষি ক্ষুব্ধ হইয়া পুত্রকে অভিশাপ দিলেন—তাহলে যাও এখনি তুমি যমলোকে প্রস্থান কর। তোমার এখানে অবস্থানে আমি প্রসন্ন নহি। নচিকেতা প্রথমে পিতার অভিশাপে ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, তারপর ধৈর্যসহকারে যোগবলের দ্বারা যমরাজ্যে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

এই অভিশাপের কথা শুনিয়া সকল মুনি 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। মাথায় জটা, সারা অঙ্গে ভস্ম, কদলীর বাহিরগাত্র সদৃশ কৌপীন পরিহিত ও মৃগচর্মে আচ্ছাদিত একটি ছোট বালককে যমরাজ্যে পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া মুনিগণ দুঃখ করিতে লাগিলেন।

এদিকে স্বামীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া নচিকেতার মাতা রোদন করিতে লাগিল। তখন উদ্দালক মোহবশে

ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'পুত্র! আমাদিগকে ভুলিয়া চলিয়া যাইতেছ? আমার ন্যায় কুটিল কঠোর নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আর কে আছে যে তোমাকে শাপ দিতে পারে! পুত্র, কিরূপে তুমি ঐ পুরীতে যাইবে যে স্থানে যম যমং রাজা এবং সেই মহা ভয়ঙ্কর বৈতরণী নদী বহিতেছে, পথে বহুদূর পর্যন্ত সেখানে এমন অগ্নি নিক্ষিপ্ত হয় যে সকল পাপী ভস্ম হইয়া যায়।

নচিকেতা উত্তর দিল, পিতা! আপনি বিন্দুমাত্র দুঃখ করিবেন না। আপনার শক্তিতে আমি যমরাজার সহিত দেখা করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। আপনার মত পিতার বাক্য সদাসর্বদা সত্য হইয়া আসিয়াছে, আমি কখনও তাহা মিথ্যা হইতে দিব না। সত্য বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্য প্রতিদিন আপন ইচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। স্বর্গেই সত্য বিদ্যমান, নচেৎ উহা ব্যতিরেকে নরক ভোগ করিতে হয়। এইজন্য যমপুরি আমি দেখিয়া আসিব। পিতা! আপনি ব্যাকুল হইবেন না। এই বলিয়া মাতার সহিত পিতা ও ঋষিদিগকে প্রণাম করিয়া নচিকেতা অন্তর্হিত হইয়া শিবের মন্ত্র জপিতে জপিতে ও ব্রহ্মার ধ্যান করিতে করিতে যমপুরীর দিকে চলিল। নচিকেতা যোগসিদ্ধ ছিল এবং এইজন্য কয়েক মুহূর্তের ভিতর যমের সভাতে আসিয়া উপস্থিত হইল যেখানে অত্রি-আদি বহু ঋষি আপনাপন পুস্তক খুলিয়া ন্যায় বিচার সম্বন্ধে বক্তব্য যমরাজাকে শুনাইতেছিলেন।

চৌপাজ

শিবের সদৃশ এই সুন্দর বালক। দেখিয়া লাগিছে সব মনেতে চমক॥

শিরেতে মুকুট জটা, অঙ্গেতে ভস্ম। দেখিয়া সবার মনে হইতেছে হর্ষ॥

মাথা নত করিয়া প্রণাম করিয়া করজোড়ে নচিকেতা ধর্মরাজকে স্তুতি করিতে লাগিল।

বৈবস্বত যম রাজা অন্যেরকে বলিলেন, পূর্ব প্রধান নচিকেতা মুনিকে, যাহার আগমনে সভার শোভা বাড়িয়া গেল, দেখিয়াই ধর্মরাজ আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সসম্মানে আপনার পার্শ্বে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া স্নেহপূর্বক কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন।

চৌপাজ

বালক বয়স মাত্র হইয়াছ সিদ্ধ। (বল) কেমনে করিলে ইহা সহজে লব্ধ॥

ধন্য তব পিতা তব জন্মদাতা। দর্শন দানে তুমি পাতকের ত্রাতা॥

কি কারণে বল তব হেথা আগমন। (কেন) বারবার মোরে করিছ স্মরণ॥

অশেষ সকল তব অমৃত কথা। বচনেতে যেন শুধু মধুরতা আনি॥

যমরাজার এই কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিল, দীন-দয়াল, আমার আপন ভুল আপনাকে কত বলিব। যখন কুমতি আসিয়া কাহাকেও আছন্ন করিয়া ফেলে, তখন সে জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। একে তো প্রথমে আদেশ অমান্য করিয়াছিলাম, তাহার উপর জ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় পিতাকে ক্রমাগত উত্তর দিতে লাগিলাম। এই অপরাধে পিতা ক্রোধে আমাকে অভিশাপ দিলেন যা, তুই এই মুহূর্তে যমপুরী চলিয়া যা, তুই আমাদের সহিত রহিবার অযোগ্য। তাই মহারাজ। পিতার বচনের সত্য রক্ষার্থে আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি; আপনি যেমন আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব।

ঈষৎ হাসিয়া যম উত্তর দিলেন, 'মহাপ্রভু! তোমার সমান মুনিকে আমি আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই, তোমার ন্যায় মুনি আর কে আছে যে এই বয়সেই এমন যোগবল লাভ করিয়াছে যে সংসারের সকল মায়া মোহ ত্যাগ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলিয়া যাইতে পারে। তোমাকে দেখিয়া আমি যারপরনাই প্রসন্ন হইয়াছি। এখানে তোমার মনে যে অভিলাষ আছে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বলিল, 'মহারাজ, এমনই যখন তোমার ইচ্ছা তখন চিত্রগুপ্তের সহিত আপনার সমস্ত পুরীর স্বর্গবাসীকে, যাহারা পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছে এবং সকল দূতগণকে, যাহারা নরক ভোগ করিতেছে,

দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। ইহাই আমার মনের বাসনা।

যমরাজ তৎক্ষণাৎ দূতকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ, এই ঋষি অত্যন্ত সত্যবাদী, পিতার অভিশাপে মর্ত্তলোক হইতে এখানে আসিয়াছেন। যাও ইহাকে লইয়া সমস্ত পুরী দর্শন করাইয়া লইয়া আইস যাহাতে ইনি আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারেন।

প্রভুর এই আদেশ শুনিয়া দূতগণ নচিকেতাকে চিত্রগুপ্তের নিকট লইয়া গেল এবং বলিল, ধর্মাবতার। যমরাজ আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। পিতার বচন পালনের জন্য এই মহাপুরুষ এস্থানে আসিয়াছেন। ইঁহার সমস্ত বক্তব্য আপনি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন।

দূতদিগের কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত নচিকেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,আপনার দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলুন, আপনার কি অভিলাষ, আমি তাহা পূর্ণ করিব।

নচিকেতা বলিল, 'ঈশ্বর তোমাকে অতি উত্তম সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল শাস্ত্র জানে, ধর্মাধর্মের বিচারে এবং আপন শক্তিতে তুমি যমরাজার সমকক্ষ। এবং প্রাণীদিগের কার্য্যাবলীর উপর তুমি যেরূপে অভিমত কর তাহাতে আমি তোমাকে আমার নমস্কার জানাইতেছি। পুণ্য ও পাপ হেতু এই নগরে সুখ ও দুঃখের যে যে স্থান আছে আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। কৃপাময় দয়া করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিলেন, এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর চিত্রগুপ্তের আজ্ঞা লইয়া দূতগণ নচিকেতাকে লইয়া স্বর্গ ও নরক যেখানে পুণ্য ও পাপের ফল দৃষ্ট হয়, দেখাইল। নচিকেতা ঐ স্থানগুলি দেখিয়া প্রসন্ন হইলে দূতগণ চিত্রগুপ্তকে জ্ঞাত করিয়া তাহাকে পুনরায় যমরাজ নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

মহাতেজস্বী ও শক্তিমান বুঝিতে পারিয়া নচিকেতা আসিতেই যমরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাকে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নচিকেতা ঋষি। এই নগরীর বিভিন্ন স্থান যেখানে আপন আপন কর্মের জন্য সকলে ফল ভোগ করিতেছে দেখিয়া আসিয়াছেন তো? বলুন এক্ষণে আপনার মনোকামনা পূর্ণ হইয়াছে তো?'

নচিকেতা বলিল, 'মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে সকল দেখিয়া আসিয়াছি। আমার মাতা-পিতা সম্ভবতঃ আমার জন্য শোকে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আজ্ঞা করুন এবার আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে যাই।

এই কথা শুনিয়া ধর্মরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই বর দিয়া ঐ স্থান হইতে বিদায় দিলেন যে আজ হইতে আপনি যোগবলে সকল দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবেন এবং মৃত্যুকে জয় করিয়া যুবকের রূপে সদা সর্বদা আনন্দে বিহার করিতে পারিবেন। এবং আপনার বংশে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করিবে না, যাহাকে আমার নিকট আসিতে হইবে।

এইরূপে যমরাজ হইতে বর পাইয়া নচিকেতা মুনি বেগে ঐস্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং কয়েক মুহূর্তেই ঐস্থানে পৌঁছিল যেস্থানে তাহার মাতা পিতা বিরহে মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌঁছিয়াই নচিকেতা দুজনকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তে সম্মুখে যাইয়া বসিলেন।

পত্নী সহিত পুত্রকে কুশল দেখিয়া উদ্দালক ঋষি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বারবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিলেন, 'নচিকেতা। আজ আমার জন্ম সার্থক হইয়াছে। জগতে আমার ন্যায় দুরাচারী পাপী আর কে আছে যে বিনা অপরাধে অভিশাপ দিয়া পুত্রকে বিবাদের মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে। পুত্র। তুমি সত্যই ধন্য, এই দেহ লইয়াই যমপুরী দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছ। তাতে কত বড় বড় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং এখনও আছেন, কিন্তু আমি বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে তাঁহাদের ভিতর কেহই তোমার গুণের দশাংশেরও অধিকারী নয়। এখন বল যমরাজার জগত ও নগরী কিরূপ দেখিলে? যমরাজাকে দেখিতে কিরূপ, কোন পথ দিয়া গিয়েছিলে যে এত শীঘ্র ঐস্থানে

যাইয়া ফিরিয়া আসিলে ? আহারই বা কিরূপে সমাধা করিলে ? কি ভাবে আলাপ আলোচনা করিলে ? এবং যাহা কিছু আশ্চর্য্য দেখিলে বা শুনিলে তাহা আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া সকল সন্দেহ দূর কর এবং তাহার পর যাহা করণীয় আমি তাহাই করিব।

নচিকেতা বলিল, 'পিতা' আপনার পুণ্য প্রভাবে বলীয়ান হইয়া আমি যমপুরীতে গিয়াছিলাম। দূত সহিত সকলের সংহার কর্তা যমরাজকে দেখিলাম এবং পুণ্য পাপ লিখনের কর্তা চিত্রগুপ্ত ও অন্যান্য অসংখ্য দেবতাকেও দর্শন করিলাম। অনেক স্তুতি করিবার পর যমরাজ অনেক বর দিলেন এবং এই নরদেহেই আমি ঐ পুরীর সব কিছু দেখিতে পাইব এবং জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া আমি সদা সবদা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, 'ইতিমধ্যে নচিকেতার ধর্মরাজের পুরী হইতে প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া ঋষিগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া আপনাপন আশ্রমের তপস্যা ত্যাগ করিয়া যমলোকের সমাচার শুনিবার জন্য ঐস্থানে আসিয়া একত্রিত হইলেন। কেহ মাথা নীচের দিকে করিয়া উপরে পা করিয়া দাঁড়াইলেন, কেহ এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কেহ দুইটিহাত বা একটি হাত উপরের দিকে উঠাইয়া দাঁড়াইলেন,কেহ মৌনব্রত লইয়া দাঁড়াইলেন, কেহ শুকনো পাতা খাইয়া রহিলেন, কেহ বিনা আহারে অবস্থান করিলেন, কেহ সংসারসাগর পার হইবার উদ্দেশ্যে তপস্যায় মগ্ন হইয়া দিগম্বর বেশ ধারণ করিলেন এবং কেহ কঠিনতম তপস্যায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়া যে স্থানে নচিকেতা আপন পিতার সমীপে বসিয়াছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঋষিদিগকে দেখিবামাত্র নচিকেতা ও তাহার পিতা সকলকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া এক একটি পৃথক আসনে উপবিষ্ট করাইলেন, অনন্তর পদ প্রক্ষালন করিয়া আচমন করাইয়া অগুরুচন্দন পুষ্প দিয়া সকলকে পূজা করিতে বলিলেন।

উচিত সময়ে ঋষিগণ বলিলেন, 'নচিকেতা' আমরা তোমার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি। আদর আপ্যায়ন তো করা হইল, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে যমলোকের বার্তা শ্রবণ করাও। ঐ লোক কিরূপ যেখানে ধর্মরাজ অবস্থান করেন ? যমদূতগণই বা কেমন ? ঐস্থানের আচার ব্যবহার, তপস্যা জ্ঞান কিরূপ, বৈতরনী নদীই বা দেখিতে কেমন ? এবং যে যাহা করে সে ঐস্থানে কিরূপ ফলভোগ করে ? কোন্ কোন্ কর্ম করিলে যমরাজা কুপিত হন ? কিরূপ দণ্ড প্রদান করা হয় ? চিত্রগুপ্তই বা কেমন তিনি জীবগণের ধর্ম ও অধর্মের আচরণ লিখিয়া ধর্মরাজকে বিহিত করেন। তাঁহার নিকট কোন মুনি ঋষিগণ অবস্থান করেন ? এই সকল কথা তুমি আমাদিগকে শ্রবণ করাও যাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে তোমার গুণগান করিতে পারি।

ঋষিগণের এইরূপ কথা শুনিয়া নচিকেতা মুনি তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'সাধুগণ আপনারা যাঁহারা এইস্থানে সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা সাবধান পূর্বক অবগত হউন। এই কাহিনী এতই আশ্চর্য্যজনক যে শুনিবামাত্র দেহ মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

ধর্মরাজের রাজ্যে নানা প্রকারের ব্যক্তি বাস করে এবং যমরাজ পুরীর চারটি দ্বার বৃক্ষরাজি শোভিত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে চারিশত ক্রোশ ব্যাপ্ত যাহার ভিতর বহু গন্ধর্ব ঋষি ও যোগী পরিবেষ্টিত হইয়া যমরাজ ধর্মের বিচার করিয়া থাকেন। ঐ রাজ্যে কোন্ দ্বার দিয়া কোন্ কোন্ প্রাণী প্রবেশ করে প্রথমে তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি।

দেবতাগণ, পিতৃপুরুষগণ, ভক্তগণ, ক্রোধ ও লোভকে যাঁহারা জয় করিয়াছেন, দান ও ধর্মে সমস্ত দিন যাঁহাদের মতি থাকে, জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ মাসে যাঁহারা পানীয় দানে জীবগণের পিপাসা নিবৃত্ত করেন, প্রচণ্ড শীত ঋতুতে যাঁহারা দুঃখী ও আর্তজনের লালন-পালন করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণ পূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করেন এবং ভোগ বিলাস করিয়া দিন অতিবাহিত করেন। হরি, হর ও দুর্গার ভক্তগণ, এবং যাঁহারা অতিথিগণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন, তীর্থগুলিতে অবগাহন করেন,

দ্বারাদিকে জয় করিয়া লন, গোজাতিকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেও কুন্ঠিত হন না এবং অনাহরণ নিমিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করেন এইরূপ মহাত্মাগণ উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া মনোবাঞ্ছিত সুখ লাভ করেন। ধর্মের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, যাঁহারা সদা সত্য কথা বলিয়া থাকেন, সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন, অপরের প্রতি হিংসা ও নিন্দার ভাব পোষণ করেন না, ভগবান বিষ্ণুর যাঁহারা ভক্ত, পরের দ্রব্যকে মৃত্তিকা জ্ঞান করেন, পরস্ত্রীকে মাতা-সদৃশ মনে করেন, এইরূপ মহাপুরুষগণ পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া বিমানে আরোহণ করিয়া যথেচ্ছো ভ্রমণ করিতে পারেন এবং আপনাপন রুচি অনুসারে আনন্দ বিহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিষ্ঠুর, পাপী, কুটিল কঠোর, ক্রুর, মমতাহীন যাঁহারা পুরাণ শাস্ত্র এবং দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের নিন্দা করে, গুরুকে মানে না, সদা সর্বদা মিথ্যা বলিয়া থাকে এইরূপ যত অধম ব্যক্তি আছে তাহারা ভীষণ ভয়াবহ দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে এবং দুঃখভোগের নিমিত্ত ধর্মরাজের আজ্ঞায় তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বিরাট দেহবিশিষ্ট যমদূতের মুগুরের প্রহারে কাহিল হইয়া পড়ে, ভীষণ অন্ধকার মহারৌরব নামক নরকে তাহাদের নিক্ষিপ্ত করা হয়. সেখানে চতুর্দিক পূতিগন্ধময়, কীটগণ কিলবিল করিয়া বেড়ায়, ব্যাঘ্র, সিংহ গণ্ডার, সারমেয়, বৃশ্চীক, সর্প, গৃধ্র, এবং বায়সাদি পক্ষীতে পরিপূর্ণ এবং পাপীদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া টানটানি করিতে আরম্ভ করে তদুপরি ঐ সময় তাহাদিগকে বৃশ্চিক দংশন করিতে আরম্ভ করে, সর্প দংশনোদ্যত হয়, লৌহসদৃশ চঞ্চু দ্বারা গৃধ্র ও বায়স ঠুকরাইতে আরম্ভ করে এবং এমত অবস্থায় তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকে না তাহারা 'মারা গেলাম' 'মারা গেলাম' বলিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতে থাকে, ধর্মরাজ ব্যতিরেকে তখন উহাদের বাঁচাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

অতএব যমপুরীর দক্ষিণ দ্বার অতীব ভয়ঙ্কর, এইস্থানেই যমদূতের কবলে পড়িয়া পাপীগণ মহানরকে পতিত হয় এবং নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। ইহা ব্যতিরেকে কুম্ভীপাক আদি সহস্র নরক আমি একের পর এক দেখিয়াছি যে সকল স্থানে বৃহদাকার কীটাদি ঘুরিয়া বেড়ায় এবং চতুর্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং মহাদুঃখদায়ক অসিপত্র এমন একটি বন যেখানে বৃক্ষরাজির পত্র খড়্গ সমান শানিত এবং তাহারই নিম্ন দিয়া অতি দুর্গন্ধ কটিপূর্ণ পাপী নদী বহিয়া যাইতেছে এবং পাপীদিগের বিচার নিমিত্ত ঐ নদীর কোথাও ২ বিরাট লৌহপাত্রে তৈল গরম হইতেছে।

উপরোক্ত কাহিনী বৈশম্পায়ন রাজা জন্মেজয়কে বলিতে লাগিলেন। এইভাবে নচিকেতা মুনি যমপুরী ও নরকের বর্ণনা দিয়া যে সব কর্ম করিলে নরক ভোগ করিতে হয় সেই সম্বন্ধে ঋষিদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। গোমাতা, ব্রাহ্মণ, মাতা, মিত্র, বালক, স্ত্রী, স্বামী, বৃদ্ধ, গুরুকে যাহারা হত্যা করে এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, মিথ্যা কার্য্যকলাপে যাহারা রাত্রিদিন আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়া রাখে, আপন ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া যাহারা অপর স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, অপরের দুঃখে আনন্দ অনুভব করে, এবং যাহারা ধর্মহীন পাপে লিপ্ত থাকে, পিতামাতার শুভবাক্য শ্রবণ করে না, সকলের সহিত শত্রুতা করে, এইরূপ পাপীগণ মহাভয়ঙ্কর দক্ষিণ দ্বার দিয়া নরকে যাইয়া পতিত হয়।

নচিকেতা বলিলেন যে যমরাজার আদেশে দূতগণ এইস্থান দিয়া পাপীগণকে লইয়া যায় এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে। এক্ষণে পাপ ও পুণ্যের যেভাবে বিচার হইতে আমি দেখিয়াছি তাহা বলিতেছি মন দিয়া শ্রবণ করুন।

যমরাজার সভায় সুন্দর আসনে আপনাপন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অত্রি, গৌতম, মৈত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র বেদব্যাস, জাহ্নু, কর্ণ, ভারদ্বাজ, দুর্বাসা, মারীচ, ভৃগু, নারদ, সনৎকুমার, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, মার্কণ্ড, হারিমিত্র, ও সুমিত্রাদি ঋষিগণ উৎকৃষ্ট

বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের সমান শোভা পাইতে থাকেন এবং নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া প্রধানদিগের ধর্মাধর্মের উপর ন্যায় বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে সুন্দর মুকুট পরিধান করিয়া নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রমাসদৃশ শোভিত মহাতেজস্বী ধর্মরাজ সর্বদা বিরাজ করেন।

এইস্থানে এক নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর যমদূতকে হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম যে পৃথিবী হইতে এক ব্যক্তিকে যমালয়ে লইয়া যাইয়া যমরাজার সম্মুখে লইয়া আসিল এবং সেই ব্যক্তি যে সকল পাপ করিয়াছে তাহা যমরাজাকে শুনাইতে বলিল।

ইতিমধ্যে সভার ভিতর যেসব ঋষি উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহারা শাস্ত্রাদি বিচার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ধর্মরাজ, এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছে, অতএব কুম্ভীপাকে সেস্থানের কষ্ট সহ্যাতীত উহাকে আপন দুষ্কর্মের জন্য ঐস্থানে নিক্ষেপ করা হউক এবং ঐস্থানে সে তার পাপের উচিত ফল অনেক দিন ভোগ করিতে পারিবে;

ইহা শুনিবামাত্র যমরাজার আদেশ পাইয়া কিঙ্করগণ ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিল এবং যষ্ঠী দ্বারা প্রহার করিতে ২ উহাকে টানিতে ২ সেই নরকে লইয়া গেল, যেস্থানে কেহ এক মুহূর্তের জন্যও কষ্ট ভোগ হইতে মুক্তি পায় না। সেই নরকে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহাকে সহস্র ২ স্থূলকায় কীট জড়াইয়া ধরিল এবং তাহার মাংস কাটিয়া ২ খাইতে লাগিল।

নচিকেতা ঋষিগণকে বলিলেন যে এইরূপে গোহত্যার পরিণামও আমি দেখিয়াছি এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, গর্ভপাতের অপরাধে অপরাধী, কামের বশবর্তী হইয়া এমন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভোগ করিয়াছে যাহার সহিত তাহাদের সম্ভোগ করা উচিত নহে, যাহা ভক্ষণ করা উচিত নহে তাহা লোভের বশবর্তী হইয়া ভক্ষণ করিয়াছে, এইরূপ অধম ব্যক্তিদিগকে ঐ সব কড়াইতে নিক্ষেপ করা হয় যাহাতে তৈল গরম হইতে থাকে, কখনও ২ ইহাদিগকে শূলেতেও বিদ্ধ করা হয়। এই সব ব্যক্তিকে দূতগণ রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া যমরাজার নিকট লইয়া যায়। ঐ স্থানে সূর্য-সম তেজোদ্দীপ্ত চিত্রগুপ্ত সকল প্রাণীর পুণ্য পাপ লিখিয়া লইতে থাকেন, ঋষিগণ শাস্ত্র-বিচারান্তে যাহা করণীয় তাহা দর্শাইয়া থাকেন এবং ইহাই হইল ধর্মরাজার সভার ইতিবৃত্তান্ত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যেসব কর্মের দ্বারা আমাদিগকে নরক ভোগ করিতে হয় তাহাও শুনাইতেছি।

যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি আদি দুষ্কর্মে রাতদিন লিপ্ত থাকে, এবং গুরুস্থানীয় কাহাকেও গ্রাহ্য করে না তাহাদিগকে যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে মহানরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে এবং যে দুষ্ট গুরুকে তর্ক করিয়া পরাস্ত করে, পিতা-মাতা-গুরুর সহিত ব্যর্থ কলহ করে, তাহাদের ঐ নরকে গমন করিতে হয় যেস্থানে ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে যাইতে হয়। এই নিমিত্ত মাতা-পিতা-গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র কুপিত হওয়া উচিত নহে যাহাতে ঐরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। যাহারা কাংস, তাম্র, পিত্তল চুরি করে, কন্যাসম্প্রদানের সময় বাধা প্রদান করে, মুনি ও ব্রহ্মচারীদিগের তপস্যা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে, গৃহে অথবা বনে অগ্নি সংযোগ করিয়া সহস্র ২ প্রাণীকে হত্যা করে তাহাদিগের সবাইকে 'অসিপত্র' বনে নির্বাসিত করিয়া লোহিত অগ্নিশিখার উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং এইরূপ অবস্থায় তাহারা পরিত্রাহী চিৎকার করিতে থাকে।

যাহারা বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সাধু, সন্তদিগকে ছলনা করে, যাহা করা উচিত নহে তাহা করে এবং যাহারা সুমিষ্ট ও সুস্বাদু বস্তু তৈয়ার করিয়া নিজেরাই তাহাদের সদ্ব্যবহার করে তাহাদিগকে বিষ্ঠা ও কীট পরিপূর্ণ বিষ কূপে পতিত হইতে হয়।

যে ব্যক্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পতিব্রতা স্ত্রীকে বহুদিন ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে তাহাদিগকে অসিপত্র বনে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাহারা নানাবিধ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে।

ইহা ব্যতীত আমি অন্য কয়েকটি নরক দেখিয়াছি যেস্থানে মহাভীষণ অগ্নি সদাসর্বদা প্রজ্বলিত হইতে থাকে। আপন কর্মের ফলস্বরূপ পাপীগণকে বারবার সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কাহাকেও শেকড়

দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় এবং মুগুরের প্রহারে তাহারা আর্তনাদ করিতে ২ যখনি পলায়ন করিতে উদ্যত হয় মায়ামমতাহীন যমদূতগণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলে এবং লৌহফলকের উপর আছড়াইতে আরম্ভ করে, কাহারও দুই পা ধরিয়া টানিতে ২ ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া উঠে, 'মূর্খ', অপরের সহিত কলহ করিবার সময় মনে ছিলনা, এক্ষণে কেন আর্তনাদ করিতেছ। আপন উপার্জিত দুঃখ এক্ষণে ভোগ কর এবং যাহারা এতদ্দৃশ কুকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে অগ্নি প্রজ্বলিত অষ্টধাতু-নির্মিত এক বৃহদাকার প্রতিমা সেইভাবে ধরিতে হয় যেভাবে তাহারা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করিয়াছিল। এতদোপরি তাহাদিগকে যষ্ঠী দ্বারা প্রহার করিতে ২ নিয়ে নিক্ষেপ করা হয়।

এইরূপ বহু নারীকে দেখিলাম যাহারা পরপুরুষের নিকট আপন সতীত্ব বিসর্জন দিয়াছে। সেই সব নারীকে পর্বত ও তালবৃক্ষের উপর হইতে নিক্ষেপ করা হয় যাহারা সন্তান নষ্ট করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

যাহারা অপরের আহার সংস্থানে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদিগকেও নরকে নিদারুণ কষ্টের ভিতর দিন ভোগ করিতে হয়। যে নারী স্বামীর নিন্দা করে এবং নিত্য কলহ করে তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। যে নারী পতির মৃত্যুর পর পরপুরুষের সহিত সহবাস করে যমদূতগণ তাহার জিহ্বা কাটিয়া লয় এবং অষ্টধাতু নির্মিত প্রজ্বলিত প্রতিমা চাপিয়া ধরিতে বাধ্য করে।

যাহারা পতিব্রতা স্ত্রীর নিন্দা করিয়া বেড়ায় তাহাদের সকলের নরকের নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং কোনও রূপে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই।

এইরূপে নানাভাবে নরকের বর্ণনা দিয়া নচিকেতা মুনি পুনরায় ঋষিদিগকে বলিলেন যে যমপুরীতে আরও একটি অদ্ভুত স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এইস্থানে একটি ভীষণাকার বৃক্ষ রহিয়াছে যাহা উচ্চতায় চার ক্রোশ এবং বেষ্টনে বিশ ক্রোশ এবং যাহা হইতে সর্বদা অগ্নি উদ্গীরণ হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র পাপীদিগকে ঐ বৃক্ষে টাঙাইয়া রাখা হয় যাহাদের হাহাকার শব্দে চতুর্দিক প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকে। তদুপরি নির্মম যমদূতগণ বজ্রসদৃশ অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে ২ বলে, 'হে অধর্মীগণ! তোমরা কদাচ তোমাদের পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণকে আনন্দ দান কর নাই, কখনও কোন তীর্থ পরিভ্রমণ কর নাই, কখনও কোন অতিথি-অভ্যাগতকে কিছু দান কর নাই, এবং মাতা-পিতা-ব্রাহ্মণ-গুরু যাঁহারা পৃথিবীতে দেবতাজ্ঞানে পূজিত হন তাঁহাদিগকে মুহূর্তের জন্যও সম্মান প্রদর্শন কর নাই এবং সেই নিমিত্ত এক্ষণে এই ফল ভোগ করিতেছ।

যমদূতগণ পাপীদিগকে মহাদুঃখদায়ক নরকগুলিতে পর্যটন করাইয়া লইয়া চলে। পাপীদিগের কেহ মহিষের উপর, কেহ বা গৃধ্রী বা সারসের উপর, কেহ বানর অথবা শৃগালের উপর চড়িয়া আগাইয়া চলে। কোথায় যাইতে হইবে, কিভাবে যাইতে হইবে তাহা এক মহাভীষণাকৃতি যমদূত বলিতে থাকে। এই দূতটির মুখ ব্যাঘ্র, সিংহ, সারসের ও বিড়ালের ন্যায়, ইহার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং হস্তে থাকে খট্টাঙ্গ, ত্রিশূল, বর্শা, যষ্ঠী ও মুষল।

সে স্থানে মনোপিত নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী যেমন দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ থাকে এবং রত্ন-খচিত এক অত্যাশ্চর্য্য ভূষণ ও পট্টবস্ত্র বস্ত্রের শোভা লাগিয়া থাকে, সে স্থানে কর্ণে কুণ্ডল এবং গলে মুক্তার-মালা পরিধান করিয়া সুন্দরী অপ্সরাগণ হস্তে বীণা আদি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে ২ নাচিতে ও গাহিতে থাকে ঐ স্থানে পুণ্যকর্ম সাধক ধর্মাত্মাব্যক্তিগণ ভোগ-বিলাস করিবার জন্য যাইয়া থাকেন যাঁহারা বিমানে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ান এবং যম-রাজার কৃপায় বহুদিন থাকিয়া সুখ ভোগ করিয়া থাকেন কারণ ইঁহারা পৃথিবীতে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে ভূমি, স্বর্ণ, গোমাতা ও বস্ত্র দানে আসনে উপবিষ্ট করাইয়া সুমধুর বচন দ্বারা এবং ফল-মূল প্রদান পূর্বক

সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, ইঁহারা ঋতুর সময় স্ত্রীর নিকট গমন করেন, প্রতিদিন ধর্ম পুণ্য করেন এবং কদাপি যমরাজার ভীষণ আকৃতি দেখিতে পান না।

যাঁহারা গৃহ নির্মাণ করিয়া বিধিমত স্বর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন তাঁহারা এমন এক স্থানে থাকিবার সুযোগ পান সেখানে চতুর্দিকে বহু আশ্চর্য্য ভোগ্যবস্তু সম্বলিত এক স্বর্ণমন্দির আছে যাহা বর্ণনাতীত। যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে এবং সকল প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কেহ শরণে আসিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ আশ্রয় প্রদান করে, তাহারা সুরপুরে অপ্সরাগণের সহিত অবস্থান করে। যাহারা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র অপরের সেবায় নিয়োজিত করে তাহারা এই স্থানে বিমানের উপর চড়িয়া যথাইচ্ছা তথা ভ্রমণ করিয়া নানারূপ আনন্দ ভোগ করিতে পারে।

চৌপাই

যে দেয় মুক্তা-মণি অথবা রতন।
মণিময় গেহে শুধু থাকে সেই জন॥
করিয়া আশ্রয় দান অথবা শীতল পান।
আনন্দ করে যে দান সেই জ্ঞানী জন॥
এইমত ইন্দ্রপুরী সহজে হয় যে লাভ।
মহাভোগ পাইবার হয় যে তাদের ভাগ॥
হস্তী উষ্ট্র অশ্বাদি করিলেক দান।
দয়াধর্ম অথবা শীলতার মানে॥
পরম স্থানেতে যে হয় তার গতি।
(যেথা) গন্ধর্বগণ শুধু গেয়ে উঠে মাতি॥
(তাই) পুণ্যতীর্থে মরণেরে করি আলিঙ্গন।
ভবের সাগরে কর আত্ম উন্মোচন॥

নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া বেদ-বিধি অনুসারে কুলিন পাত্রে যাঁহারা কন্যা দান করেন, তাঁহারা সমস্ত পৃথিবী দান করিবার ফল প্রাপ্ত হন এবং দেবতাগণ সমীপে সেই সব রমণীর সহিত বিলাস-ক্রীড়া করিতে পারেন যাহাদের সৌন্দর্য্যে কামদেব স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া উঠেন। কিন্তু যাহাদের দিন ধর্ম অথবা পুণ্য কর্ম ব্যতিরেকে অতিবাহিত হয় তাহারা লৌহ-ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস গ্রহণ করিয়া যায় কিন্তু মুহূর্তের জন্যও সুখলাভ করিতে পারে না।

নচিকেতা ঋষিদিগকে বলিতে লাগিলেন ধর্মরাজের সুরক্ষিত অন্য যে একটি রম্যস্থান আমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিল একণে তাহার সম্বন্ধে আপনাদিগকে বলিতেছি। এইস্থানে যমরাজার নিকট সাধু দূতগণ অবস্থান করে যাহারা পূর্বদ্বার দিয়া ধর্মাত্মাগণকে অমরাবতীতে পৌছাইয়া দেয়। যে ব্যক্তিগণ আশ্বিন ও কার্তিক মাসে অন্নদান করেন তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, ইঁহারাই শীতঋতুতে বস্ত্র দান করেন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতল পানীয় দান করেন এবং বসন্তকালে পুষ্প দান করেন। যাঁহারা দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন এবং ধন-ধান্যের দিন স্বর্ণ প্রদান করেন তাঁহারা যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র বিদ্যমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে অবস্থান করিবে। এইজন্য যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কর্মে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া রাখেন যাহাতে তাঁহারা সদাসর্বদা মহাসুখ লাভে সমর্থ হন। এবং যাঁহারা জলদান করিয়া থাকেন অথবা বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা হংস-চক্রবাক শোভিত বিমানে অথবা চিত্র-বিচিত্র অশ্ব-হস্তী ময়ূর ও সারস-পক্ষীর উপর আরোহণ করিয়া যমালয়ের পূর্বদ্বার হইতে আপন পুণ্য প্রতাপ বলে স্বর্গপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হন। এইসব ধর্মাত্মা যমরাজ রক্ষিত সারা অঙ্গে নানারূপ রত্নালঙ্কার ভূষিতা এবং গজমুক্তা আদি মণি-মাণিক্য শোভিতা মহাসুন্দরী দেবকন্যাদিগের সহিত বিলাস-ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সব সুন্দরীগণের চন্দ্রমাসদৃশ মুখমণ্ডল, কাঞ্চন সদৃশ দেহ, ইহাদের কাহারও রং স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কাহারও সিন্দুরের ন্যায় রক্তিমাভ, আবার কাহারও বা শ্যামল অঙ্গ, ইহারা কখনও নৃত্য করিতে ২, কখনও গাহিতে ২ আবার কখনও বাদ্য বাজাইতে ২ স্বর্গলোকের যেখানে ইচ্ছা সেইখানে সুন্দর বিমানে আরোহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দান ও পুণ্যের প্রভাবে সকল ব্যক্তি উত্তম গতিপ্রাপ্ত হয় এবং স্বর্ণদানে সূর্যলোকে ও বস্ত্রদানে চন্দ্রলোক গমন হয়ে। অন্নদানে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, এইজন্য সর্বদা অন্নদান করা উচিত যাহাতে ভবসংসারে বারবার জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং পরম আনন্দ প্রাপ্তি হয়।

নচিকেতা মুনি বলিলেন, এমনও ভীষণ মহানরক স্থান দেখিয়াছি যাহার কথা শুনিবামাত্র সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং সেই সব পুণ্যস্থানও আমি দর্শন করিয়াছি যেস্থানে ধর্মাত্মা ব্যক্তিগণ অবস্থান করেন। এই স্থানেই পুষ্পোদকা নামক সুখদায়িনী নদী বহিয়া গিয়াছে যাহার স্বর্ণ-সদৃশ বালুকারাশি দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায় এবং যাহার অমৃত সমান সুস্বাদু স্বচ্ছ জলে শঙ্খ-পদ্ম ভাসিয়া বেড়ায়। এই নদীর দুই তীরে পুষ্পশোভিত ঘন কল্পদ্রুমে আচ্ছাদিত। সর্বদা শীতল সুগন্ধ মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে, হংস, ময়ূর, কোয়েল ও কপোতাদি পক্ষী মধুর কূজন করিতেছে, ভ্রমর মত্ত হইয়া মধুরস পান করিয়া গুঞ্জরণ করিতেছে, চতুর্দিকে দেবকন্যাগণ গাহিয়া বেড়াইতেছে এবং গণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতিনিয়ত বিহার করিতেছে। এই নদীর তটে লোহিত, পীত, নীল, শ্বেত ও হরিৎ রং এর হ দীপ্তিমান রত্নের এমন সব খনি আমি দেখিয়াছি যাহাদের ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

এই মনোহর স্থানে ঐ ব্যক্তিগণ যাইয়া স্বর্ণ বালুতটে দেবতা নারীদিগের সহিত জলক্রীড়া করিয়া থাকেন যাঁহারা দেবতাগণকে পূজা ও পুণ্যতীর্থে অবগাহন করেন। ই নদীর তীরে চন্দ্র ও সূর্য সমান অনেক মণি, মুক্তা, হীরকখচিত সহস্র সহস্র মন্দির আমি দেখিয়াছি যেস্থানে পুণ্যবান ব্যক্তিগণ অতি সুখদায়ক রত্নখচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া ষোড়শী অপ্সরাদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াম। এই সব অপ্সরাদিগকে যমরাজ ঐস্থানে রাখিয়াছেন এবং তাহাদের মৃগ-নয়ন ও চন্দ্রবদন দেখিয়া কিছুতেই চোখ ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না।

নচিকেতা বলিলেন যাঁহারা দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে, সকল প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সকলের মঙ্গল চিন্তায় রাত্রদিন আপনাকে নিয়োজিত করিয়া রাখে তাহাদের বিলাসের নিমিত্ত ঈশ্বর ধর্মরাজের নগরীতে ত্রিলোক বিখ্যাত পুষ্পোদকা নামক নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ স্থানে কেহ ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয় না, কোন শোক বা সন্তাপের সঞ্চার হয় না, ভয় বা দুঃখের লেশমাত্র চিন্তা থাকে না। কোন চিন্তা মনকে পীড়ন করে না এবং সকলে নিত্য নূতন আনন্দের সহিত বিহার করিয়া থাকে।

যে পাপীগণ নিত্য সকলের সহিত কলহ করে এবং অপরকে কষ্ট দেয়, সে পরলোকে যাইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে এবং কৃতকর্মের জন্য বারবার মনঃস্তাপ করে। কখন কখন যমদূতগণ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলে, 'রে মূর্খগণ! তোমরা দুর্লভ মনুষ্য-দেহ ধারন করিয়াও কদাপি হরির নাম ধ্যান করনাই, সমস্ত জীবন পাপ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছ, ইহা কেন ভুলিয়া গিয়াছিলে যে এইরূপ কার্য্যে ক্ষণিকের সুখ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু পরিণাম স্বরূপ কোটি কোটি বৎসর নরক বাস করিতে হয়। এখানে ক্রন্দন চিৎকার সবই বৃথা, সময় থাকিতে যাহা করা উচিত ছিল তাহা কেন কর নাই এবং তারস্বরে বলিতে থাক—

সময় রহিল যবে কর নাই ভগবান ধ্যান।
এখন ক্রন্দন বৃথা দেহ যবে ছাড়িয়াছে প্রাণ।

এই তো গেল দূতগণের কথা। এখন যমরাজ স্বয়ং দূতগণকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাই বলিতেছি। যাহারা তুলসীমালা গলায় পরিধান করে, সুন্দর তিলক লেপন করিয়া থাকে, ভক্তিভরে শালগ্রাম পূজা করে সর্বদা রামনাম জপিয়া থাকে, পরস্ত্রীকে মাতা সদৃশ জ্ঞান করে, অপরের ধন মৃত্তিকা জ্ঞানে পরিত্যাগ করে সদা সত্য কথা বলিয়া থাকে, সকলের সহিত ন্যায় করিয়া চলে, ধর্মজীবন অতিবাহিত করে, পুণ্যতীর্থ পরিভ্রমণ করে, ক্রোধ, লোভ ও আহারকে জয় করে, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রকে মান্য করে, দুঃখেতে

আর্ত্তনাদ করে না, সম্পত্তি পাইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে না, এইসব ব্যক্তি ঈশ্বরের ভক্ত এবং দূর হইতে দূতগণ তাহাদিগকে প্রণাম করে।

যে পথ দিয়া যমরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয় সেই পথের পরিধি তিন লক্ষ চতুর্ব্বিংশ সহস্র ক্রোশ এবং ঐ পথে যাহা কিছু অদ্ভুত আমি দেখিয়াছি এখানে তাহাই বর্ণনা করিয়া শুনাইতেছি। এই পথের যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই মহাদুঃখদায়ক অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। কোথাও ভীষণ অন্ধকার এবং কোথাও বৃহদাকার কণ্টকাকীর্ণ পর্ব্বতাবলি দৃষ্টিগোচর হয় যাহাদিগের উপর আরোহণ করিতে নিদারুণ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। কোথাও লৌহ-শলাকা এবং সূচী-ফলক প্রোথিত রহিয়াছে এবং এই কারণে চতুর্দ্দিক আরও অন্ধকার। কিয়দ্দূরে কয়েক ক্রোশপর্য্যন্ত বালুকারাশি ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং বালুকাকণা নড়াইলেই বিপদ অনিবার্য্য। এই স্থানেই নিষ্ঠুর যমদূতগণ পাপীদিগকে রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া লৌহযষ্টি এবং অনান্য অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে করিতে প্রায় অজ্ঞান করিয়া ফেলে, পাপীগন কাতর মিনতি করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, কিন্তু পরিত্রাণ তারা পায় না। নচিকেতা মুণি ঋষিদিগকে বলিলেন, যাহারা ব্রাহ্মণ ও পশু পক্ষী বধ করে, গুরু বা প্রভুকে নিন্দা করে, বালক ও বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, অনাথ ও পথিকদের ধন হরণ করে, মহাপাপ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, বিষপ্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ হত্যা করে তাহারা প্রেতাত্মা হইয়া হাহাকার শব্দ করিয়া এইস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এক বিন্দু জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আরও অনেক পাপীজনকে দেখিয়াছি যাহাদিগকে দূতগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বারবার তিরস্কার করিয়া বলে যে এক্ষণে কি হইয়াছে আরও যে সব কষ্ট ভোগ করিতে হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হও। মনুষ্য-জন্ম পাইয়াও তোমরা কাহাকেও অন্নদান কর নাই যাহা পৃথিবীতে অতীব সহজলভ্য। তোমরা কি যমলোকের এই কঠিন পথের কথা শোন নাই যেখানে আসিলে প্রতিনিয়ত তিলে তিলে কষ্ট পাইতে হয়।

দুঃখহারা সুখদায়ী হরির করিলে না গুণ-গান। ২.
ক্রোধী লোভীর সঙ্গে থাকি, এবে কেন কাঁদছ আনচান॥
ত্যজিয়া আচার-বিধি মত্ত মদে ডুবিলে যে হায়।
নারী ভোগ করি এবে পরাণ যে রাখা হল দায়॥

কখনও তীর্থ ব্রত কর নাই, গ্রহণের সময় গোধন ভূমি, স্বর্ণ রৌপ্য আদি কিছুই দান কর নাই। এক্ষণে পুণ্য ধর্মাদি আচরন ব্যতিরেকে কি করিয়া ভয়াল সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার। বৈশম্পায়ন মুনি রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন।

এই সকল কথা যখন নচিকেতা মুনি বলিলেন তখন ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে যোগীরাজ, অতি দুঃখদায়ক যমলোকের পথে কি প্রকারে যাইতে হয় এবং কোন্ কোন্ কর্মের দ্বারা ঐস্থান হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এক্ষণে ইহাই বর্ণনা করুন যাহাতে আমাদের মন হইতে সকল সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং নিঃসন্দেহ হইয়া আপনার যশগান করিতে পারি।

অতঃপর নচিকেতা বলিলেন যে ভব-সাগরে যত জীব আছে তাহারা সকলেই মৃত্যুর আলিঙ্গনে স্ত্রী পরিবার অন্ন ধন ঐশ্বর্য্যাদির সহিত নশ্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রেতরূপে সঙ্গীহীন একেলা এই পথ দিয়া গমন করে। উহাদিগের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যাত্মা তাঁহারা আপন ধর্ম বলে অতি সহজেই এই ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া দেব-রূপ পাইয়া ধর্মরাজের নগরীতে ঋষিগণের সহিত পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

যাহারা পাপিষ্ঠ তাহারা বাঁধা পড়িয়া যায় এবং নানাপ্রকার দুঃখ সহ্য করে। এই পথে আমি বহু অতি ভয়ঙ্কর স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাদের ভিতর আটটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি কণ্টকাকীর্ণ বৃহদাকার বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং চারিশত যোজন ইহার ব্যাপ্তি, এই স্থানে দূর হইতে ক্রমাগত হাহাকার শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এবং মহাদুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াই ঐ স্থান হইতে পাপীগন বাহির হইতে পারে। দ্বিতীয়টির আয়তন অষ্ট সহস্র যোজন এবং রুক্ষ বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ এবং কেহই ইহাকে স্বইচ্ছায় পার

হইয়া যাইতে পারে না তৃতীয়টির ত্রিংশ চত্বারিংশ সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত চতুর্দিকে লৌহশলাকা প্রোথিত রহিয়াছে, পাপীগণকে এই লৌহশলাকাগুলির উপর শয্যা গ্রহণ করিতে হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ভীষণ কষ্টভোগ করিতে হয়।

চতুর্থ স্থানটিতে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দেখা যায়। বিষরূপ পরিবেষ্টিত এই স্থানটিকে তাহারাই অতি সহজে অতিক্রম করিয়া যায় যাহারা দেবতাগণের মন্দির নির্মাণ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমটি এক সহস্র দশ ক্রোশ পরিব্যাপ্ত, এই স্থানে ভীষণ অন্ধকার বন দৃষ্টিগোচর হয় যাহা কালরাত্রি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যাহারা দান করিয়া থাকেন তাহারা অতি সহজেই এই স্থান অতিক্রম করিয়া যায়।

ষষ্ঠটির নাম মহানিশা এবং এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ঘন অন্ধকারে ব্যাপ্ত এবং বৃহদাকার ব্যাঘ্র, গণ্ডার, সারমেয়, বৃশ্চিক, সাপ ও কঙ্কর প্রস্তরাদি সমাকীর্ণ, এই স্থান সর্বদা মেঘে আচ্ছাদিত থাকে, যাহারা পুণ্যাত্মা তাঁহারা মুহূর্তের ভিতর এই স্থান অতিক্রম করিয়া লন, এই পুণ্যাত্মাগণ প্রেতগণকে অন্ন, বিপ্রগণকে হস্তী, গোধন ও বস্ত্র দান করিয়া থাকেন এবং তীর্থভূমিতে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।

সপ্তম স্থানটি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং ভীষণ জলে পরিপূর্ণ, যাহারা ভূমি দান করেন তাঁহারা অনায়াসেই এই স্থান অতিক্রম করিয়া যান।

বিংশ সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত ভীষণ রৌদ্রে অষ্টম স্থানটি সর্বদা প্রজ্বলিত হইতে থাকে। যেসব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি নানারূপ দান করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন তাহারা ঐ স্থান চক্ষের পলকে অতিক্রম করিয়া লন। কিন্তু যাহারা পাপী তাহারা ইহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকে।

নচিকেতা ঋষিগণকে বলিতে থাকেন, 'এইরূপে পাপীগণ বিভিন্ন নরকের ভিতর দিয়া যখন চতুর্বিংশ সহস্র যোজন অতিক্রম করে তখন তাহারা যমরাজার দ্বারে লৌহ, সর্প কীটাদি পরিপূর্ণ চারিশত ক্রোশ পরিব্যাপ্ত ভীষণ ভয়াবহ নদীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ গোধন ও অন্ন দান করে, গঙ্গাসাগর প্রয়াগ আদি তীর্থে অবগাহন করে, সাধুদের সহিত সঙ্গতি করে, সর্বদা ধর্মকর্মে আপনাকে নিয়োজিত রাখে সে ব্যক্তি গোধনের পুচ্ছমাত্র অবলম্বন করিয়া এক মুহূর্তে ঐ নদী পার হইয়া নির্মল শরীর প্রাপ্ত হইয়া সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া পরমপদ লাভ করে।

এইভাবে পুণ্যাত্মাগণ সুখ এবং পাপীগন নানা দুঃখ ভোগ করিতে করিতে যমপুরীতে গমন করে। ইহার পর যমদূতগণ যে প্রাণীকে যেভাবে যমালয়ে লইয়া যাওয়া উচিত সেইভাবে ধর্মরাজের রাজ্যে লইয়া যায়। এবং এই প্রসঙ্গে আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

যাহারা পৃথিবীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, পট্টাম্বর বস্ত্র· দধি ঘৃত অন্ন ও পানীয় দান করিয়াছে তাহারা সে সকল সামগ্রী ঐ স্থানে প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত সর্বদা ধর্মকর্ম করা উচিত যাহাতে এই জগতে যশ ও পরলোকে সুখ প্রাপ্তি হয়। বিমানোপরি আরোহণ করিয়া ধর্মাত্মাগণ ঐ সুন্দর পথে যমালয়ে গমন করেন যেপথের দুই পার্শ্বে নির্মল জলপূর্ণ অনেক পুষ্করিণী আছে, নানাপ্রকার পত্র এবং আহারের নিমিত্ত সকল প্রকার সামগ্রী আছে। নচিকেতা ঋষিগণকে বলেন আরও এক অদ্ভুত বস্তু যাহা আমি দেখিয়াছি তাহা এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি। যমরাজার সভায় যেখানে মুনিগণের ভিতর ধর্মরাজ তারকামধ্যে চন্দ্রমা সদৃশ শোভা পান, তৎস্থানে আমার থাকাকালীন মহাতেজস্বী নারদ মুনি একদিন আসিয়া উপস্থিত হন। দূর হইতে নারদমুনিকে দেখিবামাত্র যমরাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন এবং আসনে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, 'দেবর্ষি, আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার আগমনে বুঝিতে পারিলাম যে ঈশ্বর আমাদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

যমরাজার কথায় মুনি কিয়ৎক্ষণ মৌণ থাকিয়া বলিলেন, ধর্ম অধর্মের বিচারের নিমিত্ত ভগবান তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এবং তিন ভুবনে যত দৈত্য, রাক্ষস,

মনুষ্য ও দেবতা আছে তাহারা সকলেই তোমার অনুগত। আমি দেখিতে আসিয়াছি কি প্রকারে তুমি পাপ ও পুণ্যের বিচার করিয়া থাকো।

নচিকেতা বলিলেন যে ঠিক এই সময়ে নানারূপ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল, অতি মনোহর সহস্র বিমান ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল যাহাদিগের ভিতর হইতে অতি উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, হস্তে ছত্র, চামর, বীণা বেণু লইয়া নানাপ্রকার গীত গাহিতে ২ একটি ২ করিয়া সুন্দরী বাহিরে আসিতে লাগিল এবং বহু অপ্সরা পরিবৃত হইয়া পুরোভাগে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র আসিয়া অবতরণ করিলেন। দূর হইতে হস্তী অশ্ব ও রথের প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকল পাপিষ্ঠ নরক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

এই সংবাদ শুনিয়া যমরাজ ঋষিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ পলাইয়া গেলেন। দূতসকল ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। যখন বিমান ঐ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন ঋষিগণের সহিত যমরাজ পুনরায় সভায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া নারদমুনি যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি শক্তিতে বিষ্ণুর সমকক্ষ এবং সমস্ত দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস তোমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে! কিন্তু ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে কিসের ভয়ে ভীত হইয়া তুমি এস্থানে হইতে পলাইয়া গেলে?

নারদের কথা শুনিয়া যমরাজ উত্তর দিলেন দেবর্ষি। বিষয়টি খুবই গোপনীয় তথাপি আমি আপনাকে বলিতে দ্বিধা করিতেছি না।'

নারদ মুনি ও ধর্ম্মরাজের ভিতর যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল তখন দূত সভামধ্যে আসিয়া করজোড়ে ধর্ম্মরাজকে বলিল, ধর্ম্মাবতার! এক্ষণে আমাদের কি কাজ করতে হইবে আদেশ করুন।'

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দয়া ধর্ম ত্যাগ করিয়া যেসকল অধম ব্যক্তি পাপে নিমজ্জিত আছে তাহাদিগকে সমুচিত দুঃখ দিয়া সঙ্কটের মধ্যে ফেলিয়া দাও।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া দূতগণ মহাক্রোধে খট্টাঙ্গ বর্শা, মুগুর, যষ্ঠী আদি নানা অস্ত্রের দ্বারা যে স্থানে যত পাপী অবস্থান করিতেছিল তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, এবং টানিতে টানিতে দুঃখ-দায়ক ভীষণ দন্তরাজি শোভিত ব্যাঘ্র, সিংহ, গণ্ডার, সারমেয় প্রভৃতি পশুর সম্মুখে লইয়া গেল এবং বৃশ্চিক কীটাদি ও রক্তশোষক ভ্রমর পরিপূর্ণ বৈতরণী নদীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এই ভাবে যে ব্যক্তি গোধন, ব্রাহ্মণ মাতা পিতা ও গুরুকে হত্যা করিয়াছে বা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, প্রভু ও বন্ধুদিগের সহিত বিরোধ করিয়াছে, বাহিরে সুবেশ পরিধান করিয়া জঘন্য কর্মে প্রতিনিয়ত লিপ্ত রহিয়াছে, পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সকলের সহিত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে দূতগণ বৈতরণীতে, যেস্থানে এক মুহূর্তের জন্যও কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না, বহুদিনের জন্য নির্বাসন দেয়।

নচিকেতা বলিতে থাকে যে এইরূপ আদেশ করিয়া যমরাজ যখন থামিলেন তখন নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কারণে তুমি এইস্থান হইতে পালাইয়া গিয়াছিলে তাহা তো বলিলে না?'

ধর্ম্মরাজ বলিলেন, পুরাকালে ত্রেতাযুগে এক মহা-তপস্বী রাজা ছিলেন যাহার নাম ছিল জনক। তিনি যোগ-তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন, সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, ক্রোধ লোভাদি ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন, মালি যেমন পুষ্পোদ্যান রক্ষা করিয়া থাকে তেমনি তিনি প্রজাদিগের লালন পালন করিতেন, যাহাকে ভগবান স্বইচ্ছায় আপন গুন বলিয়া দিতেন যাহার রাজ্যে বৃক্ষে অমৃত সমান ফল ফলিত, গোমাতা প্রচুর দুগ্ধ দিত, বহুদিন পর্য্যন্ত সকলে জীবিত থাকিত, কখনও কাহারও কোনরোগ হইত না, তাঁহার মহাপতিব্রতা তপস্বিনী

সর্বগুণসম্পন্না সত্যবতী নাম্নী স্ত্রী, যাহাকে ইন্দ্রাদি দেবতা আনিবার জন্য গিয়াছিলেন, অপ্সরাদিগের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া অমরাবতী প্রয়াণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই আমি এস্থান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম, কারণ যাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন এবং গুরু ও গোবিন্দকে ভক্তি করিয়া থাকেন, অতিথি অভ্যাগতকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে দণ্ড দিবার অধিকার আমার নাই। তাঁহাদের তেজে আমি ভীত হইয়া পড়ি। ইহাই আমার পলাইবার কারণ ছিল।

বৈশম্পায়ন মুনি রাজা জন্মেজয়কে বলিলেন যে চিত্রগুপ্তের নির্দেশমত যমলোক পরিদর্শনের এই সমাচার যখন নচিকেতা ঋষিগণকে শুনালেন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে বারবার প্রনাম ও স্তুতি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরলোকে সুখ প্রাপ্তির আশায় আরোও গভীর ভাবে জপ, পূজা ও ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি শ্রীনচিকেতোপাখ্যান সমাপ্ত।

কবিগুরু

অবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহা জাতির জাগরণে
যাহার বিজয় নিশান উড়ে—
মহামানব সাগর তীরে
ডাক দিল যে বিশ্ব জুড়ে—
ভারতের সুপ্রভাতে
যাহার উদয় পুণ্য পুরে—
তাহার বয়স বছর মাপে
মাপ করা কি যায়?
কক্ষ পথে আবর্তনে
ধরার বয়স সবাই মানে—
সেই নিয়মে রবি প্রকাশ
হিসাব নাহি হয়।
গুরুদেব, তুমি সাধক—
তোমার সীমায়, অসীম আসে বার্ত্তা জানায়—
খেয়ার মাঝির সোনার তরী
গান গেয়ে যায় আনন্দোর—
গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য গান
পূজা অর্ঘ লয়ে—
প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে
জীবন তরী বেয়ে—

গুরুদেব, তুমি কবি—চির নবীন
তোমার রং-এ বিশ্ব রঙীন
তোমার কথায় দেশের ভাষা
তোমার জয়ে দেশের আশা
মৃত্যুহীন জীবন তোমার
জাতির ভবিষ্যতে
বিশ্বমানব ধন্য আজি
তোমার আশীর্বাদে।

(৮ পাতার পর)

অনুশীলন কার্য্যে সক্ষম ছিলেন। একান্ত নিজস্ব বিষয় পদার্থ বিজ্ঞান হইলেও তিনি রসায়নে বিশেষ সক্ষমতার সহিত নানান কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। হিলিয়াম গ্যাস যে আজ আমাদের ক্রয় করিতে হয় না ও আমাদের নিজেদের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি হইতেই আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি তাহার মূলে আছে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নানান অনুসন্ধান বিশ্লেষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষার কার্য্য। হিলিয়াম গ্যাস বর্ত্তমানকালে অনন্ত শূন্যে প্রয়াণ ও পরমানবিক শক্তি ব্যবহারের কার্য্যে বিশেষ করিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কার্য্য এই ক্ষেত্রে সবিশেষ ফলপ্রসু হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে দুইটি পূর্ব্বে অজানা বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যার ফলে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পরিবর্ত্তিত রূপ ধারন করিয়াছে। এই দুইটির একটি হইল কোয়ানটাম থিওরী ও অপরটি হইল থিওরী অফ রেলেটিভিটি। ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্য যে উভয় বিষয়েই আইনষ্টাইন ও বসুর বিশেষ অবদান আছে। ইঁহারা উভয়েই প্রাচীন চিন্তাধারার পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পথে বিজ্ঞানকে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পদার্থ বিজ্ঞানে সকল পদার্থের বিশ্লেষণের ফলে শেষ অবধি হয় ক্ষুদ্রতার চরমে পৌঁছিয়া সকল কিছুই ঢেউয়ে পরিণত হয়, নয়ত পরমানবিক ক্ষুদ্রতম খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অতি ক্ষুদ্র টুকরার রূপ ধারণ করে। ঢেউ ও পারমানবিক বস্তু-খণ্ড লইয়া বিচার করিলে অনেক কিছু নানান দৈর্ঘ্যের ঢেউরূপে বর্ণিত হয়, আর নয়ত হয় অনু, পরমানু প্রভৃতি নামধারী বস্তু খণ্ডের রূপ ধারণ করিয়া। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্ল্যাঙ্ক আলোকের ঢেউএর গতি আলোচনা করিবার সম্পর্কে কোয়ানটাম থিওরীর গোড়া পত্তন করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন বলেন যে আলোকের ঢেউও অতিক্ষুদ্র বস্তুখণ্ড দিয়া গঠিত। এই ধারণা অবলম্বন করিয়া চলিলে বস্তুর চরম বিভাগজাত পরিণতিতে আর কোনও বিভিন্নত্ব থাকেনা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্ল্যাঙ্কের সিদ্ধান্তকে নূতন আকার দান করিলেন, ও তাহা লইয়া পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে প্রমাণ উপস্থিত করিলেন। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পাত্রে যথেচ্ছা সংখ্যক বস্তু পরমানু রাখা যাইতে পরে বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্থির করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইতালীয় পদার্থ বৈজ্ঞানিক ফেরমি বলেন যে ক্ষুদ্রতম পাত্রে হয় একটি বস্তুকণা মাত্র থাকিতে পারে, নয়ত কোনও পরমানুর তাহাতে স্থান হইতে পারে না। পরিসংখ্যানক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণিত পরমাণু-গুলিকে বোসন বলা হয় এবং ফেরমির সিদ্ধান্ত অনুগত পরমাণুগুলিকে বলা হয় ফেরমিয়ন।

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বহুগুণের আধার ছিলেন। তিনি বড় ওস্তাদদিগের মতই এসরাজ বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার শিল্পকলা ও সাহিত্যজ্ঞান ছিল সুবিস্তৃত এবং সাহিত্যকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অনেকসময়ই বহু পেশাদার সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিত। মানুষের প্রতি সখ্যভাবও তাঁহার ছিলই এবং দুর্দ্দশাগ্রস্থ নরনারীর দুঃখে তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই উদ্বেলিত হইতে দেখা যাইত; কিন্তু পশু পক্ষীর প্রতিও তাঁহার একটা অকৃত্রিম ভালবাসা উচ্ছ্বলিত ছন্দে প্রায়ই ধ্বনিত হইত। তিনি যে অসাধারণ মানবতার অধিকারী ছিলেন তাহা আরও দেখা যায় তাঁহার বিনয়, আত্মদোষস্বীকার প্রবৃত্তি, সকল শ্রেণীর ও বয়সের মানুষের সহিত বন্ধুত্বের আগ্রহ ও অপরাপর গুণের ভিতর দিয়া। তিনি যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানান আবিষ্কারের জন্য, প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা হইলেও তিনি হৃদয়ের সকলআবেগের দিক দিয়া ছিলেন প্রাচীন কালের ঋষিদিগের মত। তাঁহার হৃদয় মন সিঞ্চিত করিয়া বহুরসের ধারাই নিরন্তর বহমান থাকিত এবং তিনি নিজের মানবতার উচ্চশিখরে দৃঢভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই বিজ্ঞানের কঠিন সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মানুষ যেখানে মানুষ বলিয়া গণ্য নহে

পৃথিবীতে এখনও বহু স্থলে মানুষকে মানুষ বলিয়া বিচার করা হয় না। যথা দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণ মানবদিগকে পৃথক হইয়া বাস করিতে হয় যাহাতে তাহারা শ্বেতকায়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করিতে পারে। এই পার্থক্য নীতি বা "আপার্টাইড" মনুষ্য জগতে একটা অতি জঘন্য ব্যবস্থা এবং ইহার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় বর্ণবিদ্বেষ দোষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগ অনেক দেশের লোককেই বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন না। রোডিশিয়াতে শ্বেতকায় দিগের ঐ দোষ প্রবল ভাবেই আছে এবং তাহাদের ন্যায় ও নীতিবান জাতি সংঘে সাদরে পাশে বসাইতে কেহ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। আমেরিকায় যে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগকে নানাভাবে অপমান করা হয় এবং নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য নীতি বিরুদ্ধ রূপে একটা নিম্নস্তরে ঠেলিয়া রাখা হয় সে কথাও সর্ব্বজনবোদিত। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অন্যায় বিবেচিত হয় কিন্তু ইহার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোনও জগতসভা স্থলে অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না ইহার কারণ আমেরিকার মুক্তহস্তে দানের ব্যবস্থা। আমেরিকার অর্থে বহু দুস্থ মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিতেও আমেরিকার দান বিশেষ করিয়া মানবহিতের জন্য লাগিয়া থাকে, ও এই সকল কারণে পৃথিবীর মানুষ আমেরিকার নিগ্রো বিদ্বেষ লইয়া তত্টা আমেরিকা বিরুদ্ধতা করে না। জাতি ধর্ম লইয়া নানাপ্রকার অন্যায় অবিচার ভারতবর্ষেও আছে। ইহা পূর্ব্বে আরও প্রবল ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে তেমন জোরাল আর থাকিতেছে না ও বর্ত্তমানে ইহার সংবিধানবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ছোয়াচুঁয়ি জাতিভেদ অবরোধপ্রথা বাল্যবিবাহ প্রভৃতি মানবতাবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার ভারতবর্ষে এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই সকল প্রথার উচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক হইলেও তাহা লইয়া কেহ কিছু করিতেছেন বলিয়া জানা যায় না। আরও কিছুকিছু জাতিগত শত্রুতার কথাও এই পত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা চিনাদিগের রুশ বিরুদ্ধতা ও রুশীয়দিগের চীন সম্বন্ধে বন্ধুত্বের অভাব। ভারত ও চীনের সম্বন্ধও পরস্পরবিরোধী আরব ও ইসরায়েল, পাকিস্তান ও ভারত আফঘানিস্থান ও পাকিস্থান ইত্যাদি আরও অনেক গভীর ও দুরারোগ্য জাতি ও রাষ্ট্রগত বৈরিতার কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। কারণ ঐ সকল শত্রুতা হইতে যে কোনও সময় একটা বিরাট ও বিশ্ব ব্যাপী মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে যদি পারমানবিক সংঘাত লাগিয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্য জাতির বিনাশ হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

"চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা"

প্রবাসীর একজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা বর্ত্তমান বৎসরে চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা নামে একটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষনা করিতেছি। এই প্রতিযোগিতাতে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গল্প ঃ

প্রথম পুরস্কার	১৫০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৫০ ,,

প্রবন্ধ ঃ

প্রথম পুরস্কার	১২৫ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৪০ ,,

কবিতা ঃ

প্রথম পুরস্কার	১০০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	৭৫ ,,
তৃতীয় ,,	৫০ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি. প্রতিটি)	২৫ ,,

পুরস্কার দিবার জন্য প্রবাসী সম্পাদকের অভিমতই সকল সময় গ্রাহ্য হইবে। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইবার সময় এখন হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিল। পৌষের প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইবে। লেখকদিগকে নিজ নিজ লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে বাম কোণে "চারুশীলা দেবী প্রতিযোগীতা" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। লেখকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। অমনোনিত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

—প্রবাসী সম্পাদক

কংগ্রেস-স্মৃতি

দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭।

গিরিজামোহন সান্যাল

কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ২টায়। দ্বিপ্রহর ১২টা থেকেই প্রতিনিধি দর্শকগণ "তিলক মণ্ডপে" (প্যাণ্ডেলে) প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিলক মণ্ডপ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এবার প্যাণ্ডেলটি অতি বৃহৎ এবং তা অতি সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে সর্বত্র—ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছিল এবং তার মধ্যস্থিত পিলারগুলি ত্রিবর্ণ খদ্দর দ্বারা মণ্ডিত করা হয়েছিল। চতুর্দিকে রঙীন ফেষ্টুন টাঙানো হয়েছিল এবং অধিকাংশ পিলারের গায়ে প্রসিদ্ধ নেতাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের প্রধান পথ দিয়ে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতেই দেখা গেল—"আমরা কি ছেলে মানুষ যে আমাদের :—পরীক্ষা দিতে হবে," "আমরা পতাকা অবনমিত করব না," "ভারতবর্ষ প্রত্যেকেই তার কর্তব্য পালন করবে আশা করে" "আমরা এক সঙ্গে উঠব অথবা ডুববো" প্রভৃতি মটো-লিখিত প্ল্যাকার্ড টাঙানো রয়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ে সভাপতি ডাঃ এম্ এ আনসারী মশায় সদলবলে তিলক মণ্ডপের গেটের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ অভ্যর্থনা করলেন, ডাঃ আনসারী গেটের সম্মুখে পৌঁছেই প্রথমে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করলেন।

গেটের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে "সাইমন্ কমিশন বয়কট কর," এবং "হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ভারতের সন্তান" মটো দেখা যাচ্ছিল।

তিলক মণ্ডপের প্রধান গেট থেকে সভাপতি মশায়কে শোভাযাত্রা সহকারে ডায়াসে নিয়ে যাওয়া হল। গেট থেকে ডায়াস পর্যন্ত পথের দুধারে দণ্ডায়মান হয়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের বেষ্টন দ্বারা একটি আচ তৈরি করেছিল। তার নীচু দিয়ে শোভাযাত্রা ডায়াসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল একদল স্বেচ্ছাসেবিকা এবং তাদের পশ্চাতে একদল স্বেচ্ছাসেবক তারপর সভাপতি মশায়ের অগ্রে নেতৃবর্গ যুগলে ২ যথা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সাওকত আলী ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সভাপতি মশায়ের পশ্চাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ ছিলেন।

শোভাযাত্রা সুসজ্জিত ডায়াসে উপস্থিত হলে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মশায় ডায়াসের উপর একটি সমুজ্জল চন্দ্রাতপের তলায় সভাপতি মশায়কে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসনের নিকট নিয়ে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর তাঁর নিকটে আসন গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট নেতাগণ এবং সভাপতি মশায় কর্তৃক আমন্ত্রিত গণ্যমান্য দর্শকগণ। উভয় পার্শ্বে উপবেশন করলেন অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ। ডায়াসের "ভারত মাতার" একটি বৃহৎ মূর্তি অঙ্কিত করে রাখা হয়েছিল, তাতে চরকা ও বন্দেমাতরম্ শোভা পাচ্ছিল, ডায়াসের ৫০ গজ নীচে একটি বক্তৃতামঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং উক্ত মঞ্চের নীচে মহাত্মা গান্ধীর একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল।

মাদ্রাজের জাষ্টিস পার্টীর বিশিষ্ট নেতারা, যারা—ডায়াসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পানাগলের রাজা, দেওয়ান বাহাদুর গোবিন্দ রাঘবাচারিয়া, আরিকলম্ চেট্টি, স্যার কে. ভি. রেড্ডি, রাম

স্বামী মুদালেয়ার (পরবর্তী কালে স্যার উপাধিভূষিত) এবং মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী রাঘবেন্দ্র রাও (ভূতপূর্ব বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী এবং পরবর্তীকালে গভর্ণর)।

ডায়াসের উপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—আলী ভ্রাতৃদ্বয়; মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডঃ অ্যানি বেশান্ত, মেজর গ্রেহাম পোল, সি. প্র্যাট, পার্সেল, হর্ডি জোনস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, সি. ভি. এস্. নরসিংহ রাও, ডাঃ বরদারাজলম্ নাইডু, আর. কে. সম্মুখম্ চেট্টি, ডঃ ইউ. রমারাও, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এস্. সত্যমূর্তি, আর. ভেঙ্কটম্ নাইডু, ইয়াকুব হোসেন, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গঙ্গাধর রাও দেশ-পাণ্ডে, ডাঃ সত্যপাল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডাঃ মুঞ্জে, বল্লভভাই প্যাটেল, তুলসীচরণ গোস্বামী, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, মাননীয় কুমারাস্বামী, অরুণস্বামী মুদালেয়ার মাদ্রাজের মন্ত্রী রামানাথ মুদালেয়ার, জি. এ. নটেশন্, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে বাংলার লীগ গভর্ণমেন্টের অন্যতম মন্ত্রী), ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতি বিভাগের মিন্টো প্রফেসর) প্রভৃতি।

সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায়কে পুষ্পমাল্যে শোভিত করে তাঁর বক্ষে সভাপতির ব্যাজ পরিয়ে দিলেন। তারপর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমে একদল বালক বালিকা তামিল নাড়ুর প্রসিদ্ধ কবি ভারতীর একটি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত গাইল, তারপর একদল স্বেচ্ছাসেবিকা একটি অভ্যর্থনাসূচক সঙ্গীত দ্বারা সকলকে অভ্যর্থনা করল।

সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুরঙ্গ মুদালেয়ার তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি প্রতিনিধি ও দর্শকদের সাদরে অভ্যর্থনা করে অন্যান্য কথার পর তাঁদের সংবিধান সম্বন্ধে মত প্রকাশ করলেন যে তাঁর মতে কেন্দ্রীভূত শাসনের ভিত্তিতে সংবিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ভাষণ শেষ করে তিনি সভাপতি মশায়কে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করলেন।

সভাপতি মশায় অভিভাষণ পাঠের জন্য বক্তৃতার মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমবেত জনতা প্রবল জয়-ধ্বনি দ্বারা তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাল।

সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণে মামুলি ধন্যবাদ দিলেন। তারপর অন্যান্য কথার পর বললেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে, সম্ভব হলে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এবং প্রয়োজন হলে সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বয়ং শাসিত স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র আত্ম নিয়ন্ত্রণ, নিজেদের সংগঠন এবং অন্যের বিনা সাহায্যে আন্দোলন চালিয়ে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া যায়। এটা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের এবং কংগ্রেসের ভিতর ঐক্য স্থাপিত না হয়।

তারপর তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন সময়ের কর্মসূচী আলোচনা করে মন্তব্য করলেন যে কংগ্রেস ৩৫ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার নীতি পালন করেছে, দেড় বৎসর অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেছে এবং ৪ বৎসর কাউন্সিলে প্রবেশ করে বাধাদানের নীতি এবং সাংবিধানিক অচলাবস্থার সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, দেখা গেল সহযোগিতা দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় নি। কাউন্সিলের ভিতর বাধাদানও ফলপ্রদ হয় নি। অসহযোগ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নি তার কারণ অসহযোগিতার নীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নয়—দেশবাসীর দুর্বলতা। অসহযোগ আমাদের পরাজয় ঘটায় নি। আমরাই অসহযোগের পরাজয় ঘটিয়েছি।

তারপর তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উল্লেখ করে সম্প্রদায়ের নিকট সহনশীলতার জন্য আবেদন জানালেন এবং বোম্বাই ও কলিকাতায় ঐক্য সম্মিলনের সাম্প্রতিক

অধিবেশন সমর্থণ করে বললেন যে এখন কংগ্রেসের কাজ হচ্ছে ঐক্য সম্মিলনের প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করে জনপ্রিয় করার জন্য জোরের সহিত আন্দোলন চালানো।

কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করলেন যে কংগ্রেসকে আরও ব্যাপকভাবে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন এবং জনগণ ভোটাধিকার জনপ্রিয় করে যাতে সকল দল কংগ্রেসে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে তিনি বললেন যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক 'অথবা আত্মসম্মানী ভারতীয় কখনই স্বীকার করতে পারেনা যে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির সময় এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে রায় দেবার দাবি গ্রেট ব্রিটেনের আছে। এ ব্যাপারে মিশরের ভ্রাতারা যে ভাবে মিলনার কমিশনের প্রতি ব্যবহার করেছিল সেই ভাবে ষ্ট্যাটুটারী (সাইমন) কমিশনের প্রতি ব্যবহার করা ছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর নেই।

অন্তরীণদের সম্বন্ধে তিনি বললেন যে অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক ব্যাপার হচ্ছে এই যে শত শত যুবককে একমাত্র দেশকে ভালবাসার অপরাধে জীবনের তারুণ্যের সময় তাদের ধীরে ২ মৃত্যুর পথে নিক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। এটা গভর্ণমেন্টের পক্ষে নৈতিক দেউলিয়া হওয়ার স্বীকারোক্তি যে তারা অন্তরীণদের তাদের নিজের আদালতে উপস্থিত করে নিজেদের তৈরি আইনানুসারে নিজেদের নিযুক্ত বিচারক দ্বারা বিচার করার সাহস নেই।

সাম্রাজ্যবাদকে সভাপতি মশায় ইউরোপের ডাকাতি আখ্যা দিয়ে বললেন যে কংগো থেকে ক্যান্টন পর্য্যন্ত রক্তাক্ষরে এই ডাকাতির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণ শেষ করার পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায়ের একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করলেন। প্রতিকৃতিকে শোভাযাত্রা সহকারে মহাজন-সভার হলে নিয়ে যাওয়া হল।

সভাপতি মশায়ের আসন গ্রহণ করার পর সাধারণ সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এম্. এ. জিন্না, সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য), স্যার সি. পি. রামস্বামী আইয়ার, এ. পি. পাত্র, জর্জ ল্যানসবারী, দেওয়ান বাহাদুর আইয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হতে প্রাপ্ত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছাসূচক বার্তা সভায় পাঠ করে শোনালেন।

তারপর সভাপতি মশায় পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করল।

ক্রমশ

চল্লিশে

—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

চল্লিশে মন নেহাৎই বর্ণচোরা,
নিস্তরঙ্গ ভালোবাসা-নদী-বুক।
অবাধ ইচ্ছে-পাখিরা শিথিলগতি,
সূর্য-শায়কে আহত প্রত্যেকেই।
চল্লিশে মন নিপুণ স্বর্ণকার।
ঘৃণা-প্রেম-স্নেহ-ব্যর্থতা-পরাজয়
হৃদয়-কষ্টিপাথরে পরখ ক'রে
স্মৃতির বিবরে যত্নে লুকিয়ে রাখে।
চঞ্চলগতি সময়-সাগরগামী
তুচ্ছ-মহৎ ছোট-বড় দৃশ্যের,
পাগল মাতাল, খুনী, প্রেমিকের মুখ,
চাল্লশী চোখ-দর্পণে পড়ে ছায়া।
চল্লিশে মন সাজানো বাগানের মালী
ফুল-সমারোহ দেখে দেখে তন্ময়;
অথবা কুটিল অশালীন ঝড় এক
খেলার পুতুল ভেঙে তছনছ করে।
চল্লিশে মন পান করে হলাহল
দুঃখবোধের—নীলকণ্ঠের মত;
মত্ত যৌবন বন্ধুর পথে ছুটে
যেমন নিজের গন্তব্যেই ফিরে যায়।

হে স্বামী বিবেকানন্দ

তারক পাল

স্বদেশের রণভেরী যবে বাজি উঠি'
গণিল প্রমাদ, হে মনীশ সর্বত্যাগী,
বিদেশীর হুঙ্কারেও তুমি ছিলে জাগি।
সর্বজনে দোঁহ ব্রাত্যলে আলোর প্রেমী!
ব্রাহ্মণ-বৈশ্য ও শূদ্র! কে তোমার পর;
গর্জিলে নির্ভয়ে অনাত্মীয়ে বক্ষে ধরি,
হে স্বামী বিবেকানন্দ! ছিলে যে নির্ভয়।
অনাত্মীয় যীশু-বাণীরে তিতীক্ষায় ভরি'।
হে প্রাচীন-সনাতন, আদি পুরাতন
তুমি, হইলে কি মোর জীবন-দেবতা?
মোর দেবাশীষ তুমি? তুমি পুণ্যবান।—
কে নাহি বন্দিল; দেশে ও বিদেশে সদা।
তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি মনুনীতি
মোর প্রাণাধীশ; তুমি মাতৃ তুমি
মুক্তি।

সঙ্কলন

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা

"তত্ত্ব-কৌমুদী" পত্রিকা হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে :—

…হে শান্ত, হে শিব। ভক্তের স্ব বনের মধ্য হতে সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং এই অসংখ্য বহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্যে দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করেছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায়-চঞ্চল বিরোধে বিচ্ছিন্ন বিভীষিকায়-ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায় সেখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়। সেখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে ওঠে, বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনার ও কর্মসাধনার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ; উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও বিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, সকলপ্রকার অদ্ভুত অমূলক দুঃসহ বিভ্রান্ত ভীতি সহজেই আমাদের চিত্তকে অধিকার করে বসেছে। নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টার আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছ-চারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি—সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধসংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করিনা এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধিদ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির তমসংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল… আজ আমরা নব উদ্‌বোধনের…ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সত্য মিথ্যা কে যানে

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে রস আলোচনার বিভাগে প্রকাশ :—

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি চিনির (ex-factory) মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৫০.৯১ টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৫৮-৬০ টাকা করিয়া দিয়াছেন। এবার চিনির উৎপাদকদের মোটের উপর চল্লিশ কোটি টাকা বাড়তি উপার্জন হইবে।

চিনিকল মালিকেরাও অকৃতজ্ঞ নহেন। তাঁহারা সরকারের অনুগ্রহের বদলে' নগদ নারায়ন' এর ব্যবস্থা

করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কংগ্রেসের উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী ভাণ্ডারে ১০ কোটি টাকা দিয়াছেন।

না। না: ইহা ঘুষ নয়। সরকার যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াই চিনির দাম বাড়াইয়াছেন, আর চিনি কলমালিকেরা কংগ্রেসের প্রতি প্রেমবশতই এই চাঁদা দিয়াছেন।

যে এই দুইটি ঘটনাকে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে সে মহাপাষণ্ড সন্দেহ নাই :

রজকদিগকে রক্ষা করার কথা

শ্রীবিনয় সরকার "যুগবাণী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে এদেশের রজক সম্প্রদায় অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন ও তাঁহারা নাকি ১২ টাকায় একশত বস্ত্র কাচিয়া থাকেন। আমরা খবর লইয়া দেখিতেছি যে তাঁহারা আজকাল ২৫ টাকাতেও একশত বস্ত্র কাচিতে চাহেন না। আরও অধিক চাহিয়া থাকেন। অবশ্য ডাইংক্লিনিংকে কি দিয়া থাকেন তাহা আমরা জানিনা। ইহা ব্যতীত তাঁহাদের সময় জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই (কাপড়ের মালিক ব্যতীত অন্য লোকেও তাঁহাদের নিকট যে কাপড় দেওয়া হয় তাহা পরিধান করিয়া বিচরণ করেন দেখা যায়। কাপড় হারাইয়া ফেলাও সাধারণ ঘটনা। আমরা তাঁহারা যুগ যুগ বাঁচিয়া থাকেন ইহাই চাহিতেছি কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে বলে live and let live অর্থাৎ বাঁচিয়া থাক কিন্তু অপরকেও বাঁচিতে দাও, সেই নীতি অনুসরণ করিয়া। বিনয় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :

আমাদের ভদ্রসমাজকে বা বাবুদের ধোপদুরস্ত পরিপাটি করে ঢেকেঢুকে সাজিয়ে গুছিয়ে টপবাবু বা ভদ্রোলোক বানিয়ে যারা রাখেন, সমাজের সেই চির অবহেলিত মানুষগুলোর খোঁজখবর ভদ্রলোকেরা কোনদিনই বড় একটা রাখতেন না, এখনও রাখেন না—রাখার প্রয়োজনই হয় না। প্রয়োজন হয়না বলছি এই কারণে যে এখন বাবুরাই ডাইং ক্লিনিং নামে বেশ পরিপাটি কেতাদুরস্ত একরকম ধোবীখানা খুলেছেন, সম্ভবতঃ ধোপাখানার নোংরা সংস্পর্শ হতে বাবুদের তফাৎ রাখার ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে বাবুদের উপযুক্ত সুন্দর পরিবেশ—ভালকথা বাবুরা স্বচ্ছন্দে থাকুন, বাবুদের স্বাচ্ছন্দেই এই হতভাগ্য রজক সম্প্রদায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির বংকিঞ্চিত আশা ভরসা। কিন্তু বাবুদের যাবতীয় কলঙ্কের বোঝা কখনও গাধার কখনও নিজের পিঠে বয়ে এনে রোদে জলে ভিজে পুড়ে খাল, নদী, খানা, ডোবার ধারে কাছে অতিশয় ক্লেদাক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সপরিবারে দিবারাত্র যারা শুধু ক্লেদ ঘেঁটে, ময়লা কেচে বাবুদের বসন ভূষণ যাবতীয় পরিচ্ছদ নির্মল রাখতে জীবনপাত করছেন সেই রজক সম্প্রদায়ের দৈন্যদশা দেখে ওদের বাহন গর্দভগুলোও নীরবে চোখের জল ফেলে,—অথবা হাসে।

এরা কাপড় কেচে নীল কলপ করে শুকিয়ে ডাইংক্লিনিং পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত মাত্র ১২ টাকা মজুরী পান। সাবান-সোডা, এরারুট নীল টিনোপল সব খরচ এরই মধ্যে। হিসাব করে দেখাগেছে খুব কমকরেও খরচ ১০ টাকা। এই একশত কাপড় কাচতে কম করেও ২ জন মজুর লাগে। সাবান মাখা, নীল কলপ এসব কাজে বাড়ীর লোকজন সবাইকে যথেষ্ট সাহায্য করতে হয়। লোক না থাকলে অতিরিক্ত লোক রাখতে হয়, যদি ধরে নেওয়া যায় সবশুদ্ধ মাত্র ২জন মজুরই লাগে এই কাজটুকু সম্পূর্ণ করতে, তথাপি খরচ বাদে দু এক টাকায় এই দুর্মূল্যের বাজারে (যা সবার জন্যই এক) মাত্র দুইটি লোকের শুধু মাত্র বেঁচে থাকাও কি সম্ভব? পরিবারের কথা না হয় বাদই দিলাম, এখন প্রশ্ন হতে পারে,—তবে কি করে এই লোকগুলো বেঁচে আছে? এপ্রশ্নের একটাই মাত্র সঠিক উত্তর আছে—বেঁচে নাই," সপরিবারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেও বেঁচে থাকতে পারছেনা—একটি দুইটি করে কমছে, অথবা আপনারা স্বীকার করলে মরছে। এদের মধ্যে আবার যারা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু তাদের অধিকাংশই এদেশে এসেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যে কোন সহরের আশেপাশে একটা ঘর নিয়ে জাত ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিলেন,—পরনির্ভরশীল না হয়ে। কারণ এ কাজে পুঁজি হিসেব কিছুই দরকার ছিলনা। একটু জলের ব্যবস্থা থাকলেই [illegible] [illegible] উপর নির্ভর

করেই তারা কোন রকম বেঁচে থাকার মত উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন, যার জন্ত এদের অধিকাংশই অজ্ঞতা এবং উদযোগের অভাবে উদ্বাস্তু হিসাবে সরকারী পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা বড় একটা গ্রহণ করেন নাই বা করতে পারেন নাই। তখন জিনিষপত্রের দাম এত ছিলনা তাই চলে যাচ্ছিল কোনরকম,—তাই সরকারী সাহায্যের জন্ত গরজও তেমন অনুভব করেন নাই। কিন্তু বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এই নগণ্য আয়ে ছেলেমেয়ে সহ সবাইকে শুধু বাঁচিয়ে রাখাও সম্ভব হচ্ছেনা, অনাহারে অর্দ্ধাহারে অসুখ-বিসুখে ভুগে অনেকের অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে। 'দরিদ্রের ভগবান'—কাজের অবকাশও বড় একটা পাচ্ছেন না।

ভদ্র সমাজের তথা নেতৃবৃন্দের সামনে এদের বাস্তব অবস্থাটা উঠিয়ে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

সওদাগরী মালিকেরা অবশ্য এই একশত কাপড়ের জন্ত আর্জেন্ট অর্ডিনারী সব রকম মিলিয়ে গড়পরতা ৪০–৪৫ টাকা পান, তার মধ্যে তাদের খরচ আছে ইস্ত্রী, প্যাকিং এবং এস্টাব্লিসমেন্ট। এক্ষেত্রে তাদেরও উচিত এই মথোনোন্মুখ সহকর্মীদের জন্ত আরও কিছু স্বার্থত্যাগ করা, তাছাড়া বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির দিক বিবেচনা করে ভদ্র সমাজও তাদের সেবায় নিরত এই হতভাগ্য সম্প্রদায়ের জন্ত আরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করবেন কিনা তা তাঁদেরই বিবেচ্য।

আমার বক্তব্য শুধু এই যে—রজক সম্প্রদায়কে যেন চিরদিন সভ্যতার ময়লার বোঝাই বয়ে যেতে না হয়—সভ্যতার আস্বাদও যেন কিঞ্চিৎ পায়।

গরীবী হটাও

"যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে (করিমগঞ্জ ও গৌহাটি) সম্পাদকীয় ভাবে বলা হইয়াছে :—

কংগ্রেস দল বাহাত্তর সনে 'গরীবী হটাও' শ্লোগান তুলিয়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হইয়াছিলেন। আজ চুয়াত্তরের প্রারম্ভে তাহাদের সেই শ্লোগান স্মরণ করিয়া দেশবাসীর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন নেতাদের না থাকিলেও আমরা উহা মর্মে মর্মে অবলোকন করিতেছি। তেল ডাল চাউল চিনি আটা ময়দা আর দেশলাই পর্যন্ত স্বল্প-মূল্যের জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি আজ এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, যাহাকে অরাজক অবস্থার নিটোল দৃষ্টান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এইসব রোধ করিবার জন্ত চতু-স্পার্শ্বে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় কিছু আছে, তাহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ সাধারণ মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই এক অবস্থা। তোফা আছে শুধু মজুতদার ব্যবসায়ীরা এবং তাহাদের মাটের গুরু টাউট রাজনীতিবিদরা আর উহাদের সহায়ক চতুর অসাধু রাজ কর্মচারীরা। জিনিষপত্রের দাম যতই বাড়ুক না কেন, ইহাদের তাহার জন্ত কোনরূপ আক্ষেপ করিতে দেখা যায় না।

এই টাউট রাজদের অবসান কবে হইবে, তাহা কেউ বলিতে পারে না। সম্ভবত ইহা নির্ভর করিতেছে দেশবাসীর প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মার খাইবার ক্ষমতা কত বেশী তাহার উপর।
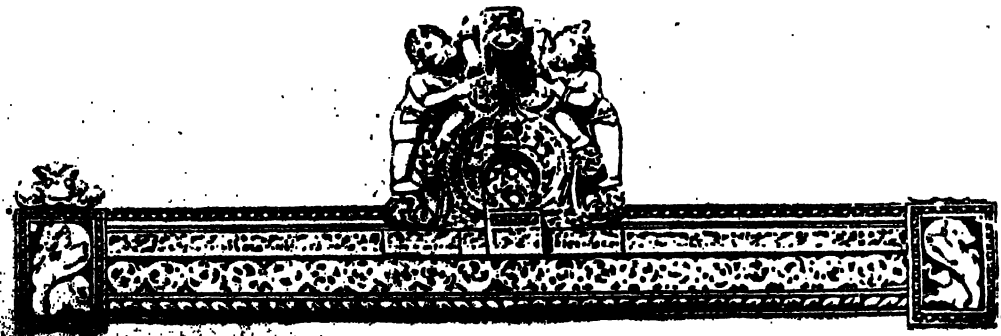
সাময়িকী

গুজরাটে তারুণ্যের জয়

গুজরাট বিধান সভা ভেঙে দেওয়া হল। গুজরাটের তরুণ সমাজ এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই। এ জয় তারুণ্যের জয়। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত অপদার্থ সরকারকে পদচ্যুত করতে এবং দায়িত্বহীন বাকসর্বস্ব জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা থেকে বিদায় করতে গুজরাটের নব নির্মাণ সমিতি যে অপূর্ব আত্মত্যাগ গঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছে তা অপদার্থ সুযোগসন্ধানী জনপ্রতিনিধির অপসারণ করার এক নূতন সংগ্রামী কৌশলের দিকদর্শন স্বীকৃতি লাভ করবে।

সরকারী হিসেব মত ৮১ জন গুজরাট অধিবাসী এই সংগ্রামের বলি হয়েছেন, এ ছাড়া আরও কত ধন-সম্পত্তি যে নষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতগুলো মানুষকে বলি দেওয়া এবং বিপুল ধনসম্পত্তির বিনাশসাধনের কি দরকার ছিল? একটা রাজ্যে দু'মাস ধরে কারফু জারী করা কি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতি এবং বহু কংগ্রেস এম, এল, এ রাই যখন বিধানসভা ভেঙে দেবার জন্য বার বার দিল্লীর কংগ্রেস কর্তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন তখন বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হলে অনেকগুলি মানুষকে যে বাঁচানো যেতো তাতে সন্দেহ নেই।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শ্রীচিমনভাই প্যাটেলের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়—গত ৯ ফেব্রুয়ারী। মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়েই বিধানসভা বাতিল না করার এক নূতন কায়দা হালফিল ধুরন্ধর রাজনীতিবিদেরা আবিষ্কার করেছেন। গত কয়েক বছর অনেক রাজ্যেই এই ক্ষমতা দখলের মজার খেলা দেখা গিয়েছে। গুজরাটেও সেই নাটকের পুনরাভিনয় করার যে আয়োজন চলছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু চিমনভাই নিজেই যখন বিধানসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দিলেন এবং দলে দলে এম এল এ'রা পদত্যাগ করতে থাকলেন—তখনও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী কর্তারা কোন ভরসায় জিদ ধরে বসে থাকলেন প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির যে সম্পূর্ণ অভাব ঘটেছে তা গুজরাটের ব্যাপারেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত দু'দিন আগেও হুকার ছেড়ে বলেছেন—সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার নয়। দীক্ষিত মশাই মানে মানে পদত্যাগ করবেন কী?

এ বিষয়ে গুজরাটের রাজ্যপালের কর্তব্য সম্বন্ধেও জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তিনি কবে কখন বিধানসভা বাতিলের পরামর্শ দেন তাও প্রকাশ হওয়া উচিত।

সংবাদে প্রকাশ গত শুক্রবার রাত ১১ টায় রাজ্যপাল শ্রী কে কে বিশ্বনাথন বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ গুজরাট শান্ত হয়ে উৎসবের রজনীতে পরিণত হয়। ছাত্ররা শোভাযাত্রা বার করেন। মিষ্টান্ন বিতরণ করেন, পটকা ফাটান। এসব দেখেশুনে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট রাত্রের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে এই মাস সক্তার প্রকাশ খুবই দুর্লক্ষণ বলতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সরকার সাড়া দেয় না বলেই—এদেশে, যে কোন আন্দোলন সন্ত্রাসের রূপ নেয়। এবং সন্ত্রাসের কাছেই মাথা নত করেন। তামিলনাডু রাজ্য গঠনের ঘটনা এবং আরও দৃষ্টান্ত পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। গণতন্ত্রপ্রেমী কংগ্রেস সরকারের এ এক অদ্ভুত চরিত্র। গণতন্ত্রের কাছে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করেন না মাথা নত করেন সন্ত্রাসের কাছে। ফলে সারা দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী নেতাদের মূর্খামীর শেষ যদি গুজরাটেই সীমাবদ্ধ থাকে—তবেই রক্ষা। নতুবা অন্যান্য রাজ্যেও দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপদার্থ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে গুজরাটি দাওয়াই যে শুরু হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

গুজরাট থেকে কর্মকর্তারা শিক্ষা নিন—দেওয়ালের লিখন পড়তে চেষ্টা করুন নতুবা শেষের সে দিন যে ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই। কূট কেরামতি দিয়েও যে জনরোষের সম্মুখে বেশীদিন দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—তা গুজরাট দেখিয়ে দিয়েছে।

দেশ-বিদেশের কথা

ব্যয় কতটা কমিল ?

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যায় "যুগবাণী" প্রধান মন্ত্রীর ব্যয় সংকোচ করার উদ্দেশ্য বিষয়ে মন্তব্য করেন। আমরা বহুমাস গত হইবার পরে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্যয় সংকোচ আন্দোলন শুরু করেছেন। আপাতত তিনি মন্ত্রীদের খরচ কমাবার জন্য আট দফা নির্দেশ দিয়েছেন। এরকম কথা বহুবার কংগ্রেস কমিটিতে পাশ হয়েছিল কিন্তু প্রস্তাব পাশ পর্যন্তই সারা। পণ্ডিত নেহেরুর আমলেও ব্যয় সংকোচের নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। অনেকে আজ আর্থিক সংকট তীব্র বলছেন—তাই নাকি এই ব্যবস্থা। ভারতবর্ষে আর্থিক অবস্থা কবে স্বচ্ছল ছিল তা আমাদের জানা নেই।

সরকার বলেছেন সারা দেশে শতকরা ৫০ ভাগ লোকই দরিদ্র রেখার নীচে পড়ে আছে। এঅবস্থাটা তো হঠাৎ সৃষ্টি হয় নি। আর পশ্চিম বাংলার অবস্থা সারা দেশের তুলনায় আরও ভয়াবহ। এখানে শতকরা ৭০ জনই দরিদ্র। ৪৫ লক্ষ বেকার। এই অসহনীয় অবস্থার থেকে মুক্তির জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা চাই। পরিকল্পনার জন্য চাই মূলধন। মূলধন সৃষ্টির জন্য চাই সঞ্চয়। এই সঞ্চয় করতে হলে মিতব্যয়ী হওয়া দরকার। এই সহজ কথাটা সকলেই জানেন। একমাত্র গান্ধিজী নিজের জীবনে এই সত্যটা রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি শুধু বক্তৃতা দিয়ে কর্তব্য সমাধা করেন নি। দরিদ্র ভারতবাসী জীবনধারা অনুসরণ করার জন্যই সরল জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীভক্তরা সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাননি।

দেশ থেকে রাজরাজড়াদের বিদায় দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাদের জায়গা দখল করে নিয়েছেন—মন্ত্রীরা, আমলারা এবং সরকারের কৃপাপ্রার্থীরা। সামন্তযুগীয় আচার আচরণ অর্থাৎ বিলাসবহুল জীবনযাপন, জাঁকজমক সব কিছুই এই নতুন শ্রেণী আয়ত্ত করে নিয়েছেন। এই নতুন শ্রেণী বর্তমানে সমাজ-দেহে দুর্নীতি, ঘুষখোরী, কালোবাজারী, বিলাসিতা, বিজাতীয় হাবভাব, সৌখিন পোষাক পরিচ্ছদ ও নানা ফ্যাসান ছড়িয়ে মানুষকে লোভী করে তুলেছেন। এই স্বভাব কি পাল্টানো যাবে ?

অর্থনীতিবিদেরা বলেন জাতীয় আয়ের অন্ততঃ শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে না পারলে, ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল ১১%, তা কমে ১৯৭১—৭২ সালে দাঁড়িয়েছে ৮% থেকে ৯% এ। এই বিনিয়োগের হার বাড়ানো জাতির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনের মানসিকতা গড়ে তুলতে না পারলে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা দূর হতে পারে না।

আমাদের মন্ত্রীরা, আমলারা, এম, পি, এম, এল, এ'রাই তো এখন সাধারণ মানুষের উপাস্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তারা কোন কালেই এই মিতব্যয়ীতার ধার ধারেন নি। বরং নিজেদের জীবনে এবং অপরকেও অমিতব্যয়ী হতেই সাহায্য করে এসেছেন। গরীব ভারতের কথা, গান্ধীজীর কথা তাঁদের ধ্যান-ধারণায় কোনদিন স্থান পায় নি। সরকারী টাকায় খানা-পিনা, জাঁকজমক আড়ম্বর ইত্যাদির চর্চাতেই এঁরা মশগুল।

মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি, কথায় গরীবী হটাবার প্রতিশ্রুতি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে গরীবদের প্রতি চরম উপেক্ষা, এই হচ্ছে নেতাদের জীবন দর্শন। গরীব দেশের মন্ত্রীরা, আমলারা যদি রাজরাজাদের হালে

চলেন, তবে সাধারণ মানুষ এরা গরীবী দূর করতে চান বলে বিশ্বাস করবেন কেন? টাকার-অভাবের জন্য পঞ্চম যোজনায় ছাটকাট করা হচ্ছে? বর্তমান বাজেটেও ছাটাই হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীদের আমলাদের খরচ কমবে না—খরচ কমবে বিভিন্ন পরিকল্পনায়। গান্ধীজী বলেছিলেন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে রাজ্যপাল, মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীরা সাধারণ বাড়ীতে থাকবেন—সরল জীবন যাপন করবেন। কিন্তু দিল্লীতে সরকারী কর্তারা যে জীবন যাপন করেন—তা আমাদের দেশের রাজা বাদসা, পুঁজিপতিদের হালচালকেও হার মানায়।

বেতন ভাতা, বাদ দিয়ে এঁদের পিছনে সরকারী কোষাগার থেকে মাসে মাসে হাজার টাকা ব্যয় হয়। সারা ভারতের মাথাপিছু আয় যেখানে বছরে ৬০০ টাকা মাত্র, সেখানে তাঁরা এরূপ ব্যয়বহুল জীবন যাপন করার নজীর সৃষ্টি করেন কোন মানসিকতা থেকে? আর যাই হোক একে সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা বলা চলেনা।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ কতটুকু কার্যকরী হয় দেখা যাক। আমরা বলতে চাই মন্ত্রীরা, আমলারা নিজের খরচ কমানোর জন্য যেমন উদ্যোগী হবেন, তেমনি অহ অর্থাৎ যারা বেহিসেবী খরচ করবেন তাদের সংশ্র বর্জন করবেন। একথা বলতে হচ্ছে এই জন্যে পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে বন্যার ফলে যে অবস্থ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে এখানে সর্বস্তরের ব্যয় সংকোচ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি এখানে পূজ পার্বনে যে জাঁকজমক শুরু হয়েছে, তা অকল্পনীয় দুর্ভাগ্যের বিষয় এসবের পিছনে মন্ত্রীদের সক্রিয় হ যাচ্ছে। এক একটা পূজায়, সত্তর আশীহাজার, ল টাকা খরচ করার কোন অর্থ হয় কি? এই সব হুজু পিছন থেকে নেতাদের সরে দাঁড়ানোই কর্তব্য। সম রকম ব্যয়বাহুল্য কমিয়ে দুর্গত মানুষের সেবায় আ নিয়োগ করাইআজ সব কাজের সেরা কাজ হোক। নেত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবেন—না তারাই ভক্তদে বিলাসিতার পকে ঠেলে দিচ্ছেন। নেতারা ঠিক প চললে—নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষও সে পথে চলবে।

এখন অবধি ব্যয় কতটা কমিয়াছে তাহা আম বলিতে পারিনা। কিন্তু জানিতে চাহি।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৪তমভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

২য় সংখ্যা

সত্যাই সকল সমস্যার সমাধান করে

সকল সমস্যারই একটা মূল কারণ অথবা আরম্ভের উৎস থাকে এবং তৎপরে দেখা যায় সেই সমস্যার গঠনের ক্রমবর্দ্ধনশীল গতি ও পদ্ধতি। সমস্যা যখন পূর্ণাবয়ব রূপ ধারণ করিয়া নিজক্ষেত্রে সক্ষমভাবে আত্ম-বিস্তার করে তখনই তাহার স্বরূপ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। সকল সমস্যাই নিজ পরিপার্শ্বিকের পূর্ণতর বিকাশ এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট জীবজন্তু বস্তু ইত্যাদির উন্নততম অবস্থা প্রাপ্তিতে বাধা দিয়া থাকে এবং সমস্যার সমাধান বলিতে সেই পরিবর্ত্তনকেই বুঝায় যাহা ঘটিলে বা ঘটাইলে সকল বাধা অপসৃত হইয়া ব্যাপকভাবে ক্রমোন্নতির পথ পুনর্ব্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ, ধরা যাউক কোথাও সমস্যা উপস্থিত হইল এরূপ যাহাতে জলাভাবের ফলে সকল তরুলতা শুখাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল, জীবজন্তু জল না পাইয়া মহা কষ্টে কোনও মতে জীবন ধারণ করিতে লাগিল ও যাহা ছিল উর্ব্বরা ক্ষেত্র ও শস্যশ্যামলা ভূখণ্ড তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিল। এখন এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথমতঃ অনুসন্ধান করিতে হইবে ঐ স্থলে জল বরাবর কোথা হইতে, কখন, কিভাবে আসিত। ইহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইল যে জল প্রধানতঃ বৃষ্টি হইতে আসিত ও তাহা ব্যতীত একটি ক্ষুদ্র নদীও অনেক জল সরবরাহ করিত। বৃষ্টিপাতের মূল কারণ যাহা যাহা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইল যে পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে বহু বৃক্ষ ছিল, বর্ত্তমানে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মতে বৃক্ষ

কাটিয়া দিলে বৃষ্টিপাতে বাধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্থির করা হইল শত শত বৃক্ষ রোপণ করিয়া ঐ অঞ্চলের পাদপহীন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নদীটির জলস্রোত হ্রাস কেন হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইল যে উপরের দিকে বহুস্থলে অযথা খাল কাটিয়া জল অপচয় করা হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই বৃক্ষ কাটিবার ফলে বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে। অতএব এইরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা করা হইল যাহাতে খালগুলি দিয়া শুধু অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলই লওয়া হয় এবং সর্ব্বত্র বৃক্ষ রোপণ কার্য্যও বাড়ান হইল। এই সকল ব্যবস্থা করিবার পরে ক্রমে ক্রমে ঐ অঞ্চলের শুষ্কতা দূর হইতে আরম্ভ হইল। অনেকে বলিয়াছিলেন যজ্ঞ ও পূজার ব্যবস্থা করিলেই জলকষ্ট নিবারণ হওয়া সম্ভব হইবে, কিন্তু বিজ্ঞান সত্য অনুসন্ধিৎসার পথ অনুসরণ করিয়া সমস্যার সমাধান যথাযথভাবে সাধন করিতে সাহায্য করিয়া দিল। অপর এক ক্ষেত্রে দেখা যাইল একটি অঞ্চলে শত শত লোকের বসন্ত রোগ হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আরও অনেকের টাইফয়েডও হইতেছে। স্থানীয় জননেতাগণ প্রাচীন পন্থা অনুসরন করিয়া বলিলেন পূজা ইত্যাদির আয়োজন করা হউক। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। সহরে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেখা যাইল যে পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে সকলে প্রায়ই বসন্তের টিকা লইত এবং এই সময় কয়েক বৎসর হইতে টিকা লওয়ায় মন্দা পড়িয়াছে। টাইফয়েডের টিকাও অনেকে লইত কিন্তু এই সময় আর লইতেছিল না। বিশেষজ্ঞদিগের চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে বসন্তের টিকা দেওয়া পুনরায় চালিত হইল এবং পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা রক্ষার আয়োজন জোরাল করা হইল। ফলে উভয় রোগই ক্রমে ক্রমে ঐ অঞ্চল হইতে দুরীভূত হইতে আরম্ভ করিল। সত্য ও জ্ঞানের পথে চলিলে যে সকল সমস্যার সমাধানই সহজ হইয়া আসে এই উদাহরণ হইতে তাহা উত্তমরূপেই বোধগম্য হয়। এক সময় একটা এমন সমস্যার আবির্ভাব হইল যাহা সমগ্র দেশব্যাপী ও যাহার সমাধান জাতীয়ভাবে অতি আবশ্যকীয় বিবেচিত হইল। ইহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। দেশের জনসংখ্যা যদি দ্বিগুণ চতুর্গুণ ষোলগুণ, এইরূপ হারে বাড়িয়া চলে তাহা হইলে শীঘ্রই জনসংখ্যা এতই বাড়িয়া যাইবে যাহাতে কাহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সহজ থাকিবে না। অনেকেই অনাহারে প্রাণ হারাইবে এবং তাহা হইতেও আরও অধিক সংখ্যক মানুষ অর্দ্ধাহারে, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির অভাবে মহাকষ্টে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইবে। কি কারণে কেমন করিয়া অধিক সংখ্যায় মানুষ জন্মায় তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে যদি অল্প বয়সে অধিকাংশ নরনারী বিবাহ করে এবং প্রায় সর্ব্বদাই একত্রে বাস করে তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুততর গতিতে হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং বাল্য বিবাহ, বিবাহের পরে সর্ব্বদা একত্র বাস এবং অধিকাংশ মানুষের বিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করা জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হইলে বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, বিবাহের পরেও যথাসম্ভব পৃথক বাসকরা উচিত এবং জাতির অনেক নরনারীর পক্ষে অবিবাহিত থাকাও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক। যদি সকল নরনারীই জীবনের কয়েক বৎসর সামরিক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে ঐরূপ ব্যবস্থা দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি ঐরূপ ব্যবস্থা না করিয়া অন্য প্রকার উপায় অবলম্বনে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিরোধ চেষ্টা করা হয় তাহার ফল বিশেষ কার্য্যকর হয় না।

বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া সকল সমস্যার সামাধানের চেষ্টা অপরাপর প্রাচীন রীতিনীতি পদ্ধতি, বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনুসরণে কার্য্যসিদ্ধি ব্যবস্থা হইতে যে অধিক কার্য্যকর একথা এখন কাহাকেও আর বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান জগতে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানুষের জীবনধারা নানা নূতন পথে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে ও যাহার দ্বারা মানবজীবন পূর্ব্বের তুলনায় বহুল পরিমাণে অধিক সুখ, নিরাপত্তা ও প্রগতির আধার হইয়া উঠিয়াছে; সেই সকল আবিষ্কারের মূলে আছে মানুষের

বিজ্ঞান অনুসরণের আগ্রহ। বিভিন্ন প্রকারের কল-কব্জা ও বৈদ্যুতিক বিলিব্যবস্থা মানব জীবনের রূপ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারে সৃষ্টিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন নূতন ঔষধ, প্লাস্টিক, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সুতা ও তাহা হইতে বয়ন করা বস্ত্রাদি (যথা টেরিলিন, নাইলন প্রভৃতি কাপড়) কৃত্রিম চামড়া, পলিথিন, রাসায়নিক খাবার ও তাহা হইতে তৈয়ারী গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি এবং আরও অসংখ্য রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যসম্ভার মানুষকে নিত্য নব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া তুলিতেছে। দুঃখ কষ্ট লাঘব, সেই সকল অভাব মোচন যাহা পূর্ব্বে কোনমতেই দূর করা সম্ভব হইত না এবং বহু বাধা বিপত্তি অপসারণ করিয়া সম্ভাব্যের দীর্ঘ তালিকা দীর্ঘতর করিয়া তোলা, বর্ত্তমান-কালে বিজ্ঞানের সাহায্যে সহজ ও সরল পথে মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়াছে। পুরাতন সংস্কারকে যদি দূর করিয়া তৎস্থলে নূতন সংস্কার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং বিজ্ঞান ও সত্যের অনুসরণ ভুলিয়া নব সৃষ্ট সংস্কারের পিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় কষ্ট কল্পনার ভাবে বিভোর হইয়া স্বপ্নপথে অগ্রগমন চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও প্রগতিই সাধিত হইতে পারে না।

ভোগ্যবস্তু উৎপাদন ও মানবজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলার ব্যবস্থা সৃজনকর কার্য্য যদি লোক-সংখ্যার অনুপাতে যথাযথ পরিমাণে করা না হয় তাহা হইলে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ অভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া ক্রমশঃ বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপ অবস্থায় যদি গতানুগতিকভাবে সকল সমাজ রক্ষা ব্যবস্থা ঘটনাচক্রের স্বাভাবিক গতির উপর নির্ভর করিয়া রাখা হয়, তাহাতে যেরূপ ঐ অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া না হওয়া বিষয়ে কোন কিছুই বলা সম্ভব হয় না; তেমনি যদি অনভিজ্ঞ জননেতাগণ বিদেশী স্বার্থান্বেষী ব্যবসাদারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের কথায় বহু আর্থিক ব্যয়ভার দেশবাসীর স্কন্ধে যথেচ্ছা বোঝাই করিয়া দেশের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহার ফলও অদৃষ্টের অজানা গহ্বরেই লুকায়িত থাকিয়া যায়। অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে অর্থনীতির বিচারে ও ব্যবস্থাতেই, তাহা কদাপি রাজনৈতিক সুবিধা অনুসরণ করিয়া সাধিত হইতে পারে না। যে ক্ষেত্রে যাহা অর্থনীতি অনুগতভাবে হওয়া সম্ভব, রাজনীতি অনুগমনে সে ক্ষেত্রে বিপরীত অর্থাৎ কিছুর উদ্‌গম চেষ্টা করিলে পরিশ্রম ও ব্যয় উভয়ই প্রস্তরে বীজবপন চেষ্টার মতই নিষ্ফল হইতে বাধ্য। আমাদের এই দরিদ্র দেশে তাহাই হইতে পারে ও হওয়াইবার চেষ্টা করা উচিত যাহা মানব শ্রমজাত ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। এবং যাহা কিছুঃ উৎপাদন চেষ্টা হইবে তাহার সকল কিছুই উৎপন্ন হইলে পরেই যাহাতে সমাজের মানুষ অচিরাৎ ক্রয় করিয়া লইয়া ভোগে লাগাইতে পারে সেই পরিণতির কথাও ব্যবস্থাপকদিগকে সকল সময় উজ্জল-বর্ণে মানসপটে অঙ্কিত রাখা আবশ্যক। দেশবাসী যাহা চায় তাহাই যাহাতে উৎপাদন করা হয় এই কথাটা মনে রাখা কঠিন নহে; কিন্তু দেখা যায় যে দেশনেতাগণ তাহাই উৎপাদন করিতে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন যাহার উৎপাদন দেখাইতে পারিলে তাঁহাদের নাম যশ বৃদ্ধি প্রবল গতিতে সচল হইয়া উঠিতে পারে। ইহাতে সমাজের নরনারীর অভাবও দূর হয় না, বিদেশী ব্যবসা-দারদিগের নিকট ঋণের বোঝাও ভারি হয় এবং উৎপন্ন বস্তুনিচয় অবিক্রিত অবস্থায় গুদামে পড়িয়া পচিতে থাকে।

সমস্যা আছে অসংখ্য এবং সেই সকল সমস্যা যথাযথ ভাবে সমাধান করিতে হইলে আয়োজন আবশ্যক অতি ব্যাপক, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গভীরতায়। সকল সমস্যার সহিত জড়িত যাহা কিছু তাহার পূর্ণ অনুসন্ধানান্তে তৎসম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে। তৎপরে হইতে পারে সমস্যা সমাধান চেষ্টা এবং তাহার জন্যও আবশ্যক বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থা। জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে আছে যে সকল একান্ত আবশ্যক অবস্থা ব্যবস্থা ও বস্তু সরবরাহের কথা, তাহা হইল শান্তি ও নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, আসবাব, রাস্তা ও

যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির আয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি। বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য যে প্রস্তুতি ও সতর্কতার প্রয়োজন তাহার জন্য আবশ্যক হয় সামরিক শক্তিগঠন ও সদা সর্ব্বদা শত্রু-নিপাত ক্ষমতা রক্ষা করিয়া দ্রুতগতিতে বৈরী ধ্বংস কার্য সাধনে সক্ষমতা। আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা নির্ভর করে বিভিন্ন অবস্থার উপর। দেশের মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাতে সক্ষম থাকিলে শান্তিরক্ষা সহজ হয়; সুতরাং অর্থনৈতিক পারিস্থিতি সুস্থ ও সবল থাকিলে পুলিশ পাহারার আধিক্য না থাকিলেও চলে। শান্তি ভঙ্গ যাহারা করে ও যেজন্য করে তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ আবশ্যক ও তৎপরে আবশ্যক সেইরূপ অবস্থান্তর সৃজন যাহা হইলে চুরী, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটপাট ইত্যাদি নিজ হইতেই ক্রমশঃ আর ততটা হইবে না। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের যে সকল উপকরণ আছে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার রীতি-পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুগতভাবে নির্দ্ধারণ করিলে বিষয়টা ব্যবস্থাপকদিগের নির্দ্দেশাধীন থাকে। গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে কি প্রকার ব্যবস্থা কতদূর সম্ভব হইবে তাহা অনুমানের কথা দাঁড়ায়; ইচ্ছা অনুসারে কোন কিছুই স্থির করা যায় না। একথা অবশ্যই সংজ্ঞন জ্ঞাত যে বহু দেশেই মূলধনের অভাব থাকে কিন্তু লোক-বলের অভাব সেই তুলনায় কমই হয়। সেই সকল দেশেই জীবন ধারণের উপকরণের অভাবও দেখা যায় এবং যদি সর্ব্বাগ্রে দেশের সমগ্র শ্রমশক্তি ব্যবহার করিবার আয়োজন করা যায় তাহা হইলে অর্থনীতি অনায়াসেই অভাবের পথ ছাড়িয়া অর্থনৈতিক পূর্ণতার পথে আসিয়া সবল পদক্ষেপে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

দুর্নিতির উৎস কোথায় ?

এক ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া ধানবাদ যাইতেছিলেন। অনেক সময় থাকিতেই তিনি স্টেশনে গিয়া একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কামরাতে মুখোমুখি দুইটি বসিবার "বার্থ" ও প্রত্যেকটির উপর ঝোলানো আরও দুইটি "বার্থ"। অর্থাৎ কামরাটিতে চারজন যাত্রী শুইয়া যাইতে পারেন অথবা চারজন বসিয়া থাকিতে পারেন। ট্রেন ছাড়িবার পনের কুড়ি মিনিট পূর্ব্বে স্টেশনে একটা মিছিলের মত জনস্রোত আসিয়া প্রবেশ করিল এবং ঐ অসংখ্য মানুষ সকলেই ঐ ট্রেনটিতে উঠিয়া পড়িল। ফলে ঐ প্রথম শ্রেণীর কামরাটিতে নিচের দুইটি বেঞ্চিতে বারজন বসিলেন ও উপরের ঝুলান বার্থগুলিতেও চারজন উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন। বাহিরের যাতায়াতের "করিডরে" ষাট-সত্তরজন দাঁড়াইয়া, এবং উবু হইয়া বসিয়া চলিলেন এবং যাত্রীদের দমবন্ধ হইয়া মারা যাইবার অবস্থা হইল। ট্রেন ছাড়িলে পরে এই সকল জনবাহিনীর লোকদের পারস্পারিক কথাবার্ত্তা হইতে বুঝা যাইল যে তাঁহারা কলিকাতায় একটা মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজার, সরকারী আমলাদিগের দুর্নীতির কার্য্য প্রভৃতি যাহাতে বন্ধ হয় সেইজন্য মিছিল বাহির ও সভা করিতে বর্দ্ধমান, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের যাতা-য়াতের খরচ বলিয়া যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া আসা সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয় টিকিট ক্রয় করেন নাই কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইয়াছিলেন। ট্রেনে কেহ তাঁহাদের টিকিট দেখিতে চাহিতে সাহস পায় নাই এবং প্রবেশ ও নিক্রমণকালে প্ল্যাটফর্মের গেটে তাঁহাদের মিছিলের প্রবল গতিরোধ করিয়া কাহারও পক্ষে টিকিট দেখাও সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতেছিলেন তিনি এই সকল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত কথা বলিয়া বুঝিলেন যে তাহারা দুর্নীতি ও অন্যায় দমন করিতে বদ্ধপরিকর ও তাঁহারা আশা করেন যে আরও কিছুকাল সতেজে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারিলেই তাঁহারা দেশে সুনীতি স্থাপন অতি দৃঢ়ভাবেই করিতে সক্ষম হইবেন। ট্রেন যখন বর্দ্ধমানে থামিল তখন অনেকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইলেন। একজন নামিবার সময় গাড়ীর একটা আলোর "বাল্ব" খুলিয়া লইয়া গেলেন।

গাড়ীতে পূর্ব্বেই আলো কমই ছিল, এখন তাহা হ্রাস হইয়া শুধু একটা মাত্র আলোতে দাঁড়াইল। যাহারা এখন রহিলেন তাঁহারা বাহির হইতে লোক ডাকিয়া আনিয়া সংখ্যাপূর্ত্তি করিয়া লইলেন। একজন বেশ লেখাপড়া জানা ব্যক্তি বলিতে থাকিলেন, কেমন করিয়া কালোবাজার দমন করা প্রয়োজন ও সম্ভব হইতে পারে। যেসকল ব্যক্তি কালোবাজার চালায় তাহাদের প্রাণদণ্ড কেন দেওয়া যাইবে না। যাহারা অধিক লাভ করে তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে লাভ করা বন্ধ হইবে। অপর একজন তার্কিক বলিলেন প্রাণদণ্ড দেওয়া সম্ভব হইবে না কিন্তু বেত্রাঘাত করিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অপর ব্যক্তি বলিলেন সহস্র সহস্র নারী কালোবাজারে চাউল বিক্রয় করেন তাঁহাদের কেমন করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে? আর একটা কথা হইল এডিং এ্যাণ্ড অ্যাবেটিং-এর কথা, যাহারা কালো বাজারের মাল খরিদ করেন তাঁহাদেরও কি প্রাণদণ্ড দেওয়া অথবা বেত্রাঘাত করা হইবে? তাহা হইলে দেশের প্রায় সকল ব্যক্তিকেই ঐরূপ শাস্তি দিতে হইবে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া অন্য একজন বলিলেন ঘুষ লওয়া বন্ধ করিলেই সকল অপরাধ দমন করা সম্ভব হইবে। ঘুষ লইয়াই সকল অপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ঘুষ লওয়া নিবারণঅপরাধ দমন ও নিবারণের সিঁড়ির প্রথম ধাপ। ধাপটি পার হইলেই কার্য্য সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু যে দেশে অপরাধীরা ঘুষ দিয়া ছাড়া পাইয়া যায়, লাইসেন্স পাইতে ঘুষ দিতে হয়, স্কুলে কলেজে, হাসপাতালে প্রবেশ করিতে হইলে ঘুষ লাগে, চাকুরী পাইতে ঘুষ, বিলের টাকা পাইতে ঘুষ, কনট্রাক্ট পাইতে, মাল কিনিতে বা বেচিতে, বুকিং করিতে বা মাল ছাড়াইতে সর্ব্বত্রই উৎকোচের সবল উপস্থিতি, এক কথায় বিশ্বসংসার ঘুষে ঘুষময়, সেখানে ঘুষ বন্ধ কেমন করিয়া হইবে? দুই চার জন বলিল ঘুষ যাহারা দেয় তাহাদের অপরাধ যে ঘুষ নেয় তাহার অপেক্ষা কম নহে। উত্তর হইল মানুষ কোনও উপায় যখন খুঁজিয়া পায় না তখনই সে ঘুষ দিতে প্রস্তুত হয়। যে ঘুষ গ্রহণ করে সে ত নিরুপায় হইয়া ঘুষ লইতে বাধ্য হয় না। সুতরাং যে নেয় সে অধিক দোষী। আর একজন বলিলেন যদি কোনও ব্যক্তি ঘুষ না লইতে চাহে তাহা হইলে তাহার চাকুরী থাকে না, কারণ ঘুষের কারবার সম্বন্ধ ব্যাপক এবং কাহারও পক্ষে সাধুতার খাতিরে সেই বিরাট বিল-ব্যবস্থার তালভঙ্গ করিয়া প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ পাল্টান সম্ভব নহে। ঘুষ ব্যক্তিগতভাবেই চলে এমন নহে; সকলেই ঘুষ লইবে এবং সে ঘুষের ভাগবাটোয়ারায় সকলেরই অংশ থাকে। ঘুষের ভাগ কোথা হইতে কোথায় যে পৌঁছায় তাহা নাকি সাধারণ মানুষের কল্পনার বাহিরে। সুতরাং ঘুষ লইব না বলা বড়ই কঠিন কার্য্য। কোনও কোনও পদে অবশ্য ঘুষ না লওয়া চলিতে পারে; তেমনি অপর কোনও কোনও পদে মানুষ ঘুষ লইতে বাধ্য হয়। কালো বাজারকে কোনও ভাবে সমর্থন করিব না বলিলে যেমন না খাইয়া বস্ত্রহীন, বাসস্থানহীন অবস্থায় থাকিতে হইতে পারে উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে পূর্ণ অসহযোগিতা তেমনি মানুষকে চাকরীহীন করিয়া দিতে পারে।

কয়েকজন বলিয়া উঠিলেন যে যদি কোন অন্যায় দমন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার এত আয়োজনের অর্থ কি? অর্থ কি এই যে দুর্নীতি দুর্নীতি বলিয়া সোরগোল করিয়া কাহাকেও অথবা কোন দলের নেতাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা? ইহার উদ্দেশ্য তাহা হইলে সুনীতি প্রতিষ্ঠা নহে, উদ্দেশ্য হইল রাজনীতির পায়তারা ও সুবিধামত লগুড়সঞ্চালন। একজন আত্মদোষ দর্শক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন কোন মানুষই পূর্ণরূপে টাকায় ষোল আনা সাধু নহে। আমরা যারা মিছিল করছি বিক্ষোভ দেখাচ্ছি, আমরাও বহু অন্যায় করি এবং করতে থাকব। সেই কারণে যে কাজ করব বলে বেরিয়েছি তাই করে কর্তব্য শেষ করাই উত্তম। বড় বড় "স্পীচ" না দিলেই দায়িত্ব বাড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পারলে আমরাও অন্যায়ভাবে লাভ করবার

চেষ্টা করি, না পারলে ধর্ম্মের অভিনয় করে মনে শান্তি পাবার ব্যবস্থা করি।

ট্রেন এতক্ষণে দুর্গাপুরে পৌঁছে গেল এবং সংগ্রামী-জনতা গাড়ী খালি করে নেমে গেলেন। এতক্ষণে যে টিকিট পরীক্ষক ট্রেনেই ছিলেন তিনি অবস্থা নিরাপদ দেখে টিকিট দেখবার চেষ্টা আরম্ভ করলেন। ইতি-পূর্ব্বে তিনি গার্ডের ভ্যানএ গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। কারণ দুই একজন টিকিটহীন মানুষকে নাজেহাল করা সহজ কিন্তু ৩০০।৪০০ সংঘবদ্ধ বেটিকিটধারীকে নিয়ে কিছু করতে হলে সামরিক ফৌজ ব্যতীত কিছু করা যায় না। পুরাকালে যখন বর্গী অথবা পিণ্ডারী লুঠেড়ারা সদলবলে বাহির হইত তখন কি কেহ তাহা-দিগের উপর কোনও আইন কানুন অথবা নির্দ্দেশ জারি করিতে পারিত? তাহারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইত কিন্তু না দিত আয়কর না চুঙ্গীর মাশুল। একটা কথা আছে জোর যার মুলুক তার। এই জোর কখন গায়ের জোর, কখনও বুদ্ধির জোর আবার কখনও বা সুনীতির শৃঙ্খলমুক্ত দুর্নীতি-পরায়ণতার জোর। যেখানে বহু মানুষ মিলিতভাবে অন্যায়ের পথে চলিতে আরম্ভ করে, সত্য মিথ্যা, সভ্যতা অসভ্যতা, দয়া নিষ্ঠুরতা, সুরুচি কুরুচি, কোন কিছুর পার্থক্য বিচার কেহ করেনা, সে অবস্থায় সুনীতির কোনও মর্য্যাদা রক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্ত্তমান জগতে মানবসমাজ নানাপ্রকার শ্রেণীতে বিভক্তভাবে দলবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিত থাকে। এক এক গোষ্ঠীর মানুষ এক এক প্রকার রীতিনীতি জীবনযাত্রা ও কর্ম্মপদ্ধতি অনু-সরণ করিয়া চলে। যথা কারখানার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কেরাণী, দোকানদার ইত্যাদিজাতীয় ব্যক্তি-গণ দোষেগুণে নিজ নিজ স্বরূপ রক্ষা করিয়া চলে। পুলিশের লোকের ও দোকানদারদিগের জনমঙ্গল বা ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ একপ্রকার হইতে পারে না। ছাত্রগণ যে প্রকার অপরাধ প্রবণতা প্রদর্শন করিবে, মৎস্যজীবি-দিগের মধ্যে সেই অন্যায়ের ধারা ভিন্নপথে প্রবাহিত হইবে। ন্যায় অন্যায় বোধ অথবা প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে নানান্ গোষ্ঠীর মানুষ নানাভাবে চলিলেও সকলের মধ্যেই একটা বিষয়ে ঐক্য লক্ষিত হইবে। ইহা হইল সকলের মধ্যেই কিছু ভালো ও কিছু মন্দ দেখা যায়। অর্থাৎ সকলেই কিছু কিছু দুর্নীতিপরায়ণ ও সকলেই কিছুটা সুনীতি পরিচালিত। এমন কোনও গোষ্ঠী দেখা যাইবে না যে গোষ্ঠীর কোনও মানুষই অন্যায় কার্য্য করেন না সুতরাং সকলেই কিছু কিছু অন্যায় করেন এই কারণে কেহই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবল অভিযান চালাইতে প্রস্তুত হইতে চাহেন না। সকলের মধ্যেই অন্যায়ের সমর্থন ইচ্ছা অল্প বিস্তর জাগ্রত থাকিতে দেখা যায়। দুর্নীতির প্রসারের ইহাই একটা অতি প্রবল কারণ।

তাহা হইলে যদি আলোচ্য বিষয় হয় দুর্নীতি কেমন করিয়া কোথায় উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে দুর্নীতির উপ-স্থিতি, ব্যাপ্তি ও হ্রাসবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয় যে দুর্নীতি মানবমনের প্রবৃত্তি ও স্বভাবজাত গতিবিধির ফলেই বাস্তব আকারে প্রকট-রূপে দেখা দেয় ও দুর্নীতির মূল উৎস মানবমনের দুর্ব্বলতা, ও ষড়রিপুর ভিতরেই রহিয়াছে। মানুষ তাহার প্রবৃত্তির দাস ও যখন মানুষ আর ধর্ম্মের বন্ধন তেমন কঠিন হস্তে কর্ম্মক্ষেত্রে রক্ষা করিতে চাহেনা, নানান্ অজুহাতে ঢিলাঢালাভাবে যথেচ্ছাচার করিয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে, তখন স্বভাবতই সুনীতি সকল বাধা দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে অপকর্ম্মের শিখরে পৌঁছিয়া যায়। মানবসভ্যতা ও নীতিবোধ তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং মানবজাতি তখন নূতন প্রেরণা, ধর্ম্মবোধের পুনর্জাগরণ ও মানবতার সংরক্ষণ কোথায় ও কি করিয়া পাওয়া যাইবে বলিয়া হাহাকার করিতে থাকে।

রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থার অভাব

বহুকাল পূর্ব্বে যখন চন্দননগর ও তাহার লাগাও কিছু জমিজায়গা ফরাসী অধিকৃত, ভারতের অংশ ছিল, তখন ভদ্রেশ্বর হইতে চন্দননগর যাইবার পথে কতকটা রাস্তার

মালিক বৃটিশ অথবা ফরাসী এই লইয়া একটা মতদ্বৈধ ছিল। ফরাসীরা বলিত উহা বৃটিশ অঞ্চল এবং বৃটিশরা বলিত উহা ফরাসী এলাকা। এইরূপ মালিকানা সংক্রান্ত কলহ থাকাতে বৃটিশ বা ফরাসী কেহই ঐ রাস্তাটি মেরামত করিবার ভার গ্রহণ করিবার দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত ছিল না। ইহার ফলে ঐরাস্তা এক সময় প্রায় ১৫।২০ বৎসর কেহই মেরামত করে নাই এবং রাস্তার অবস্থা হইয়াছিল গোলার আঘাতে জর্জ্জরিত রণক্ষেত্রের মত চার পাঁচ ফুট গভীর গর্ত্তে আবৃত। কাহাকেও ঐ সিকি মাইল পথ গাড়ী চালাইয়া যাইতে হইলে সময় লাগিত ত্রিশ, চল্লিশ মিনিট অর্থাৎ গাড়ীর গতিবেগ হইত ঘণ্টায় অর্দ্ধমাইল। বর্ত্তমান কলিকাতার অধিকাংশ বড় রাস্তার অবস্থা ঐ ভদ্রেশ্বর-চন্দননগরের বেমালিক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের তুলনায় কিছুটা ভালো হইলেও খুব কিছু উন্নত নহে। দুই ফুট গর্ত্ত অনেক রাস্তাতেই প্রায় প্রতি পাঁচ গজে দশবারটি দেখা যায় এবং তাহার সংস্কারচেষ্টা কিছু হইতেছে বলিয়া কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছেনা। সুতরাং এই ভাবে পড়িয়া থাকিতে দিলে শীঘ্রই দুইফুট যাইয়া পাঁচ ফুটে দাঁড়াইবে এবং রাস্তা দিয়া আর গাড়ী চলা সম্ভব হইবে না। গাড়ী (মোটর চালিত) চালাইতে হইলে গাড়ীর মালিকদিগকে যে রাস্তা ব্যবহারের ট্যাক্স দিতে হয় তাহা বাৎসরিক প্রায় দুইশত টাকা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যদি ২০০০০। ৩০০০০ গাড়ী কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে তাহা হইলে পঞ্চাশলক্ষ টাকা সেই গাড়ীগুলির জন্য রাস্তা ব্যবহারের ট্যাক্স দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু গাড়ী গর্ত্তে পড়িয়া নানাভাবে জখম হয় ও ভাঙ্গিয়া যায়। এই সকল ক্ষতির জন্য রাস্তা মেরামতকারীগণই দায়ী। অথচ তাঁহাদের কেহ কিছু বলিতেছে বলিয়া শুনা যায় না। মালিকদিগের একটি অটোমবাইল এসোসিয়েশন অফ ইষ্টার্ণইণ্ডিয়াও আছে বলিয়া সকলে জানেন। তাঁহারাও রাস্তা মেরামত না করার জন্য কোন প্রকার কিছু করিতেছেন বলিয়া শুনা যায় না। কিন্তু গাড়ীও ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং [illegible] তাহা অপেক্ষা আরও অধিক অব্যবহার্য্য হইয়া যাইতেছে। ট্যাক্সও সকলে শান্ত ও সুবোধ বালকদিগের মত দিয়া চলিয়াছেন। জাতীয় জীবনে জনসাধারণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা যাঁহারা করেন তাঁহাদের দায়িত্ববোধের অভাবের জন্যে নিজেদের কোন অসুবিধা হইতেছে না। এইরূপ অবস্থা জাতির উন্নতির দিক দিয়া একান্তই ক্ষতিকর। গাড়ীর মালিকগণ প্রথমতঃ বৎসরে ২০০। ৩০০ শত টাকা দিতেছেন এবং রাস্তার অবস্থার জন্য গাড়ী ভাঙ্গিয়া মেরামতের খরচ আরও বাৎসরিক ৪০০।৫০০ শত টাকা খেসারত দিতেছেন। ইহার উপরে আবার রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিলে বহুস্থলেই প্রতিবার গাড়ী রাখার জন্য চার আনা আট আনা আদায় করা হইতেছে যাহা বাৎসরিক ১৫০।২০০ শত টাকায় দাঁড়ায়। গাড়ী চালাইবার সকল খরচ বাদ দিয়া তাহা হইলে বৎসরে হাজার খানেক টাকা খরচ হইতেছে ট্যাক্স দাঁড়াইবার মাশুল ও ভাঙ্গাগাড়ী সারাইবার জন্য। রাস্তা ঠিকভাবে মেরামত হইলে ইহার অর্দ্ধেক টাকা অন্ততঃ বাঁচিয়া যাইত।

ধর্মের মুখোস পরিয়া পাপের আত্মগোপন প্রচেষ্টা

অতি পুরাকাল হইতেই চোর ডাকাত পাপাত্মারা সাধু সাজিয়া নিজ নিজ অপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে এবং সরল প্রকৃতির মানুষ ঐ সকল সাধুদিগের সাধুতার মিথ্যা অভিনয়ের পশ্চাতে লুকানো যে পাপকার্য্যের ও অপরাধপ্রবণতার আবেগ তাহা সহজে দেখিতে পাইতেন না। ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া ও ন্যায়পরায়ণতার অভিনয় করিয়া ঐ সকল দুষ্টলোকেরা মানুষের মনে বিশ্বাস জাগ্রত করিত যে তাহারা সকল অন্যায়ের বাহিরে থাকিয়াই জীবনযাপন করে এবং তাহাদের উপর নির্ভর করিলে কাহারও কোন প্রকার অপরাধের সহিত ঘনিষ্ঠতা কখনও হইতে পারিবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ জাতীয় ব্যক্তিগণ সকলপ্রকার প্রবঞ্চনা, পরধনলুণ্ঠন, বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাপর পাপ কর্ম্ম পূর্ণ উদ্যমে করিয়া চলিত যাহার পরিণামে প্রতারিত, উৎপীড়িত

হতাহত ও হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদিগকে অশেষ লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ করিতে হইত। এখনও বহুঠগ, প্রবঞ্চক, গুপ্তচর ও দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি সাধুতার অভিনয় করিয়া ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধ আকারে দেশের মানুষ ও সমগ্র জাতির সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ভারতে সহস্র সহস্র পাপকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ও আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচর ঘোরাফেরা করিতেছে যাহাদের গেরুয়াবসনের ছদ্ম-বেশের আড়ালে রহিয়াছে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধনের সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। বিদেশী শত্রুর চরেদের কার্য্য সাধারণ লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আহরণ করিয়া তাহাদেরই মাতৃভূমির বিরুদ্ধাচরণ [] করা। কেহ সাজিয়াছে শিক্ষক, ব্যবসাদার, কেহ চিকিৎসক কেহবা, গৈরিকবসনাবৃতদেহ মুণ্ডিতমস্তক সন্যাসী। সকলেই গোপনে করে একই কার্য্য। ভারতের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কার্য্য। গোপনে নানা বিষয়ের খবর সংগ্রহ। জনসাধারণের মনে দেশ নেতাদিগের সম্বন্ধে অবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করা এবং বিদেশীকে বন্ধু বলিয়া মানিয়া লইতে শেখান। আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার শিক্ষা করিয়া এদেশের দেব দেবীর প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের একান্ত নিজের লোক সাজিয়া বসাই উদ্দেশ্য। যাহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা অবশ্য বলিলেন "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ" কিন্তু সে আর কয়জনই বা? অধিকাংশ লোকই বিদেশীদিগের কণ্ঠে শ্যামা সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ, হতবাক। আর সেই অধিকাংশরাই সরল চিত্তে তস্করদিগের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর গুণমুগ্ধ মার্শাল সাহেব

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

১৮২৯ সালের ১লা জুন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তিনি বারো বছরের কিছু বেশী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি পান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী তখন ক্যাপটেন জি, টি, মার্শাল সাহেব যিনি বিদ্যাসাগর মশাইকে আগে থেকেই চিনতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্ডিতের পদ খালি হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওই পদের জন্য আবেদন করলেন।

১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলেন। মাইনে মাসিক ৫০ টাকা। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি মার্শাল সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত শেখেন। মার্শাল সাহেব ভাল বাংলা জানতেন। বিদ্যাসাগর মার্শালকে বাংলায় চিঠি লিখতেন। ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে একদিন বিদ্যাসাগর বাড়ীতে এক আত্মীয়ের অসুখের জন্যে কলেজে যেতে পারলেন না। তিনি মার্শাল সাহেবের কাছে এক চিঠি পাঠালেন। চিঠিখানা বাংলায় লেখা হয়েছিল।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

সবিনয় নিবেদনং

অদ্য আমার পিতৃব্য পুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারিবার ভেদ হইয়াছে। ২০ ড্রপ লডেনস্ দেওয়াতে আপাতত প্রায় এক ঘন্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। অতএব তাঁহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক, সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না ক্রটিমার্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮শে নভেম্বর ১৮৪৩

আজ্ঞাধীন:
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মনঃ

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার এফ জে মোএটের আলাপ করিয়ে দেন। ডাক্তার মোএট তখন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী। ১৮৪৬ সালের মার্চ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদটি শূন্য হয়। মোএট সাহেব এই পদের জন্য মার্শাল সাহেবকে এক যোগ্য লোকের নাম সুপারিশ করতে বললেন। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দিতে অনুরোধ জানালেন। বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী পাবার আগেই এই পদ গ্রহণে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন ফোর্ট উইলিয়ামের এই চাকরী ছেড়ে যেতে চাই না। মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজে যোগ দিতে বারবার বিদ্যাসাগর মশাইকে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর মশাই তখন জানালেন, যদি তাঁর মেজ ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত করা হয় তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দিতে পারেন। মার্শাল সাহেব দীনবন্ধু ন্যায়রত্নমশাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত করলেন আর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের জন্যে মোএট সাহেবের কাছে বিদ্যাসাগরের নাম সুপারিস করেন।

১৮৪৬ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদের জন্যে ইংরাজী আবেদন পত্র পাঠান। এই আবেদন পত্রের সঙ্গে মার্শাল

সাহেবের এক প্রশংসাপত্র ছিল। প্রশংসাপত্রটি এইরকম :

Certified that Iswar Chandra Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengalee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanskrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since by private study acquired a very considerable degree of knowledge of the English Language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanskrit College for the last four years,in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and feedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition and high respectability of character.

G. T. Marshall
Secretary, College

College of Fort William
28 th March 1846

মিঃ মোঁএট বিদ্যাসাগর মশাইকে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। সেটা ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাস। তখন ভাল বাংলা বই ছিল না। সিভিলিয়নরা বাংলা শেখার ভাল সুযোগ পেতেন না। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরমশাইকে অনুরোধ করেন. তিনি যেন বাংলা বই রচনার কাজে হাত দেন। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগর মশাইকে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষার বই বাংলায় অনুবাদ করার জন্যেও উৎসাহ দেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম বই বাসুদেব চরিত। এখন সে বই পাওয়া যায় না। এরপর তিনি হিন্দি বেতালপচ্চীসী অবলম্বনে লেখেন বেতালপঞ্চবিংশতি।

রসময় দত্ত ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পঠন পাঠনে আমূল সংস্কার করতে চাইলেন। কিন্তু রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটল। বিদ্যাসাগর মশাই ১৮৪৭ সালের জুলাই সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিলেন। এরপর দেড় বছর তিনি কোন সরকারী কাজ করেন নি। ফোর্টউইলিয়াম কলেজে রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের পদ খালি হল। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিযুক্ত করলেন। সেটা ১৮৪৯ সালের ১লা মার্চ।

মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষার পরীক্ষক হন। তিনি বিদ্যাসাগর মশাইকে সংস্কৃত বিষয়ের প্রশ্ন তৈরী করতে অনুরোধ জানান। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত বিষয়ের প্রশ্ন পত্র তৈরী করেন।

বিদ্যাসাগরমশাই এক প্রেস কেনেন। এর জন্য তাঁকে টাকা ধার করতে হয়। তিনি মার্শাল সাহেবকে জানান একটা প্রেস কিনেছি, যদি ছাপাবার কাজ থাকে আমাকে দেবেন। মার্শাল সাহেব একথা শুনে খুশী হয়ে বললেন বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বইটি পড়াশোনা করে। বইটির কাগজ জঘন্য, ছাপার কাজ নিম্নমানের, বানান ভুলও অনেক। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী থেকে অন্নদামঙ্গলের পাণ্ডুলিপি এনে বইটি ছাপাবার ব্যবস্থা করুন। ছশো টাকা দিয়ে আমি একশ বই কিনব। এইসব বই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের দেওয়া হবে। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তাঁর প্রেসে ছাপালেন। মার্শাল সাহেব ৬০০ টাকা দিয়ে একশ বই কিনলেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ধার শোধ হয়ে গেল।

শ্রদ্ধেয় রামগতি ন্যায়রত্ন মশাই লিখেছেন মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন ততই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম করিতেন না।

বিপ্লবী কবি বিজয়লাল

মাধব পাল

নদীয়ার কবি বিজয়লালকে চারণ কবি বলেই অনেকে আখ্যাত করেছেন। আমার মতে তিনি শুধু চারণ কবিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিপ্লবী কবি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিকরূপে একজন গান্ধীবাদী হলেও তিনি বিপ্লবী-মনোভাবাপন্নও ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বানী ও ঋষি অরবিন্দের জীবনাদর্শে তিনি একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুও তাঁর এই বিপ্লবীমনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি আই. সি. এস. ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা সর্ব্বপ্রথম পত্র দ্বারা বিজয়লালকেই জানিয়েছিলেন।

তাঁর সন্ধ্যাহারার গান ও আফ্রিকা কবিতায় সুর ক্ষুব্ধ কবিমনের অভিব্যক্তিতে পূর্ণ। গত কয়েক বছরের অনেক কবিতাতেও তাঁর সেই ক্ষুব্ধমনের তিক্ততা পরিস্ফুট। জীবনের শেষদিকে এসে যেন যৌবনের সেই চেতনায় আবার উদ্বুদ্ধ হতে চাইতেন। তাঁর 'শেষ মিনতি' কবিতায়—

* * *

'আরাম কেদারা ফেলে চলেছি দুর্গম শৈল পথে
আমরা বিপ্লবী,
ধ্যান চক্ষে দীপ্ত পায় শাপমুক্ত দেশমাতৃকার
দিব্যোজ্জ্বল ছবি।'

এই ছিল তাঁর যৌবনের সংগ্রামী-মনের পরিচয়। এ কবিতারই শেষদিকে আছে—

'জীবন সায়াহ্নের রক্তে, হে যৌবন জ্বালো শেষবার
আগুনের শিখা,
শেষ যুদ্ধ করে যাবো মানুষের ধূলিমাখা ভালে
দিতে রাজটীকা।'

স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর পরেও মানুষের অশেষ দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি ব্যথিত ছিলেন। ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী মানুষের সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। একান্ত আলোচনায় তাঁর সেই বেদনার আভাষ পাওয়া যেতো। প্রায়ই বলতেন নাট্যকার ইবসেনের The enemy of the the people ও Pillars of the society নাটক দুটির কথা। নাটক দুটি তিনি বার বার পড়তে বলতেন। নাট্যকার ইবসেনকে তিনি সেরা বিপ্লবী বলে উল্লেখ করতেন।

রাজনীতির নামে ব্যক্তি হত্যা ও সন্ত্রাসের বিকাশে তিনি তিক্ত বিষাদের সুরে বলেছেন:—

স্বপ্নের গুহায়

মানুষ এখনও বন্য, অসভ্য, বর্ব্বর।
সেই বর্ব্বরতা আজ হিংসার ভিতর
গর্জমান রক্তপ্লুত শ্যাম বঙ্গদেশে।

মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পূর্ব্ব হতেই কবি নানারকম অসুখে ভুগেছিলেন। একে তো বয়সের ভারে ক্লান্ত। দেহের রক্তে ছিল, চিনির মাত্রাধিক্য। ছিল শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা। এর উপর মৃত্যুর একবছর আগে পা ভেঙে বেশ কিছু দিন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি ছিলেন। সভা সমিতিতে অনেকক্ষণ বক্তৃতা দিলেও ক্লান্ত হতেন।

তবু তাঁর মনে ছিল অদম্যশক্তি। যার ফলে তিনি

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন এবং উপস্থিত হতেন। অপরকেও নিজের যৌবনোচিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। গত বৎসর পূজার পরেও একটি কবিতায় লিখেছেন—

ভগ্ন উরু, সঙ্গীহীন জীবন সন্ধ্যায়।
তা নিয়ে কিসের ক্ষোভ? আজও বালকায়
আলোকে শিশিরবিন্দু শারদ প্রভাতে।
শেফালী বাতাসে গন্ধ ঢালে স্নিগ্ধ রাতে।
শুভ্র জ্যোৎস্নায় ফুল্ল আজিও শর্ব্বরী,
জীবন ডাকিছে আজও বাঁজায়ে বাঁশরী।
সুন্দরের পায়ে যায় সমর্পিত প্রাণ
কোন্ দুঃখে চিত্ত তার হবে পরিম্লান?

আধুনিক গদ্য কবিতায় তাঁর আপত্তি ছিলনা। তবু নিজে সছন্দ কবিতাই লিখতেন, পছন্দও করতেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রচীন কবিদের শেষের সারির একজন কবিসত্তা অন্তর্হিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক দুপুরবেলা

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১৩২৫ সনে সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। ১৩২৬ সনের শ্রাবণে ভারতী পত্রিকায় আমার 'বুলবুল' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ভারতী-কার্য্যালয়ে ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে আমাকে কবিবরের ভাইপো সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখতে পেতেন। তিনি একদিন আমাকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে যান এবং জোড়াসাঁকোয় তাঁদের বাড়ীতে কবিবরের সাথে পরিচিত করান্। ঐ কবিতাটি পাঠে সুধীন্দ্রনাথ খুব প্রীত হয়েছিলেন, তাই তিনি আমৃত্যু আমাকে ভালবেসেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হয়ে প্রণামান্তে চলে আসার সময় 'আবার এসো' বলে' স্নেহে বিদায় দিয়েছিলেন। এরপর বহুবার আমি রবীন্দ্রভবনে গেছি।

সম্ভবতঃ ১৩৩১।৩২ সনের প্রথমভাগে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা হয়ে ময়মনসিংহ শহরে যান এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তটে মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের Alexander Castle এ কয়েকদিন অবস্থান করেন। তিনি তথাকার স্বনামধন্য নেতা ডাঃ বিপিনবিহারী সেনকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি খবর পেয়েই দুপুর বেলায় ময়মনসিংহ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি! তিনি প্রাসাদের দোতলায় খোলা বারেন্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। প্রণাম করার পর আমাকে বসতে বলেই দুঃখের সঙ্গে বললেন—"আমার সাধের স্ব[illegible] ভেঙে যেতে বসেছে, যতীন্। শান্তিনিকেতনকে আর বুঝি টিঁকিয়ে রেখে যেতে পারবোনা আমি!"

আমি বিনীতভাবে বললাম, "আপনি নোবেল প্রাইজ ১লাখ ২০ হাজার টাকা পেলেন, তবু কেন ভাবছেন।" "খরচপত্র তবু চালাতে পারছিনা। তুমি যদি পূর্বময়মনসিংহের জমিদারদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য চেয়ে এনে দিতে পারো, তবে অশেষ উপকৃত হবো আমি।"

আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললাম, "রথীবাবু যদি আগামীকাল প্রাতের ট্রেনে গৌরীপুরে যান, তবে আমি তাঁকে ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবো এবং মোটর গাড়ীতে গৌরীপুর, কালীপুর ও তরফ, কৃষ্ণপুর, গোলকপুর, বাসাবাড়ী ভবানীপুর ও রামগোপালপুর জমিদারবাড়ীগুলিতে রথীবাবুকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে সাহায্যপ্রার্থী হবো। রথীবাবুকে কিছুই বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলবো।" এতে সন্তুষ্ট হয়ে কবিবর রথীবাবুকে ডেকে আমার কাছে পরদিন যেতে বলেছিলেন এবং আমিও তদ্রূপ কার্য্য করেছিলাম। এভাবে আশানুরূপ না হলেও অল্প কিছু সাহায্য সংগ্রহ করে রথীবাবুকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

রথীবাবু কৃষ্ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরীর বাড়ীতে জলযোগ করেছিলেন। পরে গৌরীপুরের জমিদারভবনে দুপ্রহরে আহারাদি করে ময়মনসিংহে কবিবরের কাছে ফির যান। আমিই ষ্টেশনে গিয়ে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।

আমরা ২।৩ বার গৌরীপুরে খুব ঘটা করে' কবিবরের জন্মজয়ন্তী করেছিলাম। একবারের সভাপতি ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং আরেকবারের সভাপতি শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী হয়েছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের হাতেও শান্তিনিকেতনের জন্য আরো কয়েকশত টাকা পাঠিয়েছিলাম।

বৃদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথকে চাঁদপুর হয়ে ঢাকা হয়ে ময়মনসিংহে অর্থ সংগ্রহ করতে যাওয়াটা বড়ই দুঃখজনক। আমার আজ ৮৫ বৎসর বয়সে অতীতের এসব কাহিনী ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের জীবন চিত্র

সুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

প্রাচীনকালে দিল্লীর নিকটে ছিল কুরুরাজ্য, ইহার রাজধানীর নাম ছিল হস্তিনাপুর। সে রাজ্যের রাজা ছিলেন শান্তনু। তাঁহার রূপ গুণ ছিল অতুলনীয়। স্বয়ং গঙ্গাদেবী মানবীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সর্ত ছিল রাজা গঙ্গাদেবীর কোন কাজে বাধাসৃষ্টি করিতে পারিবেন না। অন্যথায় দেবী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। রাজা শান্তনু এসর্তে সম্মত হইয়াছিলেন।

স্বর্গের আটজন দেবতা মহর্ষি বশিষ্টের শাপে স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবীর পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন। জন্ম মাত্রই গঙ্গাদেবী এক একটা করিয়া সাতটি ছেলেকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়াছিলেন। স্বর্গের আটজন দেবতা অর্থাৎ অষ্টবসুর মধ্যে সাতজন অর্থাৎ সপ্তবসু শাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবীর কার্যে অত্যন্ত শোকাতুর রাজা শান্তনু সর্তভঙ্গের ভয়ে কোন প্রতিবাদ করেন নাই। অষ্টমবারে দেবীর আর একটি ছেলে জাত হওয়া মাত্র তিনি তাঁহাকেও নদীর জলে বিসর্জন দিবার উদ্যোগ করিতেই; রাজা তৎক্ষণাৎ দেবীর বক্ষ হইতে ছেলেটিকে ছিনাইয়া লইলেন। সর্ত ভঙ্গ হওয়ায় গঙ্গাদেবী রাজাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে অষ্টম ছেলেটি শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিতে পারিলেন না।

যথাকালে ফিরাইয়া দেবার সর্তে অষ্টম ছেলেটীকে লইয়া গঙ্গাদেবী অন্তর্ধান করিলেন। যাবার কালে বলিলেন এই বালকটি অসাধারণ মানুষ হবে। একদিন নরনাথ শান্তনু মৃগয়া হইতে ফিরিবার পথে দেখিতে পাইলেন, এক অপরূপ সুন্দর বালক তীর-ধনুক হাতে গঙ্গার প্রবল প্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বালকের অসীম সাহস দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। এমন সময়ে গঙ্গাদেবী রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—নরনাথ! এই বীর বালকটি আপনারই ছেলে। এর নাম হইল দেবব্রত, স্বয়ং পরশুরাম বালকটিকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, দেবগুরু বৃহস্পতি ইহাকে শাস্ত্রজ্ঞান দান করিয়াছেন। দেবব্রতের শিক্ষা শেষ হইয়াছে। তাই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলাম, একথা বলিয়াই গঙ্গাদেবী অদৃশ্য হইলেন।

নরনাথ শান্তনু দেবব্রতকে সিংহাসন দান করিয়া বাণপ্রস্থে যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। যমুনানদীর ঘাটে খেয়া পারাপার করিতেছিলেন ধীবররাজের কন্যা মৎস্যগন্ধা, রাজা শান্তনু নদী পার কালে ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন। পরাশর ঋষি তীর্থভ্রমণ হইতে যমুনার ঘাটে উপস্থিত হইয়া এই মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরাশর ঋষি এবং মৎস্যগন্ধার মিলনে যমুনার দ্বীপে তাঁহার এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুত্র জন্মে। দ্বীপে জন্ম বলিয়া তাঁহার নাম হয় দ্বৈপায়ন, ইনি বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম হয় বেদব্যাস। অতএব তাঁহার পূর্ণনাম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সেই প্রাচীন আমলে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিলনা, একই মেয়ের একাধিক বিবাহের রীতি ছিল। তাই বলিয়া ধীবররাজ মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, এই সর্তে, ইহার গর্ভজাত ছেলেই কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অধিকারী হইবে। রাজা শান্তনু ভাবিলেন, দেবব্রতের মত গুণধর ছেলে থাকিতে তা কি সম্ভব?

রাজা শান্তনুর মনোগতভাব দেবব্রতের কানে পৌছিল। তিনি ধীবররাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি কখনও সিংহাসনের দাবী করিবেন না। ধীবররাজ বলিলেন,

তুমি সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিবে, তা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমার ছেলেরা বা নাতিরা সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিবাদ করিবেনা, এসমস্যার সমাধান কি? একথা শুনিয়া দেবব্রত ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি চিরকুমার থাকিব, বিবাহ করিব না। মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর ছেলেদের সেবকভাবে জীবন যাপন করিব। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবব্রতের নাম হয় ভীষ্মদেব। পুত্রের ভীষণ প্রতিজ্ঞা অসাধারণ ত্যাগ এবং পিতৃভক্তির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া রাজা শান্তনু তাঁহাকে বর দিলেন তাঁর হবে ইচ্ছামৃত্যু। ভীষ্মদেব ভীষণ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, এই সুউচ্চ আদর্শের জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বিচিত্রবীর্য এবং চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীর দুই পুত্র জন্মিল। বিচিত্রবীর্যকে ভীষ্মদেব রাজসিংহাসন দান করিলেন। এবং কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বা এবং অম্বালিকাকে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। অম্বার পুত্র জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, এবং অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু। অল্প বয়সে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়। পিতামহ ভীষ্মদেব ইহাদের লালনপালন করেন। জন্মান্ধ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজসিংহাসন পাইলেন না। পাণ্ডুই রাজ্য পাইয়াছিলেন। গান্ধারদেশের (বর্তমান কান্দাহার) রাজকন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশতপুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যা জন্মে। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী। কুন্তীর তিন পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন. মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল এবং সহদেব। পাণ্ডুর পুত্রগণ জ্ঞানী এবং ধার্মিক ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা প্রায় সকলেই অতিশয় দুদান্ত ছিলেন, তাই এদের নামের পূর্বে "দু" বা এই জাতীয় একটা কিছু থাকিত।

পূর্বপুরুষ রাজা কুরুর নামানুসারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বলা হইত কৌরব, আর পাণ্ডুর পুত্রদের পিতার নামানুসারে বলা হইত পাণ্ডব। অল্প বয়সেই রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হয়, ভীষ্মদেব জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। (মহাভারত-আদি পর্ব সংক্ষেপীকৃত এবং সরলীকৃত)

কুরুরাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন কুরুবৃদ্ধ-পিতামহ ভীষ্মদেব। তিনি বহুপূর্বেই সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে রাজ্য ভাগ লইয়া বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ অযাচিতভাবে কুরুরাজসভায় গিয়া পরম বাগ্মীতার সহিত সন্ধিকরার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন। দুষ্টমতি দুর্যোধন তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, মুখে নীতি কথা বলিতেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে অধর্ম নীতিই সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেন—"আমি স্বাধীন নহি, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য হয় না। আপনারা দুর্মতি দুর্যোধনকে শাস্ত করুন"। "শ্রীকৃষ্ণঃ বলিলেন—আপনারা কুরুবৃদ্ধগণ ঐশ্বর্যমদমত্ত দুর্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত অন্যায়াচরন করিতেছেন—"সর্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহানয়মতিক্রমঃ" ইত্যাদি (ঐ—উদ্যোগ পর্ব)। হে রাজন! দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন। আপনার দোষে যেন ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল না হয়।"

সন্ধির সকল চেষ্টা বিফল হইল। দুর্যোধন বলিলেন, "মতঙ্গ মুণি বলিয়াছিলেন, বরং মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবু ইহজনমে কাহারও নিকট নত হইবেননা—অপ্যপর্বনিভজ্যেত ন নমেদিহ কস্যচিৎ।" ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বরং যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব, জীবন থাকিতে—"বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' সে সময়ে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"কালপক্কমিদং মন্যে সর্বং ক্ষত্রং জনার্দনে।" অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষত্রিয়েরা কালপক্ক হইয়া উঠিয়াছে (মহাভারত-উদ্যোগপর্ব, ১২৭।৩২) কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন—"কালপক্কমিদং সর্বং সুযোধন বশানুগম" (ঐ—১৩২) অর্থাৎ-কালবশে দুর্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহারা কালপক্ক হইয়াছে।

মহাভারতীয় এই উদ্যোগপর্বের প্রধান নায়ক হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কুরুক্ষেত্রে মহাকালরূপে

আবির্ভূত হইলেন—"কালোঽস্মি লোক ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো" ইত্যাদি (গীতা—১১।৩২)। আজ হইতে প্রায় চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মঘানক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিদিন উভয় পক্ষের এক অক্ষৌহিনী ধ্বংস হইয়া আঠার দিনে উভয়পক্ষের আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য ধ্বংস হইয়াছিল। কুরু পক্ষের এগার অক্ষৌহিনী, এবং পাণ্ডব পক্ষের সাত অক্ষৌহিনী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। অক্ষৌহিনীর সংখ্যানুসারে এক অক্ষৌহিনীতে ছিল—হাতী ২১৮৭০টি, অশ্ব ৬৫৬১০টি, রথ ২১৮৭০ খানা পদাতিক সৈন্য ১০৯৩৫০ জন। কুরু পক্ষে কেহই জীবিত রহিলেন না। এই পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব। পাণ্ডব পক্ষে বাঁচিয়া রহিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, এবং পঞ্চপাণ্ডব (মহাভারতের—ভীষ্ম পর্ব)।

সেকালের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন —

"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
(মহাভারত—সভাপর্ব)

কুরু বৃদ্ধপিতামহ শরশয্যায় শয়ান, অন্তিমকালে দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতিরা তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। তখন কুরুবৃদ্ধ পিতামহ বলিয়াছিলেন—বৎস যুধিষ্ঠির এই আমার সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছ, ইঁহাকেই দেব বলিয়া জানিবে। ইনি আদি পুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইনি নিজ মায়াবলে সমস্ত লোক (এখানে লোক শব্দ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—নরলোক দেবলোক, ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, ধ্রুবলোক ইত্যাদি) মোহিতকরিয়া গোপনরীতিতে যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। তোমরা যাহাকে আত্মীয় জ্ঞান করিতেছ, তিনি স্বয়ং ভগবান। ইহার মহিমা দেবর্ষিনারদ, সাক্ষাৎ ভগবান কপিলদেব অবগত আছেন—"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান" ইত্যাদি (শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।১৮—২২)।

রণক্ষেত্রে যখন আমার শাণিত শরসমূহ শ্রীকৃষ্ণেরগাত্র বিদ্ধ করিতেছিল, তখন তাঁহার হস্তে ঘূর্ণিত সুদর্শন-চক্র, উত্তরীয় বসন অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট; ভূতলে লুণ্ঠিত, তাঁহার পদভরে মেদিনী কম্পিত, রক্তে তাঁহার অঙ্গ আপ্লুত অবস্থায় তিনি মদভিমুখে ধাবিত। ইহা আমার প্রতি তাঁহার অসীম দয়া, সেই ভক্তের ভগবান, আজও আমার গতি হউন—"প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান গতির্মুকুন্দঃ ইত্যাদি (ঐ—১।৯।৩৭—৩৮)। আমার অন্তিমকালে আমার যাহা কিছু নিষ্কাম মতি সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম—"ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণাভগবতি সাত্বত পুঙ্গবে বিভূম্নি" ইত্যাদি (ঐ ১।৯।৩২)। ভক্ত অর্জুনের রথ রক্ষার জন্য এক হস্তে অশ্বরজ্জু এবং অন্য হস্তে বেত্রদণ্ড ধারণ করিয়া তিনি সারথির হেয় কার্য করিয়া ছিলেন (সেকালে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথির কার্য অত্যন্ত অপমানজনক ছিল) এই শোভা দর্শন করিয়া যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার এই মুমূর্ষু সময়ে সেই অপরূপ রূপেই আমার চিত্ত মগ্ন হউক—"ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতাগতাঃ স্বরূপম্" ইত্যাদি (ঐ—১।৯।৩৯)। জগতের আত্মা সেই ভগবান আজ আমার নয়ন সম্মুখে—"মমদৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা" (ঐ—১।৯।৪১)।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রতি সমদর্শী হইলেও একান্ত-ভাবে ভক্তাধীন। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং আগমন করতঃ আমাকে দর্শন দিয়াছেন—"যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোদর্শনমাগতঃ" (ঐ—১।৯।২৩)। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এই কলেবর ত্যাগ করি ততক্ষণ ইনি আবার সম্মুখে অবস্থান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা—অপরে যাহাকে ধ্যান করেন, আমি নিজ চক্ষু দ্বারা যেন তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্তি, সুপ্রসন্ন অরুণ-লোচন-শোভিত হাস্যময় বদনারবিন্দ দর্শন করিতে

করিতে দেহত্যাগ করি…"প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ" (ঐ—১।৯।২৩—২৪)।

এভাবে প্রার্থনা করিয়া ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—অন্তিম কালে আমার নিষ্কাম মতি সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি স্বরূপানন্দে মগ্ন আছেন, ইঁহা অপেক্ষা বিরাট আর কেহ নাই, লীলা করার জন্য যিনি প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করেন, প্রকৃতি বা মায়া দ্বারাই সৃষ্টিলীলা চলিতে থাকে কিন্তু তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন হন না—"স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ" ইত্যাদি (ঐ—১।৯।৩২) অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক—"রতিরস্তু মেঽনবদ্যা" (ঐ—১।৯।৩৩)। ভীষ্মদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ করিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত না হইয়া অন্তরেই লীন হইল—"আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ" (ঐ—১।৯।৪৩)। ভীষ্মদেব নিরঞ্জন পরব্রহ্মে মিলিত হইলেন—"ভীষ্মং ব্রহ্মণি নিষ্কলে" (ঐ—১।৯।৪৪) [বসুমতি সাহিত্য মন্দিরের শ্রীমদ্ভাগবত বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকৃত এবং সরলীকৃত]

রবি কবির ভাষায় যেন কুরুপিতামহ ভীষ্মদেবের বাণী—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ,
তাই এত মধুর।"
"জগতে আনন্দ যজ্ঞে,
আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন।"
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাইতো আমি এসেছি এ ভবে।"

পশ্চিম বাংলার বাউল মেলা

সুধীর রক্ষ

সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বাংলার গীতি কাব্যে প্রধান তিনটি চরিত্র হল সখী, রাধা ও কৃষ্ণ। মূল বিষয় হল বৈষ্ণব কেলি রহস্য। রাধা কৃষ্ণের লীলা বিলাস কবি জয়দেবের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করায় তাঁর রচিত গীতগোবিন্দ আমাদের কাছে চির নূতন। গীতগোবিন্দ আজও অমর। তাই প্রতি বৎসর জয়দেবের তিরোভাব দিবসে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক মেলা বসে। দূর গ্রাম থেকে আসে বৈষ্ণব ভক্ত ও বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-মুসলমান। একতারার সাহায্যে গায়ক গায়িকার অন্তরের গভীরতম প্রেম নানাভাবে প্রকাশ করে থাকেন। এঁদের একনিষ্ঠ ভক্তি নিবেদন পালা কয়েকদিন ধরে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। কবি জয়দেবের স্মরণে বাউল মেলা শুরু হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রী পঞ্চমী তিথিতে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম বামাদেবী, পিতা ভোজদেব কেন্দুলী, গোস্বামী বংশের এক ত্যাগী ধার্মিক।

শৈশবে জয়দেবের ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। নয় বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। তখন তাঁর মনে এল এক নতুন ভাব। বুদ্ধদেবের মত তিনিও গভীর রাতে পিতামাতাকে প্রণাম করে গৃহত্যাগ করলেন। পুরীর পথে তাঁর সঙ্গে মাধবাচার্য্যের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি জয়দেবকে শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও ছন্দ শিক্ষাদান করেন। শ্রী চৈতন্যদেব স্বীকার করেছেন যে জয়দেব এক প্রকৃত বৈষ্ণব। জয়দেব দেশে দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করলেন। আজও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিদিন তিন বেলা গীতগোবিন্দের কীর্তন করা হয়। বাংলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন জয়দেবকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। নানা দেশ পর্য্যটনকালে তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। গীতগোবিন্দ রচনা করার সময় তিনি তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীকে কৃষ্ণধ্যানে রাধিকারূপে বরণ করেন। পদ্মাবতী রাধামাধবের মালা গাঁথছিলেন, জয়দেব স্নান সেরে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন যে তাঁর অসমাপ্ত শ্লোক সমাপ্তিতে উজ্জ্বল। গীতগোবিন্দের চব্বিশটি গীতের মধ্যে মুগ্ধ মাধবঃ সর্গে দেখা যায় শ্রী কৃষ্ণ রাধার মান ভঞ্জন করতে গিয়ে বলেন:

স্মর-গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।

জয়দেব উল্লিখিত প্রথম ছত্র লিখে স্নান করতে যান। সেই সময় শ্রী কৃষ্ণ নাকি জয়দেবের বেশে মন্দিরে প্রবেশ করে শেষ পংক্তিটি লিখে যান। কবি আত্মহারা হয়ে স্ত্রীর চরণে রাধিকা ভেবে আশ্রয় নেন। স্থান-মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কেন্দুবিল্ব অর্থাৎ কেঁদুলীতে অজয় নদীর ধারে এক মন্দির মধ্যে একটুকরো টিনের ওপর কাঁচা হাতে রক্তে লেখা 'দেহী পদ পল্লব মুদারম'। এই লেখার পিছনে নানা কাহিনী থাকলেও বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ তীর্থ। District Census Hand book, Biarhum 1961 নিম্নাংশে উল্লেখযোগ্য:—

At present there is a number of temples all round including the temples and Akhras of the

Tantrics like Monohar Khepa. A large congregation of pilgrims as far as from southern India gather here during the mela at Makar Sankranti .

বিল্বমঙ্গল, জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও রায় রামানন্দ সহজিয়া ধর্মসাধনা করেছেন। সুফী ধর্মের সমন্বয়ে এই ধর্মের উৎপত্তি। সুফী সম্প্রদায় ও মুসলমান সহজিয়ারা বৈষ্ণব সহজিয়া মতে প্রভাবিত হওয়ায় বাউল ধর্ম বাংলার সাধারণ মানুষের নিজস্ব ধর্মে পরিণত। তাঁরা সাধারণ সমাজ থেকে দূরে আখড়া তৈরী করে গানের দ্বারা নিজেদের প্রকাশ করেন। ধর্ম তত্ত্ব আলোচনা ও সাধন সংকেত বাউল গানের মূল কথা। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের স্বতন্ত্র সাধন পদ্ধতি ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রণিধানযোগ্য। পদাবলী কীর্তনের আদি কবি জয়দেবকে গুরুস্থানে বসিয়ে বাউলরা নিবেদন করে তাদের ভক্তি। যারা ঘর বাঁধে না শীতকালে তাঁরা পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে সাত দিন ধরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সমবেত হয় অন্তরের টানে। নানা স্থানে চলে বাউলদের গান। একতারার ঝঙ্কারে বোল ফোটে। পায়ের ঘুঙুর ঝম ঝমিয়ে রঙিন ভরিয়ে দেয় আকাশ বাতাস। কবি জয়দেব স্মরণে বাউল এক ফোটা তাল খাগড়া দিয়ে গড়ে কত আখড়া। মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বাউলরা সব দল বেঁধে মেলা জমজমাট করে। গাছতলায় ঘর বাঁধতে দৌড়ে আসে। অজয়ের ধারে যখন কাশ ফুল আসে চাপ চাপ হয়ে, এলো মেলো দমকা বাতাসের সঙ্গে যখন উড়ে বালি তখন বাউলদের প্রধান মেলা বসে জয়দেবের কেঁদুলি গ্রামে। সাতদিন পর মেলা ভাঙতে ভাঙতে যায় কেঁদুলী থেকে সিউড়ির কাছাকাছি নগরীতে। পরে বাঁকুড়া ঘুরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার শ্যামতোড়া হয়ে তিলুরি, আড়া মধুকুণ্ডা, পুরুলিয়াতে গদী বেড়ো, শিলাবতী আর আসানসোলের কাছাকাছি মোহনপুর-কেঁদুলী মেলা হল শেষ বড় মেলা। ক্ষেপা ক্ষেপীর মেলায় বিকিকিনির হাট, গাছতলায় বাউলদের গান, যাত্রা, মাইলখানেক জুড়ে অসংখ্য দোকান পাট, মুষ্টিভিক্ষার চাল দিয়ে খোলা হয় লঙ্গরখানা শ্রীচৈতন্য পুরীধাম যাবার পথে মোহনপুরে নাকি বিশ্রাম করতে থামেন। আমি কিন্তু বাউল মেলার সম্যক পরিচয় পেতে এগিয়ে যাই পুরুলিয়ার গদীবেড়োর মেলার দিকে। মেলায় ঢুকতে না ঢুকতেই নজরে পড়ল মন্দিরের সোনার চুড়ো। রঘুনাথ জীউ কেশবজীউ, জোড়বাংলা মন্দিরগুলি নিয়ে দেবালয় চত্বর। জোড়বাংলার মন্দিরে কোন দেবতা নেই। টিলে পাহাড়গুলোর নামগুলি বেশ চমকপ্রদ যেমন হাতিচুড়ো, ঘোড়াচুড়ো, স্বর্গচুড়ো ইত্যাদি। গদীবেড়ার মেলায় আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। বাংলায় খাটঘর আচার্য্য পরিবার। ঘরের মধ্যে তাঁরা তামিল ভাষায় কথা কয়—যেন একখণ্ড দক্ষিণ ভারত পুরুলিয়ার মাটিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় দুশো বছর আগে পাকেট থেকে গরুর নারায়ণ সিংহ একবার তিরুপতি যান। সেখানে গোপাল আচার্য্যের সাধন ভজনে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কুলগুরু রূপে বরণ করেন। ১০৪ টি নিষ্কর মৌজা তিনি দান পান। তাই গোপাল আচার্য্য সশিষ্য মাদ্রাজ থেকে বাংলায় চলে আসেন। জঙ্গল সাফ করে প্রতিষ্ঠা করা হল মন্দির। কিন্তু মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পে দক্ষিণ ভারতের ছিটেফোঁটা ছাপ দেখলাম না।

গোটা বীরভূম তো হুমড়ি খেয়েই আছে বাউলদের গানে। এখানেও সেই বলরাম, মানিক, শ্যামাপদ বাউল। মাথায় পাগড়ি, পায়ে ঘুঙুর, হাতে একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে যেমন :—

'দমের মানুষ দমে চলে
আলের মানুষ আলের উপর
আর এক মানুষ গোপনে রয়
জেনে শুনে সাধন কর।

রবীন্দ্রনাথ বাউল পদাবলীর এক অনুরাগী নবীন বাউল। তিনি বলেছেন যে শিলাইদহে যখন ছিলেন বাউলদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। তাঁর

অনেক গানে অজ্ঞ রাগের সঙ্গে বাউল সুরের মিল আছে।

কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী মেলা বসে অজয় নদীর ধারে। অজয়ের এক পারে বীরভূম ওপারে বর্দ্ধমান। ওপারে নবগ্রাম থেকে রাত দিন বাস চলে দুর্গাপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। বীরভূম জেলার ইসলামাবাদ থানার ওপরে সিউড়ি, দক্ষিণে অজয় নদী, পুবে বোলপুর পশ্চিমে দুবরাজপুর। বাউলদের প্রধান মেলা দেখতে এবার আমি রওনা হই বোলপুর থেকে কেঁদুলীর পথে।

বোলপুর রেল ষ্টেশনের ধারে কয়েকটি বাস মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। বাসের এক কনডাক্টর আমাকে একটি বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে দিল। যাত্রীদের বিছানার গাদায় আমি বসেই আছি কিন্তু ড্রাইভার মহাশয়ের সাক্ষাৎ মেলা ভার। সন্ধ্যা সাতটা তখন, কেঁদুলী পৌঁছাতেও সময় নেবে প্রায় ঘন্টাখানেক। আরোহীরা সব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কীর্ণাহার থেকে যাত্রীরা সকলে উঠেছেন, সকলেই তাদের দেয় ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমি কেবল বোলপুর থেকে সেই রিজার্ভ বাসে আরোহী হয়েছি। রাত আটটায় আমিও অধৈর্য্য হয়ে যে বাস আগে যাবে সেই খানে স্থান সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠি। "শ্যামলী" নামে অপর এক বাসে সামনের দিকের এক আসন দখল করে রিজার্ভ বাসের দিকে যাই। তখন ড্রাইভার এসে কাজির কীর্ণাহার যাত্রীদের নিয়ে বাস চলল এবং সব বাস ছাড়িয়ে থামল এসে রাস্তার মোড়ে অর্থাৎ কেঁদুলী যেতে হলে সর্ব্বাগ্রে উক্ত বাস কেঁদুলী পৌঁছাবে। রাত আটটায় বাসের হেড লাইট জ্বলল—বাসেও তিল ধারণের স্থান নেই। মাঝ পথ দিয়ে বাস চলে ঘন্টায় পঁচিশ মাইল বেগে। গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য্য জ্যোৎস্নার আলোয় ফুটে উঠল। পথের দুধারে গাছের সারির মধ্যে কখন দেখা যায় লোকজন—বাসের ঘন ঘন হর্ণের আওয়াজে সরে যায় জঙ্গলের মধ্যে। ইলামবাজারে বাস থামল খানিকটা। পরে চলে এল সোজা কেঁদুলী। রাস্তার ধারে এক তোরণ মেলায় আসতে স্বাগত জানায়। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে চলেছি—দুধারে দোকান ঘর, হোটেল-রেস্তোরাঁ সার্কাস পার্টির তাঁবু, নাগরদোলা, ইত্যাদির এক ব্যাপক আয়োজন। জয়দেবের রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দির প্রাঙ্গণে দেখি বহু যাত্রীর সমাবেশ। যাত্রীরা সেখানে রাত কাটাতে প্রস্তুত হচ্ছেন কারণ এই অস্থায়ী মেলায় যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়ার মত বিশেষ কোন পাকা বাড়ী নেই। মন্দিরের পাশেই মোহন্তজীর এক দোতলা বাড়ী। সদর দরওয়াজার সামনে পুলিশের কয়েকটি তাঁবু। একজন পুলিশ এগিয়ে এল হাতে টর্চ লাইট নিয়ে দোতলার ঘরে মোহন্ত থাকেন। পুলিশকে সাথী করে করে কোন রকমে সিঁড়ির ভাঙ্গা ধাপগুলো অতিক্রম করা গেল। মোহন্তজীর ঘর তালা বন্ধ—সারি সারি ঘর কিন্তু কোনটি খালি দেখলাম না। নীচে নেমে দেখি প্রাঙ্গণের মাঝে খড়ের চাল দেওয়া একটি চত্বর। যাত্রীরা সব আপাদমস্তক কাপড়চাপা দিয়ে নিদ্রা দেবীর আরাধনায় ব্যস্ত। সদর দরওয়াজার পাশেই একটি ছোট ঘর। মোহন্তজীর দর্শন সেখানে মিলল। দাড়ি রয়েছে, সুপুরুষ বলে মনে হল। আশ্রয়ের প্রার্থনা জানাতেই তিনি কালীবাবু নামে এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন। কালীবাবু মেলা উপলক্ষ্যে সবে মাত্র এখানে পৌঁছেছেন। দাঁতকাঠি নিয়ে নদীর পারে যাওয়ার আগে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। তখন রাত দশটা বেজেছে। আমি আর কালক্ষেপ না করে চলে যাই রামকৃষ্ণ আশ্রমের দিকে। কয়েক বছর আগে আমি এখানে মাত্র একরাতের জন্যে আশ্রয় পাই। এবার দেখি রামকৃষ্ণ স্কুল প্রাঙ্গণ ও মূল আশ্রমে তিল ধারণের স্থান নেই। স্বামী গৌরানন্দ আশ্রম অধ্যক্ষ আমাকে দোতলার একটি ঘরে রাত কাটাবার নির্দেশ দেন। টীনের চাল ও মাটির মেঝে খড়পাতা থাকলেও সেখানে সিউড়ি থেকে আগত গোটা ছয় আশ্রম-সেবক তখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাদের পাশে দরজার সামনে আমার বিছানা পাতা হল। কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে গভীর রাতের ঠাণ্ডায় শরীরটাকে হিম করে দেয়। আর

নীচের বারান্দায় আমারই মত যাত্রীরা স্থানাভাবে কোন রকমে রাত কাটাচ্ছে। রাত যতই হতে থাকে অজয় নদীর বায়ু হিল্লোল আমাদের হাড় কাঁপিয়ে দেয়। চট দেওয়া পর্দা, কম্বলাদি ভেদ করে যখন শরীরটাকে অবশ করে তোলে তখন আমি ঘর ছেড়ে নীচে নামি। একটি ঘরে তখন জয়দেব মনসাদেবীর পূজা শেষে হোমের আগুন জ্বালান হয়েছিল। কাঠের ধোঁয়ায় চোখে জল আসে কিন্তু শরীরের অবসন্ন ভাব ঘুচে যায়।

প্রভাতের আলো আঁধারে রামকৃষ্ণ আশ্রমের বাইরে এলাম। কেন্দুবিল্বের এক বিচিত্র বটগাছ প্রায় একর খানেক জায়গা জুড়ে তার বিস্তার। লোকে বলে গাছের নাম দল বেদনাশ বট। মূল কাণ্ড এখন প্রাণহীন কিন্তু তার অসংখ্য ঝুড়ির পত্রভার ও লতা পাতার বাহার মাটিতে মিশেছে। ঝুড়ির ফাঁকে কোগলা টাঙিয়ে ছোট ঘর ও পাতার চাঁদোয়া। সাধু সন্তরা আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরগুলোতে। কেউ টাঙিয়েছে কাপড়, কেউ খোলা জায়গায় কম্বল বিছিয়ে বটের তলায় রান্নার আয়োজন বা ধর্মপাঠে নিযুক্ত। এ এক আনন্দ মেলা, দুঃখ কষ্ট সংসারে আছে বলে মনে হয় না। মেলা বসে নিজে থেকে, অন্তরের তাগিদে। কর্তৃপক্ষের মেলা সামলাবার দায়িত্ব নেই। অন্য মেলার মত এখানে না আছে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা, ফলে তাই কেরোসিন তেলের লণ্ঠন ও হ্যাজাক। কেন্দুলী মেলায় কলা বিক্রয় হয় বেশী। পথের দুধারে ভিক্ষু; বাঁশ ও খড়ের চালাঘর। হাজার কলার কাঁদি ঝুলছে প্রত্যেক দোকানে। অন্ধ খোঁড়া, কুষ্ঠরোগী পথের ধারে পেতে রেখেছে একটুকরো ছেঁড়া কাপড়—চাল, ডাল, পয়সা দিতে দিতে যাত্রীরা চলেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের ভিড় বাড়ে। পুণ্যার্থীদের অনেকেই বৈষ্ণব, কাঁধে বাচ্চা পোটলা পুঁটলী, খালি পা। ত্রিপল ঘেরা ছোট ঘরে মাটি, লোহা, এলুমিনিয়াম ও নানাধরের দ্রব্যাদি, খেলনা। জামা কাপড়, কম্বল প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। এই বৈষ্ণব মেলায় মাছ মাংস ও মদের কোন অভাব নেই। যাত্রীর ভিড় মেলা ক্রমেই সরগরম করে তোলে। হঠাৎ দেখি এক মহিলা তার প্লাসটিকের ঝোলা খুঁজছে। পরক্ষণেই সে কেঁদে আকুল। ব্যাপার কি বুঝতে আমি একটু থমকে দাঁড়িয়ে যাই। মহিলাটি কলকাতা থেকে মেলা দেখতে এসেছেন। বয়স প্রায় পঁচিশ। মেলা থেকে কয়েকটি দ্রব্যাদি ক্রয় করে সে নাকি তার টাকার থোলেটি প্লাসটিকের ঝোলায় রাখে। প্রায় একশত টাকার নোটগুলি কখন পাচার হয়ে গেছে, কেউ বা তার খবর রাখে।

কেঁদুলী থেকে প্রায় মাইলখানেক পথ হেঁটে চলেছি। অজয় নদীকে পাশে রেখে আল ক্ষেতের উপর দিয়ে চলতে গেলে পায়ে লাগে ধান কাটা গাছগুলো। ধূ ধূ মাঠ—দূরে দেখা যায় কয়েকটি বসতি—গরু ছাগল নিয়ে পল্লীবাসীরা ব্যস্ত। আমি একটি বস্তীর মধ্যে ঢুকে পড়ি—প্রশ্ন করি দুধ পাওয়া যাবে? উত্তর এল দুধ সকালে বিক্রয় হয়ে গেছে। পশ্চিম প্রান্তে অবধূত প্রেমদাস সাধুবাবা কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রকটিত শ্রীবিল্বমঙ্গল ধাম। সেখানে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জন্ম স্থান, যুগল তমাল, রাধাকুণ্ড ও অক্ষয়বট প্রভৃতি দ্রষ্টব্যগুলি দেখে মধ্যাহ্নে ফিরে এলাম।

অপরাহ্নে মেলা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। "আনন্দ কানন কলা ভবন" এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রবেশ পথে দেখি এক ছেলে একটি মেয়ের হাত ধরে চক্রাকারে ঘুরছে। একটি মেয়ে মডেল দেখে খানিকটা থমকে দাঁড়িয়ে যাই। হাত, কোমর, ও দেহভাঙ্গ সদাই সচল—তবলার তালে বাইজী নাচে ইলেকট্রিক সাহায্যে। মেলায় বসেছে সার্কাস, সিনেমা, প্রমোদ চিড়িয়াখানা। যুগশিল্প প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারে এক সাপুড়ে সাপ খেলায়। সাইকেল চড়ে যুবক যুবতীর মডেল সচল হাওয়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলা থেকে অল্প দূরেই রয়েছে জয়দেব ও পদ্মাবতীর দেবালয় রাধামাধব জিউর মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন ও বাইরে দেখা যায় নানা খোদিত মূর্তি। বাংলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন অনুপ্রাণিত সেই মন্দিরদ্বারে একটি নোটিশে লেখা আছে পৌষ সংক্রান্তির দিনে গীত

গোবিন্দ সম্পূর্ণ, নবগ্রহ স্থাপন ও গুরু দক্ষিণা পর অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের শাক্ত পূজাদি যখন তান্ত্রিকের অধিকারে ও বিষ্ণু পূজা অকৃতদার সন্ন্যাসীর তখন সাধারণ গৃহস্থ নারী ও অব্রাহ্মণদের অর্চনায় বঞ্চিত ছিল। কবি জয়দেব বৃন্দাবন ধারায় সকল শ্রেণী মানুষকে নামের অধিকার দেন। জাতির মধ্যে সরল ভাষায় প্রাণ সঞ্চার করেন।

জয়দেব কেঁদুলীর প্রিয় দেবতা কুশেশ্বরনাথ। কেঁদুলীতে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে গ্রামবাসীরা একশ আট ঘড়া জল দিয়ে কুশেশ্বরনাথকে স্নান করান অনাদিলিঙ্গ কুশেশ্বরনাথকে তপস্যা করে জয়দেব সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধাসনের ডানদিকে ৺কুশেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ৺বিপিন বিহারী দে মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মন্দির সংস্কার করা হয়েছিল। একটি পাথরে লেখা আছে "শ্রীমতি সুষমাসুন্দরী দেবী ও হেমন্তকুমার দে সাং জগুবাজার, বীরভূম, সন ১৩৫৭ সাল"। মন্দিরের পাশে এক পাথরে পায়ের ছাপ অঙ্কিত। আর একদিকে কুশেশ্বর শিবলিঙ্গ। মূল মন্দিরের ভেতরে আলো কম; ছোট এক দরজা। চৌকাঠ থেকে ফুট তিনেক নীচে চার ধাপ সিঁড়ি। সিমেন্ট বাঁধান মেঝে। পাথরের এক বেদী এই অষ্ট দল পদ্মাসনে জয়দেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। জয়দেবের অপূর্ণ শ্লোক পূর্ণ করে দিতে ভগবান নাকি এখানে পদার্পণ করেন। বাঁধের উপর খানিকটা হেঁটে চলেছি। কদমখণ্ডীর ঘাটে সত্যবানের স্থান। মেয়েরা ভক্তিভরে মূর্তিতে সিন্দুর পরাচ্ছে। ঘাটের ওপাশে শ্মশান। একদিকে শবদাহের ধূমায়িত অগ্নি আর একদিকে জীবনের উচ্ছ্বাস—কল্যাণ ও অকল্যাণ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জয়দেব গঙ্গাবাসী কুটির থেকে তখন একবাউল গান গাইছিল :—

সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা লয়কর্তা আছেন খাড়া
ওরে মনের মধ্যে মনগুরু রয়, পাসনে কি তাঁর সাড়া ?

ক্ষেপচাঁদ ছত্র সমিতিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়দেব সিদ্ধাসনের পাশেই ২১ ঘড়া খিচুড়ী ও দুইঘড়া তরকারী তখন রান্না করা হচ্ছিল। রাতে প্রসাদ বিলির বিরাট আয়োজন। অনেকটা ত্রিপল দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে। কাটুরিয়া বাবার পঞ্চদশ মুণ্ড মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ, সাং ভূরকুণ্ডা, জেলা ২৪ পরগণা। মন্দিরটির ভিতরে কোন বিগ্রহ নেই, কয়েকটি ছবি ও এক প্রৌঢ়া মহিলা ধ্যানাসনে উপবিষ্টা। যাত্রী সব তাঁকেই দক্ষিণা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাঁর টাকা পয়সার প্রতি কোন লক্ষ্যই ছিল না। কেঁদুলীতে আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য হল কাঙালক্ষ্যাপার কালীবাড়ী। পঞ্চমুণ্ডির সমাধি, শীবা নায়ক সেবাশ্রম মণিমোহন প্রভুর বটতলা, কোটরে বাবার সমাধি, মহাপ্রভুজীউ এবং রামচন্দ্র ঠাকুর জীউ, মোহন্তের কাছারি প্রভৃতি।

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমে। পাশেই মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রম। অনেকটা জায়গা নিয়ে সেখানে আসর বসেছে। বাউলেরা সব এখানে সারারাত গান গাইবে। তিনরাত এখানে সঙ্গীতানুষ্ঠান। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউলেরা জমায়েত হয়েছে। গাছতলায়, বিভিন্ন মন্দিরে তারা একের পর এক গান গায়। নানা স্থানে ছাউনি দিয়ে দর্শকদের বসার আয়োজন চলছিল। কয়েক স্থানে গান শুরু হয়ে গেছে।

অজয় নদের ধারে উন্মুক্ত প্রান্তর রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সেই রাধাবিনোদ মন্দির থেকে শুরু গানের মেলা প্রান্তকে ক্রমেই মুখরিত করে তোলে। মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রমে দেখি ক্ষ্যাপা বাবা সিল্কের এক গাউন পরে মাঝে মাঝে ভক্তদের দর্শন দিয়ে যায়। শুভ্র শ্মশ্রু বয়স প্রায় সত্তর। তাঁর কাছে শুনলাম যে সেখানে বাউলগান শুরু হবে রাত আটটা আন্দাজ। আশ্রম পথ তখন লোকে লোকারণ্য। কয়েকটি পুলিশের সাহায্যে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে যাই প্রান্তরের এক বটগাছ তলায়। সেখানে তখন বাউলগান বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। বাউল-স্ত্রী ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আমাকে আসরে আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাল। এক বালক বাউল তখন তানপুরা হাতে সুরেসুরে গান গেয়ে

সকলকে মোহিত করে রাখছে প্রান্তরের এক ত্রিপল। ঘেরা স্থানে জয়দেব প্রদর্শনী। মৃৎশিল্পের আয়োজন নেহাৎ অল্প নয়। প্রদর্শনীর মধ্যে খানিকটা স্থান বাউল গানের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে আর বসবার স্থান পেলাম না। দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে খানিকটা। তাদের গানের মধ্যে দেহশুদ্ধির মন্ত্র আছে। বাউল-তত্ত্বের মধ্যে তাই উপনিষদের সাদৃশ্য আছে। তাঁরা মনে করেন দেহের মধ্যে মানুষের উপস্থিতি। মানুষই পরমআত্মা—মুক্তির জন্য তীর্থ দর্শন বা দেবদেবীর উপাসনা নিরর্থক। বাউলরা ভগবানে বিশ্বাসী নয়। মানুষের দেহকে ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান করে। দেহের সাধনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সহজ মানুষে রূপান্তরিত হন। বাউলদের বিশ্বাস নর নারীর মিলনের মধ্যে আত্মোপলব্ধি করা যায়। সাধারণ সমাজের বাইরে নিজেদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও গুরুর নির্দেশমত পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা। সংস্কৃতে 'বাতুল' শব্দ থেকে বাউল কথাটি এসেছে। অর্থাৎ নিজেদের সাধনা নিয়ে সদাই ব্যস্ত থেকে জীবনকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করেছেন। মনের মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে তারা নিজেদের সহজ মানুষ বলে পরিচয় দেন। এদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার, কোন বর্ণবৈষম্যের বালাই নেই। এই সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ও মুসলমানরা বরাবরই মিলে-মিশে বাস করে এসেছে। আমি দেখি তাদের বহির্বাস গেরুয়া রংয়ের বসন এক আলখাল্লা। তুলসী ও পাথরের মালা, কাধে সাদা চাদর, কোমরে গেরুয়াকাপড়। বাউলরা নর নারী নির্বিশেষে চুল রাখে, খোঁপা বাঁধে। মনোহর ক্ষ্যাপার তাঁবুতে এক বাউল গান ধরেছেঃ—

কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে ওঠা ভার
বুঝিবে রসিকজনা, অরসিক কি বুঝিবে তার।

রাত ১২টায় বীরভূমের ক্ষ্যাপা বাউল যিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছোটবেলায় গান শুনিয়েছেন সেই সুগায়ক ও গীতিকার পূর্ণদাস গান সুরু করলেন। সঙ্গে তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী মঞ্জু দাস উপস্থিত। রেডিও ও রেকর্ডে যেসব বাউলদের গান শোনা যায় তাঁরাও আজ কেন্দুবিল্ব মেলায় গান পরিবেশন করতে সমবেত হয়েছেন। লক্ষ্মণ দাস, দিলীপ রায়, উপেন দাস, মৃণালকান্তি ঘোষাল প্রভৃতি গায়কদের গান যখন শেষ হল তখন ঘড়িতে দেখি রাত চারটা।

"চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা"

প্রবাসীর একজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা বর্ত্তমান বৎসরে চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা নামে একটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষনা করিতেছি। এই প্রতিযোগিতাতে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গল্প :

প্রথম পুরস্কার	১৫০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৫০ ,,

প্রবন্ধ :

প্রথম পুরস্কার	১২৫ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৪০ ,,

কবিতা :

প্রথম পুরস্কার	১০০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	৭৫ ,,
তৃতীয় ,,	৫০ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	২৫ ,,

পুরস্কার দিবার জন্য প্রবাসী সম্পাদকের অভিমতই সকল সময় গ্রাহ্য হইবে। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইবার সময় এখন হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিল। পৌষের প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইবে। লেখকদিগকে নিজ নিজ লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে বাম কোণে "চারুশীলা দেবী প্রতিযোগীতা" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। লেখকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। অমনোনিত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

—প্রবাসী সম্পাদক

চির চলমান পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

রণজিৎ কুমার সেন

সংসারে কোনো কোনো নাম উচ্চারণ করলে মন পবিত্র হয়। এম্নি একটি নাম পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীর স্মারকগ্রন্থে আমি তাঁকে উল্লেখ করেছিলাম, সেকালের ও একালের 'সেতু' ব'লে। সেই কথাটি বিদগ্ধ মহলের অনেকেই সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এপার আর ওপারকে যে আপন ক'রে বাঁধে, সেই তো সেতু। সেই সেতুর উপর দিয়ে পারাপারের পথ রচনা হ'য়ে যায়: ওপারের বাণী আসে এপারে, এপারের গান ভেসে যায় ওপারে। তাই গেঁথে গেঁথে রচিত হয় সিম্ফনী।

মানুষের জীবনে কথনও বা তেম্নি এক একটি লোকের আবির্ভাব হয়—যাকে বলা যায় সেই সেতু। দুই পৃথিবী, দুই যুগ বা দু'টি মতবাদের মাঝখানে তিনি দেন গ্রন্থি রচনা ক'রে। পারাপারের পথে তখন দুয়ে মিলে এক হয়, হয় সিম্ফনী রচনা।

আমাদের কালে সেই সেতু হ'য়ে ভেসে উঠলেন একটি মানুষ—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যার নাম। উনিশ শতকের প্রাণধারা নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন বিশ শতকের দরজায়, বিগত শতকের বাণী নিয়ে এলেন এই শতকে, আর এই শতকের গান বাজালেন সেই শতকের বীণায়। দুই শতাব্দীর মাঝখানে সেতু হয়ে রচনা করলেন তিনি সিম্ফনী। ঘরানা তাঁর রাবীন্দ্রিক, বাহার তাঁর সুকান্তে। দলিল তাঁর সামন্তরাজের, ছাড়পত্র তাঁর সাম্যবাদে আর শান্তির মিছিলে মননে তিনি বাঙালী, চলনে তিনি বাঙালী, রুচিতে তিনি বাঙালী, অথচ চরিত্রে তিনি ভারতীয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-বাসরে ভারতীয় প্রাণসত্তাকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছেন, ভারতীয় শিল্পীসমাজকে পেয়েছেন প্রাণের অঙ্গনে।
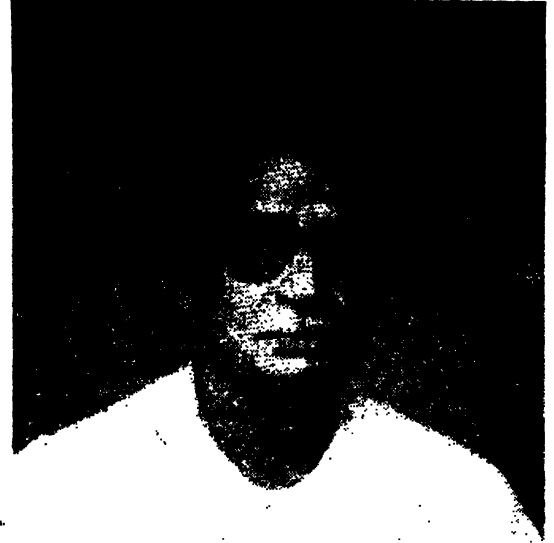
তিনি প্রেমিক, প্রেমই তাঁর জীবন। কি সুখে, কি দুঃখে, কি অভাবে, কি স্বভাবে প্রেমই তাঁর একমাত্র মনন-আধার। এ প্রেম বয়স মানে না, মানে না ঠাকুর্দা-নাতি। বর্ষার জলধারা যেমন ক'রে সব কিছুকে ছাপিয়ে এসে উপচে পড়ে, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেমও তেমনি বয়সের সীমা লঙ্ঘন ক'রে, দল আর মতের গণ্ডী পেরিয়ে আপন উচ্ছ্বাসে সবার মধ্যে উপচে পড়ে। সেখানে 'আপনি'র দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই, সেখানে একটানা 'তুই'য়ের লীলা। সারা ভারতব্যাপী তাঁর যে কত আত্মীয় কতদিকে ছড়িয়ে আছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। জীবনে তিনি আত্মজয় ক'রে আত্মীয় লাভ করেছেন।

বৌদ্ধমতে তিনি অনাগরিক ছিলেন না, ছিলেন গৃহাশ্রমের সন্ন্যাসী। জীবনে তিনি ঘর বেঁধেছেন, স্বামী হয়েছেন, পিতা হয়েছেন, শ্বশুর হয়েছেন, দাদু হয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে বাঁধতে পারেনি, না সংসার —না পরিজন। মুক্ত বিহঙ্গের মতো কণ্ঠে সঙ্গীত নিয়ে ছুটে গেছেন তিনি এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে, ডেকে ডেকে বলেছেনন: 'কে আছিস, আয়, মাটি যে সমতল, সূতিকাগৃহ থেকে শ্মশান অবধি সব যে সমান। আয় আমরা সমানে সমানে কাছাকাছি হই, ঠাসাঠাসি হই। এক একটা যন্ত্র আলাদাভাবে বাজলে তাতে যে অর্কেষ্ট্রা হয় না, সব যন্ত্রের সব সুরকে এক ক'রে মিলিয়েই যে ঐকতান। আয়, আমরা সেই ঐকতানে একতাবদ্ধ হই, এক হই, হই একটি বিরাটকায় সেতু।'

সেই প্রেমের রাজ্যে চির বৈরাগী প্রেমিক ছিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিক্রমপুরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৩০০ সালের ১১ই ভাদ্র তাঁর জন্ম। পিতা কামিনীকুমার ছিলেন স্কুল-শিক্ষক; কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কাব্যের ছন্দ ও সঙ্গীতের সুর দিয়ে তিনি দারিদ্র্যকে রমণীয় ক'রে তুলেছিলেন। মাতা শরৎ-কামিনী ছিলেন ধরিত্রীর মতো সহনশীলা ও দৃঢ় চরিত্রের নারী। তাঁদের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে পবিত্র কুমার ছিলেন তৃতীয় সন্তান। স্কুল-জীবন শেষ ক'রে তিনিও প্রথম শিক্ষকতা গ্রহণ করেন; পরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রিকার সঙ্গে এসে যুক্ত হন। ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর মধ্যে যে সাহিত্যানুরাগ জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার প্রাথমিক স্ফুরণের সুযোগ ঘটে এই পত্রিকার সংস্পর্শে এসে। এর মধ্যে পরোক্ষ রাজ-নীতি, গ্রন্থাগার গঠন, বিবিধ সমাজকর্ম ও শরীর চর্চায় কেটেছে কিছুদিন। পরবর্তী অধ্যায় শুরু হলো তাঁর কলকাতায় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)—সম্পাদিত 'সবুজ-পত্রে।' প্রমথ চৌধুরীর স্নেহধন্য হয়ে তাঁর 'কমলালয়' গৃহেই আশ্রয় পেলেন তিনি। সবুজপত্রের সান্ধ্য আড্ডা তখন নানা গুণীজনের সমাবেশে জমজমাট থাকতো। সকলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হ'তে বিলম্ব হলোনা তাঁর। এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরি-বারের সঙ্গেও অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। তার মূল সূত্র প্রমথ চৌধুরী।

এসময়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে খাঁটি বিক্রম-পুরী ভাষায় মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা লিখে দিয়ে শিল্পা-চার্যের অপরিসীম স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। ইতিপূর্বে তিনি পূর্ববঙ্গের অসংখ্য শব্দ সংগ্রহ ক'রে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিকে দেন এবং পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের কাহিনী গল্পাকারে বিক্রমপুরের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে 'ঠাকুরমার ইতিহাস' নামে তা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠ্যজীবন থেকেই কবিতা ও গদ্য রচনায় তাঁর বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সবুজপত্রের সংস্পর্শে এসে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদী ক্ষুরধার রচনার মধ্যে বাংলাভাষার নতুন এক আলোকোজ্জ্বল রূপ লক্ষ্য ক'রে তিনি অভিভূত হন এবং যুক্তিবাদী সেই ভাষাই পবিত্রকুমারকে তাঁর পরবর্তী জীবনের যাবতীয় রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে।

১৯১৩ সালে ইছাপুরের হীরণ্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষিয়া কন্যা স্নেহলতা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহিত জীবন মাত্র চব্বিশ বছর স্থায়ী হয়। ১৯৩৭ সালে স্নেহলতা পরলোক-গমন করেন। তাঁদের ছয় কন্যা ও এক পুত্র। চার জামাতা—কবি ও ঔপন্যাসিক ডাঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখো-পাধ্যায়, গল্পকার ও সাংবাদিক গৌতম সেন এবং কবি ও সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অপর জামাতা চাকরি করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যা অবিবাহিতা। পুত্র পৃথিশ অঙ্কনশিল্পী। কোনো দিনই এমন আর্থিক সংস্থান ঘটেনি যে পবিত্রকুমার সংসারের অভাব মেটাতেন, কিন্তু তাঁর পিতার মতো তিনিও নিজের দারিদ্র্যকে শিল্পের ললিত বিভাসে মনোরম করে তুলেছিলেন। কাজী নজরুলের ভাষায় দারিদ্র্য যেন সম্রাটের ঐতিহ্য ও খ্রীষ্টের সম্মান বলে

এসেছিল পবিত্রকুমারের জীবনে। কাজী নজরুলকে বাংলা সাহিত্যজগতে পরিচয় করিয়ে দেবার মূলেও ছিলেন পবিত্রকুমার। এমন কি রবীন্দ্র-দরবারে তাঁকে নিয়ে হাজির করবার মূলেও তিনি।

দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগের সম্পাদনায় 'কল্লোল' প্রকাশিত হলে পবিত্রকুমারের আসন শুধু কল্লোলের সাহিত্য বিভাগে নয়, সহযোগি বন্ধুদের চিত্তশতদলেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেবার মাধুর্যে, চিত্তের ঔদার্যে ও সাহিত্যের নৈপুণ্যে তিনি ছিলেন কল্লোলের অন্যতম প্রাণপুরুষ। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও এই শতাব্দীর গোড়া থেকে সাহিত্য-সংসারে, রাজনীতিমঞ্চে ও অভিনয়জগতে যাঁরাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সান্নিধ্য পবিত্র-কুমারের জীবনে যেমন দিনে দিনে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে, তেমনি তরুণতম সাহিত্যসেবীদের তিনি ছিলেন প্রেরণাস্বরূপ। যেসব সাময়িকপত্রের সংস্পর্শে তিনি তাঁর সাংবাদিক জীবনের বিভিন্নকালের দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন, তা হচ্ছে—সবুজপত্র, স্বরাজ, প্রবাসী, দেশ, ভারতবর্ষ ও বিজলী। সজনীকান্ত দাসের সাহচর্যে প্রবাসী পত্রিকায় যোগদান করেন তিনি বিভার হিসেবে। এ সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র ক'রে যে বিরাট সাহিত্যিকমণ্ডল গ'ড়ে ওঠে, সেখানেও অবারিতদ্বার ছিল পবিত্রকুমারের।

১৯৩৫-এ ইয়োনে নোগুচির সম্বর্ধনা থেকে শুরু ক'রে প্রগতিসাহিত্য আন্দোলন ও নিখিল ভারত শান্তিসম্মেলনের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ এবং রোগীর সেবা থেকে শুরু ক'রে আসানসোলে রবীন্দ্র-স্মরণীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোৎসবে সঙ্ঘ-প্রধানের ভূমিকা গ্রহণ—এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না—যেখানে পবিত্রকুমার সক্রিয়ভাবে এগিয়ে না গেছেন। 'সাহিত্যসেবক সমিতি'র অন্যতম স্রষ্টা সাহিত্যিক-কবিরত্ন রমেশচন্দ্র সেনের যেমন নিত্যসঙ্গী ছিলেন তিনি, তেমনি ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। এ যুগের ছোট-বড় প্রতিটি শিল্পী-সাহিত্যিকের তিনি ছিলেন পবিত্রদা, তাঁর কাছে সবাই ছিলেন 'তুই' সম্বোধনের পাত্র।

কালান্তরের ভাষায় বলা যায়—সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক পরিক্রমা ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। গোর্কির ছোটগল্পের অনুবাদের জন্য তাঁকে পথিকৃৎ বলা চলে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল,' 'সহযাত্রী' ও 'মানুষের জন্ম' —এই তিনটি অনুবাদ সেদিক থেকে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ছোটদের জন্য তিনি লেখেন 'সোনার দেশ' ও 'বীরত্বের কাহিনী,' আবার ক্নুট হামসুনের 'হাঙ্গার'-এর বাংলায় অনুবাদ করেন 'বুভুক্ষা' নাম দিয়ে। মেটারলিঙ্কের সাঙ্কেতিক নাটক 'ব্লু বার্ড'-এরও তিনি অনুবাদ করেন 'নীল পাখি' নামে। আর একটি অনু-বাদ তাঁর 'চাকার দরবেশ'। ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার উপর লেখা ভান্দা ভাসিলাভেস্কায়ার বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস 'রেন বো'র অনুবাদ করেন তিনি 'রামধনু' নামে। 'চলমান জীবন' দু'খণ্ডে তিনি যে স্মৃতিচারণ করেছেন, তাতেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও জীবনের প্রবাহ-মানতা। সাহিত্যের এমন কোনো সভা বা আড্ডা ছিলনা—যার পুরোধা ছিলেন না পবিত্রকুমার। যখনই জিজ্ঞেস করা গেছে: 'কেমন আছেন?' বলেছেন: 'ভালো আছি।' বলেছেন: 'জীবনে দুঃখ পেয়েছি বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ভাগ্যবান কেউ নেই। কীই বা কাকে দিয়েছি, কিন্তু তার চেয়ে পেয়েছি অনেক বেশী। জীবনের সবক্ষেত্রের মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের ভালোবাসা পেয়েছি। আমার মতো সাধারণ লোকের এ কী কম লাভ?'—জীবনে নির্মম দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েও মুখে সারল্যের হাসি মাখা থাকতো তাঁর। কোনোদিন তাঁকে বড়একটা শুয়ে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়নি। চিরদিনের জন্যে শয্যা নিলেন তিনি একদিনই, সেদিন ৭ই, এপ্রিল ১৯৭৪। জীবনের আশী বছর পূর্ণ ক'রে হাসিমুখে এ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তিনি।

আমার জীবনে তাঁর সাড়ম্বর উপস্থিতি ঘটেছিল এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিতভাবে। বউবাজারের তৎকালীন

ক্যালকাটা হোটেলে তখন নিয়মিত রবিবাসরীয় সাহিত্য-আসর বসতো প্রতি রবিবার সন্ধ্যায়। পরিচালক কবি বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। হোটেলের পরিচালকও তখন তিনিই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমারু বিমান তখনও আকাশকে সচকিত ক'রে তোলেনি। যাঁরা এসে নিয়মিত এই সাহিত্য-আসর জমাতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, রাখাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি। এক অধিবেশনে আমি আর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ব'সে অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলছি, হঠাৎ পিছন থেকে আমার গা ঘেঁষে এসে বসলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, তারপর কানের কাছে মুখ এনে বললেন: 'বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তোর অনেক গল্প আমি পড়েছি। গল্পগুলোতে উপন্যাসের মেজাজ লক্ষ্য করেছি। তুই উপন্যাস লেখ।' বলেই আবার নিজের নির্দিষ্ট যায়গায় গিয়ে ব'সে পড়লেন। আসরের আলোচ্য বিষয়ের দিকে তখন আর আমার মন নেই! ইতিপূর্বে পবিত্রকুমারের সঙ্গে আমার যোগাযোগও বিশেষ ঘটেনি; দূর থেকে কাচিৎ-কখনও দেখতাম, এই পর্যন্ত। সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মুখ থেকে একথা শুনে আমার সারা মনে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ বোধ করলাম। আসর ভেঙে গেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নাম্‌তে নাম্‌তে তাঁকে সেদিন প্রথম 'পবিত্রদা' ব'লে সম্বোধন ক'রে বললাম: 'আপনার আদেশ আমার মনে রইল।'

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার এই আমার প্রাথমিক সূত্রপাত। এরপর সাহিত্যসেবক সমিতি এবং এখানে-ওখানে নানা ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—নিজের সম্বন্ধে তিনি অধিকমাত্রায় চাপা। সাহিত্যিকমহলে এরকমটা কিন্তু দুর্লভ। একদিন তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যপরিষদ ষ্ট্রীটের বাসায় নিয়ে গেলেন। স্ত্রীহীন সংসার শ্রীহীন হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ আমাকে নিয়ে বসে আবার পথে বেরিয়ে এলেন। মনে হলো—পথই বুঝি তাঁর শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা যখন নিবিড় থেকে নিবিড়তম হ'য়ে উঠলো, তখন বয়সের দীর্ঘ তারতম্য থাকা সত্ত্বেও যৌন বিষয় থেকে শুরু ক'রে সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব—এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথালোচনা হ'য়ে না-উঠেছে। সে-অধিকার তিনিই দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে নিজেই সিগারেট চেয়েছেন। পরে সিগারেট ছেড়ে চুরুট ধরেন। তারপর জীবনের শেষদিকে ধূমপান একেবারেই ত্যাগ করেন।

এরপর সারা দেশে নেমে এলো দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ ও দেশভাগের নির্মম অভিযান। তার প্রত্যক্ষ দর্শক আমরা। ছাড়িয়ে গেল, ছিটিয়ে পড়লো মানুষের জীবন। দেশভাগের লাঞ্ছনায় সমস্যাবহুল হয়ে উঠলো এই বঙ্গ। জীবনের মান বলতে আর কিছু রইল না। এসময়ে পবিত্রকুমার নানা অনুবাদকর্মে গভীর ভাবে নিমগ্ন। আমি তখন 'কলিকাতা সাহিত্যিকা'র সাধারণ সম্পাদক। বাগবাজারের দেব-পরিবারের আঙিনায় একটি অধিবেশন ডেকে পবিত্রকুমারকে সভাপতি ক'রে নিয়ে গেলাম। কোনোদিনই তিনি বাক্‌-পটু ছিলেন না, তবু দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও সাহিত্য-বিষয়ে তিনি ধীরে ধীরে গুছিয়ে তাঁর ভাষণ দিলেন। শুনে সবাই মুগ্ধ হলেন।

এরপর আরও বেশ কিছুকাল কেটে গেল। আমার সম্পাদনায় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা তখন নিয়মিত প্রতিমাসে খ্যাতিমান লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পবিত্রকুমার এলেন একদিন একটি প্রস্তাব নিয়ে। মলেয়ারের একটি বিখ্যাত নাটক অনুবাদ ক'রে নাম দিয়েছেন 'বিদূষী'। বঙ্গশ্রীতে অনুবাদটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'লে তাঁর কিছু আর্থিক সুবিধে হ'তে পারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'য়ে কপি চেয়ে নিলাম তাঁর কাছ থেকে এবং পরবর্তীসংখ্যা থেকেই বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিক প্রকাশ ক'রে তাঁকে সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে মোট দুশো টাকা দেবার ব্যবস্থা করলাম। তারপরেও আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রচনা দিয়ে তিনি

বঙ্গশ্রীর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর তিন জামাতার রচনা প্রকাশেরও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম। তিন জামাতাও আমাদের দীর্ঘকালের সাহিত্যিক দাদা ; সে ইজন্যে তাঁদের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধ'রে মধুর থেকে মধুরতর হ'য়ে উঠেছে।

আমার পঞ্চাশতম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'দিশারী' সাহিত্যসংস্থা উদ্যোগী হ'য়ে কলকাতার 'কুমার সিং'-হলে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। ১৩৭৪ সালের ১০ই শ্রাবণ। কলকাতার বিদগ্ধ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, অধ্যাপক, শিল্পী, সমালোচক, গায়ক ও বাদ্যকরের ভিড়ে কুমার সিং-হল সেদিন পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। প্রবীনদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, গৌতম সেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রভৃতি। 'দিশারী'র স্থায়ী সভাপতি হিসেবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্বহস্তে আমাকে মাল্যভূষিত ক'রে আশীর্বাদ করলেন। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আত্মীয়কও ছিলেন তিনি। অগ্রজের এই আশীর্বাদ পেয়ে সেদিন যেন আমি নবজন্ম লাভ করেছিলাম। মনে হয়েছিল—এ যেন শুধু পবিত্রদার হাত থেকেই মালা পেলামনা, তাঁর পূতশুদ্ধ হাত দিয়ে উনিশ ও বিশ শতকের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তি বুঝি এ মালা পরিয়ে দিয়ে গেল তাদেরই এক সগোত্র সহোদরকে! পবিত্রদাকে প্রণামের মধ্যদিয়ে আমি সেই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তিকে আমার প্রণাম পৌঁছে দিলাম। এ জীবনে এতবড় উল্লেখযোগ্য দিন আর আসবে না।

এরপরেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে আমরা উভয়ে একত্রে মিলিত হ'য়ে মুখর হয়ে উঠেছি। যখনই দেখা হয়েছে, কখনও অল্পে ছেড়ে দিতে চান নি, নিজের হাতের মুঠোয় আমার হাত শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে রেখেছেন। ছাড়িয়ে আসতে গিয়ে নিজেই কষ্ট পেয়েছি। তাঁর 'আহ্বান সংস্কৃতি পরিষদে' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় তাঁর ও আমার মিলিত ভাষণ দিতে তিনি আমাকেই ডেকে নিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে কোনো পত্রিকা তাঁর কাছে লেখা চাইলে তিনি নিজে না লিখে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, বলেছেন : 'তোর লেখাই আমার লেখা।' —একথার পিছনে একটা কারণ আছে। প্রথম জীবনে তিনি প্রমথ চৌধুরীর গৃহে থেকে তাঁর 'সবুজপত্রে' কাজ করেছিলেন। আর আমি ছিলাম প্রমথ চৌধুরীর শেষ সম্পাদিত মাসিকপত্র 'রূপ ও রীতি' ও তার মুদ্রণালয় লিপিকা প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ। পবিত্রদা তাই বলতেন : 'চৌধুরী মশাইয়ের সম্পাদনাকর্মে আমি ছিলাম প্রথম যুক্ত, আর তুই ছিলি শেষ। আমার চাইতে তুই তাই আরও বেশী জেনেছিস।' এরপর 'প্রবাসী'র একটি সংখ্যায় যখন আমি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকীয় লিখন-রীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখি, পবিত্রদা শুনে খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।—এমন খুসীবোধও সকলের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি যেন শিব, খুসীবোধ নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন ; খুসীবোধ নিয়েই পবিত্র মনে পৃথিবী থেকে চ'লে গেলেন।

তাঁর ষষ্টি ও সপ্ততিতম জন্মদিনকে সারাদেশের মানুষ মিলে বিশেষ উৎসবে পরিণত করেছিল। আত্মীয়ক ছিলেন রাখাল ভট্টাচার্য, আর অনেকের সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম সেই উৎসব-পরিচালনে। 'চলমান জীবন' ছিল যাঁর কাছে শুধু চলার মন্ত্রেই গাঁথা, যার অন্তর জুড়ে ছিল শুধু চরৈবেতি-চরৈবেতি, যিনি সেকাল থেকে অবলীলাক্রমে হেঁটে এসেছিলেন একালের মনের মাটিতে,··তাঁর গায়ে কখনও ধুলো লাগেনি, চন্দনে আবৃত হ'য়ে উঠেছিল সারা অঙ্গ। সেই পবিত্র চন্দনের সুরভী আজ আর একবার ছড়িয়ে গেল একালের চিত্তলোকে।

সুতপা

(উপন্যাস

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

অনিমা স্বামীর কাছে ফিরে যাবার আগে একদিন সুতপার বাড়ীতে এসে সেই ঘরেই আবার দু'জনে মুখোমুখি বসেছিল, দুটো চেয়ারে। ঘরের চারদিকে ছড়ান ছিল ডাক্তারি বই আর পত্রিকার রাশ। ঘরের মধ্যে অনিমার সেই পুরোন দৃষ্টি আবার নতুন করে যখন পড়ল, তার মনে হ'ল যেন রাতে স্বপন ভেঙে সূর্য্যের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। কল্পনার সৌধ পরিণত হয়েছে উজ্জ্বল জীবনের বাস্তব লীলাভূমিতে।

হ্যাঁরে তুই চাকরি করবি, না ডিস্‌পেনসারী খুলবি?'

'বলা শক্ত রে। চাকরির চেষ্টা ত' দেখতেই হবে। কিছু বাঁধা রোজগারও চাই। তারপর সম্ভব হয় ত' প্র্যাকটিসও করব।'

'অনন্তর সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ প্রায়ই হয়ত' এখন, তোকে বলাই হয় নি। দু'টি ছেলেমেয়ে, বেশ ভালই আছে। বাড়ীর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে, দিব্যি সংসার করছে। তোরাই ভাল আছিস যা দেখছি। হেসে ওঠে সুতপা।

'কেন বাবা তোমায় কে বারণ করেছিল বেশ থাকতে?'

'আমার এই বেশ। তোদের থেকে আমায় একটু আলাদা হ'তে হল এই যা।'

'সে আর ক'দিন? বিয়েত' একদিন করতেই হবে, তখন আবার আমাদের দলে ঢুকে পড়বি নিশ্চিন্তে।

'ওরে বাবা এখন ওসব একেবারেই নয়। আমার এখন কর্তাদিকের ভাবনা বল দেখি। সে মনটা যে কোথায় পালিয়েছে বোঝা শক্ত। আমার এখন বরের চেয়ে চাকরি খোঁজা বেশী দরকার।

'তোর সে মন যে কোথায় পালিয়েছে আমি জানি। অনিমা মুচকে হেসে বলে। সুতপা একটু যেন অবাক হয়।

মানে? কেউ আমার মন কেড়েছে বলছিস্?'

'না তা নয়—অনিমা হাসে, তবে কিনা এক ব্যাপারে ঘটেছে।'

'কি ব্যাপার শুনি।' সুতপা বেশ একটু কৌতূহলী হয়।

'ছেলেদের সঙ্গে তোদের এক সঙ্গেই ক্লাশ করতে হয়, তাতে ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে হতে তোর পুরুষের সম্বন্ধে যে একটু কৌতূহল সেটা কমে গেছে, তার উপর নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত পথ খুঁজে পেয়ে এখন বিয়েটা এখন একটা অন্য ব্যাপারে এসে দাঁড়িয়েছে।'

'ওরে বাবা, তোর দার্শনিকতা ত' দেখছি সংসারে ঢুকেও চলে যায়নি। আমার ধারণা ছিল এসব জিনিষ ঘর সংসারের ঝঞ্ঝাটে চলেই যায়। কিন্তু তোর দেখছি বেড়েছে!'

'তোর ধারণাটাই ভুল। এসব জিনিষ সংসারের ঝঞ্ঝাটে আরোও বাড়ে গণ্ডিভেঙে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে, অবশ্য তাকে যদি আমল দি'।'

সুতপার মা সুনন্দা একডিস মিষ্টি আর জলের গেলাস হাতে নিয়ে ঢোকে। অনিমা বিব্রত হয়—

'একি মাসিমা? আমাকে ডাকলেন না কেন? নিজে এলেন।'

'তাতে কি? আমি ত' এই ঘরেই আসছিলুম। তুমি এখন ছেলের মা, তোমার জন্যে এটুকু করব না?' হাসে সুনন্দা।

'কিন্তু মাসিমা সুতপার বিয়ের খাওয়াটা সেবার মাঠে মারা গেল, সে লোভ আজও ভুলতে পারছি না।'

তিন জনেই হেসে ওঠে।

'বাঃ বেশ রসিক হয়েছে রে অনিমা, বলে সুনন্দা, দাড়াও দাঁড়াও বিয়ের খাওয়া কি আর পালাচ্ছে? এখন একটু শোক সংবরণ কর, দেখছ ত' এই অবস্থা।'

'ওর সঙ্গে একজন ডাক্তারের বিয়ে দেবেন। দুজনেই প্র্যাকটিস করবো একসঙ্গে।'

'না না বাবা, সুতপা বলে ওঠে, আর ওসবে কাজ নেই। এখন তোরা সব সংসার কর আমরা দেখি। ধরে নে যেন আমার দেখেই আনন্দ। সবাই যদি ঘর বাঁধবে ত' ঘর বাঁধা দেখবে কে? বুঝলি না সবাই যদি প্লে করে ত' দর্শক হবে কে?

'খুব হয়েছে, তোমার আর দর্শক হয়ে কাজ নেই, একটু বিরক্তি প্রকাশ করে সুনন্দা, 'এই বার আস্তে আস্তে ঘর বাঁধার চেষ্টা দেখ। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুনন্দা।'

'তোর ননদ কি চলে গেছে না আছে?'

'না আছে এখনও। চলে যাওয়ার কথা' আমিই আটকে রেখেছি, ছোড়দি চলে গেলে একা দম আটকে আসবে। কোন রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আরও কদিন আটকাব, তারপর আমি চলে গেলে তখন যাবে এখন। ছোড়দির সঙ্গে একবার যে কাটিয়েছে তার আর তাকে ছাড়া মুস্কিল। ওর তবু একটু সুবিধে বিয়েটিয়ে করে এখানেই আছে; আমার কি মুস্কিল বলত। বছরে একবার আসতে পারলে ত' খুব শীগ্‌গীর।

'তোর জেঠ শ্বশুর এখন কি করছেন?'

'কি আবার করবেন, ও যেন একটু জিজ্ঞাসু হয়, যা করছিলেন তাই।'

'মানে সেই পুজোআচ্চা ব্যস?'

'আবার কি? হাটবাজার করেন আর একটু বিষয় কর্ম নেহাৎ বেটা না হলে নয়। উনি ওই পুজোআর্চা আর ধর্মগ্রন্থ নিয়েই আছেন এক রকম। বিষয় কর্ম প্রায় সবই শ্বশুরই দেখেন। তোকে বললুম না ফ্যামিলি বলতে আমার শ্বশুরের, জেঠ শ্বশুরের বউ মানে জেঠিমা মারা যেতে আর ত' বিয়ে করলেন না, ছেলে-মেয়েও নেই, আর খুড় শ্বশুর ত' বিবাগী হয়ে চলে গেলেন বিয়েটিয়ে না করেই।'

'যাক্ তবু ভাল, বিয়ে করে বিবাগী হলেই মুস্কিল, সব তোর শ্বশুরের ওপর পড়ত।

'হ্যাঁ এদের বংশে এটা খুব আছে। শাশুড়ির এই নিয়ে কত গর্ব। এরা ধর্মপথটা খুব ভালবাসে।'

'তা হোক কিন্তু বাপু বাড়াবাড়ি ভাল নয় আবার। এই বিবাগী হয়ে চলে যাওয়া-টাওয়া শুনে যেন কেমন লাগে।'

'আমিও ঠিক জানতুম না তবে জেঠামশায়ের সঙ্গে কথা বলে এখন যেন অনেক কিছু মনে হয়।

'কি বলেন?'

'সেদিন সাহস করে জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলুম কথায় কথায় যে আপনি ত' ইচ্ছে করলেই সংসারী হতো পারতেন, সংসারে যখন রইলেনই তখন সংসারী হতে বাধা? আপনিই ত' বলেছেন সংসারে থেকেও ধর্মকর্ম করা চলে।'

'কি বললেন?' জিজ্ঞেস করে সুতপা।

'একটু হাসলেন। বললেন, দেখ ধর্মকর্ম যেন ঈশ্বর থেকে আলাদা করে ফেল না। ঈশ্বরকে না পেলে আর ধর্মের দরকার কি? তাই যতটা পারবে মনকে ঈশ্বরের দিকে দেবে। আর সংসারের কথায় বললেন, যাদের কিছু ভোগতৃষ্ণা থাকে তাদের জন্যেই নাকি সংসার। যাদের ভোগতৃষ্ণা নেই তাদের কাছে সংসারও যা তার বাইরেও তাই, সুবিধে অনুসারে যা দরকার মত থাকা। সংসারের টান ওঁর নাকি কোনদিনই ছিল না। ওঁর মা নাকি জোর করে বিয়ে দিয়েছিল কাকে যেন কন্যা-দায় থেকে উদ্ধার করার জন্য। তারপর প্রথম ছেলে হওয়ার সময়েই মারা যায়।'

বাঃ বেশ সুন্দর কথা বলেছেন ত'। খুবজ্ঞানী বলে মনে হচ্ছে।'

'কি জানি হতেও পারে, আমি আবার সব কথা ঠিক বুঝি না। তবে বেশ কিছু আছে বলে মনে হয় ভেতরে।'

'কেন? কিসে বুঝলি?'

'আমার বিয়ের প্রায় বছরখানেক পরে একদিন শাশুড়িকে কথায় কথায় বলেছিলেন, তোমার প্রথমে একটি নাতি হবে, তবে এখন নয় দেরী আছে। সে হবে আমাদের বংশের রত্ন।'

'তারপর।'

'তারপর পাঁচবছর কিছু হ'ল না দেখে বাপের বাড়ীতে ডাক্তার দেখানোর কথা বলেছিল, শাশুড়ি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার রাগ হয়েছিল এতে। তারপর দেখ ছ'বছর পরে খোকা হ'ল।'

'উঃ বেশ মিলে গেল ত।'

আরও অনেক ঘটনা দেখেছি আমি, অথচ কারোও হাতও দেখেন না, গোনেন না। আর ওসবে খুব একটা আগ্রহও নেই।'

সুতপা কি যেন ভাবে, বলে, 'খুব জ্ঞানী লোক প্রচুর পড়াশুনা করেন না?'

'পড়াশুনা ত করেন কিন্তু জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কি করে বুঝবো? ও হাসে একটু, নিজের ভেতর কিছু থাকত ত' পরখ করে নেওয়া যেত।'

কেন, তা' কেন?' নিজের মনের মত একটা প্রশ্ন করে তার জবাবটা পেলেই ত' বোঝা যায়। মনের সন্দেহটা ঠিক যদি কাটিয়ে দিতে পারেন ত বুঝব তার এবিষয়ে জ্ঞান আছে কিনা।'

'ওরে বাবা প্রশ্নটা করব কোত্থেকে? হেসে-ফেলে ও, আমার যা প্রশ্ন সে'ত জেঠ শ্বশুরের কাছে বলা যায় না তাই চুপচাপ থাকাই ভাল নয়? উনি নিজের থেকে বলেন সে এক হয়।'

আচ্ছা উনি বোধহয় একটু খেয়ালী প্রকৃতির, না? এসব লোকেরা কিন্তু এই রকমই হয়।'

'না খেয়ালী ঠিক নয় তবে আপনভোলা। বেশীর ভাগ সময়ই কি রকম একটা যেন নেশার ঘোরের মধ্যে থাকেন, কথা বলেন কম।'

'আমার ইচ্ছে হচ্ছে আলাপ করতে সত্যি।'

'বেশত' যাস না একদিন তবে আমি থাকতে থাকতে যাস। তবে আমি উঠি ভাই আজ।'

অনিমা আর দাঁড়ায় না। যেতে যেতে বলে—'ত হলে যাস পরশু দিন, কথা রাখিস কিন্তু।'

সুতপা অনিমার সঙ্গে নিচে নেমে সদর দরজা পর্য্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে ওপরে চলে আসে। বারান্দা ঘড়িতে দেখে দু'টো বেজে দশমিনিট। উঠোনে ঝি বাসন মাজা সুরু করে দিয়েছে। বাড়ীর লোকের যে যার ঘরে বিশ্রাম করছে। ও নিজের ঘরে গিয়ে বসল।

আজ সন্ধ্যায় আবার হোষ্টেলে ফিরতে হবে। কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস ঠিক করে নিতে হবে ছোট ব্যাগটাতে। এমন সময় ওর বাবার গলা শুনল। অনুপমবাবু সুতপাকে নিজের ঘর থেকে চেঁচিয়ে ডাকছেন। ছুটি না হলেও কয়েকটা দিন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতেই কাটাচ্ছেন উনি।

'যাচ্ছি বলে সাড়া দিয়ে ও গেল বাবার ঘরে। অনুপমবাবু তখন চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা-তুলে দিয়ে চুরুট খাচ্ছিলেন। সুনন্দা খাটের ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুতপা ঘরে ঢুকতেই অনুপমবাবু জিজ্ঞেস করলেন—

'হ্যাঁরে কাল তুই কখন আসছিস?'

'কেন? সন্ধ্যে বেলায়।'

'ঠিক আসিস কিন্তু। পরশু দিন সকালে রোহিনীবাবু নাতনিকে নিয়ে আসবে তাকে একটু পরীক্ষা করে দেখবি। কি বলছে পেটের গোলমাল সারছে না। তোকে দেখাবে।'

'বেশ ত' আসুক না, আমি ত' সেদিন থাকছি।'

'আজ যাচ্ছিস কখন?'

'সন্ধ্যের দিকে যাব, ওই যেমন যাই।'

অনুপমবাবু চুপচাপ চুরুট টানতে থাকেন, সুতপা দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে বললে—

'বারে, কি বলবে বল, ডাকলে কেন?'

'বলছি বলছি দাঁড়া না অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?'

উনি খানিকক্ষণ চুরুট টানলেন তারপর বললেন—

'বলছি কি জানিস, নিচেকার ঘর দু'টো আর ভাড়া দিলুম না, ও দুটো তুই নে। তোর ডিস্পেন্সারি ওখানে ভালই মানাবে?'

'বারে, এই সেদিন বললে ধর্মতলার ওদিকে চেম্বার করে দেবে.........'

'না না আর ধর্মতলার দরকার নেই, সুনন্দার গলা শোনা গেল। দুজনেই তাকিয়ে দেখে সুনন্দা ঘুম ভেঙে জেগে ওদের কথা শুনছে।

'যা করার এখানেই কর। বাড়ীতে জায়গা থাকতে শুধু শুধু টানা-পোড়েন করবার দরকার নেই।

'আর তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার দেখ' অনুপম বাবু মেয়েকে বোঝান, 'পাড়ায় আমার জানা যে ক'জনকেই দেখছি তারাও সবাই এটাই চায়। পাড়ায় লোড ডাক্তার ওই যা একজন। পাড়াটাও দেখ খারাপ নয়, তাছাড়া তোকে সবাই ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। খেয়াল না ভেবে দেখ।

সুতপা ভাবতে থাকে। এক্ষুনি কিই বা বলা যায়। বাবাকে যাও বা বোঝান যায় ত' মাকে বোঝান মুস্কিল। পরে না হয় যা' হোক ভেবে চিন্তে দেখা যাবে। তবু একবার বললে—

'ওদিকে চেম্বার করলে আয়ের দিক থেকে কিন্তু সুবিধে হয়। ওসব জায়গায় পসার জমান একটু সহজ হয় বাড়ীতে এতটা হয় না। পয়সারও ত' দরকার, আর তা' ছাড়া নিচের ঘরগুলো ভাড়া দিলে আয় হয় একটা সংসারের। সেটাও দেখ।'

'বুঝেছি কিন্তু তুই পয়সার কথা ভাবছিস কেন?' অনুপমবাবু বলেন, 'পয়সার ভাবনা তোকে এখন থেকে ভাবতে হবে না। আর পয়সার কথা যেটা বলছিস সেটা ত' হাসপাতালে এটাচ্‌ থাকলেই হবে। তারপর সব ব্যাপারেই বরাত বলে একটা কথা আছে।

সুনন্দা বলে তুমি পয়সা রোজগার করে আমাদের সংসার চালাবে, সেটাও ত' আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়। তুমি বিয়ে থা করে নিজে সংসার করবে, কারোও গলগ্রহ হবে না এটাই আমরা চাই। বাড়ীর বাইরে কাটালে আমাদের বাপু স্বস্তি হবে না, ও আশা তুমি ছাড়। পড়াশুনোর সময় যা গেছে তা' গেছে।'

'বাড়ীতে প্র্যাকটিস্ করলে পসার হয় না তোকে কে বলেছে। অন্তবাবুর ছেলে ত' বাড়ীতে বসেই প্রেক্ট করেছে।' বলেন অনুপমবাবু।

'হ্যাঁ না তাত বলিনি, বলছি আরও ভাল হ'ত। যাই হোক যা ভাল হয় ক'র।'

সুতপা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, একটু যেন চিন্তার ছাপ পড়ল মুখের ওপর। এ নিয়ে, পরামর্শ করা যায় কার সঙ্গে। অনেক ভাববার চেষ্টা করল। আপন মনে ছোট ব্যাগটা ভর্তি করে এক পাশে রেখে খাটের ওপর গা টা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল আর তন্দ্রার আমেজ ওকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ওর অজ্ঞাতসারেই। চিন্তা আর তন্দ্রার মিলিত শক্তির কাছে ওর জাগরণ পরাজয় মানল।

কিন্তু তন্দ্রার রাজ্যে গিয়ে চিন্তা পেল রূপ, আপন ইচ্ছা চিন্তাকে কল্পনায় রূপায়িত করতে গিয়ে দেখল যেন কে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, বলছে—

'নারী-জীবনের স্বপ্ন কি পয়সা আর পসারে সফল হয়? আমার সাফল্যই তোমার বাঞ্ছনীয় নয়? আমার ওপর নির্ভর করে, আমার সাফল্যকে নিজের গর্ব্বের বস্তু করে তুলতে কি চাও না? না চাওনি কোন দিন?'

'তুমি কে?' সুতপা তাকে দেখতে না পেয়েও যেন জিজ্ঞেস করলে।

'আমাকে ত' জানই, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'তুমি ছিলে বটে কিন্তু এখন কোথা থেকে এলে? কেনই বা এলে? আমার পথ আটকাতে?'

'না পথ চিনিয়ে দিতে।' উত্তর এল।

'পথ কি পাইনি এখনও?

'জীবনধারণের পথ আর শিরায় শিরায় জীবনকে উপলব্ধি করার পথ কি এক?'

'জানি না কিন্তু তুমি কে? ভাল করে বল।'

'ভাল করে চেয়ে দেখ।'

সুতপা যেন তার উদ্দেশ্যে ভাল করে তাকাতে গেল।

হ্যা, একটা যেন পরিচিতমুখ বলে মনে হচ্ছে না? হ্যাঁহ্যা, ও'ত চেনা মুখ ফুটে উঠেও যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে যেতে যেতে আবার ফুটে উঠছে ওটা কার মুখ। ও তো মার মুখ, ক্রমশ মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখে মা 'ওকে ঠেলছে।

'হ্যারে ওদিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এল, আর কত ঘুমুবি, ওঠ তাড়াতাড়ি, এই নে চা।'

সুনন্দা ওকে ডেকে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। সুতপা খাটের ওপর বসে একটু আড়া মাড়া ভেঙ্গে নিল, আশ্চর্য্য লাগল কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবল, বোধহয় স্বপ্নের আমেজটা তখনও মনের মধ্যে উঁকি মারছিল। তারপর কলঘরে ঢুকে গা ধুয়ে তৈরী হয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে এল কিছু জল খাবারের জন্যে। রাতের খাওয়া হোস্টেলেই হবে।

কলেজের ফটকের কাছেই আনন্দবাবুর সঙ্গে দেখে।

'কি বাড়ীতে গিয়েছিলেন।'

'আর কোথায় যাব বলুন।'

সেত বটেই। আপনি ইউনিওনের নোটিশটা দেখেছেন। একসস্টুডেন্টস রি-ইউনিয়নের ডেট্টা পেছিয়ে দিয়েছে।'

হ্যা দেখেছি, এটা ঠিক কিরকম হ'ল বুঝতে পারছি না, বলে সুতপা, আবার পনের দিন পেছিয়ে এমন কি হবে? অথচ দেখুন আমাদের জুনিয়র ব্যাচের পরীক্ষার ব্যাপার রয়েছে।'

'এটা নিয়ে ত' দু'টো মত তৈরী হয়েছে, কি করা যায় বলুন ত? যেভাবে হোক এভাবে তারিখ পেছান বন্ধ করতে হবে।'

'ইউনিয়নের বক্তব্যটা কি?'

ইউনিয়নের বক্তব্য আর কিছুই নয়, যা বুঝেছি সমস্ত এক্স স্টুডেন্টদের এখনও ঠিকমত খবর দেওয়া হয় নি তার ফলে টাকা পুরো ওঠেনি।'

সুতপা ভাবল একটু, সত্যিই টাকা যদি তেমন না উঠে থাকে ত' কি করা যাবে আবার এদিকে অন্ত ব্যাপার রয়েছে। তবু বললে—

সেটা যা' হোক একটা ব্যবস্থা ত' করতে হবে।'

আনন্দবাবু বললেন, 'আসুন, আমরা যারা তারিখ পেছোনর বিরুদ্ধে তারা একটা মিটিং ডাকি, আমাদের প্রস্তাবটা সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে দিই।'

সুতপা হেসে ফেললে। বললে—

'আপনারা সব জিনিষেই অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। এটা এমন একথা ভয়ঙ্কর মতবিরোধের কথা নয় যে আমাদের আলাদা মিটিং ডেকে ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নামতে হবে। এতে মাঝখান থেকে দু'টো দলের মধ্যে একটা শুধু ঝগড়ার সৃষ্টি হবে।'

একটু উত্তেজিত হন আনন্দবাবু।

'তা' হলে আপনি বলতে চানটা কি?

'আমি বলছি আমরা জনাকয়েক ইউনিয়নের কমিটির সঙ্গে বসে একটা কথাবার্তা বলে কিছু একটা ঠিক করি। প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের গোঁ ধরে থাকি তা' কি ভাল হবে বলেন?

'ধরুন যদি দেখা যায় তারিখ পেছনই ঠিক রইল? তা' হলে আমরা মেনে নোব।'

মেনে নোব?'

'নিশ্চয়ই যদি জয়েন্ট মিটিং এর ডিসিশন তাই হয় ত' মেনে নেবেন।'

'এ হতে পারে না।'

'বলুন কেন পারে না, হাসে সুতপা, কি করবেন বলুন তখন?'

আনন্দবাবু উত্তেজনাটা একটু সংযত করে আনেন। বলেন——

'আমরা রি-ইউনিয়ন বয়কট করব। পারবেন না?

সুতপা ঘাবড়ে যায় একটু। বেশ চিন্তার ছাপ পড়ে মুখে, এর আগে একবার পরীক্ষা পেছনর ব্যাপার নিয়ে দু'টো দলে মারামারি হয়ে গিয়েছিল, আজও সে কথা ভাবতে ওর ভয় করে। একটি সেকেণ্ডইয়ারের ছাত্রকে ত' পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হ'ল আর একটি ছাত্রীকে হাসপাতালেই কাটাতে হয়েছিল মাসখানেক

ছাত্রী হিসেবে নয়, রোগীনি হিসেবে। অবশ্য তার কোন দোষ ছিল না, এক বরাতের ছাড়া। আর এসব ছাপিয়ে যে একটা আতঙ্ক আর হুজুকের হাওয়া বয়েছিল তাতেই অনেকের শারীরিক ওজন কমে গিয়েছিল। মুখে শুধু বললে——

'এসব আর টেনে আনবেন কেন? রি-ইউনিয়ন হ'লে একটা আনন্দের ব্যাপারে এর মধ্যে আবার যদি কিছু রক্তপাত ঘটে সেটা কি আপনারই মনঃপূত হবে? বলুন।

আনন্দবাবু হেসে ফেলেন। দেখুন সুতপা দেবী রক্ত জিনিষটা শরীরের সার বস্তু সেটা আমিও স্বীকার করি কিন্তু সব ব্যাপারে এটার উল্লেখের আমি কোন যুক্তি খুব খুঁজে পাই না। এর মধ্যে আপনি রক্ত পেলেন কোথায়? সুতপাও হাসে, 'কেন? আপনি পাচ্ছেন না? সেবারে কি হ'ল মনে নেই?'

'আছে, সেটা ছিল অন্য ব্যাপার।'

'হলই বা। সেখানেই কি শরীরের এই সার বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কথা ছিল? ওরা দু'জনেই হাসতে থাকে।

'নাঃ আমি হেরে গেলুম,' বলেন আনন্দবাবু।

'কিন্তু কেন বলুন ত? সুতপা বলে।

'কেন জানেন? অপনারা মানে মেয়েরা সব ব্যাপারেই একটু বেশী বোঝেন। বলুন ঠিক বলিনি?

'হ্যাঁ বলেছেন ঠিকই তবে পুরোপুরি ঠিক বলেন নি।

'কেন? কোথায় আবার ভুল করলুম?' একটু অবাক হওয়ার ভান করেন উনি।

'আসলে পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে মেয়েদের জ্ঞান একটু বেশী। নয় কি?

'আবার মেয়ে চরিত্র সম্বন্ধে পুরুষের জ্ঞান গভীর এটা মানেন ত?'

'একেবারেই না।'

'এইত………আচ্ছা কেন বলুন।'

'তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের পুরুষ সম্বন্ধে যতটা ভাবতে হয়, অন্ততঃ আমাদের সমাজে, পুরুষদের মেয়েদের সম্বন্ধে অতটা দরকার হয় না।

'ও: আমি আবার হারলুম, আর দাঁড়াব না, চললুম, গুড নাইট্।

আনন্দবাবু রেলিং-এর ওপর থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমেই হন্ হন্ করে নিজের ওয়ার্ডের দিকে চলে যান। সুতপাও হেসে নিজের হোষ্টেলের দিকে পা বাড়াল।

সেদিন সুতপা নিজের ঘরে খাটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে একটা মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছিল। মাথার দিকের জানলাটা দিয়ে বাইরের বাগানটা দেখা যায়। তার ওপারেই রাস্তা। রাস্তার ওপারে ছোট ছোট টিনের ঘরগুলো পেরিয়ে দেখা যায় অনিমার শ্বশুর বাড়ী। ওর বাপের বাড়ী সুতপাদের বাড়ীর উল্টো দিকে। আজ অনিমা আসলেও আসতে পারে, সুতপা পত্রিকার পাতায় তাই পুরোপুরি মনটা দিতে পারছিল না। মনটা যেন কেমন একটু সুদূরপিয়াসী গোছ হয়ে গেছে। ও বেশ বুঝেছে যে এখন ওর ভবিষ্যৎ নিয়তি ক্রমশঃ ওর হাতেই তুলে দিচ্ছে। সব কথা বাবা মাকে জিজ্ঞেস করা মানে তাদের অযথা বিব্রত করা। অবশ্য বড় রকমের একটা কিছু করতে গেলে পরামর্শ নেওয়ার দরকার আছে নিশ্চয়ই।

সমস্ত দেহ মন জুড়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি, না আনন্দের না বেদনার। বোধহয় মানষিকতার পরিবর্তন, এ অবস্থায় হয়ত হয়। শৈশবের যে আনন্দ, যে সুযোগ সুবিধে তা যখন চলে যেতে থাকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তখন একটা বেদনার হাওয়া শরীরে বয়ে যায় ক্ষণিকের জন্যে, আবার বাল্য হয়ে যায় স্বাভাবিক, শৈশব হয় পরিত্যক্ত। এই মনোভাব জীবনের সব স্তরেই থাকে। ছাত্রজীবন চলে গিয়ে কর্ম্মজীবনের প্রথম শুরুতেই বা তা হবে না কেন? তাই কর্ম্ম জীবনের শুরু ছাত্রজীবনের অনুভূতিগুলো ছাড়াতে গিয়ে দেয় ক্ষণিকের বেদনা। কত রকমই আছে। ওর মনে পড়ে অনিমার জেঠামশাইয়ের কথা—

মিলন বিচ্ছেদ জীবনে অপরিহার্য্য। যার কিছু নেই তারও কৈশোরের সঙ্গে বিচ্ছেদে হয় যৌবনের সঙ্গে মিলন, এই আর কি।

'আচ্ছা জেঠামশাই, এই যে মিলন বিচ্ছেদ, জন্ম মৃত্যু এ সবই কি মানুষের হাত না ভাগ্য? আমি যদি বলি মানুষের হাত।

কি যেন ভাবলেন ভদ্রলোক, বললেন—'হ্যাঁ ঠিক ঠিক। তোমার কথা মানতে আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। তোমাদের ডাক্তারিতে যদি জন্ম মরণ সমস্যার আমূল সমাধান করতে পারে ত' তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার বক্তব্য তা' নয়। আমাদের নিয়তির আমরাই স্রষ্টা, এইটি জেনে রাখ।'

'অর্থাৎ আপনি বলছেন ভাগ্য আছে, তবে সেটা আমাদেরই হাতে।'

'বিলক্ষণ।'

'দেখুন এ ত চিরকালের কথা, নিছক অলস লোকদের উৎসাহ দেবার জন্যে বলি, সত্যিই কি তাই?'

'ও ভাবে বিচার করলে ঠক্‌বে। তুমি কর্ম নিয়ে এসেছ তার সম্ভাব্য ফলই তোমার ভাগ্য তোমার নিয়তি। এই ভাবে দেখ। হাজার চেষ্টা করেও পারছ না, এটা তোমার প্রাক্তন, আবার এই যে হাজার চেষ্টা এটা কিন্তু ভবিষ্যতের খাতায় উঠে যাচ্ছে, দেখবে গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি।'

'এ কথার পর আর কিই বা বলা যায়, এত কথা।' ও একটু ভেবে কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞেস করেছিল— 'আচ্ছা দেখুন আমি ভাবছি প্র্যাকটিসও করব আবার চাকরীও করব, মানে টাকা পয়সা আয় যাতে হয় তার চেষ্টা করব। আমার এই চেষ্টা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?'

উনি একটু ভাবলেন কি যেন, তারপর বললেন—

'দেখ জীবনের উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যা খুসি তাই কর, খারাপ কিছু হবে না।'

'মানে? জীবনের উদ্দেশ্য বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?'

উনি কি যেন ভেবেই হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠলেন, ব্যাপারটা যেন বোঝা গেল না।

সুনন্দা ঘরে ঢুকতেই সুতপার চমক ভাঙে।

'ওরে যা নিচে গিয়ে দেখ্‌ ঘরগুলো ঠিক পরিষ্কার হ'ল কিনা। তাকগুলোও সব পরিষ্কার করতে বলেছি আর দেওয়াল আলমারিগুলোও। তোর নতুন আলমারী এলে না হয় ওধারের দেওয়ালে বসাস।'

'চল চল দেখি, ওরা দু'জনেই লেগেছে ত? লক্ষণ একা পারবে না।'

'না না হরি লক্ষণ দু'জনেই আছে।'

ওরা নেমে এল নিচে। বাড়ীর পাশের বড় রাস্তার ঠিক ওপরেই বড় ঘরখানা, তারপর একটা ছোট ঘর ভেতরের দিকে। ডাক্তারখানা হিসাবে ভালই। ততক্ষণে ঘর দু'খানা একেবারে খালি করে ফেলা হয়েছে। এ দুটো ঘরে যত আজেবাজে জিনিষ ভর্ত্তি ছিল অনেক দিন ধরে। ওধারে বাড়ীর সামনে বাগানের দিকের ঘরগুলোই ব্যবহার হ'ত। এখন পরিষ্কার করার ঘর গুলো যেন হাসছে। সুতপা মনে মনে খুসী হল। তবু বললে—'ভাল করে চুণকাম করা দরকার, বুঝলে মা, দেখছ না দেওয়ালে সব দাগ ধরে রয়েছে।

'হবে হবে দাঁড়া না, এখনও ত' দেরী আছে, এখনও অনেক কিছু করতে হবে এর পেছনে।'

হরি দেওয়ালের একপাশে জলঢেলে ঝাঁটা দিয়ে একটা কালির ছোপ তুলছিল, সুনন্দা সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল।

'কি গো হাসছ কেন?' সুতপা মার দিকে তাকায়। তখনও হাসছে সুনন্দা, আস্তে আস্তে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু তবুও হাসছে সুনন্দা, কেন কে জানে চোখের চাউনিতে ফুটেছে আবেশ, কিন্তু তবুও অল্প অল্প হাসি যেন বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে বাধা মানছে না।

সুতপা মায়ের কাছে এগিয়ে এল। আঙুল তুলে দেখাল—'ওই খানটায় তুই জন্মেছিলি।'

সুতপা তাকাল, হরি তখনও প্রাণপণে সেই কালির দাগ তুলতে ব্যস্ত।

'তোকে কোলে নিয়ে বসেছিলুম, হাত লেগে মোম বাতিটা পড়ে গেল, কাল দাগ হয়ে গেল ওখানে। কি জানি ছাই ও দাগ আর উঠল না আজও, আমি কত মুছেছি।'

'দূর ছাই তবে আর উঠবে না। বলে হরি ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে কপালে ঘাম মুছতে লাগল।'

'থাকগে যাক, তুই বরং এই দিকটা দেখ, সুতপা বলে।

বুড়ো লক্ষণ দরজাটা মুছতে মুছতে বলে, দিদিমনি আবার নতুন করে এ ঘরে জন্ম নিচ্ছে, ও দাগ থাকবেই।'

সুনন্দা হাসে।

'তুমি নিজের কাজ কর দিকি।' বলে সুতপা।

কিন্তু সুতপার শরীরে শিহরণ খেলে যায়। আবার নতুন করে জন্ম। যে সুতপা একদিন এই ঘরে জন্মেছিল সে আজ নতুন করে জন্ম নিতে চলেছে।

সুনন্দা বাড়ীর ভেতর চলে গেল। হরি আর লক্ষণও ক্রমশঃ বাড়ীর ভেতর গেল। সুতপা একটা ভাঙ্গা চেয়ার ওধারের আবর্জনা থেকে টেনে এনে রাস্তার দিকে চেয়ে আপন মনে বসে রইল। অসিমার আসবার কথা ছিল কই এল না'ত। আর ক'দিন বাদেই চলে যাবে, এর মধ্যে যেটুকু ওকে পাওয়া যায়। বেলাও বাড়ছে বোধ হয় দুপুরের দিকেই আসবে।

'আরে ওকি? ও একটু অবাক হয়েই তাকাল রাস্তায়। আনন্দবাবু না? হ্যাঁ হ্যাঁ তাইত। ও তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর এসে হরিকে রাস্তায় পাঠাল ডেকে আনবার জন্যে। ভদ্রলোক কোনদিকে না তাকিয়ে গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলেছেন। সুতপা দরজায় এসে দাঁড়াল; হরি গিয়ে কি বললে কে জানে, আনন্দবাবু একটু বিস্মিতভাবে পেছন ফিরে তাকিয়ে সুতপাকে দেখতে পেয়েই যেন কেমন মিলিটারী কায়দায় এবাউট টার্ণ করে সড়াৎ করে প্যান্টের পকেট থেকে ডান হাতটা বার করে উঁচু করলেন অভিবাদনের উদ্দেশ্যে, সারা মুখমণ্ডল হাসিতে খুসিতে ভরে উঠল।

সুতপা ভ্যাবাচাকা খেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ওরকম দশাসই চেহারার ক্ষিপ্র অঙ্গসঞ্চালনে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিনা কে জানে। তার ওপর আবার যদি ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন ত' অপ্রস্তুতের একশেষ হতে হবে।

'আরে আরে এই কি আপনার বাড়ী নাকি? জানতুম নাত। আমি ত' এদিকে প্রায়ই আসি।'

'কেন? এদিকে কেউ থাকে নাকি আপনার?

'ওই যে দূরে দেখছেন গোলাপী রঙের বাড়ীটা···

'ওটা ত' প্রিয়নাথবাবুর বাড়ী। প্রফেসর···

'এই ত' ঠিক বলেছেন, ওটা আমার মামার বাড়ী। আমি ওই বাড়ীর ডাক্তার বলতে পারেন এখন। বাড়ীতে কিছু হলেই আমার ডাক আগে পড়ে, অবশ্য কিছু না হলেও ডাকতে কোন কারণ খোঁজে না ওরা।

'প্রিয়নাথবাবু আপনার মামা?'

'মামাও বটে, মাষ্টারমশাইও বটে।

'আপনি বসুন, এলেন বাড়ীতে একটু চা খাবেন না।'

'তা' দিন চায়ে আমার অরুচি নেই।'

'একটু বসুন আমি আসছি—'

সুতপা ভেতরে চলে যায়, একটু পরেই সুনন্দাকে নিয়ে ফিরে আসে। হরি আরও দু'খানা চেয়ার দিয়ে যায়। ওরা বসে, আলাপ হয় কথা হয়।

আনন্দবাবু চাকরীর চেষ্টা চালাচ্ছেন, আপাততঃ প্র্যাকটিসের কথা ভাবছেন না। সাগর পারে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সুতপা এই ঘরে ডিনপেনসারি করবে শুনে খুসীই হলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না।

হাতে চা নিয়ে ওরা কলেজের কথায় মেতে উঠল দেখে সুনন্দা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু ওরা লক্ষ্য করল না তার মুখের ওপর কখন এসে পড়েছে একটা অজানা আলোর মধুর আভাস। বুকের স্পন্দন মাঝে একবার দ্রুততালে চলে গিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। কোন সময়ে নিজের অজান্তেই জোড়হাত কপাল ছুঁয়ে ফেলেছিল আর কি।

আপন মনে হেসে ফেলছিল, দেবতাও হাসল কিনা কে জানে। রান্নাঘরে ঢুকে দু'একটা কাজ সেরে বেরতেই দেখে সুতপা কাপগুলো নামিয়ে রাখছে।

'ফিরে চলে গেল?'

'হ্যাঁ আর কতক্ষণ থাকবে এই অবেলায়?'

'প্রিয়নাথবাবুর কি যেন বললে?'

'ভাগ্নে। এখান দিয়ে নাকি প্রায়ই যায়, আমি ত' দেখিনি কখন।'

'আমার যেন মনে হচ্ছে দেখেছি কয়েকবার।'

'হবে।'

'পড়াশুনায় বেশ ভাল বলে মনে হয়, বেশ তীক্ষ্ণ চেহারা।'

'হ্যাঁ তা বেশ ভাল রেজাল্টই করেছে। ওদের আবার ডাক্তারের বংশ। হাসে সুতপা, অনিমার ওকে বেশ ভাল লেগেছে, রোজ দেখত যেত কিনা।'

'তাই নাকি? তোর এখানে ডিসপেনসারী হবে শুনে ত' বিশেষ কিছু বললে না।

'কি আবার বলবে?' একটু অন্যমনস্ক হয় সুতপা, 'ও এখন ওর নিজের ভাবনা ভাবছে।

'প্রিয়নাথ বাবুরাও ত' বেশ শিক্ষিতের বংশ। পয়সা আছে, বাপের এক ছেলে, কিন্তু একটুও দম্ভ নেই, আশ্চর্য্য।

হাসে সুতপা। দম্ভের কথা বাইরে থেকে বোঝা শক্ত না, কার আছে আর কার নেই বাইরে থেকে বিচার করা শক্ত। প্রিয়নাথবাবুর বাইরে থেকে যতদূর মনে হয় ভদ্র।'

'তা সবাইকে কি অন্তর্য্যামী হয়ে তার ভেতরে গিয়ে বিচার করব বলছিস?' ব্যঙ্গ করে সুনন্দা মেয়েকে।

'ঠিক তা' না হলেও……

'যা যা আর দেরী করিস নি চান করে খেয়ে নে।'

সুতপা তোয়ালেটা টেনে নিয়ে কলঘরে ঢুকে পড়ে।

বাড়ীর ভেতর এখন একটা গাম্ভীর্য্যের হাওয়া যেন কোথা থেকে এসে পড়েছে। সবাইয়ের ভেতর একটা বেশ পরিবর্তনের আমেজ লেগে হাল্কা হাসির হাওয়াটাকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তার বদলে এনে দিয়েছে একটা ব্যাপ্তিময় প্রশান্ত দৃষ্টি।

এটা বাড়ীর লোকের কাছে প্রথমটা ধরা পড়েনি, পড়ল অনেক পরে যখন অনুপমবাবুর বড় ভায়েরা ভাই বরদাবাবু এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক এমনিতে বেশ হাসিখুসি, কিন্তু সেদিন বাড়ীতে এসেই কেমন যেন একটু বিব্রত বিব্রত ভাব নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। সবাই আগের মতই তাকে আপ্যায়িত করলেও তাঁর মন যেন ঠিক ঠিক পাওয়া গেল না।

উনি বাড়ীতে ঢুকেই এঘর দেখলেন, ও ঘর দেখলেন সবায়ের মুখের দিকে তাকালেন। সবাই বেশ মজা পেল। তারপর খানিকটা গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। তারপর বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

'হুঁ এইবার বুঝেছি।' বললেন শেষে।

দীর্ঘশ্বাস মোচন করে সুতপা সুনন্দা হেসে উঠল। অনুপমবাবু চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন—

'যাক, নিশ্চিন্ত, দাদা এইবার ব্যাপার বুঝেছেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা কি? সুনন্দার প্রশ্ন।

'এইবার জানাব একটু ধৈর্য্য ধর, অনুপমবাবু স্ত্রীকে আশ্বাস দেন, সবে ত' দাদা বুঝলেন, এখন বোধ্য-বস্তুটা ব্যাখ্যা করতে একটু সময় দাও।'

'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ত' দেখছি, বলেন বরদা বাবু, বেশ অবাক অবাক লাগছে।'

'কেন কি দেখলেন? বাড়ীটা সাবান হয়েছে এই ত। আর কি দেখেছেন? সুতপা জিজ্ঞেস করে।

'মানে বাড়ীর ভোলটা বেশ পালটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কোথায় যেন বেশ একটা চেঞ্জ এসেছে। এত চারিদিকে বই কিসের দেখি' উনি একটা টেনে নেন, একটা ইংরাজী নভেল।

এখন আর তাসে টাসে যাই না, এই নিয়েই আছি। বলেন অনুপমবাবু।

'আর ও গুলো?'

'ও সব সুতপার বই ডাক্তারি, আর অন্য সব। ওরও

ত'.পড়াশুনো শেষ, এই বার যাহোক একটা কিছুতে দিতে হবে।

'তা হলেই দেখ সুতপার দৌলতে তোমার ধারণাটা পাল্টাল।'

'সেত একশবার। যে ভাবে ও বিয়েতে বেঁকে বসল আমার ত' বেশ ভাবনা হয়েছিল, এখন যা হোক তবু মুখ রেখেছে।

'বলেছিলুম না কিছু ভয় নেই, সুতপা তেমন মেয়েই নয়। ওর বুদ্ধিও খুব ভাল, বুঝলে অজু, যাকে বলে শুভবুদ্ধি। ও তোমার বাড়ীর মুখ রাখবে। সুতপা আস্তে আস্তে কেটে পড়ে।

'কিন্তু দাদা কি করা যায় বলুন ত'? মেয়েদের বিয়ে না দিতে পারলে ত স্বস্তি নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবে ঠিকই, কিন্তু একটা অবলম্বন ত' চাই জীবনে, নইলে কি ঠিক করে? কি বলেন আপনি?'

'কথাটা ঠিকই। কিন্তু ভেবে দেখ মেয়ের বিয়ের চিন্তা আগে যে ভাবে করেছিলে এখন ত' আর সেভাবে করা চলবে না। এখন ওর বিয়ের কথা বরং ওর কাছেই বলে বা বলিয়ে ওর মতটা ভাল করে জেনে নাও আর সেই বুঝে ব্যবস্থা কর। তবে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ছেলের অভাব হবে না।

'ডাক্তার ছেলে হলেই ভাল হয় সুনন্দা বলে।

'ডাক্তার হলেও ভাল, ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর এসবই বা মন্দ কি? কি বল ভায়া?

'হ্যাঁ, মানে হাতে আপনার সে রকম থাকলে দেখুন না।'

'ওই ত' বললুম, এখন আর ওভাবে চিন্তা না করে মেয়ের মনটা ভাল করে জেনে নাও। জোর ত বাপু এখন চলবে না।

ক্রমশঃ

দিশেহারা

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

একটা মশারি কিনতে হবে। কিন্তু হাতে পয়সা নেই। এমাসে নানা উটকো খরচ এসে পড়ায় বেকায়দায় পড়ে গেছে। কিন্তু মশারী যে কিনতেই হবে। এত বছর মশারি ছাড়া দিব্যি চলে গেছিল কিন্তু আর চলছে না। বিনয় ভয়ানক চিন্তায় পড়ল। একটা ছোটো মশারী কিনতে গেলেও কম করেও নিশ্চয় আট দশটাকার ধাক্কা। সে অবশ্য মশারির দাম জানে না। যা-ই হোক; বাড়তি ঐ টাকা খরচ করা তার মত মানুষের পক্ষে নিতান্ত বিলাসিতা। এদিকে বউয়ের শরীর ভাল নেই, আবার বাচ্চা-কাচ্চা হবে। ডাক্তার বলেছে টনিক খাওয়াতে। তার দামও ছ'সাত টাকা। নিজের একজোড়া জামা প্যান্টের অবস্থা সঙ্গীন। আর বাইরে পরে বেরোন দায়। বউও প্যান প্যান করছে। তারও আটপৌরে কাপড়গুলো আর কোনমতেই টেকানো যাবে না। ছেলেটার জন্যও একটা কৌটোর দুধ কিনতে হবে। গরুর দুধ জল। তা খেয়ে খেয়ে ছেলেটার যা হাল হয়েছে—তাকানো যায় না।

বিনয় চিন্তা করতে করতে বেরোল। কারখানার বাসে বসে ভাবতে লাগল। কিছু ধার করতে হবে। কিন্তু কার কাছে। ধারদেনা এমনই হয়ে গেছে প্রভিডেন্ট ফণ্ডে। বন্ধুবান্ধবের কাছেও ধার পাওয়া অসম্ভব। সকলেরই তথৈবচ।

—'কাগজ দেখেছ শিবপদ? আরও চল্লিশ জন মরেছে আমাদের বর্ধমান জেলায়।'

বিনয় চমকে উঠল। মিনমিনে গলায় শুধাল—'কিসে মরেছে?'

—'আরে ভাই কিসে আবার? জাপানী বোমায়? চীনা জাপানী সব ব্যাটারা আমাদের ধনে প্রাণে মারছে।' ক্যাকক্যাক করে লোকটা হাসতে লাগল।

হাসছে ও? কিন্তু বিনয়ের সব রক্ত শুকিয়ে জেলা হয়ে যাচ্ছে। কী সাংঘাতিক রোগ। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরছে। চিকিৎসা করবার আগেই টেঁসে যাচ্ছে সব। ক্ষুদে মশা কতকগুলো। যেগুলোকে কোন কালে কেয়ারই করে নি, সেগুলোই যমদূত হয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হচ্ছে। ভাবতে গেলে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায়। না। মশারি আজ কিনতেই হবে। যে করে হোক। তার জন্য যদি একবেলা খেতে হয়, নুন ভাত খেতে হয়, তা ভী আচ্ছা।

কারখানায় গিয়ে কাজে মন বসাতে পারে না সে। ভিতরে কি জানি ঠেলা লাগছে—খোঁচা দিচ্ছে। রাতে বিনে মশারিতে শোয়। চারিদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু দূতরা ঘুরে বেড়ায়। উঃ। লোমকূপ দিয়ে শিরশিরানি বেরিয়ে আসে—ছড়িয়ে পড়ে মাথা পর্য্যন্ত। ঘাড়ের কাছটায় কেমন চিনচিন করছে যেন। ঘাড় ফেরাতে কষ্ট হচ্ছে না? কাগজে কালই দেখেছে ঐ রোগটার কি কি লক্ষণ। তার মধ্যে একটা হল—বাপ্‌রে—! এরই মধ্যে ঐ ক্ষুদে শয়তান সর্বনাশা হুল ফুটিয়ে ও পারে যাবার ডাক দিয়ে গেছে কিনা! বিনয়ের গলা দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এল।

—'কী হল দাদা? শরীর খারাপ নাকি?' পাশের সন্তোষ নামে ছোকরা ওর দিকে চাইল।

—উঁ। দেখ তো ভাই সন্তোষ আমার জ্বর হয়েছে নাকি?

—'দেখি—' সন্তোষ ওর গায়ে-কপালে হাত দিয়ে বলল—

—খুব মশাই ঠাণ্ডা বরফ।'

—'কেমন জানি কষ্ট হচ্ছে।'

—'কষ্ট হচ্ছে? কী [illegible] বোঝা? যান্ ঐখানে বসে থাকুন। কাজ করছেন কেন?'

বিনয় সত্যিই আর পারছিল না কাজ করতে।

হাত দুটো যেন ঢিলে হয়ে গেছে। বসল গিয়ে একটা টুলে। কিন্তু বসতেও ভাল লাগছে না সন্তোষের পাশে এল।

—'হ্যাঁ ভাই সন্তোষ মশারির দাম কত জান?

—'মশারি—!' সন্তোষ ভুরু কুঁচকে তাকায়।

—'হ্যাঁ।'

—'কে জানে মশাই। ওসব মশারি ফসারির ধার ধারি নাকি? অবশ্য মশা ব্যাটারা কামড়াতে ছাড়ে না ঠিকই, টের পাই না। গণ্ডারের চামড়া তো।' সন্তোষ নিজের হাতের চামড়া টেনে শেষ করে কথা। ওর দাঁত বার করা হাসি দেখে বিনয় অবাক্ হয়ে যায়। লোকগুলো হাসে কী করে? ওদের মনে কী কোন দুর্ভাবনা নেই? ওদের মৃত্যু ভয় নেই। শুধু তারই কী যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা। কিন্তু নিরুদ্বেগে থাকাই বা যায় কী করে! মশারী ছাড়া শোয় বলে মশা কামড়ায় খু-ব। সকালে রোজই দেখে হাতে পায়ে লাল লাল ফোলা। সারাদিন খাটা খাটনির পরে রাতে এমন ঘুমতো যে মশার কামড় টেরই পেত না এতদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু যেদিন প্রথম খবরটা কাগজে দেখল সেদিন থেকে রাতের ঘুম গেছে। বউ ছেলে অবশ্য অঘোরে ঘুমোয়। বউ কাগজ পড়ে না, তাই নিশ্চিন্দি। ও বলেও নি বউকে। সারারাত বসে মশা তাড়ায়—মশা মারে বিনয়। হঠাৎ কোন মশা গায়ে হুল ফুটিয়ে দিলে সেটাকে ফট করে মেরে ফেলে। সভয়ে দেখে হলদে না কালো। কালই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু পেটটা যেন কেমন হলদেটে। হলদে মশা নাকি? গলা দিয়ে একটা ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এসেছিল। বউয়ের ঘুম ভেঙে গেছল। ওকে বসে থাকতে দেখে শুনিয়েছিল—'কী হল? বসে কেন? ঘুম হচ্ছে না বুঝি?

—'বড্ড মশা।'

—মশা? কই আমার তো লাগছে না।'

—'কুম্ভকর্ণের মত ঘুমালে লাগবে কী করে—ঐ দেখো—' বিনয় আঙুলের ইশারায় দেখায়। দেওয়াল, আসে পাশে শুয়ে কয়েক শ মশা। ওর ভিতর কার মধ্যে যে মরণকাঠি লুকানো আছে ভগবান জানেন।

বউ বলল—'মশা তো বরাবরই আছে। কই, কোনদিন তো তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। অন্য কিছুর জন্য ঘুম হচ্ছে না। দেখি শরীর কেমন—?'

—'শরীর আবার কেমন' বিনয় খিঁচিয়ে উঠেছিল।

বউ ওর গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—'নিশ্চয় তোমার শরীরের ভিতরে কোন কষ্ট আছে। বুঝতে পারছ না। তুমি শোও আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।' বউয়ের গলায় মমতা।

—'একটা মশারি কিনব। মশার কামড়ে কী মানুষের ঘুম আসে?

—'এ মাসে অনেক খরচ গেল। এখন হট্ করে মশারি কিনে বাজে খরচ করো না। বরং খোকার—'

বিনয় দাঁত কিসিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলে—'বাজে খরচ? এটা বাজে খরচ হ'ল। মশারী না কিনলে আমাদের যে খরচের খাতায় নাম চলে যেতে পারে তা জানো?

—'ষাট ষাট। রাতের বেলায় কী অলুক্ষুণে কথা। আসলে ঘুম না হওয়াতে তোমার মাথায় আজে বাজে চিন্তা ঘুরছে।—ওরকম হয়—'

বিনয়ের নিতান্ত সাদাসিধে বউ ওকে একটু আরাম দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিনয় একটুও আরাম বোধ করে নি। বাকি রাতটা ছটফট করে কাটিয়েছিল।

এখনও পারছে না দাঁড়াতে· বসে থাকতে। পাশের ডিপার্টমেন্টে সুধীরের কাছে গেল। সুধীর তার একমাত্র বন্ধু।

—'সুধীর তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

—'কিরে? কী ব্যাপার? তোর মুখ শুকনো কেন? শরীর ভাল তো?

—'হ্যাঁ। ঐ-মোটামুটী। এদিকে শোন—'

সুধীরকে একটু আড়ালে ডেকে নিল।—'আমাকে দশটা টাকা ধার দে—' বিনা ভূমিকায় বলে ফেলল।

—'এই সেরেছে। মাসের শেষে তুমি ব্যাটা টাকা

চাইছ? তাও আবার আমার মত মত মহাজনের কাছে। তোর আর আমার মত, দু'জনের পকেটেরও তো হরিহর আত্মা তা। জেনে শুনেও—'

—'ভীষণ দরকার। না হলে কি চাইতাম? দে সুধীর দে—'

বিনয়ের গলায়, দেহে মুখে অদ্ভুত আকুতি।

সুধীর ওর দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল—'তোর যে খুবই দরকার বুঝছি। আমি দেখি আর কারো কাছে—নিজের তো—' সুধীর হাসল করুণ ভাবে।

সুধীর যোগাড় করে দিল টাকা। টাকাটা হাতে পেয়ে বিনয়ের যেন একটু গায়ে জোর এল। কারখানার ছুটি হতেই ছুটল বাজারে। যেখানে তাদের মত মজুরেরা সংসারের দরকারী জিনিস কিনে থাকে।

মশারির দরদাম দেখে চোখ কপালে উঠল। সবচেয়ে সস্তারটাই তেরটাকা। আর তার কী চেহারা। যা জ্যাল জ্যালে—এতে মশা আটকাবে কোথায়। দোকানদারকে সে কথা বলতে বলল—'সস্তার জিনিসও দেখবেন আবার সেরা মালও চাইবেন—তাতে কী হয়? আরও দুচার টাকা বেশী ফেলুন। দেখুন কেমন খাসা জিনিষ দেখাই।'

আরও দুচার টাকা। কোথা থেকে আসবে। ঐ তের টাকারটাই নিতে হবে কমিয়ে সমিয়ে। কিন্তু এতে যদি মশা ঢুকে যায়? তাহলে? তাহলে তো—

দোকানদারের সঙ্গে দর-কষাকষি করল খানিক। একটাকা কমাল। কিন্তু হাতে দশ টাকা বই নেই। আরও আনা ছয়েক পকেটে পড়ে আছে অবশ্য। নেওয়া হ'ল না মশারি। ভালই হ'ল। ওই মশারিতে আসল কাজ কী হত? মাঝখান থেকে ক'টা টাকা জলে যেত। কিন্তু—। রাত—মশা—কামড়—জ্বর—ঘাড়ে ব্যথা তারপর—

সব ভাবনা কিলবিল করে উঠল খিলুর মধ্যে।

আচ্ছা একটা 'মচ্ছর কা দুশমন' মলম কিনলে কী হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ চমৎকার। এতক্ষণ ওর মাথাতেই আসে নি। এমন সহজে মশার হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে তাড়াতাড়ি ছুটল মনোহারী দোকানের দিকে।

মশারীওয়ালা পিছন থেকে চেঁচাল—'কী হল? নিয়ে যান দাদা—ঐ দশটাকাতেই পাবেন—'

বিনয় আর ফিরে চাইল না। মনোহারী দোকানের কাউন্টারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—'মশাই, মশার মলম দিন তো একটা' মলমটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল—দাম কত? তিন টাকা। বিনয়ের মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল, এত সস্তা। তিনটাকায় কেল্লাফতে। ভাগ্যিস মশারীটা কেনে নি। ঐ জালের মত মশারীতে কোন ফায়দা হত না।

সাত সাত টাকা বাঁচল। খোকার জন্য দুধ নিলে হত। কিন্তু সাত টাকায় হবে না। তাহলে বউয়ের টনিক? তাই নেওয়া যাক।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, তাদের মত লোকেদের দুর্দশার কথা। তার উপর হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়ে এ সব বিপর্যয়। এইবার এই জাপানী রোগ আর বছর দুই আগে হয়েছিল 'জয় বাংলা'। রোগের আসল নাম লম্বা চওড়া। কোন্ রসিক ছোকরা নাম দিয়েছিল 'জয় বাংলা'। আজ যেমন বাসের সেই লোকটা হালের এই রোগটার নাম দিল জাপানী বোম। বোমাই বটে। তা সেই 'জয় বাংলা, রোগ মানুষকে প্রাণে মারে নি। একটু আধটু ভুগিয়েছিল। আর বিনয়ের মত লোকদের খামোখা একটা বাড়তি খরচের ধাক্কায় ফেলেছিল। বিনয়েরও ওই চোখ-ওঠা রোগটা হয়েছিল। চোখের কটকটানির জন্য এবং কারখানায় পাঁচ জনের বলাবলিতে একটা কালো চশমা কিনতে হয়েছিল। সেও মাসের শেষে। ধার করেই কিনেছিল। সে দেনা শোধ করতেও কম প্রাণান্ত। তাদের মত লোকেদের বাড়তি এক পয়সা খরচ করলেই অকূল পাথার। এই দশটা টাকাও যে কবে শোধ হবে। সাত টাকা খরচ না করে সুধীরকে ফেরৎ দেওয়া যেত। কিন্তু হাতে টাকা এলে কী আর খরচ করা আটকায়? সামনে আবার পুজো। আর কারো না হোক খোকার জামা প্যান্ট ও বিধবা মায়ের একটা থান তো কেনা উচিত। বছরের এই একসময়েই তো মায়ের জন্য দেশের বাড়িতে কাপড় পাঠায়।

বাড়ী এসে দরজায় কড়া নাড়ল। বউ খুলে দিল। গম্ভীর মুখ। মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম টলটল করছে।

—'কী? কী হয়েছে?' বিনয়ের গলা দিয়ে কষ্টে স্বর বেরোল।

—'খোকার জ্বর।'

—'জ্বর—!' ধপ করে বসে পড়ে বিনয়।

—'নাও ঠেলা। অত ভাবনার কিছু নেই। ডাক্তার-খানায় নিয়ে গেছলাম। ডাক্তার বলল ঠাণ্ডা লেগেছে। ওঠো দেখি। একটুতেই তুমি এত ঘাবড়ে যাও কেন? পুরুষমানুষ।' বউয়ের গলায় মৃদু তিরস্কার।

বিনয় তবু উঠতে পারছে না। শরীরের সব কব্জা ঢিলে হয়ে গেছে—এখুনি খুলে পড়বে বুঝি।

সত্যি খোকার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে? কী জানি ডাক্তার ঠিক দেখেছেন তো? যদি অন্য কিছু হয়? ভাবতে গিয়ে মাথাটা টলে যায়। উঠবার চেষ্টা করে, উঠতে পারে না। সারাদিনের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মাথাটা প্রচণ্ড ভারি হয়ে উঠেছে। মাথার ভার তাকে মেঝের সঙ্গে চেপে রেখেছে যেন। বউ পাশের ঘরে চলে গেছে। বাইরের দরজার কাছেই বিনয় বসে আছে। খোকাকে দেখবার ইচ্ছাও হচ্ছে না।

পাশের ঘরে ডুকরে কেঁদে উঠল খোকা। লাফ মেরে উঠল বিনয়। পাশের ঘরে ছুটে গেল। খাটে বসে জ্বরে-ক্লিষ্ট তিনবছরের ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ল। একী! খোকার হাতে কপালে মশা। দুহাত দিয়ে মশা গুলোকে তাড়াতে লাগল। এক ঝাঁক মশা উড়ে। সর্বনাশ। মশাগুলো কী? হলদে না কালো? হঠাৎ মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে মশার শত্রু বের করে খোকার হাতে মুখে ঘসতে লাগল। খোকা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। রান্নাঘর থেকে উঁকি মারল খোকার মা।—'কী করছ কী? কী মাখাচ্ছ? এই দ্যাখ ছেলেটা যে ককিয়ে গেল—' ছুটে এল কাছে। '—খোকার গায়ে কী লাগাচ্ছ? দেখতো ছেলেটা একেবারে—'

আর কোন ভয় নেই পার্বতী।'

—'কী ভয় নেই?

আর রাতে খোকাকে কিম্বা আমাদের মশা কামড়াবে না।'

—তোমার হতচ্ছাড়া মশা ভূতে পেয়েছে যাও দেখি এখন চা-টা খেয়ে খোকার জন্য ওষুধ আর বার্লি নিয়ে এসো। এই দেখো ওষুধের নাম। হাসপাতালে বললে এ ওষুধ তাদের নেই। কিনতে হবে।'

—অ্যা—! কী কিনতে হবে? বিনয় চমকে উঠল। পয়সা কোথায়? কী ফ্যাসাদ।

—'আর ডাক্তার বাবু বলেছে খোকা খুব দুর্বল। ওকে বলকারক ওষুধ খাওয়াতে হবে।'

—'অ্যাঁ—মানে আজই ওষুধ খাওয়াতে হবে?

—'হবে না? ওষুধ পেটে না পড়লে জ্বর কমবে কিসে? যাও শীগগীর। চা হয়ে গেছে।'

কুড়িয়েবাড়িয়ে দু এক টাকা বাড়ীতে আছে হয়ত। বার্লিও কিনতে হবে। ঘরের তাক বাক্স হাতড়ে হাতড়ে দুআনা চার আনা করে টাকা দুই হল। ওষুধের দাম কত? আর বার্লি? চাল-ডাল-কয়লা তরকারী—পূজার কাপড়—কোথা থেকে কী হবে? চারদিকে ধার দেনা। দোকানেও ধার। তারা আর দেবে না ধার।

টাকা দুটো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। ফাঁকা মাঠে গিয়ে বসলে হয় একটু। মাথাটা ক'দিন ভারি হয়ে উঠেছে কে জানে? খোলা মাঠে অন্ধকারে চুপচাপবসে থাকে। কার কাছে আর হাত পাতবে? সুধীর তো দশ টাকা দিয়েছে আজই। আর কে দেবে টাকা? মাইনে পেতে এখনও সাত আট দিন। এ কটাদিন কেমন করে চলবে? আধপেটা খেয়ে থেকেও চলবে না। খোকার ওষুধ-বার্লি-দুধ-টনিক কিনতে হবে। কিনতে হবে যে করে হোক। মাঠের নরম ঠাণ্ডা ঘাসে লম্বা করে শুয়ে পড়ে বিনয়। শরীটাকে আর টেনে তুলতে পারবে না বোধহয়।

বনবন করে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঘুরছে বিনয়ের চার-পাশে। বসছে হাতে পায়ে মুখে—কামড়াচ্ছে। কিন্তু বিনয়ের একেবারেই খেয়াল হচ্ছে না।

হরিজন উন্নয়ন কোষ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সুখমতিয়া

বছর পাঁচ কেটে গেছে। কিষণ রামধারী রামসুখয়া প্রোমোশন পেয়ে সোজাসুজী ক্লাসে উঠেছে।

কিন্তু সুখমতিয়া আর গজমোতীয়া একেবারে আশ্চর্য্যভাবে শেষ দু'বছরের পরীক্ষায় পাশ করেছে। গজমোতিয়া সুখমতির মাসীর মেয়ে। আর আশ্চর্য্য ভাবে চটপটেও হয়েছে। তীক্ষবুদ্ধি দুটো মেয়েই। বয়স ১৪।১৫ হ'ল। তারা ম্যাট্রিক্ দেবে ইচ্ছে। কি করে ম্যাট্রিক্ দেবে। কোনো স্কুলে এবারে কি ভর্তি করা যাবে-না, কোনো ক্রমে বইটই কিনে প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়াবেন। অনেক সময় অনেক মেয়ে তো তা করে থাকে বাড়ীর অসুবিধায় কাজকর্মের অসুবিধায়।

সন্ত কেওর কৃপাশঙ্কর করুণাময়ের সীতামেহেত্তার খুব আনন্দ। ছাত্রীদের সাফল্যে বিশেষ করে সুখমতির উৎসাহ ও চেষ্টা দেখে।

কে এখন বাইরের বই পড়তে পারে: শিক্ষাকেন্দ্রের লাইব্রেরীর অনেক সব হিন্দী গল্পের বই পড়ে ফেলেছে।

প্রেমচন্দ্রজীর ছোটগল্প বড় উপন্যাস অন্য সকলের বিখ্যাত অবিখ্যাত মাসিক পত্রগুলিও পড়ে, অন্য বইও পড়ে। বুঝে না বুঝে নেশারমত পড়তে চায় দু'বোনে।

আর ইংরেজী ছোট ছেলেদের গল্পের বই, বড়দের কথাও হাঁটকায়।

এখন কোনোক্রমে তাদের প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিইয়ে দেওয়া কি সম্ভব ?

দুটী মেয়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রঙীন শাড়ী গুলো' পরে চুল বেঁধে কুইন পার্কের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের সেলাইয়ের চরকার তাঁতের ক্লাসের বর্ণহিন্দু শেঠ বণিক ব্রাহ্মণ ছাত্রি দুহিতার সঙ্গে অনায়াসে মিশে গেছে যেন।

এখন তারা আকারেপ্রকারে নির্ভীক। আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে তাদের ভীত হরিজনজীবন ভরসা সাহসহীন কোন একজন্মের ঐতিহ্যকে কোথায় পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য তারা নিজেরা তা জানেনা। বুঝতে পারেনা। শিক্ষিকারা আনন্দিত গর্বে তাদের সাফল্যকে মনে মনে অভিনন্দিত করেন। বাইরে উৎসাহ দেন।

রামসুখ

রামসুখের সপ্তম শ্রেণীতে প্রোমোশন হয়েছে। এখানেও টীচাররা খুব খুসী।

সহসা একদিন রামসুখের পিতার খুব অসুখের কথা 'মোতিজ্বরা' (টাইফয়েড) শোনা গেল। বেশক'দিন ধরে ডাক্তার ওষুধ, বৈদ্য হাকিম, ঝাড়ফুঁক দেবতা কদম সাধু ফকীর ত'রা করল। আজ অবধি ওদের জন্য কোনো হাসপাতাল নেই বাল্মীকি ভবনের। আর অসুখ একেবারে তাকে কাবু করে ফেলেছে। বুঝি চাকরী আর থাকেনা। একমাস পরে। ওঠবার ক্ষমতা নেই।

নতুন দিল্লীর ত্রিমূর্তি ভবনের অনেক ঝাড়ুদারের মধ্যে সেও একজন। দিন ১০ টাকা রোজের কাজ। মাগগী ভাতা, নানা সুবিধা সুযোগময় চাকরী। তাছাড়া এখানেও পাকা বাড়ীর বাসিন্দা। পদমর্য্যাদা বেশীতো।

রামসুখ বাপের পাশে এসে বসে থাকে স্কুলের পর। চিন্তিত মন। বাড়ীর লোক তার মা ছোট ভাইবোন যাদের এখনো পড়ানোর ব্যবস্থা হয়নি। কাজে বেরুবার মতন কারুর বয়স নয়।

সন্ধ্যাবেলা পিতা চোখবুজে কি যেন ভাবে। সহসা চোখ খুলে সেদিন পাশে পুত্রকে দেখে বলল—তোহর মাতারি কাঁহা (তোর মা কোথায়?)।

মাকে ডাকল রামসুখ। মা এলো।

পিতা বললে, দেখ্ ভালো হই কিনা। বৈদ্ ভাগদার কি বলে?

মা বললেন, 'ভাল হবে বৈকি। তবে 'মতিঝরা' তো দেরী হবে গায়ে জোর পেতে'। একটু বাজরা গমের 'দলিয়া' খেতে খেতে গায়ে তাকৎ মিলবে। (দলিয়া আধভাঙা শস্য। শস্যের খিচুড়ীপথ্য রোগীর জন্য)।

আবার ক'দিন যায়।

পিতা রামঅবতার বা 'রামতার' আবার ছেলেকে ডাকে, স্ত্রীকে ডাকে। বলে, 'দেখ এবারে রামসুখের বিয়ের ঠিক করতে হবে। একবার সুখমতিয়ার বাপ লছমনদাসকে ডাকো।'

মা তেজস্বী বলে 'আচ্ছা তুমি সেরে ওঠো, তখন সব ঠিক হবে'।

রামসুখ বিব্রত হয়ে ওঠে বলে 'বাবু, (বাবা) এখন তো পড়ছি। সাদির কথা থাক্। শীগগীর দু'তিন বছরে পাস হয়ে যাব ইম্তাহানে ভালো নম্বর পাচ্ছি। আর আর তুমিও ভাল হয়ে ওঠো।

পিতা। 'বেটা আর পড়ে কি হবে। আমার নোকরীটায় তোকে ঢুকিয়ে দিই এইবেলা। আমি তো ভারীকাজ আর বোধহয় করতে পারব না। একাজ হাতছাড়া হয়ে গেলে 'ফির' আর ভালো কাজ নয়াদিল্লীর এলাকায় পাবিনা, মিলবেনা। তখন এখানকার এবাড়ীও ছাড়তে হবে। এতো আমাদের বড় জমাদারদের জন্য। আমার জমা মাহিনাতে সংসার চলছে এখনো। কিন্তু অসুখের বেশীদিন তো পুরো মাহিনা মিলবেনা। এতো রোজানা রোজ তলব মাহিনা। এরা সবাই খাবে কি? তোকে তো চাকরী করতেই হবে। বিয়েও হয়ে যাব।

পিতা ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে শুলো।

মা-ও চিন্তিত। আরো তিনটি সন্তান রয়েছে। সব ৭।৮ বছরের মধ্যে।

পিতা বললে 'পাড়না লিখনা বেশতো শিখেছিস। সই করতে 'খত' লিখতে হিসাব লিখতে শিখে গেছিস। বড় বড় ছত্রিদেরই ছেলেমেয়েরই আজকাল তংখা (মাহিনা) দিন দশ রূপেয়ার নিচে। তোকে এখন ঢুকিয়ে দিলে দিন চার রুপেয়া থেকে বেড়ে গিয়ে আমার মাহিনাতে দু' বছরেই পৌছে যাবি। আমার কত জানাশোনা অপসর (অফিসার) আছে। তাছাড়া এরা (বাচ্চারা) আমরা সবাই খাব কি?

মাথা নিচু করে রামসুখ বসে রইল।

পিতা। 'তোর শ্বশুরকে ডাক সেই বা কি বলে দেখি'। বিয়ে দেয় কি না দেয়। আমি আর তো অত টাকা দিয়ে 'দারু সামন' খাওয়াতে পারবনা। খানাপিনার খরচা! দু' তিনশো, মেয়েকে টাকাও দিতে হবে পাব কোথা?

রামসুখ নীরবে বসে রইল। মা একটু দুঃখিত ও চিন্তিতভাবে ছেলের মুখের দিকে চাইল। সেও তো পুরোণো দিল্লীতে ঝাড়ু দেয়। ময়লার টীন মাথায় বহন করে ফেলে আসে ময়লার গাড়ীতে। কিন্তু তার মাহিনা তো দিন ২।০ টাকার বেশী নয়। এতগুলি মানুষ খেতে।

লছমন দাস

রামতার লছমনদাসের বাল্যবন্ধু। আবার 'পাতালতায়' কুটুম্ব ওয়া পরস্পর সকলেই। রামতায়ের চাকরীর পদমর্য্যাদা বেশ আছে।

অসুখ হয়ে অবধি পাড়ার সবাই দেখাশোনা করে যাচ্ছে চিন্তিত ভীতভাবে। পাছে বাঁকাপথ ধরে অসুখ। যাহোক এখন কমের দিকে এসেছে। সকলেই খুসী।

এদিকে সুখমতিয়ার পড়াশোনা খুব ভালো হচ্ছে। সেকথাও রটে গেছে সমস্ত হরিজন পল্লীতে। সবাই বলছে ও একবার একটা পাশ করলে একেবারে সীতা বিবিজীদের ভালো কাজ পেয়ে যাবে। ঝাড়ু সুপ নিয়ে আর ময়লার টীন মাথায় করে ও রাস্তা ঘাট দিয়ে বেড়াবেনা।

স্কুলের সত্তকওরজী বলেছেন, ভারি এলেমদার

(বুদ্ধিমতী) মেয়ে। লছমন দাস তাতে গর্বিত। কিন্তু একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। জন্মের আগে থেকেই এই সব বিয়ের দেনাপাওনা কুটুম্বিতার ঠিক; এখন মেয়ে তো বলছে সে 'পাশটা' না করে বিয়ে করবে না……।

বন্ধু ও ভবিষ্যৎ কুটুম্বের কাছে এসে লছমন বসল। বাইরে ঝোপড়ী কোয়ার্টারের এক পাশে রামচরিত মানসের কথা হচ্ছে।

সত্যবদ্ধ দশরথ অবসন্ন মূর্চ্ছাতুর অবস্থায় পড়ে আছেন। কাছে কৈকেয়ী নিষ্ঠুর কঠিন মুখে বসে। সভা ও সভাসদ্‌রা গুরু বশিষ্ঠ সব স্তব্ধ।

কথক গাইলেন, "রঘু কুলরীতি সদা চলিআই
প্রাণ যাই বরু ভি বচন না যাই"।
বচন না যাই। বচন না যাই।

এও তো সত্যবদ্ধতা। দুই 'সহেলী' নানীর বাক্য দান। এখনো তারা বেঁচে আছে। বিয়ের উৎসব দেখতে চায়। ওদের বলে।

রাম অবতারের ও কালেও "রঘু কুলরীতি সদা চলি আই" বচনটী প্রবেশ করেছে। বাগদত্ত পিতামাতা।

তুলসীদাস, রামচরিত মানসে, সদগুরু বচন, ওরা কেন জানে। ছোটবেলা থেকে সেই গ্রামের অশথ বটের রৌদ্র ছায়ায় বসে শীতের বিকেলে সেকথা তারা শুনেছে। গরমের সন্ধ্যায় শুনেছে মিটমিটে তেলের কুপী বা দীপে (দিয়া) দিল্লীতে চাকরী করতে এসেও শুনেছে। শোনে আজো।

রামতার বন্ধুকে দেখে বললে 'দেখ ভাই ছেলে তো আরো পড়তে চায়। অথচ তা'হলে ওরা সব খাবে কি?' আর বিয়ের খরচাও তো, মেয়ের পণ, আমার জমা যা ছিল সব এই অসুখে বেরিয়ে গেল।

তুমি কি বল?

লছমন দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, ভাই ওদিকেও তো সুখমতি পাস না করে বিয়ে করতে চাইছে না। ইস্কুলের বিবিজীরাও আমাকে তাই বলছেন।' গর্বিত অথচ চিন্তান্বিত পিতা বলে।

কর্মক্ষেত্র

রামসুখ নীরবে বসে থেকে উঠে গেল বাপের কাছ থেকে।

সবাই বলছে—'বাবু' ভালো হবে, কি করে পড়াবি আর খাওয়াবি—খাবিই বা কি?

স্কুলের মাষ্টার সাহেবরা বললেন, 'তুমি এখন তোমার বাবার অসুখ না সারা অবধি স্কুলে আর এসো না। বাবার কাজেই যোগ দাও। সত্যিই তো খেতে হবে, বাঁচতে হবে। খাওয়াতে হবে বাঁচতে হবে। 'বাবা সেরে উঠে নিজের কাজ নিলে তুমি আবার ইস্কুলে এসো।' আমরা ভর্তি করে নেবো।

রামধারী কিষণ অমরু সবাই বিমর্ষ, নীরব…।

দিব্যলোক

হাঁ কাজ পেল। নয়া দিল্লীরই কারজেন্ ভবন না পথের সামনে তার কর্মভার পড়ল।

না জমাদারদের মত মাথায় গামছা বা হাঁটু অবধি ছোট্ট ধুতিপরা অথবা ময়লা ছেঁড়া জামা ও পাজামা পরা সেখানে চলেনা।

ধবধবে সাদা সরু চুড়ীদার পাজামা আধহাতা (হাফসার্ট) জামা মাথায় সাদা গান্ধীটুপী পায়ে নাগরা কোমরে পেটী বাঁধা তাতে নয়া দিল্লী লেখা চাপরাশ। যেন হোটেলের বা অফিসের চাপরাসী। কে বলবে জমাদার! রবারের পালিসকরা পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাতল দেওয়া 'দাঁড়া আড়া ঝাড়ু'। জঞ্জালই পথে নেই। তবু ঝাঁট দেয় বাগানের কম্পাউণ্ডের পথ। ভবন প্রাঙ্গণের ভিতরে চক্চকে মোজেইক বা মারবেলে ভবন সামনে বারান্দা। তারও মাঝখানে দামী কার্পেট পাতা। যা জুতোপরে সবাই মাড়িয়ে যাচ্ছে।

রামসুখ এমন বাড়ী ঘর প্রাসাদ বাগান জীবনে কখনো দেখেনি। বেহেস্ত? স্বর্গ? ওঃ কি সুখে ঐশ্বর্যভরা ভবনগুলো। কি খায় ওরা? কোথায় কোন ঘরে শোয়? থাকে? কল্পনায় আসেনা। কি সুখ ওদের।

একটি বালক কিশোর মন-মুগ্ধ বিস্ময়ে চারদিকে তাকায় আর ভাবে।

আর কি বাগান সব! ফুল ও ফল!

এত ফুল এত রকমের ফুল! কি সব রং ফুলের আর কত বড় বড় 'ডাউঁলি' (চন্দ্রমল্লিকা)! বাল্মীকি ভবনেও একটু গাছপালা ফুলগাছ আছে। পুরোণো দিল্লীতেও বাগান বাগিচা আছে। কিন্তু এমন বাড়ী বাগান সে জন্মে দেখেনি, যেন ইন্দ্রপুরী। হ্যাঁ ইন্দ্রের নাম ওরা জানে।

আর ফল। আঙুর, আপেল নথ (ন্যাসপাতি) আম, জাম, কলা, মোসাম্বি, আনারসও। নাঃ ও অত-সব ফলের নামও জানেনা। চোখেও দেখেনি। জীবনে খায়ওনি। এইসব ফল? কারা খায়। কিরকম খেতে? কাঁচা খায়, না পাকা হলে? কাদের জন্ত ও বাগান! কেউ ছোঁয়ও না! ঢোকে না ওসব বাগানে সবাই ঢুকতে পায়না।

আর কি সুন্দরসুন্দর সব বাচ্চারা, ছেলেমেয়েরা। কাপড় জামাই বা কি সুন্দর! বাগানের খালিমাঠে খেলা করে কত রকমের খেলা; ব্যাটবল নিয়ে ওরা বলে (গেঁদ), আবার পাখীর পালকের বল, গেঁদ নয়।

আর কি আলো রাত্রে ওখানকার পথে মাঠে বাগানে। যেন দিন।

ঝকঝকে সুন্দর গাড়ী করে ওরা ছোটরা কোথায় যায় (মাদ্রাসা) স্কুলে? গাড়ী কি ওদের সরকার থেকেই দেয়? ওদের তলব তংকা (মাহিনা) কত? পাঁচ হাজার? সাত হাজার?

নাঃ ও হিসাব করতে পারেনা।

শুধু কাজ করে আর ভাবে। ভাবনা অথই। কি করে এতভালো বাড়ী ওদের জন্য করা হয়। কত খরচা হয়? কারা দেয়? কি কাজ করে ওরা? কি রকমের সে কাজ?

একদিন সহসা মনে হয় আচ্ছা ভগত-রামজীর বাড়ী কোন্‌টা? এখানেই কি?.........তিনি তো হরিজন মোসাহেব (মন্ত্রী)। তাঁর বাড়ী? কি যেন ভবন! বালক-মনের কল্পনা এগুতে চায়না শুধু মনে মনে ভাবে। ওরা? ওরাও কি লেখাপড়া করলে এরকম বড়া আদমী হতে পারবে মোসাহেব? মন্ত্রী? 'রইস' (সম্রান্ত ব্যক্তি)।

—ক্রমশঃ

একজন অদৃষ্ট পুরুষের কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

দাউ দাউ করে অগ্নির লেলিহান শিখা ছেলেটিকে গ্রাস করল। ছেলেটিকে বোধ হয় আর রক্ষা করা গেল না। কয়েক জনের আপ্রাণ চেষ্টায় ছেলেটি কিন্তু রক্ষা পায়। তাহলে কি হয়? বৈশ্বানর কিন্তু তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সমর্থ হয়েছে। বালকটি বোধহয় জীবনে আর কখনও হাঁটতে পারবে না। পা দুটি পেশী সঙ্কোচনের ফলে একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। সামান্য নড়াচড়াতেই বালক এখন যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে।

মা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। মাঝে মাঝে রাত্রে স্বপ্নে তিনি তাঁর খোকনকে চলাফেরা করতে দেখেন। আনন্দে ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই পাশে শোওয়ান খোকাকে দেখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি আবার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু হায় স্নেহময়ী জননী ক্ষণিকের তরেও চিন্তা করেন নি সেদিন—পুত্র তার কি অসাধারণ মনোবলের অধিকারী।

এরপর শুরু হল তাদের বেদনা-দায়ক দৈনন্দিন জীবন। মা প্রতিদিন বৈকালে ছেলেকে গৃহসংলগ্ন বাগানে বসিয়ে দিয়ে আসেন আর গৃহকর্মের অবসরে ঘরের জানালা দিয়ে তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। সেদিনও মা এমনি জানালার পর্দা সরিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু এ কি! তার খোকন কি প্রচণ্ড চেষ্টায় বাগানের মধ্যে পড়ে থাকা লাঙলের হাতলটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনেই বালকের মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর সেই কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা তার সাফল্য মণ্ডিত হল। বালক গর্বভরে এবার জানালার দিকে তাকাতেই মার হাসিমাখা মুখখানা তার নজরে পড়ল। মা আনন্দে ছুটে এসে ছেলেকে তাঁর দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।

অতঃপর চলতে লাগল সেই পঙ্গু বালকের অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টা। এবার থেকে লাঙলটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সেটির হাতলটিতে দুহাত রেখে ব্যাকুল চেষ্টায় পা দুটিকে নাড়বার চেষ্টা করে সে। হ্যাঁ পাদুটি যেন একটু নড়ল। আশায় আনন্দে বালক অধীর হয়ে উঠল। অতঃপর শুরু হল বালকের চলার পালা। কি বেদনাদায়ক তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

সেই যন্ত্রণা আর প্রবল বাসনা—এই দুইএর মধ্যেই আরম্ভ হলো Glenn Cunningham এর হাঁটতে শেখা। তারপর হাঁটবার দূরত্ব একটু করে বাড়তে আরম্ভ করল। ক্রমে হাঁটায় যখন আর কোন কষ্ট রইল না তখন সে আরম্ভ করল ধীরে ধীরে দৌড়, যা অতি শীঘ্রই ক্ষিপ্র দৌড়ে পর্য্যবসিত হল।

এরপর এমন দিন এলো যখন প্রতিবেশী বয়স্ক ছেলেরাও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। অতঃপর দৌড় প্রতিযোগিতার তালিকায় দেখা যায় Glenn Cunninghamএর এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকারের পরিচিতি।

এই খানেই এ গল্পের শেষ নয়। বোধ হয় তার জগৎবাসীকে আরও কিছু জানাবার ছিল। অন্ততঃ করুণাময় ঈশ্বরের তাই ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তা জানাও গেল ১৯৩৪ সালের কোন এক সকাল বেলায়। জগৎবাসী স্তম্ভিত হয়ে সংবাদপত্রে দেখল সেদিন "এক মাইল দৌড়ে Glenn Cunningham এর মি: ৪ সে: ০৬·৮ এ একটি বিশ্ব রেকর্ড।

ক্রীড়া জগতের এ দৌড় এক ঐতিহাসিক দৌড়" নামে পরিচিত। এরপর থেকেই মানুষ চিন্তা করতে আরম্ভ করল—হয়ত বা ৪ মিনিটে মাইল দৌড়ান সম্ভব। আর পরবর্তী কালে তা সম্ভবও হয়েছে একদিন।

Glenn Cunningham মি: ৪ সে ০৪·৪ এও মাইল দৌড়েছেন। কিন্তু সরকারী ভাবে এটা স্বীকৃত হয়নি।

অনিবার্য্য ভাগ্য নির্দিষ্ট অক্ষমতাক্লিষ্ট অথচ ভবিষ্যত সমাজের একজন গলগ্রহ মানুষ তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ডের থেকে ২ সেকেণ্ড কম সময়ে মাইল দৌড়তে সক্ষম, কথাটি চিন্তা করলেও মানব মন অসম্ভব সম্ভব হওয়ার রহস্যবিচারে কিরকম যেন দিশেহারা হয়ে যায়।

স্পন্দিত

মানসী বসু

তখনও ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ হয়নি—বিপ্লবী যুগ ও গান্ধী যুগ পাশে পাশে চলছে। সেই সময়ে এক কেমরা-চোমরা পদস্থ পুলিশ অফিসার—যিনি একটা গোটা এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সেই কল্যাণ সোম সকালে চায়ের টেবিলে বসে ষ্টেটস্‌ম্যানটা উল্টেপাল্টে দেখে নিচ্ছিলেন—কাজের তাড়া আছে এক্ষণি বেরুতে হবে। একটা ছোট্ট খবরে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল! কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে স্ত্রী বিনতার হাতে দিলেন। বিনতা খবরটা পড়ে বল্লে বীরনগরের জমিদার হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন? কল্যাণ সোম নীরবে ঘাড় নাড়ল। বিনতা একটু সঙ্কুচিতভাবে বলল—উনি ত তোমার প্রথম পক্ষের শ্বশুর? কল্যাণ সোমের ভ্রুকুঞ্চিত হল—উনি সীমার দাদামশাই। একটু থতমত খেয়ে বিনতা উত্তর দিলে এখন সীমা কার কাছে থাকবে, ওর আপন ত কেউ নেই। কল্যাণ সোম নিরুত্তরে উঠে গেলেন।

বিনতার মনে পড়ল এইরকম একটি ছোট্ট মৃত্যুখবর প্রায় দশবৎসর আগে পাথরের হৃদয় কল্যাণ সোমকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল—সেটা সীমার মার মৃত্যু সংবাদ। এরপর কল্যাণ সোম সীমাকে নিজের দখলে আনবার বহু চেষ্টা করেছিলেন—বিত্তশালী জমিদার গ্রাহ্যই করেননি, আর এখন ত সীমার ত্রিশ বৎসর বয়স হ'ল—সাবালিকা, সেকি আসতে চাইবে?

অফিসরুমে ঢুকে কল্যাণ সোমও অনেকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন পরে ডায়াল করলেন—ট্রাঙ্ককলে দেওয়ান দীননাথ সাড়া দিলেন ও কল্যাণ সোমের ইচ্ছানুসারে সীমা এসে ফোন ধরল—কল্যাণ সোম আশ্চর্য্য হলেন, সীমা কলকাতায় আসতে রাজী হ'ল—তবে দাদামশায়ের শ্রাদ্ধশান্তির পরে—না ওঁকে পাঠাতে হবে না দেওয়ান দাদুই দিয়ে আসবেন।

তখন পুরা স্বদেশী যুগ, বিত্তশালী জমীদার নরেন্দ্রকৃষ্ণ এই যুগ-হাওয়ায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। সংসারে একমাত্র কন্যাসন্তান ছাড়া কেউ ছিলনা নরেন্দ্রকৃষ্ণ চাইছিলেন কোন সুদর্শন বুদ্ধিমান ছেলেকে জামাই করে নিজের বিত্ত ও আদর্শের অধিকারী করে যাবেন। কল্যাণ সোমকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েগেলেন বিশেষ কিছু খবরা-খবর না করে বিয়েটা সেরে নিলেন। কল্যাণ সোমের বাবা রাজকর্ম্মা ও রাজভক্ত লোক ছিলেন না কিন্তু নরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিন পরেই তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। মাতৃহারা মেয়ে বাপের আদর্শে অনুপ্রাণিতই ছিল। বিয়ের সময় তার ১৬ বৎসর পার হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে বাপকে জানাল—শ্বশুর বাড়ীর সকলেই ইংরাজ-ভক্ত। বিলাতি জিনিষ ছাড়া তারা ব্যবহার করেনা—তাদের খানাপিনা কাজ কারবার সব সাহেবদের সঙ্গে। স্বাধীনতাকামীরা ইংরাজদের শত্রু যারা, তারা তাদেরও শত্রু—মেয়ের চোখ জলে ভেসে গেল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ মেয়ে পাঠালেন না। জামাই যাতায়াত কর্ত্তে লাগল। সেও তার বাবাকে জানাল, এঁরা দারুণ স্বদেশী, সাহেবদের শত্রু—বাড়ীতে বিলাতি জিনিষ ঢোকেনা—উপরন্তু ওঁরা বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয় ও অর্থ সাহায্য করেন বলে সন্দেহ হয়।

কল্যাণ সোম ও তার বাপ দুজনেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েও, নরেন্দ্রকৃষ্ণকে চটাতে সাহস করলেন না—কিন্তু বউকে নিজেদের দখলে আনবার চেষ্টা করলেন। কল্যাণ সোম যাতায়াত করতে লাগলেন, প্রথমে খুব ভাল ব্যবহার করে, পরে কঠিনভাব দেখিয়ে এবং তারপরে ভয় দেখিয়েও স্ত্রীকে রাজী করাতে পারলেন না—শ্বশুর জামাইআদর করতে লাগলেন কিন্তু মেয়ে পাঠাবার নামগন্ধও করলেন না। এই টানা পোড়েনের ভিতর দিয়ে প্রায় দেড়বৎসর কেটে গেল তবুও নরেন্দ্রকৃষ্ণ অটল

রইলেন। সীমা তখন প্রায় ২ মাসের। সেইসময় কাগজে একটা খবর বেরুল কল্যাণ সোম পুলিশ বিভাগের বেশ ভাল চাকরি পেয়েছে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ খবরটা মেয়েকে দেখালেন। এরপর কল্যাণ সোমের বাবা চিঠি দিলেন ছেলে চাকরিস্থলে বৌ নিয়ে যাবে, নাতনী ও বৌমাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সীমার মার কাছে নরেন্দ্রকৃষ্ণ চিঠিটা পাঠিয়ে দিতে সীমার মা চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। কল্যাণ সোম কী তার বাবা চেষ্টা কি হুমকি দিতে কসুর করেন নি— কিন্তু সীমার মা সাবালিকা আর দু' তিন মাসের মেয়েকে কেড়ে আনতেও আইন সায় দেবেনা। তখন আর একটা বিয়ে করার ভয় দেখালেন তাতেও নরেন্দ্রকৃষ্ণ টললেন না। তবে জামাইকে ওর চেয়ে ভাল মাইনের কাজ দেবেন জানালেন, কিন্তু কল্যাণ সোম ও সিংহের গুহায় ঢুকতে সাহস পেলেননা—একটা কথা, স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব কোনদিনই সে সহ্য করতে পারেনি। এই নিয়ে যতদিন আসা যাওয়া ছিল স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ যথেষ্ট হয়েছে—এ পর্য্যন্ত বলেছে টাকার লোভে বাবা মোহে পড়ে গেলেন—এখন না গেলে পরে পস্তাতে হবে। কিন্তু সীমার মায়ের এক কথা—স্বাধীনতা বিদ্বেষীদের আমি ঘৃণা করি এ জমিদারীতে স্বাধীনতা চায়না এমন কেউ নেই। কল্যাণ সোম শাসিয়ে গিয়েছিলেন এই এলাকা মাথা গুড়িয়ে দেবো। যদি সাধ্য থাকে দিও, সংক্ষিপ্ত উত্তর হল।'

এরপর বহু বৎসর চলে গেছে কল্যাণ সোমের। কল্যাণ সোম জাঁদরেল অফিসার হয়েছেন। বিয়ে হয়েছে ছেলে, মেয়ে হয়েছে, সরকারী মহলে বড় কর্ম্মী বলে নাম হয়েছে এবং কল্যাণ সোমের বাবাও তাঁর মৃত্যুর আগে বহু আকাঙ্ক্ষিত রায়-বাহাদুর হয়ে যেতে পেরেছেন! শুধু শ্বশুরের মৃত্যুতে সীমার কথা মনে হ'ল। নরেন্দ্রকৃষ্ণ কিন্তটা জানতেন এইবার যদি জমিদারীটা হাতে পাওয়া যায় তাহলে ঐ জমিদারীটাও উনি দেখে নেবেন। বিপ্লবীর উচ্ছেদ এখনও একেবারে হয়নি আর ঐ জমিদারীটা হচ্ছে ওদের গোপন স্থল।

সীমার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হ'ল দাদামশায়ের শিক্ষায় ও সাহচর্যে ও বড় হয়েছে। মাকেও তপস্বিনী বেশে-দেখেছে। মোটা লাল পাড় শাড়ী হাতে দুগাছা বালা অথচ সমস্ত দিন ব্যস্ত—চরকা কাটছেন, নিরক্ষরদের স্কুলে পড়াচ্ছেন—রান্না করে বহু বুবাহুতকে খেতে দিচ্ছেন। মুখে হাসি লেগে আছে। একটু বড় হয়ে ও মাকে, নয় দাদামশায়কে বাবার কথা জিজ্ঞেস করেছে। উত্তর পেয়েছে—তোর জবরদস্ত বাবা কলকাতায় আছে দিদি, বড় হয়ে সব বুঝবি রে।

ওর দশবৎসর বয়েস যখন, তখন মা হঠাৎ মারা গেলেন। ডাক্তার বল্লে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতার জন্যে, তবে মনে আছে ও নিজের রোদনস্ফীত অবস্থায় ওর মাকে বলতে শুনেছে বাবা সীমা যেন আমার আদর্শ মেনে চলে দেখো। তাই হবে মা দাদামশায় চোখের জল চেপে বলেছিলেন। কিন্তু বড় হয়ে ওর মনে হয়েছে যে মায়ের জন্য পাঁচখানা গ্রাম চোখের জল ফেলেছিল—শোক করেছিল—সেই মা ইচ্ছে করলে কি ওর বাবাকে ফেরাতে পারেন না। তাই বাপের উপর ওর এটা সহানুভূতি ছিল। ছোটবেলায় ও দেখেছে মা কত স্নেহময়ী অন্নপূর্ণার মত কত লোককে খেতে দিয়েছেন তার দিন রাত্রি বলে কিছু নেই। এইসব তরুনদের জন্য মায়ের কত মমতা—দিদিমণি দিদিঠাকরেন—সকলের মুখে শ্রদ্ধা, সমীহ ফুটে উঠত।

দাদামশাই, সুনামী জমিদার ছিলেন, প্রজারা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত। জাতি ধর্মনির্বিশেষে তারা অনুগত ছিল। জমিদারের খাজনা দিতে তারা কার্পণ্য করতনা। তারা জানত পৃথিবীর রস টেনে নিয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়, আবার সেই মেঘই শুষ্ক পৃথিবীকে যে সহস্র ধারায় সিক্ত করে দেবে। একবার অজন্মা হল, খরায় ধান সব জ্বলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুধু যে খাজনা মকুব তাই নয়, বীজ ধান ও চাষের জন্য টাকা বিতরণ করা হল। বাড়ীতে লঙ্গরখানা করা হল। দিদিঠাকরেন পাড়ার মেয়েদের নিয়ে রান্না ও পরিবেশন করেছেন। সকলের খাজনার টাকা যোগাড় হয়নি—দিদিঠাকরেন নিজের গহনার বাক্স বের করে দিয়েছেন।

গোটা এলাকাটাই স্বদেশপ্রেমী। এই বিপ্লবী ছেলেরা বিভিন্ন প্রজার ঘরে ঠাঁই পেত সময়ে সময়ে। বিনা পিকেটিংএ বাজারে বিলিতী কাপড় আসতনা। জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। নরেন্দ্রকৃষ্ণ একটি গ্রামের এক একটি মোড়লের উপর ভার দিয়েছিলেন। আবার প্রতিমাসে তাদের সকলকে একত্র করে নিজে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন। তবুও থানা পুলিশের অভাব ছিল না আর তারা মাঝে মাঝে সন্দেহে হানাও দিত। সীমার মনে আছে বেশ একটু রাত্রে সে বাড়ীতে কলরব শুনে উঠে এসে দেখলে, কয়েকটি তরুণকে মা কত মমতার সঙ্গে খাওয়াচ্ছেন। খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে কয়েকজন এসে সংবাদ দিল দারোগা সাহেব পুলিশবাহিনী নিয়ে আসছেন, ছেলে-গুলির হাতে একগোছা নোট দিয়ে মা কয়েকজনকে আদেশ করলেন—ওদের রাত্রের মত কোথাও জায়গা দিতে হবে। খানিক পরেই দারোগাসাহেব পুলিশ-বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছেন তখনও কয়েকজন প্রজা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা এসে কড়াসুরে জিজ্ঞেস করল এখানে কাহারা খেয়েছে এত রাত্রে? মোলায়েম স্বরে বলল—হুজুর আমরাই ত খেয়ে ছিলাম। এত রাত্রে তোমরা এখানে খেতে এসেছ কেন? ধমকের সুর দারোগার। এজ্ঞে আজ দিদি-ঠাকুরেনের ব্রত ছিল, একটু আগেই উনি ব্রত ভেঙে-ছেন এখনও খাননি। সঙ্গের একটি কনষ্টেবল এক গ্রাম-বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলল কিহে শেখ, তুমিও কি বন্দের খাবার খেতে এসেছ দারোগা ফিরে তাকাতেই সে ঝুঁকে সেলাম করে বলল এজ্ঞে দিদিঠাকুরেন ত শুধু আমাদের দিদি নন উনি আমাদের মা জননী—মা জননীত সকলের না, প্রসাদ পেতে আপত্তি কি।

খবর পেয়ে নরেন্দ্রকৃষ্ণও ওদের নিজের খাস কামরায় ডাকলেন, খানাপিনা করালেন, ভুল খবর দিয়ে যে বিভ্রান্ত করেছে তার সম্বন্ধে কটূক্তি করলেন। এই অন্ধকাররাত্রে তাড়াতাড়ি থানায় যাতে সকলে পৌঁছাতে পারে তার জন্য নিজের মোটরটাও দিলেন। অতিশয় দুঃখিত বলে তারা বিদায় নিল। একজন এসে খবর দিয়ে গেল হাঁ কর্তা আপনি ত ওদের অনেকক্ষণ রেখে-ছিলেন, ছেলেরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছে।

আরো একদিনের কথা সীমা মনে করতে পারে, একটি তরুণী ও একটি কিশোর প্রায় দিন পনেরো তাদের বাড়ীতে ছিল—পরে জেনেছিল ঐ ব্যাপারটি গুলী খেয়ে এসেছিল বলে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের একেবারে বিরাট জমিদারের অন্দরমহলে ভিতরের দিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ডাক্তার দুই বেলা এসে দেখাশুনা ও চিকিৎসা করছে। সীমার মা তাদের নিয়ে খুব ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সেদিন পাশের একটি বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে সানাই বাজছে—হঠাৎ একজন এসে বলল, এবার দলবল নিয়ে দারোগা আসছে, সঙ্গে লালমুখো সাহেব। সীমার মা ছুটে গেলেন—নিরু তুমি কি চলতে পারবে ভাই। হেসে ঘাড় নেড়ে কিশোর উত্তর দিল, হ্যাঁ দিদি পারব। তবে শীগ্‌গির ওঠ—একদম সময় নেই—পুলিশ আসছে শমিতা তুমি ঐ যারা পুকুরে কুলো মাথায় দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে এই শাঁখটা নিয়ে ঘোমটায় মুখে ঢেকে বাজাতে বাজাতে ওদের সঙ্গে মিশে পড়। বাবা বীরসিংহ আর রহিমকে দিয়ে এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, যাও দেরী করোনা।

রহিম এসে দাঁড়াল—বিরাটকায় পাঠান মুসলমান। নরেন্দ্রকৃষ্ণ একদা ওকে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই থেকে ও নরেন্দ্রকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত বিশ্বস্ত অনুচর। ব্যাকুল কণ্ঠে সীমার মা বলল, রহিম এই ছেলেটির অমূল্য প্রাণ তোমার হাতে দিলাম—এই রিভলবার সমেত একে নিরাপদে ২৪ ঘণ্টা রাখবার ভার তোমার বাবা—জান কবুল দিদি সাব। নিরাপদেই থাকবে—এস বাবা তোমাকে আমি কিছুটা কোলে নিয়ে যাব। চক্ষের নিমেষে রহিম কিশোরকে নিয়ে মিলিয়ে গেল। বীর সিং এগিয়ে এল—বীর সিং এই রিভলবার আর ঐ যে ঘাটে যাচ্ছে লালপাড় শাড়ী ঘোমটা দেওয়া দিদি, ওকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাও। রহিম

যেখানে গেছে—ঠিক আছে দিদিজী আমার শির কবুল। বীর সিংও চলে গেল—উপরের জানালা দিয়ে ওদের অগ্রগতি সীমার মা উদ্বিগ্নভাবে দেখতে লাগল। বড় হয়ে সীমা জেনেছিল এ কাজ ওদের মাঝে মাঝেই করতে হত। সীমা দেখল, নীচের উঠানে সারি সারি ধানের গোলার একটা খুলে বিরাট ধামা নিয়ে ধান ঢালা হচ্ছে—আর দেয়ান দাদু যিনি দাদুর হাতে তৈরী, ব্যস্ত হয়ে এগোলা ওগোলা করছেন। পুলিশবাহিনী এসে পড়ল। দেয়ান দাদুর চোখের ইঙ্গিতে ধান আবার গোলায় ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দারোগা ও লালমুখো চোখ পাকিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে হুকুম দিলেন বাহিনীকে গোলাগুলি সার্চ করতে। অতগুলি গোলা লাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে ভিতর দেখা ইত্যাদি করতে প্রায় ঘণ্টা দুই কেটে গেল। বাহিনী হতাশ হয়ে বলল, কোন রিভালভারই এখানে পাওয়া গেলনা। নিম্নস্তর পুলিশ-বাহিনীকে দেয়ান দাদু কিছু জলযোগ করালেন—দারোগা ও লাল-মুখো অফিসারকে নরেন্দ্রকৃষ্ণ আপ্যায়িত করে নিজের খাস কামরায় ডেকে স্কচ হুইস্কি ও সোডার বোতল আনতে বললেন—দুজনেরই চোখ চক্ চক্ করে উঠল। তারপর তাদের মদ খাওয়া দেখে নরেন্দ্রকৃষ্ণ শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন—বেশ করে মদ খাওয়ার পরে নরেন্দ্রকৃষ্ণ এখানে তাদের আগমন কি জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। দারোগা বলল জমিদারবাড়ীতে রিভলভার সহ দুজন বিপ্লবী নাকি আস্তানা গেড়েছে—আজ পর্যন্ত কোন ইনস্পেক্টর একটাকেও ত ধর্তে পারেনা। শুধু বদলি হচ্ছে সোম সাহেবের হুকুমে আর হুমকিতে। লালমুখ কিছু গোলমাল আছে কে খবর দিয়েছে আমাদের শুধু শুধু হায়রানি—বাই দি বাই—স্যার আপনার বন্দুক আছে? আছে বই কি একটা নয় অনেক গুলো—দীননাথ লাইসেন্সগুলো দেখাও। যার অস্ত্রগুলোও আমি জমিদার এত প্রজা শাসনে রাখতে সরকার ত সাহায্য করবেনই। হুষ্ট মনে কোয়াইট ট্রু বলে লাইসেন্স এবং অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল। ইনস্পেক্টরের তবু বিরক্তি যায় না অথচ এই রিপোর্ট গেলে সোম সাহেব গর্জন করে উঠবেন। আমরা অপদার্থ, নরেন্দ্রকৃষ্ণর চাল বুঝিনা—উনি খুব ভাল করেই জানেন নাকি বরাবরই বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় ও অর্থ পায়। বোগাস্ বলে লালমুখ উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, অত্যন্ত দুঃখিত যে শান্তিপূর্ণ স্থানে এসে অশান্তি করলাম সকলে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ মেয়েকে জানাননি তবুও সোম সম্বন্ধে কথাগুলো তার কানে গেল। উপরে সে উদ্বিগ্ন ভাবে পথের দিকে চেয়েছিল। বীর সিং আর রহিম কেল্লার পথে দুর থেকে হাত নেড়ে তাদের গচ্ছিত জিনিষের নিরাপত্তা জানায়। নিশ্চিন্তে নেমে আসবার সময়ে নরেন্দ্রকৃষ্ণের খাসকামরার কথাবার্তা তার কানে যায়—এক ঝলক আগুন তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টাও বাইরে থেকে করা হয়েছিল—কিন্তু এ বিষয়ে নরেন্দ্রকৃষ্ণ অত্যন্ত সজাগ ও কঠিন ছিলেন, কাজেই এ চেষ্টাও বিফল হয়েছিল।

দেওয়ান দাদু বললেন—সীমা দিদি যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আমার ভাবনা হচ্ছে—তোমার দাদুও কোনদিন সে কেউটে সাপের গর্ত্তে তোমাকে পাঠাতে চাননি। আমি জানি দেওয়ান দাদু, দাদু আমাকে মিথ্যা শিক্ষা দেননি—আমার শুধু দেখবার ইচ্ছা—মা কিছু ভুল করেছিলেন কিনা যারজন্য তিনি সারাজীবন তপস্বিনী ছিলেন। তুমি আমায় ট্রাঙ্ককল করবে—বিপদ বুঝলে কোড ভাষায় কথা বলবে।

বিনতা কল্যাণ সোমের ইচ্ছানুযায়ী পাশের ঘরটা সীমার জন্য ব্যবস্থা করে দিলে—মেয়ের আচার আচরণ কল্যাণ সোমের নখদর্পণে থাকাটাই ইচ্ছা—ভদ্রলোক দুঁদে অফিসার হয়েও বুঝলেন না ভুলের বীজ কী ভাবে রোপণ হ'ল।

চায়ের টেবিলে যখন সকলে তখনি সীমা এসে পৌঁছাল—তারা অনুমতি পেয়ে ভিতরে দাঁড়াল, দেওয়ান দাদু চুপি চুপি ওর বাবাকে দেখিয়ে দিলেন—সীমা প্রণাম করে

দাঁড়াতে কল্যাণ সোম বিষম খাঁকুনি খেলেন, এত সীমার মাই এসে দাঁড়াল। এ মেয়ে ত খাপখোলা ইস্পাতের, তলোয়ার এক সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মনে হ'ল। কল্যাণ সোম দেওয়ান দীননাথকে নিয়ে অফিসে এসে বসলেন।

সীমা তার নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে দেখলে সমস্ত বিলাতি সজ্জা, বিনতাকে বল্লে আপনি—এই সব জিনিষ নিয়ে যান, এসব আমি ব্যবহার করি না। বিনতা সভয়ে বলে—তুমি ত জান সীমা তোমার বাবা বিলাতি জিনিষ ছাড়া ব্যবহার করেন না খদ্দর টদ্দর গুলো—

সীমা মৃদুহেসে বল্লে—তাঁর একথাও অজানা নয় যে বিলেতি জিনিষ আমি ব্যবহার করি না—তবে খদ্দর নয়ত। সত্যিই মূল্যবান কাশ্মিরী পর্দ্দা ও বিছানার আস্তরণ বের করে দিল—শুধু এই নয় মা, বাবা ও ভাই বোনদের জন্যও মূল্যবান শাল বের করে দিল—ভাই বোনদের খারাপ লাগলনা তবে ওর কাছে ওরা বেশী-ক্ষণ থাকতে সাহস করেনা ইচ্ছা থাকলেও—সীমা একটু অবাকই হয়ে যায় কিন্তু এর মানে রাত্রেই ও বুঝলে তখন বেশ রাত ওরা সব শুয়ে পড়েছে। কল্যাণ সোম ফিরে এলেন পুলিশের চাকরী কাজের ঝঞ্ঝাট রাতেই হয়ে থাকে। সীমার ঘুম ভেঙ্গে গেল পাশের ঘরে ও বাবার ঈষৎ পানোন্মত্ত গলার আওয়াজ পেল—ঐ শালগুলো ত বেশ মূল্যবান—ওর দাদামশায়ের ত অঢেল টাকা, ওকে এখানে রাখতে চাই তবে খাতী নিচু যেন ওর সঙ্গে বেশী মেশেনা সে দিকে কড়া নজর রাখবে—বিনতা মৃদুস্বরে কী বলতে কথা থেমে গেল-সীমা পাশ ফিরে শুলো। পরদিন চায়ের টেবিলে কল্যাণ সোম সীমাকে বেশ স্নেহ প্রদর্শন করলেন—যা কিছু অসুবিধা ও প্রয়োজন হবে জানাতে। মোটা-মুটি স্নেহময় বাবার মতই ব্যবহার। সীমা হাতের মুঠো থেকে একটা খাম বের করে বাবাকে জানাল এই তিন মাস বাদে ও এ'য়ে পরীক্ষা দেবে টাকাকড়ি জমা পড়ে গেছে—একজন প্রাইভেট টিউটর ও রাখতে চায়। বীরভূম থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই ভদ্রলোকের বিদ্যাবত্তা দেখে ঠিক করা হয়েছে—বাবা যেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেন—আজ ভদ্রলোক আসবেন এখান। কল্যাণ সোম দরখাস্তটা নিয়ে খুলে পড়লেন অমর রুদ্র—স্বদেশীর নামের লিষ্টটা মনে মনে আউরাতে লাগলেন, না এ নাম নেই। তবু সাবধান হওয়া ভালো—পরিচয় জানতে চাইলেন—সীমা জানাল সব ঐ দরখাস্তে আছে। ভ্রুকুঞ্চিত করে এ্যাপ্লিকেশনটা উল্টেপাল্টে দেখলেন—আচ্ছা বলে নিজের কাছে রাখলেন পরে খোঁজ কলেন কত দিতে হবে?

আড়াইশ থেকে তিনশ, সপ্তাহে তিন দিন—এঁ্যা কল্যাণ সোম আকাশ থেকে পড়লেন—কিন্তু সীমা জানাল আসবার আগে দেওয়াম দাদুর সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেছে—উনি প্রতিমাসে টাকা দিয়ে যাবেন। কল্যাণ সোম গুম হয়ে গেলেন।

অমর রুদ্রের চেহারা ও সাজ দেখে—কল্যাণ সোমের মত পুলিশেরও হাসি পেল—সাজ ত হিপির, আবার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। এই লোক এত বিদ্বান—না সন্দেহ করা যায় না। ওরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো দেখলেন। ঠিকানা নিলেন। খুব গরীব, মাকে নিয়ে রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। খবরে সত্যিই তাই জানা গেল। টিউটর দেখে সীমা ঘাবড়ে গেল—এ কি পড়াবে? বিদ্যাবত্তা দেখে ও মুগ্ধ হয়েছিল, এই সাজ ভাবেনি। কিন্তু বইখুলে পড়ান দেখে ও আশ্চর্য্য হয়ে গেল—কি পড়ানর কায়দা, কি উচ্চারণ একেবারে মনের ভিতর এসে ঢোকে। দিন সাতেক পরে—টিউটর চলে গেলেও বই খাতা গুছিয়ে রাখছিল, একটা খাম পড়ে থাকতে দেখে ও খুলে ফেল্লে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাবলে পরে নিজের জামার ভিতর ওটা রেখে দিল—এই কদিনেই সে লক্ষ্য করেছে তার ঘরের জিনিষপত্র এধার ওধার করা থাকে—সম্ভবতঃ কোন ফাঁকে সার্চ করা হয়। বাইরে যদি সে য়ুনিভার্সিটি কি কোথাও যায় ত মনে হয় কে যেন ওকে দূরে থেকে অনুসরণ করে। চেষ্টা করেও ও বিরক্তি দমন করতে পারে না। গভীর রাত্রে বাবার গলার আওয়াজ পায়,

তার মা ও দাদুর বিরুদ্ধে বিষ উদ্‌গীরণ করা হয়—সুর চাপা থাকে তবু সীমা শুনতে পায়, ওর স্বরবন্ধন শিথিল হচ্ছে বোঝে।

পরদিন অমর রুদ্র এলে সীমা নিঃশব্দে চিঠিটা ব্লাউজ থেকে বের করে ওর হাতে দিলে। অমর রুদ্র ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল অতপরঃ?

সীমা চাপা সুরে বলল—যার মাথার জন্য—পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে—সে এখানে আসতে সাহস করলে কি করে?

আমার উপায় ছিল না অর্থের দরকার আর এটাই নিরাপদ আশ্রয়। এর পর দুজনের মন জানাজানি হতে দেরী হ'ল না—ভূমিতে এসে দাঁড়াতেও দেরী হ'লনা। সীমা কিন্তু ওর জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠল। ও জানতে পারল—পাশ করে ও আমেরিকায় যায় এখানের বিপ্লবীদের নায়ক হয়ে ভিন্ন চেহারায় ভিন্ন নামে আসে। সেই নাম ও চেহারাই পুলিশবিভাগে আছে। নামটা আগেরই তবে সাজটা একেবারে ভিন্ন। এখন ওর আমেরিকা থেকে ডাক এসেছে—ফের ভিন্ন নামে ও ভিন্ন সাজে ওকে পাড়ি দিতে হবে—টাকার দরকার। খুব তাড়াতাড়িই ওরা কাছাকাছি এসে গেল। সীমা আরো কিছুদিন ভাবতে সময় নিলে—একদিন একটা দীর্ঘ পত্র রাত জেগে লিখে দেওয়ান দাদু এলে তার হাতে দিলে। রাত্রেই ও কল্যাণ সোমের গলা পেল বুড়োটা এসেছিল কি কর্ত্তে? মনিবের মতই ওটা শয়তান বুঝলে? এর পরের দিনই বাবার গর্জন ও মদ ঢালবার আওয়াজ পেল—হতচ্ছাড়া হারাম জাদাদের দেশ উদ্ধার করা হবে—একবার ধরতে পারলে হয়—ঐযে আমেরিকা থেকে এক ছোকরা দেশ উদ্ধার করতে এখানে বেশ কয়েক মাস এসে গণ্ডগোল বাধিয়েছে—নানান নামে নানান বেশে পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দাও সদর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। একবার ধরতে পারলে হয়—এরপর উঁচু পোষ্ট ঠেকায় কে। আচ্ছা এই মাষ্টার ছোকরাটা ত হিপির বেশ করে—ওটা-কেও একবার নেড়ে চেড়ে দেখা দরকার। সীমা কান খাড়া করে তার পিতৃদেবের মুখোস খোলা মূর্ত্তিটা বোঝে। সংকল্পও ওর মনে মনে ঠিক হয়ে যায়।

পরদিন টিউটর আসতেই ওকে দেওয়ান দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে চিন্তিত মনে অপেক্ষায় থাকে। সকালে কল্যাণ সোম চায়ের টেবিলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন কবে পরীক্ষা? মাষ্টার কেমন পড়ায় আজ আসবে কিনা। সীমা দক্ষ অভিনেত্রীর মত যথাযথ উত্তর দিলে—আজ টিউশনের দিন নয় বললো।

পরদিন সকালেই দেওয়ান দাদু এসে কল্যাণ সোম-কে জানালেন বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমার উপস্থিতি কয়েকদিনের জন্য প্রয়োজন—শেষ হলেই ওকে পরীক্ষার আগে এখানে পৌঁছে দেব। কল্যাণ সোম এখনও সুতো ছেড়ে যাচ্ছেন ঠিক, সময়মত গুটাবেন। ট্যাক্সি নিয়ে দেওয়ান দাদুর সঙ্গে সীমা রওনা হল। সারারাস্তা দেওয়ান দাদু চুপ করে থাকলেন। গাড়ী ষ্টেশনের দিকে চলল—সীমা জানে দেওয়ান দাদু দাদুর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি সিদ্ধ—কল্যাণ সোম চেষ্টা করেও বিষয় সম্পত্তির কোন সংবাদ আদায় করতে পারেন নি। হঠাৎ মোটর একটা ঝক্‌ঝকে নামী দামী হোটেলের সামনে দাঁড়াল। দাদু নেবে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ঢুকলেন, সীমা একটু পিছনে আর একটা মোটর থামতে দেওয়ান দাদুর মুখের হাসির মর্ম বুঝল। ওরা একেবারে ভিতরের দিকে চলে গেল—হঠাৎ সীমা দেখল ভিতরের একটা দরজা দিয়ে ওপাশের রাস্তায় বেরিয়েই অপেক্ষমান একটা প্রাইভেট কারে সীমাকে নিয়ে উঠে বসতেই গাড়ী হু হু শব্দে দম দম এয়ার পোর্টে এসে গেল। দেওয়ান দাদু বুঝিয়ে দিলেন—গোয়েন্দা বাবুরা আমাদের বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরবার জন্য রাস্তার উল্টোদিকে অপেক্ষা করুক।

এয়ার পোর্টে এসে লাউঞ্জে যে ভদ্রলোক প্যান আমেরিকা ছাড়বার জন্যে অপেক্ষা করছে তাকে ডাকতে সে হাসিমুখে উঠে এসে দাঁড়াল—সীমা বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখলে তাঁকে ব্রৌলভী বৈরে ভুল বলা হয়

না। দেওয়ানদাদু ওরিমধ্যে ওদের একটু নিরালা খুঁজে দিলেন।

সীমা—অমররুদ্র রুদ্ধস্বরে বলল আমি যদি বেঁচে থাকি দেশ স্বাধীন হলে তবে তোমাকে পাবত? অমর আমিও তোমারই সীমা স্থির কণ্ঠে বললে—তুমি যেখানেই থাক আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব—তুমি দেশের কাজ করে যাও অমর। আমি বাধা দেবনা। অমর রুদ্র ম্লান কণ্ঠে বলল, ফাঁসির দড়িতে যদি না ঝুলি—তবে তোমার হাতের মালা একদিন নেবই সীমু। আজ আমি নিঃস্ব এই আংটি আমার মা আমাকে দিয়েছিলেন, এটাই এস তোমার হাতে পরিয়ে দিই, আমার দাবী রেখে গেলাম। প্লেনে ওঠবার জন্যে ঘোষণা করা হল। এক মুহুর্ত সীমার মাথাটা বুকের কাছে চেপে রেখে—ছুটে চলে গেল। প্লেন নড়ে উঠল আকাশে উড়বার জন্য।

সীমার হাত ধরে দেওয়ানদাদু বললেন চল দিদি এখন হাওড়ায় ট্রেন ছাড়বে। গাড়ীতে বসে দেওয়ান দাদু বললে তোমার যে চিঠি আমার হাতে দিয়ে পড়তে দিয়েছিলে তখনি সব ব্যবস্থা করে ওকে খবর দিতে লোক পাঠাতে যাচ্ছি এমন সময় অমর তোমার পত্র নিয়ে হাজির হল। ব্যবস্থা কর্তে দেরী হলনা।
সীমা একটু ইতঃস্তত: করে বলল ওর মায়ের কি দুর্দশা পুলিশ কর্বে? দেওয়ানদাদু মুচকি হেসে বললেন, অমর যার নাম করেছে সে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করে। তার নামও অমর ও পাড়ার সকলেই তাকে চেনে। গোয়েন্দা পুলিশ ঐ রকমই করিতকর্মা—ও ওখানে থাকত না। অমরের কেউই নেই, একটি মাত্র বোন, সেও আমেরিকায় থাকে। তুই কিছু ভাবিসনা দিদি, রামকৃষ্ণ মিশনের থ্রু দিয়ে অমরের পৌছান খবর ও খবরাখবর কর্বে।

সন্ধ্যার সময়ে কল্যাণ সোমের ট্রাঙ্ককল এল। ঠিক পৌছেচে কিনা। দেওয়ান দিননাথ জানালেন ঠিক সময়েই ট্রেন ধরে তারা পৌছবেন। সীমাকেও ফোন করে জানাতে হল পৌছানর খবর।

দীননাথ হেসে বললেন, গোয়েন্দা বেচারার এবার চাকরিটা যাবে দেখছি? কিন্তু সীমা তুমি কি আবার ওখানে যাবে? না দেওয়ানদাদু, মা যে আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী ছিলেন, এই একমাসে বুঝে এসেছি। কিন্তু পরীক্ষাটা? না না আর পরীক্ষা নয় এইখানে থেকেই মা ও দাদুর ইচ্ছামত দেশসেবা করি। আর তুমি যদি অনুমতি দাও তবে একবার আমেরিকায় যাবো।

সীমার আবির-ছোঁয়া মুখের দিকে চেয়ে দেওয়ান দাদু তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তাই হবে সীমা, তবে আগে বিষয়-সম্পত্তির বুঝে নাও। আমারওত বয়স হয়েছে। তোমার দাদুর আরব্ধ কাজ আমি করেছি, এখন সব তোমার বুঝে নেওয়া দরকার। আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা আমি করে রাখব।

সীমা দেওয়ান দাদুকে প্রণাম করে উত্তর দিলে, তাই হবে দাদু।

কংগ্রেস-স্মৃতি

দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭

গিরিজামোহন সান্যাল

সভাপতি মশায় স্বয়ং আরও ৪টি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

প্রথম প্রস্তাবে নবগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগকে অভ্যর্থনা করা হল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে চীনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং ভারতীয় সৈন্যদের অপসারণের দাবি করা হল।

তৃতীয় প্রস্তাবে গভর্ণমেন্টের পাশপোটের নীতি বিশেষতঃ সাকলাতওয়াল'কে ভিসা দানে অস্বীকারকে ধিক্কার দেওয়া হল।

চতুর্থ প্রস্তাবে কাকোরি বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হল।

প্রস্তাবগুলি পাশ করা হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ব্যাপকভাবে ভারতে এবং পূব সমুদ্রে এবং বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সমর প্রস্তুতি চালাচ্ছে তা এই কংগ্রেস উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছে এবং অভিমত প্রকাশ করছে যে এর উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার সর্বপ্রকার চেষ্টার কণ্ঠরোধ করা এবং একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে অগ্রগতি দেওয়া এবং এই কারণে এটা বন্ধ করা প্রয়োজন। অতএব কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে এরূপ কোন যুদ্ধ হলে ভারত তাতে কোন অংশগ্রহণ করবে না।

নিম্বকর মশায় প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে কংগ্রেসকে ব্রিটেনের সমর সচীবের সাম্প্রতিক ভারতভ্রমণ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে গ্রেটব্রিটেন, রাশিয়া, আফ-গানিস্তান এবং চীনের সহিত যুদ্ধ করতে চায় এবং যেহেতু কোন ব্রিটিশ উপনিবেশের নিকট থেকে এ বিষয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না সুতরাং পরাধীন ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

তারপর সেদিনের মত অধিবেশন শেষ হল।

পরবর্তী অধিবেশনের দিন স্থির হল ২৭শে ডিসেম্বর।

(১২)

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময়।

প্রথম দিনের মতই সভাপতি মশায়কে শোভাযাত্রা সহকারে প্যাণ্ডেলে আনা হল। তিনি আসন গ্রহণ করলে—যথারীতি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল।

সাধারণ সম্পাদক মশায় অসুস্থ, হাকিম আজমল খাঁর বাণী পড়ে শোনালেন। এই বাণীতে তিনি সাইমন কমিশন বয়কট এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। সধারণ সম্পাদক তারপর মধ্য প্রদেশের মন্ত্রী দেশমুখ, দেওয়ান বাহাদুর টি. রঙ্গচারিয়া এবং বি. মদনের নিকট হতে প্রাপ্ত কংগ্রেসের শুভেচ্ছা সূচক—বাণী পড়ে শোনালেন।

আজকার অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না।

প্রথমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে কংগ্রেসের লক্ষ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজী দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে কংগ্রেসের যে লক্ষ্য আজ স্থির করা হল তা বহু দূরের লক্ষ্য নয়। কংগ্রেসের বর্তমান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আজ অথবা কাল, এক বৎসর অথবা দশ বৎসরে পৌঁছানো যাবে তা নির্ভর করছে আমাদের শক্তির উপর।

বুলুস্থ শাম্বমূর্তি তামিল ভাষায় প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ভি. আই. শাস্ত্রী বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করে জানালেন যে তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। এই উক্তির সঙ্গে ২ চতুর্দিক থেকে এরূপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য হতে লাগল যে তাঁর বক্তব্য কারুর কর্ণগোচর হল না। সভাপতি মশায় দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। এতে ফল হল, শাস্ত্রী মশায় প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেন।

এস্, সত্যমূর্তি প্রস্তাব সমর্থন করে তীব্রভাবে পূর্ববর্তী বক্তাকে আক্রমণ করে তাঁর মত খণ্ডন করলেন।

মৌলানা শওকত আলী কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত বাংলার অন্তরীণ বন্দীদের সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করে বন্দীদের প্রতি গভর্ণমেন্টের হৃদয়হীন ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করলেন।

ডাঃ সত্যপাল এবং কি. হরি সর্বোত্তম রাও কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব পাশ হল।

তারপর সভাপতি মশায় স্বয়ং ১৪ দিন যাবত অনশনরত নাগপুর সত্যাগ্রহের নেতা এভারী মশায়ের প্রতি সমবেদনাসূচক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

ব্রহ্মদেশের প্রতিনিধি মং মৌজি ব্রহ্মদেশে উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে এবং ভারত-ব্রহ্মদেশের সমঝোতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

রেভারেণ্ড উত্তম ও টি. প্রকাশম্ দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব পাশ হয়।

এরপর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় সাইমন কমিশন বয়কট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

যেহেতু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী ষ্ট্যাটুটারী কমিশন নিযুক্ত করেছে অতএব এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে ভারতবর্ষের একমাত্র আত্মসম্মানজনক পন্থাই হচ্ছে প্রতি পদে এবং সর্বপ্রকারে উক্ত কমিশন বয়কট করা। বিশেষভাবে—

(ক) এই কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণকে এবং দেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে :—

(১) ভারতে কমিশনের পদার্পণের দিন গণবিক্ষোভ সংগঠন করতে এবং ভারতের যে সকল সহরে কমিশন উপস্থিত হবে সেই সকল স্থানে অনুরূপ গণবিক্ষোভ সংগঠন করতে।

(২) জনমত গঠনের জন্য সজোরে আন্দোলন চালাতে যাতে সকল প্রকার রাজনৈতিক মতের ভারতীয়দের সুষ্ঠুভাবে কমিশন বয়কট করার পথে আনয়ন করা যায়।

(খ) এই কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন বিধান সভার বেসরকারী সদস্যদের, ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক নেতাদের এবং অন্যান্য সকলকে কমিশনের নিকট সাক্ষ্যপ্রদান না করতে অথবা তার সহিত কোন প্রকার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সহযোগিতা না করতে অথবা তার উপলক্ষ্যে আয়োজিত কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে আহ্বান করছে।

(গ) এই কংগ্রেস সাইমন কমিশনের কাজের সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটী গঠনে ভোট না দিতে এবং উক্ত কমিটীতে অংশগ্রহণ না করতে বিভিন্ন বিধান সভার বেসরকারী সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছে।

(ঘ) এই কংগ্রেস বিধান সভার আসন শূন্য বলে

গণ্য করার পথে বাধাদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কংগ্রেস সদস্যদের বিধান সভায় উপস্থিত না হতে আহ্বান করছে।

(ঙ) এই কংগ্রেস বয়কট কার্যকর এবং সম্পূর্ণ সফল করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দলগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং যেখানে সম্ভব তাদের সহযোগিতা অর্জন করতে ওয়ার্কিং কমিটীকে ক্ষমতা প্রদান করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে আয়েঙ্গার মশায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত হবে না। তিনি জানালেন যে বয়কট ব্যাপারে জিন্না সাহেব, স্যার চিমনলাল শীতলবাদ, স্যার শিবস্বামী আইয়ার, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং সি. ওয়াই. চিন্তামণি কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াবেন।

ডঃ অ্যানি বেশান্ত প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে ভারতবর্ষের কোন লোক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে সাহস পাবে না। তিনি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করলেন যে ভারতের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করার ক্ষমতা ইংরাজের নেই।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ভারতবাসী, তা তিনি হিন্দুই হোন অথবা মুসলমানই হোন, পার্লামেন্টের এই অপমান ছুঁড়ে ফেলে দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হবেন এবং প্রতিজ্ঞা করবেন যে তিনি কমিশনকে প্রতিপদে এবং সর্বপ্রকারে বয়কট করবেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে (ঘ) ধারার পরিবর্তে একটি নূতন ধারা দ্বারা বিধান সভার সদস্যদের তাঁদের আসন ইস্তফা দিয়ে তৎপরিবর্তে খদ্দরের প্রসার ও বিলাতী বস্ত্র বর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে।

কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্পায়া এই সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

টি, প্রকাশম্ আর একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তাতে বিধানসভার সদস্যগণকে কাউন্সিলে পুনঃপ্রবেশ করে যে সকল আইন ওয়ার্কিং কমিটীর মতে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী তাতে বাধাদানের অধিকার দিতে বলা হয়েছে।

শাম্বমূর্তি এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

অভয়ঙ্কর মশায় সমস্ত সংশোধক প্রস্তাবের বিরোধীতা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য কে, আর, করণ্ড বিরোধিতা করে বললেন যে বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অনিষ্টকর কাজে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশের মত কাজ করছে। এটা বিধান সভার অভ্যন্তরে অসহযোগের চিত্তরঞ্জন দাশের কর্মসূচী।

মৌলানা মহম্মদ আলী একটি দীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিতর্কের অবসানে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন।

তারপর ভোটে সকল সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। মূল প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

এই প্রস্তাব গ্রহণান্তর সেদিনের অধিবেশন শেষ হল।

১৩

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর রাত্রি ১১ টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। রাত্রি ১১টা থেকে শেষ রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলল। সমস্ত রাত্রি ধরে বিষয় নির্বাচনী সমিতির আলোচনা ইতিপূর্বে কখনও হয় নি।

এই অধিবেশনে হিন্দু মুসলমান সমস্যা, যৌথ, নির্বাচন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রচলন, এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে প্রস্তাবের সুপারিশ

করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি স্বয়ং এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমানদের এক পক্ষের দাবী যদৃচ্ছা বাদ্যভাণ্ড সহযোগে শোভাযাত্রা পরিচালনার অধিকার এবং অপর পক্ষের দাবি যেখানে ইচ্ছা উৎসর্গ ও খাদ্যের উদ্দেশে গোহত্যা করার অধিকার এই উভয় দাবি অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমানেরা মুসলমানদের নিকট গোহত্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের মনে যতদূর সম্ভব আঘাত না দিতে এবং হিন্দুরা হিন্দুদের নিকট মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো সম্বন্ধে মুসলমানদের মনে যতদূর সম্ভব আঘাত না দিতে আবেদন করছে এবং তদনুসারে কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য বল অথবা আইনের আশ্রয় গ্রহণ না নিতে অনুরোধ করছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে তার সমর্থনে মহাত্মা গান্ধী হিন্দীতে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক হলো। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রস্তাবটি কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য গৃহীত হল।

তার পর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য ভোটাধিকার এবং যৌথ নির্বাচন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

বোম্বাই অধিবেশনের যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে বর্তমান প্রস্তাব রচিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শোনালেন। এবং যৌথ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনার সমগ্র ইতিহাস সভার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। তিনি আরও জানালেন যে কেন তাঁরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তনে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনে রাজি হয়েছেন।

তিনি জোর দিয়ে বললেন যে কোন সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে এটা করা হয়নি।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর মিশ্র একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন তাতে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে কোন সংবিধান পরিকল্পনায় যেন নিম্নলিখিত নীতিগুলি পালিত হয়:—

(১) বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা মজুর বা কৃষিজীবির ক্ষেত্র ছাড়া আসন সংরক্ষণ না করে যৌথ নির্বাচন এবং

(২) দেশব্যাপী সাবালকদের ভোটাধিকার দান।

তিনি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে এর দ্বারা সম্প্রাদায়িকতা উচ্ছেদ হবে।

এই উক্তির পর জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি হিন্দু মহাসভার সভ্য কি না।

মিশ্র মশায় উত্তর দিলেন যে তাঁর সেই গৌরব আছে। তিনি মন্তব্য করলেন যে যদি তাঁর বন্ধু মৌলানা মহম্মদ আলী খিলাফৎ কমিটীর সদস্য হতে লজ্জাবোধ না করেন তা হলে তিনিই বা কেন হিন্দু মহাসভার সদস্য হতে লজ্জাবোধ করবেন।

ডাঃ মুঞ্জে, সরদার সার্দুল সিং অর পুনিয়া প্রভৃতি সদস্যগণ আলোচনায় যোগ দিলেন।

এম্ এস্ আনে একটি সংশোধিত প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাবে একটি নূতন ধারা সংযোগ করতে বললেন যাতে সমস্ত সিডিউল্ড অঞ্চলগুলিতে যুগপৎ শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রস্তাব উপস্থিত করে তিনি মন্তব্য করলেন যে কংগ্রেস যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভীতির জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

তার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একটি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

ঐ-প্রস্তাবে সিন্ধুকে পৃথক করণ এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের ব্যাপারে মুসলমান নেতাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে মূল প্রস্তাবে যে (গ) ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা বর্জন করে তৎস্থলে নিম্নলিখিত ধারাগুলি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

১। কংগ্রেস আশা করে যে ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যেক অংশ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মারফৎ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট লাভ করবে। এই মত পোষণ করে কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে শাসন সংস্কারের উপযোগী করতে অবশিষ্ট ভারতে বিচার ও শাসন সম্বন্ধে যে বিধিসম্মত আইন

প্রচলিত আছে সেইরূপ আইনের অধীনে আনতে হবে। কেবল উক্ত প্রদেশের বিশেষ স্বার্থের প্রয়োজনে বিশেষ আইন রাখা যেতে পারে।

২। প্রদেশের শাসন ব্যাপারে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরু করার উদ্দেশে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন নীতি এবং প্রকৃত জাতীয় ভাবুকতার সম্পূর্ণ বিরোধী বলে নিন্দা করে যেখানে সম্ভব আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে ভাষার ভিত্তিতেপ্রদেশগুলির পুনর্গঠনে কংগ্রেস রাজি আছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজী দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তাঁর বক্তৃতার সময় ব্রিটিশ ভারত উল্লেখ করায় মৌলানা মহম্মদ আলী বাধা দিয়ে বললেন যে"ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া। পণ্ডিতজী তা স্বীকার করলেন "নিশ্চয়ই। মালব্যজী চান যে দেশীয় রাজন্যবর্গও, তাঁদের রাজ্যে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রচলন করেন। এই সময় মহম্মদ আলী পুনরায় বাধা দিয়ে বললেন যে তিনি "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া দ্বারা স্বাধীন ভারতের কথা বলেছিলেন। মালব্যজী সঙ্গে২ "হিয়ার, হিয়ার", "অপনাকে ধন্যবাদ। আমি কি বোকা। (এই উক্তিতে তুমুল হাস্য রোল উঠল।)

পরিশেষে মালব্যজী মন্তব্য করলেন যে তিনি এমন স্বরাজের কল্পনা করেন যাতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহ সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ অংশ থাকবে।

ডাঃ মুঞ্জে মালব্যজীর সংশোধক প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এস্ সত্যমূর্তি মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে তিনি সকলের নিকট আবেদন করলেন যেন তাঁরা প্রস্তাবটিকে কোন সম্প্রদায়ের দাবির জন্য নয় তার নিজস্ব গুণের জন্য বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন যে মুঞ্জে ও মহম্মদ আলীকে একজন পরম হিন্দু ও একজন পরম মুসলমান স্বরূপে নয়, পরম ভারতপ্রেমিক হিসাবে তৈরির জন্য কোনমূল্যই অধিক নয়।

নীলকণ্ঠ দাস একটি সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা পৃথক উৎকল প্রদেশ গঠনের দাবি করেন।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে ডাঃ মুঞ্জে ও জয়াকর উভয়েই প্রস্তাবটি বোম্বাইতে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন।

আর, কে, সিদ্ধ পৃথক সিন্ধু প্রদেশ গঠনের দাবি করে একটি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ডাঃ চৈতরাম গিডোয়ানী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন।

সমস্ত সংশোধক প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পর আরও কতকগুলি প্রস্তাব পাশ হল।

শেষ রাত্রি ৪ টার সময় (ইংরাজী মতে ২৮ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৪ টার সময়) বিষয় নির্বাচনী সমিতি অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

১৪

কংগ্রেসের তৃতীয় বা শেষদিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৮ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮ টায়। পূর্ব ২ দিনের মত এদিনও সভাপতি মশায়কে শোভাযাত্রা সহকারে ডায়াসে নিয়ে আসা হল। সভাপতি মশায়ের আসন গ্রহণ করার পর জাতীয় সঙ্গীত গীত হল। তার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমে সভাপতি মশায় স্বয়ং দুটি প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত করলেন :—

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ঔপনিবাসিকদের এবং আফ্রিকানদের মধ্যে চুক্তি এই কংগ্রেস ভারতীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতীক স্বরূপ মনে করছে বটে কিন্তু সঙ্গে২ জানাচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় বাসিন্দাদের পদমর্য্যাদা ভোটাধিকার প্রাপ্ত অধিবাসীদের সমপর্য্যায়ে গণ্য করা না হবে ততক্ষণ ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হবে না।

এই কংগ্রেস মিষ্টার সি, এফ, এণ্ড্রুসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সেবাকার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস—পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের পূর্ণ মর্য্যাদালাভের সংগ্রাম

চালিয়ে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে এবং একজনও ভারতীয় প্রতিনিধি না নিয়ে পূর্ব আফ্রিকা ফেডারেশন কমিশন নিয়োগের প্রতিবাদ করছে এবং দেশের উচ্চ ভূমি একান্তভাবে ইউরোপীয়দের বসবাসের জন্য রিজার্ভ রাখায় ট্যাঙ্গেনিয়া ম্যানডেট ভঙ্গের বিপদের প্রতি জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

প্রস্তাব দুটি গৃহীত হল।

তার পর শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

ভবিষ্যতে কোন সংবিধান পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হবে। দুই মহান সম্প্রদায়কে আপাততঃ তাদের ন্যায্য স্বার্থ-রক্ষার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার উদ্দেশে এবং বাঞ্ছনীয় মনে হলে প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণ করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে অনুরূপ সুবিধা পাঞ্জাবের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়কে দেওয়া যাবে যাতে তারা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক বেশী আসন পেতে পারে। কোন প্রদেশে যে অনুপাত ঠিক করা হবে সেই প্রদেশ হতে কেন্দ্রীয় বিধান সভার সভ্য নির্বাচনের সময় সেই অনুপাত রাখা হবে। পাঞ্জাবের আসন সংরক্ষণ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

অন্যান্য প্রদেশে এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য মুসলমান নেতাদের দাবি এই কংগ্রেসের মতে ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত এবং তা কার্য্যে পরিণত করা কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শাসন সংস্কারের সঙ্গে২ বিচার সংস্কারও উপরোক্ত প্রদেশগুলিতে চালু করা হয়।

সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশরূপে গঠন করার প্রস্তাব সম্বন্ধে কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করছে যে কংগ্রেস সংবিধানে গৃহীত নীতি অনুসারে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের সময় উপস্থিত হয়েছে।

এই কংগ্রেসের মতে এইপ্রকারে প্রদেশগুলির পুন-বিন্যাসের কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং কোন প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে এই প্রকার দাবি করলে তদনুসারে কাজ করা প্রয়োজন।

এই কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করছে যে,— অন্ধ্র, উৎকল, সিন্ধু ও কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশরূপে গঠন করে এই কাজ আরম্ভ করা হোক।

ভবিষ্যতের সংবিধানে বিবেকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন বিধান পরিষদ বিবেকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। বিবেকের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বাধীনতা। ধর্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান পালনের এবং মিলনের স্বাধীনতা এবং অন্যের ভাবানুভূতির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রেখে এবং অন্যের অনুরূপ অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ধর্মীয় শিক্ষা ও তার প্রচারের স্বাধীনতা,

আন্তর্সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে কোন বিল, প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক বিধান সভায় উত্থাপন করা যাবে না যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন একটি সম্প্রদায়ের উক্ত বিধান সভার চার ভাগের তিন ভাগ সদস্য এইরূপ বিল, প্রস্তাব বা সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন, আলোচনা এবং পাশ করতে আপত্তি করে। আন্তর্সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হচ্ছে—বিধান সভা-গুলির প্রত্যেক অধিবেশনের প্রাক্কালে গঠিত—হিন্দু মুসলমানের যৌথ কমিটি কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিষয়।

এই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করছে হিন্দু ও মুসলমানদের অধিকারের দাবি ক্ষুণ্ণ না করে অর্থাৎ একের পক্ষে যখন খুসী বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা পরিচালনা করার এবং অন্যের পক্ষে ধর্ম অথবা খাদ্যের জন্য যখন গোহত্যা খুসী করার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে গোহত্যা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব হিন্দুর মনে আঘাত না দিতে মুসলমানরা মুসলমানদের নিকট আবেদন করছে এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো যতদূর সম্ভব মুসলমানের মনে আঘাত না দিতে হিন্দুরা হিন্দুদের নিকট আবেদন

করছে এবং তদনুসারে এই কংগ্রেস গোহত্যা নিবারণ এবং মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজানো বন্ধ করার জন্য বল প্রয়োগ বা আইনের আশ্রয় গ্রহণ না করতে হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট আবেদন করছে।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে যুক্তিতর্ক দিয়ে বা বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যকে ধর্মান্তরিত করা অথবা পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার অধিকার আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির এইরূপ কাজ করতে বা তা বাধাদিতে বলপ্রয়োগ, বঞ্চনা এবং অন্যপ্রকার অন্যায় যথা আর্থিক উন্নতির প্রলোভন প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা চলবে না। পিতামাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন লোককে—ধর্মান্তরিত করা উচিৎ হবে না, যদি অন্য ধর্মের কোন লোক ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে তার পিতা মাতা অথবা অভিভাবকের সঙ্গ ছাড়া অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তা হলে অবিলম্বে তাকে তার নিজ ধর্মের লোকের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। কোন ধর্মান্তরিতকরণ; অথবা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যক্তি, স্থান, ও পদ্ধতি সম্বন্ধে—কোন প্রকার গোপনতা অবলম্বন করা অথবা ধর্মান্তরিতকরণ অথবা স্বধর্মে পুনর্গ্রহণের সমর্থনে কোন প্রকার আনন্দোচ্ছ্বাস প্রদর্শ করা চলবে না। ধর্মান্তরিতকরণ বা স্বধর্মে পুনর্গ্রহন গোপনে অথবা বল প্রয়োগে সংগঠন হওয়ার সংবাদ এবং যখনই ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ পাওয়া যাবে তখনই ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা অথবা সাধারণ আইনানুসারে গঠিত সালিশী দ্বারা—উপরোক্ত অভিযোগের অনুসন্ধান করা হবে।

কোকিলকণ্ঠী প্রস্তাবিকা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবটি উপস্থিত করে তাঁর অনবদ্য ভাষায় ইংরাজী এবং উর্দ্দুতে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রস্তাব সমর্থন করে মত প্রকাশ করলেন যে বর্তমান প্রস্তাবটি লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট অপেক্ষা অনেক উন্নত।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর মিশ্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মন্তব্য করলেন যে এই প্রস্তাবের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ।

পাটনার জগৎনারায়ণ লালও প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে প্রস্তাবটি অস্পষ্ট এবং অনেক ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক, বিশেষতঃ বাদ্য বাজানো এবং গোহত্যা ব্যাপারে। তিনি যদৃচ্ছা গোহত্যা সমর্থন করতে পারেন না। এই কারণেই তিনি প্রস্তাব সমর্থন করতে অসমর্থ। উপসংহারে তিনি সকলের নিকট গো রক্ষার জন্য আবেদন করলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার উপরও জোর দিলেন।

গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রস্তাব সমর্থন করে হিন্দিতে বক্তৃতা করলেন।

সরদার শার্দ্দুল সিং প্রস্তাবের সমর্থনে উর্দ্দুতে ভাষণ দিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব সমর্থন করে মন্তব্য করলেন যে এই প্রস্তাব দ্বারা লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে।

এস্ সত্যমূর্ত্তি তামিলে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন

সিন্ধুর ডাঃ চৈতরাম গিডোয়ানী মশায় প্রস্তাব মোটামুটি সমর্থন করে অভিমত প্রকাশ করলেন যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রেখে কেবলমাত্র ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন অসমীচীন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাব সমর্থন করে জোরালো ভাষায় হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে প্রস্তাবটি স্বরাজ অর্জনের একমাত্র পথ। মহাত্মাজী এক বৎসরে স্বরাজ অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাব, বা মহাত্মাজীই রচনা করেছেন, গৃহীত এবং কার্য্যকর করা হলে ২৪ মাসের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হবে; এই স্বরাজ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সহ সমুদয় সম্প্রদায় এই স্বরাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশায় প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে তাঁর এক বৎসরের সেবাকার্য্য ফলপ্রসু

হয়েছে, গৌহাটীতে তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবেন। বর্তমান প্রস্তাব দ্বারা তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে।

মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে গৌরীশঙ্কর মিশ্র এবং জগৎনারায়ণ লাল প্রস্তাবের যে বিরোধিতা প্রকাশ করেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর ভাষণে তিনি অভিভূত হয়েছেন এবং অভিমত প্রকাশ করলেন যে ভাষণটি অপূর্ব। এখন তিনি ব্রিটেনকে বলতে প্রস্তুত যে ভারতের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য; মিশরে যখন মিলনার কমিশন গিয়েছিল তখন মিশরবাসীরা জানিয়েছিল, যে তাঁদের প্রবক্তা হচ্ছেন জগলুল পাশা। লর্ড উইনটারটন ঘোষণা করেছেন যে তিনি সংখ্যালঘুদের চ্যাম্পিয়ন। মৌলানা সাহেব জানালেন যে লর্ড সাহেবের উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। তিনি সংখ্যালঘুদের চ্যাম্পিয়ন নয়, সংখ্যালঘুদের চ্যাম্পিয়ন হচ্ছেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

তার পর সভাপতি মশায় প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করার সময় প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করলেন যে তাঁরা যেন ঐকামত হন।

"মহাত্মাজী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হল।

প্রস্তাব পাশ হওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন অপরাহ্ণ ৫ টা পর্যন্ত মুলতুবী হল। ক্রমশঃ

প্রকল্প রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

বন্দী বিচারের শেষ দৃশ্য

ত্রিশ লক্ষ নিরস্ত্র অসহায় বাঙালীকে পশুবৎ হত্যা ও দু'লক্ষ অসহায়া বঙ্গললনার উপর পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী নব্বই হাজার বন্দী পাক্-বাহিনী, যাদের ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয়ভার এযাবৎকাল বহন করেছেন ভারত সরকার দরিদ্র দেশবাসীর বিপুল অর্থে, তাদের যথোপযুক্ত বিচারেরই আশা করেছিল জনগণ বাংলাদেশ সরকারের নিকট। কিন্তু বিচারের শেষদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে হতাশ এবং বিস্মিত করেছে সমগ্র বাঙালী জাতিকে। এমনকি এ ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবন্ধুর বারংবার দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণাও শেষ পর্য্যন্ত পরিণত হল নিছক প্রহসনে। কীমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ? এ ক্ষেত্রেও কি সেই মানবিকতারই অপূর্ব নিদর্শন ? নইলে এতবড় একটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অভূতপূর্ব্ব নরনিধন যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল মাত্র ১৯৫ জন পাক্-চমু, আর বাদবাকী সব নিরপরাধ ? তারা সব বিনা বিচারে নিঃশর্ত্ত মুক্তিলাভ করল ? রাজনীতির কী অপূর্ব্ব মহিমা! অবশ্য ত্রিশ লক্ষ শহীদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে নব্বই হাজার অতি তুচ্ছ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের সুবিচারে তারা যোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত হলে, কোটি কোটি শোক-সন্তপ্ত বিক্ষুব্ধ বাঙালীর ন্যায়-সঙ্গত ক্ষোভ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হত, সন্দেহ নাই। অতএব তা যখন হয়নি, তখন আর মাত্র ১৯৫ জন আটক বন্দীর বিচারের হুমকী কেন ? তাদেরও অবিলম্বে বিনা বিচারে নিঃশর্ত্ত মুক্তি প্রদান করে, বাংলাদেশ সরকারের উচিত অপূর্ব্ব মানবিকতার বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করা।

অতঃপর বাংলাদেশে বর্তমানে যেরূপ গদীর লড়াই চলছে এবং উহার পরিণাম যে কী ভয়াবহ, পশ্চিমবঙ্গবাসী জনসাধারণের সে সম্বন্ধে অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং পুরাতন বীভৎস চিত্র নবরূপে দর্শনের পরিবর্তে আপাততঃ আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত চিত্র দর্শন ও প্রদর্শন করছি।

অসহনীয় দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি

ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য গগন ভেদ করে এখন অসীম অনন্তপথে অতি দ্রুতবেগে প্রধাবিত হচ্ছে। প্রতিরোধ করবার শক্তি সম্ভবত সর্বশক্তিমান সরকারেরও আর নেই এবং এর যে শেষ কোথায়, হয়ত এ রাজ্যের প্রখ্যাত রাজ জ্যোতিষীদের অভ্রান্ত গণনারও বহির্ভূত। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে জনজীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং উহা যদি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হয়ে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা কিম্বা নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে সর্ব্বত্র গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং যার ফল হয় অত্যন্ত অশুভ। বলা বাহুল্য স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রমশঃ অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু জনমনে বহুদিন ধরেই প্রবল বিক্ষোভ ঘনীভূত হয়ে আছে, কিন্তু উহা ব্যক্ত করবার সৎসাহসটুকুও তারা ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে! দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করেও জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশও সংগ্রহ করতে না পেরে অত্যন্ত অসহায় ভাবেই অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করছে এবং প্রতিনিয়তই মূল্যবৃদ্ধির পরোক্ষ করভারে জর্জ্জরিত হয়ে একমাত্র ভগবৎ চরণেই তাদের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করছে। সকলেরই আজ 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। সুতরাং এক অসহনীয় পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে কোন প্রকাশ্য আন্দোলনে সামিল হওয়ার অবসর কিম্বা উৎসাহও আর তাদের নেই। তাই তাদের চরম ধৈর্য্য ও নীরবতার সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ মুনাফা শিকারীর দল দিনের পর

দিন দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিচ্ছে। কিন্তু এ সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী নয়। কারণ মানুষের ধৈর্য্য ও নীরবতার একটা সীমা অবশ্যই আছে এবং যখন সেই সীমা অতিক্রান্ত হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আসবে স্বাভাবিক উন্মত্ততা, উচ্ছৃঙ্খলতা, হিংসা-পরায়ণতা। দলে দলে কাতারে কাতারে অনশনক্লিষ্ট বুভুক্ষু নরনারী তখন নগ্নদেহে বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্য রাজপথে একমাত্র খাদ্য ও বস্ত্রের দাবী নিয়ে এবং যে কোন প্রতিরোধ তাদের নিকট হবে তখন অতি তুচ্ছ। শুরু হবে তখন অবাধ লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, নরহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী—যার নাম গণ-বিক্ষোভ।

উন্নয়ন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ন

স্বাধীন ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে এযাবৎকাল বিদেশ থেকে ঋণার্জ্জিত সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করেছেন ভারত সরকার এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই করবেন। কিন্তু ব্যয়ের অনুপাতে উন্নয়নসাফল্য কতটা কি হয়েছে, সে সমীক্ষা করবেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ-গণ। তবে যে উন্নয়নের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যমান যে সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিতভাবেই উন্নত হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তদ্ভিন্ন শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি, দারিদ্র্য, বেকারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সবকিছুই ত এখন উন্নতির চরম পর্য্যায়ে এসে পৌছেছে। এ বাস্তব সত্য অস্বীকার করবার আর কোন উপায় নেই। দ্রব্য মূল্য বর্তমানে যে স্তরে উঠেছে তাতে সমাজের সকলস্তরের মানুষেরই শিরঃপীড়ায় পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি উহা দেশের প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে অতি নিম্ন স্তরের ব্যক্তিকেও বিশেষ ভাবে বিচলিত করেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চোখে তো আর ঘুমাই নাই। জনকল্যাণমানসে কি উপায়ে এই গগনভেদী মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায়, সেই ভাবনাতেই তাঁরা সর্ব্বক্ষণ অস্থির। বিভিন্ন সভা সমিতি এমন কি এব্যাপারে সংসদ অধি-বেশনেও সদস্যদের অসার গর্ভ বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনার অন্ত নেই। কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং তার প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন কমিশন গঠন করে মূল্যবৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করা মজুতদার কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসায়ী প্রভৃতি হরেকরকম দুষ্কৃতকারীকে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করে সরকার প্রতিকারের সব রকম চেষ্টাই করেছেন। এমন কি ভূষি, চাল, চিনি তেল, মসলা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর নানাবিধ কেলেঙ্কারী (অবশ্য সব জিনিষ সরকার নিয়ন্ত্রিত) দিনের পর দিন সরকার আবিষ্কার করছেন এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধানও করছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এযাবৎ সুফলের তো কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয়নি, বরং প্রতি নিয়তই দ্রব্যমূল্য উর্দ্ধগামী হওয়ার ফলে জনমনে বিক্ষোভাগ্নি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং সরকারের এই ব্যর্থ প্রয়াস কি শুধু বিপন্ন বিক্ষুব্ধ জনগণকে সান্ত্বনাবারি সিঞ্চনের নিমিত্ত অথবা মূল্যবৃদ্ধির রোধ প্রকৃতপক্ষে সরকারের সদিচ্ছা বর্তমান, সেইটাই হচ্ছে জনগণের ভাববা বিষয়।

কারণ যে কোন ব্যাপারেই হোক, সরকারের শুভেচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকেনা। অবিলম্বে উহা কার্য্যে পরিণত হয়ে থাকে। যেমন নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্দ্ধারণ রাষ্ট্রীয়করণ প্রভৃতি সবই তো সরকারের সদিচ্ছা এবং ক্ষমতাধীন। শুধু একটি মাত্র অর্ডিন্যান্স সাপেক্ষ। সুতরাং সরকারের সদিচ্ছায় যেখানে দ্রব্যনিয়ন্ত্রণও অসম্ভব নয়। অবশ্য ন্যায্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ যদি সরকারী নীতিবিরুদ্ধ হয়, তবে স স্বতন্ত্র কথা। কারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি দ্বারা জন-গণের দিন যাত্রার মান উন্নয়ণও হয়ত সরকারী প্রকল্পেরই অন্তর্ভুক্ত। নইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিম্বা ন্যায্যমূল্য স্থিতিশীল নয় কেন? বলা বাহুল্য, সরকার নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ ধাপে ধাপে যত উর্দ্ধেই উঠুক না কেন, সরকারের নিকট কদাপি উহা অন্যায্য বলে বিবেচিত হয় না। ন্যায্য মূল্য হিসাবেই সরকার পরিচালিত ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত উহার যথারীতি সরবরাহ হয়ে থাকে। তদ্ভিন্ন যখনই যে কোন নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের মূল্য

বৃদ্ধির প্রকল্প সরকারী সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়, ঠিক তখনই সেই বিশেষ বস্তুটি হঠাৎ অদৃশ্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে এবং উহার অনটনের খুবরটিও অবিলম্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার ফলে, কালোবাজার অকস্মাৎ সাদা হয়ে উক্ত সুদুর্লভ বস্তুটি যথাসম্ভব সুলভ করে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ বর্দ্ধিত মূল্যে জনগণকে সরবরাহ করে। নিতান্ত প্রয়োজনবোধেই মানুষ তখন বাধ্য হ'য়ে অত্যুচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করে থাকে। অবশ্য আধুনিক যুগে এমন মূর্খ অতি বিরল, যারা অপেক্ষাকৃত কম কিম্বা ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পেলে স্বেচ্ছায় উহা অগ্নিমূল্য দিয়ে ক্রয় করে। কিন্তু পেটের জ্বালা। তাই অনন্যোপায় হয়েই জীবনের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করতে হয় সাধারণ মানুষকে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য দিয়ে। সুতরাং সেখানে আর তখন সাদা কালার কোন বিচার বিবেচনা থাকা সম্ভব নয় এবং সংগ্রহমূল্য যত চড়াই হো'ক না কেন, অত্যন্ত প্রয়োজনবোধেই মানুষকে উহা ক্রয় করতে হয়। অতএব সরকার নিয়ন্ত্রিত-অথবা বিনিয়ন্ত্রিত এবম্বিধ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যথা চিনি—সাময়িক বিনিয়ন্ত্রণোত্তর কালো বাজার বেশ কিছুকাল অবাধে ফট্‌কাবাজী চালাবার পরে সরকার পুনরায় উহার একটা ন্যায্য মূল্য স্থির ক'রে, (অর্থাৎ যে মূল্য পূর্ব মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী) ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত্ সরবরাহ কার্য্য সুরু করলেন। একেই বলে দ্রব্য মূল্য উন্নয়ন প্রকল্পে দ্রব্যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে কালো বাজারের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করা। নইলে সরকারী গুদামে যখন চিনি বাড়ন্ত অর্থাৎ অনটন তখন কালো বাজারে কী করে উহা সরবরাহ হয় টন্ টন? সুতরাং সরকার কি সে খবর রাখেন না? অবশ্যই রাখেন, তবে সরকারী নীতি সাধারণের দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য। কিন্তু দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির ইহা যে একটা বিশেষ কারণ, সে বিষয় কোন সন্দেহই নাই।

অতএব মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে যে শুধু কালোবাজার কিম্বা অসাধু ব্যবসায়ীরাই দায়ী, এরূপ ধারণাও ঠিক অভ্রান্ত নয়- সরকারের সদিচ্ছা এবং বিনা সমর্থনে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে উহা রোধ করতে পারেন এবং সে জন্য এত জল ঘোলা করবারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সরকার কেন যে উহা রোধ করেন না, সে প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই পাওয়া সম্ভব সরকারের বাৎসরিক বাজেট দৃষ্টে। এ যাবৎ কাল কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত এবং অনুমোদিত বাজেটে যাবতীয় দ্রব্য মূল্য ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী ভিন্ন কদাপি উহা নিম্নগামী হয়েছে ব'লে কোন নজির নেই। সুতরাং ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্য মূল্যের জন্য মূলতঃ দায়ী সরকারী নীতি এবং যতদিন না উক্ত নীতি সংশোধিত কিংবা পরিবর্তিত হবে, ততদিন মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা মানুষ কেন, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারও অসাধ্য।

স্বাধীনোত্তর ভারতে দ্রব্যমূল্য উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে জাতীয় সরকার এযাবৎ ক্রমশঃ কিরূপ অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ সেকালের তুলনায় একালের দ্রব্যমূল্য কত অধিক উন্নত, আধুনিক পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদর্শিত হ'ল।

দ্রব্য মূল্য

সেকালে যা দেখেছি

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য	
চাল—	প্রতি মণ	২—২॥৹	টাকা
ডাল—	” ”	২॥৹—৩	”
তেল (খাঁটি সরষা) ”	” ”	১০—১২	”
ঐ (” নারিকেল) ”	” ”	১৫—১৬	”
ঘৃত ”	” ”	৩০— ৪০	”
দুগ্ধ ”	” ”	১—১৷৹	”
মাংস	” ”	১০—১২	”
মৎস্য	” ”	৫—৬	”
ঐ ইলিশ	একটা	৪—৫	পয়সা
ডিম	প্রতি জোড়া		একপয়সা
ধুতি, শাড়ী সাধারণ ”	”	১—১৷	”
স্বর্ণ	” ভরি	১৮—২২	

সেকালে ছিল বৃটিশ সরকারের শোষণ নীতি

একালে যা দেখছি

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
চাল	প্রতি সের বা কে, জি,	৪—৫ টাকা
ডাল	” ”	২॥—৪ ”
সঃ তেল ভেজাল	” ”	১০—১২ ”
নাঃ তেল	” ” ”	২০—২৫ ”
ঘৃত	” ” ”	২০—৩০ ”
দুগ্ধ	” ” ”	২—২॥ ”
মাংস	” ”	১০—১২ ”
মৎস্য	” ”	১০—১৫ ”
ঐ ইলিশ	একটা	২০—২৫ ”
ডিম	প্রতি জোড়া	১ ”
ধুতি, শাড়ী (সাধারণ)	”	২০—৫০ ”
স্বর্ণ	প্রতি ভরি	৫৫০—৬০০ ”

একালে চলছে জাতীয় সরকারে পোষণ নীতি

বর্তমান স্বাধীন ভারতে দ্রব্যমূল্য উন্নয়ন কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, উপরোক্ত তালিকাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। অবশ্য একালের পাঠক শ্রেণীর সকলের নিকট হয়ত উক্ত তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে, তাঁরা অনেকেই জন্মাবধি বর্তমান কালোবাজারের সঙ্গে পরিচিত এবং প্রচলিত অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যই হয়ত তাঁদের নিকট স্বাভাবিক ব'লে গৃহীত। সুতরাং সেকালের দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোন ধারণা থাকাও সম্ভব নয়। তবে প্রবীনদের নিকট থেকে এর সত্যাসত্য নিরূপণ করতে তাঁরা অবশ্যই সক্ষম হবেন, তাতে কোন সন্দেহই নাই।

প্রাক স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য অধিকাংশ সময়ে বিভিন্ন জন-সভায় ভাষণ দান কালে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বলেছেন :—"সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে পারলে আমাদের সমাজ হবে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত এবং তখন মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-মূল্য ক্রমশঃ নিম্নগামী হবার ফলে স্বভাবতই সাধারণ মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের সেই আশ্বাসবাণী সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস ক'রেই উজ্জ্বল ভাবীকালের আশায় অতীব হৃষ্টচিত্তে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করতঃ অহিংস সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করল এবং তারই ফলে ভারত আজ স্বাধীন। কিন্তু, স্বাধীন ভারতে নেতৃবৃন্দের সে আশ্বাসবাণী কোন দিক থেকেই সফল হয় নি, বরং ফল হ'য়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্য মূল্য হেতু সেকালের তুলনায় একালে জনগণের দুঃখ দুর্দশা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবাস্তব সত্য অনস্বীকার্য। তাই আজ সাধারণ মানুষ একমাত্র জীবিকানির্বাহের জন্য যে কোন ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করছে না, যার ফলে বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজ এত অধিক দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল।

দ্রব্য মূল্য ও যানবাহন ভাড়া বৃদ্ধি কার স্বার্থে ?

জন স্বার্থে ? অসম্ভব! ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য ও যাত্রী ভাড়া কখনও জনগণের পক্ষে কল্যাণকর হ'তে পারে না। জন স্বার্থের উহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তবে কি ব্যবসায়ীর স্বার্থে ? তাই বা কি ক'রে সম্ভব ? জন-সংখ্যার অনুপাতে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, কিম্বা উচিতও নয়। সুতরাং যদি একমাত্র ব্যবসায়ীর স্বার্থেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়ে থাকত এবং সরকার যদি এব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষই হ'তেন, তা হ'লে বহু পূর্ব্বেই সরকার জনকল্যাণ উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে সুনিশ্চিত মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতেন। কিন্তু তা যখন করেন নি, তখন ইহা অতি সহজেই অনুমেয় যে মূল্য-বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ সদিচ্ছা এবং অনুমোদনের অভাব নেই। সরকার প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের মাধ্যমেই একালের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয় এবং সেজন্য সরকারের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ

রক্ষা করবারও প্রয়োজন হয়। সুতরাং সরকারের অজ্ঞাতে কিম্বা বিনা সমর্থনে কোন ব্যবসায়ীর পক্ষেই সম্ভব নয় যখন তখন খেয়ালখুসীমত কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা। সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ-সাজসেই উহা সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। অতএব মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে শুধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই যে সরকার নিঃস্বার্থ ভাবে অনুমতি প্রদান কিম্বা অনুমোদন করেন, এরূপ ধারণা করাও সম্পূর্ণ অমূলক। সরকারের পূর্ণ স্বার্থ এব্যাপারে বিদ্যমান এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পূর্বোল্লিখিত সরকারের বাজেট।

মূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ:—যার ফলে খোলা অর্থাৎ সাদা বাজার রূপান্তরিত হ'য়েছে কালোবাজারে এবং ক্রমশঃ যার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পরিণত হ'য়েছে এক বিরাট মহীরুহে, যার দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য ফলপ্রাপ্তির আশায় স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিয়মিত ধর্ণা দিতে হয় সমাজের প্রায় সব স্তরের মানুষকে। মহাকাল এই কালোবাজারের অসীম প্রভাবেই উদ্ভূত হ'য়েছে দেশের বর্তমান মহাসংকটজনক পরিস্থিতি। এরই মাধ্যমে আশাতীতরূপে সফল হ'য়েছে সমাজবিধ্বংসী বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্প। যথা—দ্রব্যমূল্য, কালোটাকা, ঘুষ, চুরি, জোচ্চুরী প্রভৃতি যাবতীয় দুর্নীতি, যার বিশদ বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক, কারণ বর্তমান সমাজচিত্র জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়। দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় সমগ্র সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে কালোবাজার, যার ফলে অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে যে সহস্রের মধ্যেও একটি সৎব্যক্তির সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। অবশ্য অতীতে যে অসৎ কিম্বা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিল না, এমন নয়। কিন্তু একালের তুলনায় সেকালের ছিল একেবারেই ছিটে ফোঁটা। সুতরাং বর্তমান বিদগ্ধ সমাজকে দুর্নীতির উৎস কালোবাজারের কবলমুক্ত করা এখন আর খুব সহজসাধ্য নয়।

প্রকাশ্যে খোলাবাজারে যারা জীবিকার্জনের নিমিত্ত বহুকাল সৎভাবে চাল, ডাল প্রভৃতি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং স্বল্পলাভে উচিত মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করাই ছিল যে ব্যবসায়ের মূলনীতি, বলাবাহুল্য খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে তাদের সেই প্রচলিত স্থায়ী ব্যবসায় হঠাৎ হ'য়ে গেল বন্ধ। অগণিত ব্যবসায়ী হ'লেন বেকার। সুতরাং স্বভাবতই তারা তখন বিকল্প কর্ম সন্ধানে সচেষ্ট। কিন্তু তাদের আর দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হল না, অবিলম্বেই তাদের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। নিয়ন্ত্রণের পরে যখন দেখা গেল যে সরকার মাথা পিছু সাপ্তাহিক রেশনের যা বরাদ্দ ক'রেছেন, তাহারা কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরই দু'তিন দিনের বেশী চ'লতে পারে না।

তখন উক্ত ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠ থাকবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। কারণ তাঁরা তখন সঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ তো আর না খেয়ে থাকতে পারবে না, বাঁচতে হ'লে সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে হোক সপ্তাহের অবশিষ্ট দিনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য তাদের সংগ্রহ করতেই হবে। সুতরাং তারা তখন অবিলম্বে রং পাল্টালেন অর্থাৎ সাদা থেকে কালো রূপ ধারণ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে মহানন্দে চালাও চালের কারবার শুরু করলেন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যথা সম্ভব মাল মজুত করবারও প্রয়াসী হ'লেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রকাশ্য খোলাবাজারে উক্ত ব্যবসায়ীদের যেসমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হ'ত, গুপ্ত বাজারে সে সবের কোন বালাই না থাকায়, ক্রেতা জন-সাধারণের নিকট থেকে যত অধিক মূল্য আদায় করা সম্ভব, অবাধে এবং নিঃসংকোচে তারা তাই শুরু করলেন। অতএব জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় চালের দাম যত ঊর্দ্ধগামী হ'তে লাগলো, আনুষঙ্গিক খাদ্যদ্রব্য মূল্যও ক্রমশঃ হ'ল তার অনুগামী, এবং এইভাবেই একদা সৃষ্ট হ'য়েছিল মহাকাল কালোবাজার যার অদম্য প্রভাবে সশঙ্কিত আজ সমগ্র ভারত। সুতরাং সরকার

যদি খাদ্য নিয়ন্ত্রণোত্তর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যদ্রব্য প্রকৃত ন্যায্য মূল্যে জীবিকা নির্বাহের একান্ত প্রয়োজনীয় সঠিক বা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সরকারী দোকান মারফৎ জনসাধারণকে সরবরাহ করতেন এবং জনগণও যদি আংশিক রেশনের পরিবর্ত্তে প্রয়োজনীয় পূর্ণ রেশন পেতেন এবং খাদ্যবস্তু সংগ্রহার্থ সাদা কালো কোন বাজারেই তাদের তার পদার্পণ করতে না হ'ত, তাহলে কখনই এই সমাজবিধ্বংসী কালোবাজারের সৃষ্টি হ'ত না এবং ক্রমশঃ এর ব্যপক দুর্নীতির ফলে জাতির এরূপ শোচনীয় অধঃপতনও ঘটত না।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ যে কীভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯৪৩ সালে, যখন তা তৎকালীন বৃটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের ফলে এই বঙ্গদেশেই লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছিল একমাত্র খাদ্যাভাবে। অবশ্য বৃটিশ সরকার তখন যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্যই খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, নইলে প্রায় দু'শ বছর এদেশে বৃটিশ শাসনকালে কখনও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কিম্বা উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ভিক্ষের নজির নেই? অথচ পরাধীন ভারতে বৈদেশিক সরকার তখন জনস্বার্থ বিরোধী বহু নীতিই প্রবর্ত্তন করতে পারতেন, যার প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিবিধান করার কোন ক্ষমতাই ছিল না তখন জনগণের। কিন্তু সেসব সত্বেও মানুষের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বিশেষতঃ অন্নবস্ত্রের এরূপ প্রকট অভাব পরিদৃষ্ট হয় নি কখনও এবং তার একমাত্র কারণ যাবতীয় দ্রব্য মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। আজ সে সবই যেন মনে হয় স্বপ্ন। নইলে স্বাধীন ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য হেতু জনগণের এরূপ হাঁড়ির হাল হবে, কেউ কি তা কখনও কল্পনা করেছিল? সুতরাং যে নীতির ফলে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ আজ, সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন, বিপর্য্যস্ত, জাতীয় সরকারের কি উচিত নয় জন স্বার্থে, দেশের স্বার্থে সে নীতি সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করা? দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়েই জাতীয় সরকার গঠিত। অতএব তাঁরা অবশ্যই জানেন যে শরীরকে অনশনে রেখে মস্তিষ্ক কখনও বড় হ'তে পারে না। সুতরাং সরকারী খাদ্যনীতির ফলে শরীর যদি ক্রমশঃ কঙ্কালে পরিণত হ'য়ে বিনষ্ট হয়, তাহলে মস্তিষ্ক যত স্থূল, যত উর্বর হোক না কেন, শরীরের সঙ্গে উহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।

সরকারী করপোরেশন

বৃটিশ আমলে কলিকাতা মহানগরীতে জন-সেবা মূলক আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল একটি ১৮৭২ সালে, যার শুভ নাম কলিকাতা করপোরেশন (বর্ত্তমানে সরকার পরিচালিত)। নানা কারণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না ব'লেই সম্ভবত জন সাধারণ উহার একটি বিকল্প নামকরণ ক'রেছিলেন, যা উল্লেখ করা এস্থলে অনাবশ্যক, কারণ এখনও সে নামটি অনেকেরই স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয় নি। অবশ্য কলিকাতা করপোরেশন সে সবের কোন তোয়াক্কা না ক'রে এযাবৎকাল অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে জনসেবা কিম্বা আত্মসেবাই ক'রে আসছেন। বরং সেকালের তুলনায় একালে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, করপোরেশনের সেবার মাত্রাও ক্রমশঃ অস্বাভিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে এখন আর কোন দিক থেকেই যেন টাল সামলাতে পারছেন না। তাই মহানগরীর দৃশ্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, ময়দান, হাট, বাজার প্রায় সর্ব্বত্রই স্তূপীকৃত আবর্জনার ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়, যার সুগন্ধে বা দুর্গন্ধে মানুষের নাভিমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। ফুট পথের দৃশ্য তো আরও চমৎকার। সর্ব্বত্রই স্থায়ী অস্থায়ী অসংখ্য বিপনি, সর্ব্বহারাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সংসার এবং তাদের রাশিকৃত মল মূত্র ইতস্ততঃ ত্যাগ করবার ফলে অতীব দুর্গন্ধময় পরিবেশ স্বভাবতই পথচারীদের কল্পিত নরকের দৃশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। সংবাদপত্রে তো প্রায়ই করপোরেশনের গুণকীর্ত্তন করা হয় জনস্বার্থ-

মান কেলেঙ্কারী প্রসঙ্গে। জনসেবা মূলক এ হেন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান স্বয়ম্ভরও হ'তে পারল না এই সুদীর্ঘ শতবর্ষে এবং তার প্রমাণ, অনেক সময় দেখা যায় যে মাসের শেষে করপোরেশনের বিপুল সংখ্যক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মীর বেতন ও ভাতা দিতে অপারগ হ'য়ে কর্তৃপক্ষ গৌরী সেনের অর্থেই সমস্যার সমাধান করেন। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানের এরূপ নিখুঁত সেবাকার্য্যে জনসাধারণের কোন আস্থা না থাকা একেবারেই অস্বাভাবিক নয় এবং যে জন্য করপোরেশন নামটি পর্য্যন্ত জনগণের নিকট অতীব অপ্রিয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয়করণ নীতি প্রয়োগ করে জাতীয় সরকার বিবিধ ব্যবসায় পরিচালনের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং প্রকারভেদে বিভিন্ন বিভাগে বা সংস্থার মাধ্যমে যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ করছেন। সংস্থাগুলির অধিকাংশই এক একটি স্বতন্ত্র করপোরেশন। যেমন খাদ্য করপোরেশন; কয়লা করপোরেশন, পরিবহন করপোরেশন প্রভৃতি। ভবিষ্যতে উক্ত করপোরেশনগুলি এক একটি বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, সেই আশায় শুরু থেকেই সরকার উহার পরিপুষ্টির জন্য অর্থব্যয় করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না। অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সর্ব্বোচ্চ পদ থেকে নিম্নতম পদে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে সরকার বিভিন্ন করপোরেশন পরিচালনা করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই। কারণ সরকার হয়ত মনে করেন এরূপ ব্যবসায় একদিকে যেমন বেকারী হ্রাস করবে অন্যদিকে তেমনই ব্যবসায়ে সরকারের প্রচুর অর্থলাভ হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ফল হয় তার বিপরীত।

সরকারী সংস্থায়ে সাধারণতঃ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোনীত প্রার্থী বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই অগ্রাধিকার পায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ভাগ্যে সরকারী পদ খুব কমই জোটে। অথচ তাদেরই প্রয়োজন বেশী যেহেতু দারিদ্র্য এবং বেকারী তাদের মধ্যে এখন চরম পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং বেকারী হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ উহা যে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে, সে বিষয় কোন সন্দেহই নেই। সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে লাভ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব ও মমত্ববোধ দুইই থাকে, সরকারী প্রতিষ্ঠানে যার একান্ত অভাব, তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ ভিন্ন লোকসানের অঙ্ক খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। অথচ সরকার পরিচালিত বিরাট বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লাভ তো দূরের কথা, নিয়মিত ঘাটতি পূরণ করতেই সরকার প্রাণান্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে একটি ব্যবসায়ের উল্লেখ করছি যেমন পরিবহন করপোরেশন। বেসরকারী সাধারণ একখানা বাসের মালিক ব্যসায়ে যেরূপ লাভবান হন, সে তুলনায় খাস মহানগরীতে সরকার পরিচালিত শত শত উচ্চ শ্রেণীর বাস সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও পরিবহন করপোরেশনে এরূপ পাহাড় প্রমাণ নিয়মিত ঘাটতি কেন? এমন নয় যে যাত্রী সাধারণ সরকারী নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দেন না। সকলেই সরকারী বেসরকারী বাসের নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করেন। তাহলে সরকারী প্রতিষ্ঠানের এরূপ লোকসানের কারণ কী? সুতরাং সরকার যদি এর মূল কারণ নির্ণয় না করে, ঘাটতিপূরণের নিমিত্ত ধাপে ধাপে জনস্বার্থ বিরোধী, অসঙ্গত ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, তা'হলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল ভিন্ন উন্নত হওয়ার কোন আশার সম্ভাবনাই নেই।

শুধু পরিবহন কেন, অন্যান্য করপোরেশনের নিয়মিত ঘাটতিও সরকারকেই পূরণ করতে হয়। অবশ্য করপোরেশনগুলিকে স্বয়ম্ভর করবার জন্য সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কোন অংশে কম নয়, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই ফল হয় তার বিপরীত। যেমন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিদ্বারা সরকার চান খাদ্য করপোরেশন, দুগ্ধ করপোরেশন প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভর করা এবং যার ফলে দ্রব্যমূল্য বহু পূর্বেই মানুষের ক্রয়-

ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছে· কিন্তু সরকার কী এযাবৎ এব্যাপারে কোন সুফল পেয়েছেন? একদিকে যেমন দ্রব্য মূল্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, অন্যদিকে তেমনই সরকারকে দফায় দফায় কর্মীদের দাবী পূরণ করতে হ'চ্ছে। সুতরাং এর শেষ কোথায়?

দ্রব্য মূল্য যথাসম্ভব স্বাভাবিক হ'লে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কোথাও অস্বাভাবিক বেতন ও মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির কোন প্রশ্নই আসে না এবং জনসাধারণও যথা সম্ভব স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু তা না হ'য়ে বর্তমানে যে নীতি চলেছে, উহা সরকার কিম্বা জনসাধারণ, কারোর পক্ষেই কল্যাণকর নয়। সংবাদপত্রে অনেক সময়ে সরকারী করপোরেশনের বিবিধ কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হ'য়েছে। যেমন ভূষি, চাল চিনি, দুগ্ধ, তেল, মসলা প্রভৃতি সরকারী নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রী পাইকারী হারে চুরি, পাচার ও নানাভাবে অপচয়ের সংবাদ জনগণের অবিদিত নয়। কিন্তু এই সমস্ত সৎকর্ম তো আর বাইরের লোক দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মীরাই এজন্য দায়ী। সুতরাং অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য এবং যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির প্রকল্প রূপায়ণের পূর্ব্বে সরকারের উচিৎ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে গলদমুক্ত করা, নইলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কোন সুফল হবে না, ফল হবে তার অতীব বিরোধ। সরকারের বিভিন্ন গুদাম, ভাণ্ডার, ওয়াগন থেকে শুরু করে পুকুরচুরি, বন্দর চুরির বিচিত্র কাহিনী সব সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে। সুতরাং রাজ্যের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সবই যদি চোরের কল্যাণে নিঃশেষ হয়, তাহ'লে জনসাধারণের ভাগ্যে একমাত্র বহ্নুগুণ ভিন্ন আর কী জুটতে পারে? অতীতে অত্যন্ত সস্তার বাজারেও পুরুষানুক্রমে সরকারী চাকুরী ক'রে অনেকের ভাগ্যে অট্টালিকা তৈরী করে বাস করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারী কর্মীদের অনেকে, অবশ্য যাদের ডান হাত বাঁ হাতের সুযোগ থাকে, ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা তৈরী করে বসবাস করেন এবং সে জন্য তাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করবারও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সরকারের সদিচ্ছা হলে সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সরকার অতি অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করাও সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

গণবিপ্লব

পূর্বে গণ-বিপ্লবের কথা উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক সশস্ত্র বিপ্লব যেমন উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন সাপেক্ষ সমাজ বিপ্লবে তার কোন প্রয়োজন হয় না। দুর্নীতি, বেকারী ও দারিদ্র্য চরম পর্য্যায়ে পৌছবার ফলে, শোষিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের আশা ও ধৈর্য্যের বাঁধ যখন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়, সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সমাজবিপ্লব তখন আপনা হ'তেই উদ্ভূত হয়। ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবও একদিন সংঘটিত হ'য়েছিল, ঠিক একই কারণে এ দেশেও সমাজ বা গণবিপ্লব আসা একেবারে অসম্ভব নয় এবং যার সূচনা ইতিমধ্যেই একাধিক প্রদেশে পরিলক্ষিত হ'য়েছে। সুতরাং যখন সেই প্রবল স্রোত সমগ্র দেশে প্রবাহিত হবে, তখন গণবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশের একটা মস্তবড় বিমানে চেপে আমরা সকলে চলেছি। বিমানে অনেক সময়ে খাদ্যের সঙ্গে মাংস সরবরাহ করা হত তাই অনেক সময় আমাদের পেটভরা আহার জুটতো না। তাই এবার ট্যুরিষ্ট কোম্পানীকে অনুরোধ করাতে তাঁরা আমাদের জন্যে বিমানের কর্ম্মচারীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আমরা নিরামীশভোজী। ওরাও আমাদের জন্যে নিরামীশ তরকারী করে রেখেছিল। লাঞ্চের সময় হতেই ওরা সকল যাত্রীদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে গেল। দেখলাম তাঁদের পাতে চিকেন রোষ্ট, কড়াই-শুটী বিলাতী সিম ও আলুসেদ্ধ, আর আমাদের পাতে এসে পড়েছে শাকপাতা, কড়াইশুটী ও আলুসিদ্ধ। যাত্রীরা আমাদের দিকে আড়নয়নে একবার চেয়ে মুরগীর ঠ্যাং থেকে দাঁতে করে মাংস টেনে টেনে চিবুতে লাগলেন। ওদের দেখে আমাদের চুপ করে থাকতে হল। ষ্টুয়ার্ড আসতেই আমাদের লাঞ্চটা পরিবর্তন করতে বলি। কিন্তু তার আর উপায় নেই কারণ, আমাদের জন্যে কোন মাংসের আয়োজন প্রথম থেকেই হয়নি। যদিও আমি একটু অস্বস্তিবোধ করছিলাম তবুও আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ল। আমার স্ত্রী আমার মনের ভাব বুঝে বললেন যে যদি আমার মাংস খেতেই ইচ্ছা করে থাকে তা হ'লে আমি যেন এবার থেকে আর নিরামিশাষী বলে নাম না লেখাই। যদি গোমাংস পাতে পড়ে তাহলে শুধু রুটী মাখন খেয়েই যেন আমি পেট ভরাই। অবশ্য বিমানে উঠবার পূর্ব্বেই বিমানবন্দরে জাপানী লাঞ্চ কিছুটা খেয়েছিলাম বটে কিন্তু পেট ভরেনি। বিমান বন্দরের জাপানী লাঞ্চের মেনুগুলো আমাদের মুখে এত বিস্বাদ লেগেছিল যে ভালভাবে তা খেতে পারিনি। খিদে অবশ্য আমার খুব পায়নি তবে মুরগীর রোষ্টটা দেখে মনটা আমার একটু খুঁত খুঁত করছিল। দুজনেই সেদ্ধগুলো থেকে কিছু কিছু গলাধঃকরণ করে পাতের পাশ থেকে বড় লেবুটা তুলে নিলাম। লেবুটা বেশ বড় আর লাল রঙের, আর ওজনেও বেশ ভারী। ভাবলাম যে এটা হয়ত আমেরিকা আর না হয় অষ্ট্রেলিয়ান কমলা লেবু। খেতে নিশ্চয় খুবই সুস্বাদু হবে। লেবুটা ছাড়াতে গেলাম কিন্তু গায়ের ছালটা এত শক্ত যে ছাড়ানো গেলনা। ছুরী দিয়ে কাটবার জন্যে উপক্রম করতেই আমার স্ত্রী বলে উঠলেন যে লেবুর ওপরটা কাটা আছে। দুজনেই লেবুর মাথাটা হাত দিয়ে সরিয়ে ফেললাম। লেবুর ভেতরে লেবুর কোয়া দেখতে পেলাম না। আমার স্ত্রীকে দেখি তিনি ভেতরে চামচ ঢুকিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তিনি কিছুটা খেয়ে বল্লেন "দেখ কি চমৎকার আইসক্রীমটা কেমন লেবু লেবু গন্ধ ছাড়ছে। এমনটা আর আমরা কোথাও খাইনি।"

আমিও চামচ দিয়ে খানিকটা খেয়ে দেখলাম।

খেতে খুব সুস্বাদু। লেবুর মধ্যে যে এমন ভাবে আমাদের আইসক্রীম খাওয়াবে এ আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। আইক্রীম খাবার জন্যে প্রথম থেকেই লেবুর ডিসে ছোট্ট একটা চামচ ছিল। কিন্তু আমরা প্রথমে ওটা খেয়াল করিনি। বেশ আনন্দ করে লেবুর মধ্যের সমস্ত আইসক্রীমটা উদরসাৎ করলাম।

পিছনে আর সামনের সিটে আমাদের বন্ধুরা সব পরিতুষ্টি সহকারে লাঞ্চ খাচ্ছে দেখতে পেলাম। বিমান-বন্দরে ওঁরা বেশ ভালভাবেই জাপানী লাঞ্চ খেয়েছেন দেখেছি কিন্তু এখনও একঘন্টা পার হয়নি আবার ওঁদের খিদে পেয়ে গেল? আমরা দুজনেই অবাক্ হয়ে গেলাম। সামনের চীনা বন্ধুটীকে জিজ্ঞাসা করলাম "এর মধ্যেই আপনাদের খিদে পেয়ে গেল?"

উত্তরে তিনি বল্লেন "খিদের জন্যে ত খাচ্ছিনা। বিমানের ভাড়াটা কিছু উশুল করার ইচ্ছা ছিল তাই উশুল করে নিচ্ছি। আর তা'ছাড়া হংকং-এ কখন লাঞ্চ দেয় কে জানে পেটটা ভরা থাকলে পেটেরও শান্তি আর মনেরও শান্তি।"

আমাদের বিমানটী তাইওয়ান (ফরমোসা) বিমান-বন্দরে নেমে কিছুক্ষণ ধরে যাত্রী আর মালপত্র তোলানামা করে তাইওয়ান ত্যাগ করল। জাপানে যাবার সময় ঘনমেঘের জন্যে ফরমোসার অনেক কিছু নৈসর্গিক বৈচিত্র চোখে পড়েনি কিন্তু এবার আকাশ পরিষ্কার থাকায় তা আমাদের চোখে পড়ল। ফরমো-সাতে অনেকগুলি ছোট বড় হ্রদ ও পর্বতের গায়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। এটা একটা ছোট দ্বীপ হলেও বেশ-কিছু উর্ব্বরা জমি এখানে রয়েছে আর জমিগুলিও ফসলে ভর্ত্তি দেখলাম। আমরা ফরমোসা ছাড়িয়ে চীন সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভাসতে চললাম। এদিকে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। কয়েকটা বৃহৎ রণতরী ভাসতে দেখলাম, মনে হ'ল হয়ত এই রণ-তরীগুলি আমেরিকার বিখ্যাত সপ্তম যুদ্ধ-নৌবহরের কয়েকটী রণতরী। বহু দূরে চীনের ভূখণ্ড রেখা আমরা দেখতে পেলাম। সমুদ্রতীরে কয়েকটী নৌকা ভাসছে।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ পরে হংকং-এর কাই-টাক বিমান-বন্দরে এসে নামলাম। প্রথম এখানে আসবার সময় এখানকার রানওয়েটা (Runway) ততটা ভালভাবে বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে আমাদের বিমানটা সমুদ্রের ওপর অবস্থিত রানওয়ের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কাউলুনের ভূখণ্ডে এসে থেমে গেল।

হংকং বিমানবন্দরটী আধুনিকভাবে সাজ্জত। এখানে বেশীর ভাগ চীনা পুলিশ প্রহরী, তাঁদের মধ্যে দু' একজন ইউরোপীয় অফিসার এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন দেখলাম। এখানকার বড় বড় অফিসাররা প্রায় সকলেই বৃটিশ। আমাদের সকলকে নিয়ে যাবার জন্যে সানইয়া হোটেলের আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত চীনা কর্ম্মচারীটী বিমানবন্দরে এসেছিলেন। আমায় দেখে ভদ্রলোকটীর মুখে হাসি দেখা গেল। আমার ওপর হোটেল ম্যানেজারের অভদ্র ব্যবহারের জন্য তিনি বেশ ক্ষুণ্ণ ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি আমার সমস্ত কুশল সমাচার নিলেন। তাঁকে দেখে আমার খুব ভাল লাগল। তিনি হোটেলের একটী ভ্যান এনে-ছিলেন। সেই ভ্যানে করে আমাদের তিনি সান-ইয়া হোটেলে নিয়ে তুললেন। বিমানবন্দর থেকে সহরের দূরত্ব প্রায় চার মাইল হবে। এই বিমানবন্দরে অনেক-গুলি দেশের বিমান ওঠানামা করে থাকে দেখলাম।

সান-ইয়া হোটেলে আমাদের পূর্ব্বেকার ঘরটা অন্য একজনের দখলে রয়েছে। আমাদের দু'জনকে পাঁচ-তলার একখানি ঘর দেওয়া হ'ল। এখানেও ঘরের মধ্যেই বাথরুম রয়েছে। ডবলরুমের প্রত্যেক ঘরেই একটা করে বাথরুম থাকে। সেজন্যে আমাদের আর কোন অসুবিধা হ'ল না। ভ্যানে চড়ে আসতে আসতে দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না। হোটেলের মধ্যে ঢুকেই সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। সমস্ত হোটেলটাই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা। লিফ্‌টের সেই আলাপী মেয়েটীকে দেখতে পেলাম না। হোটেলের ঘরে এসে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর

আমাদের বেশ ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। ঘরের মধ্যের শীতলতা কম বেশী করাটার কৌশল হোটেলের বয়-এর কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিলাম তাই রক্ষে। একটি বড় লাঠি ঘরের এককোণে থাকে। সেই লাঠিটা দিয়ে একটি লোহার দণ্ড সরিয়ে কমবেশী করা হয়। এখানে প্রত্যেক ঘরে ঘরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বসানো নেই। কয়েকটি বড় বড় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র হোটেলের একধারে বসানো আছে। সেখান থেকে পাইপের সাহায্যে হোটেলের সর্বত্র শীতল হাওয়া প্রবাহিত করা হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ ঘরে বসবার পর আমরা একে একে যথাক্রমে স্নান করে নিলাম। তারপর বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ডিনারের সময় সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্য্যন্ত। আমরা রাত আটটার সময় উঠে বেশভূষা করে ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকলাম। এখানে গিয়ে দেখি যে আমার সব বন্ধুবান্ধবেরা কিছু-ক্ষণ পূর্ব্ব থেকেই তাঁদের দক্ষিণ হস্ত চালাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমরাও পাশের আর একটি টেবিল দখল করে খাবার অর্ডার দিলাম। এঁদের কাছেই জানতে পারলাম যে আসছে কাল কাউলুন আর চীন সীমান্ত দেখাতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের ডিনার এসে গেল। ডিনারের আয়োজন বেশ ভালই ছিল, এখানে নিরামিশভোজী আর আমিশভোজী বলে নাম লেখাবার দরকার নেই। মেনু অনুযায়ী যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। কয়েক রকমের মেনু আছে। বিরাট হোটেলে প্রায় শ'তিনেক লোক রোজ খাওয়াদাওয়া করে থাকেন। মাশরুমের সুপ, চিকেন রোষ্ট, কড়াইশুঁটী, আলু, বিলাতী সিম সেদ্ধ রুটী, জ্যাম, বাটার, ও পুডিং মেনুতে ছিল। এগুলো খেলে সকলেরই পেট ভর্ত্তি হয়ে যায়। তারপর কফি বা চা। জাপানে ও অন্যান্য জায়গায় প্রায় শেষপাতে পুডিং খেতে হ'ত। অন্য কোন জিনিষ থাকলেও আইসক্রীম থাকত না। পুডিং খেয়ে খেয়ে আমার স্ত্রীর মুখ খারাপ হয়ে গেছে, একটু মুখ বদলানোর দরকার বলে তিনি বেহারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন "তোমরা রোজ রোজ পুডিং ছাড়া আর কিছুই তৈরী কর না? অন্যান্য জায়গাতে ত আইসক্রীম আর ফ্রুটস্যালাড হয়।" কর্মচারীটি বল্লে "কেন, পুডিং ছাড়া আইসক্রীম আপনি খেতে পারেন।"

"আইসক্রীম তা'হলে পাওয়া যায়? বাঃ, তা'হলে আজ আমাদের দু'জনকেই আইসক্রীম দেবে।" আমার স্ত্রী মৃদুহেসে তাকে জানিয়ে দেন।

দুজনের জন্যে দুটা ভাল আইসক্রীম এ'ল। আশে পাশের বন্ধুরা একটু বেশ ফ্যাসাদে পড়লেন। তাঁরাও রোজ রোজ পুডিং খেতে খেতে হয়রাণ হয়ে গেছেন। তাঁরা ও মুখ বদলাতে চান। কিন্তু সে সুযোগ আর ছিল না। যখন তাঁরা দেখলেন যে আমরা আইসক্রীম খাচ্ছি তখন তাঁদের সমগ্র চক্ষু আমাদের দিকে ফিরল কিন্তু তাঁরা পুডিং প্রায় শেষ করে ফেলেছেন আইস-ক্রীমের অর্ডার আর দিতে পারলেন না, অর্ডার দিলেই নিজেদের পকেট থেকে পয়সা বের করতে হবে! জাপানে জিনিষপত্তর কেনাকাটিতে সকলেরই প্রায় পকেট খালি। টুরিষ্ট কোম্পানীর লোকেরা যা বিনাপয়সায় এখন খেতে দেবে সেটাই খেতে হবে তার বেশী খেলেই নিজেদের পকেট থেকে দিতে হবে। পকেট থেকে খাবারের জন্যে আর বেশী খরচ করা যায় না। বাড়ীর জন্যে হংকং থেকেও কিছু কিছু জিনিষ কিনে নিয়ে যেতে হবে। তাই তাঁরা আমাদের আইসক্রীম খেতে দেখে হাসতে হাসতে বল্লেন।

"আসছে কাল আমরাও আইসক্রীম খাব।" বলে তাঁরা ডাইনিংরুম ছেড়ে লাউঞ্জে গিয়ে বসলেন। আমাদেরও কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া হয়ে গেলে আমরাও লাউঞ্জে এসে বসলাম।

আমাদের লাউঞ্জের কয়েকতলা ওপরেই রয়েছে মস্তবড় প্রকাণ্ড নাচঘর। আমাদের দলের একজন বলে উঠলেন "ওপরে নাচ হচ্ছে শুনলুম, আপনারা কি কেউ দেখতে চান?"

রাত্রের আহারের পর জলযোগ অনেকেরই বেশ ভাল, তাই সকলেই যাবার জন্যে মত দিলেন। আমার

স্ত্রীটি কিন্তু মত দিলেন না, আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে বললাম। "দেখাই যাকনা নাচঘরটা। সকলেই যাচ্ছে যখন তখন আমরাও একবার দেখে আসি। গেলেই ত আর ওরা আমাদের ধরে বেঁধে নাচাবেনা।" যাই হোক সকলে মিলে লিফ্‌টে করে আমরা ছাদের মাথায় গিয়ে উঠলাম। ছাদের মাথা থেকে রাতের বেলায় কাউলুন সহর ও দূরের হংকং দ্বীপটা আলোর মালায় সজ্জিত হয়ে এত সুন্দর দেখতে হয়েছিল যে তা ভোলবার নয়। আকাশের অসংখ্য তারারমালা আর সহরের অসংখ্য আলোরমালা যেন একাকার হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখে আমাদের ভারি ভাল লাগলো। তবে দ্বীপটার একটা দিক বেশ অন্ধকার, বোধহয় ওখানে লোকালয় নেই ভাবলুম। পাশেই নাচঘরের হলঘর। দর্শকদের ভীড়ে হলটা সব ভর্তি। ষ্টেজে অদ্ভুত সুন্দরী যুবতীরা ইংরাজীগানের সুর সংযোগে নৃত্যপরিবেশন করে দর্শকদের মনে এক চাঞ্চল্য এনে তুলছেন তা দর্শকদের ঘনঘন করতালি ও আনন্দমুখর উচ্চশব্দে বেশ বোঝা গেল। দূর থেকে তাঁদের দেখে মনে হ'ল যে তাঁরা বেশীরভাগ চীনা ও ইউরেশিয়ান যুবতী। মিঃ চেং ও তাঁর যুবতী স্ত্রীটী আগেভাগেই ভেতরে গিয়ে দুটী চেয়ার দখল করেছিল। তারপর দু'একজন করে ভেতরে ঢুকলেন দেখলাম। আমরা আর ভেতরে ঢুকলাম না। আমরা আবার লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে এলাম। মিঃ চেং-এর প্রৌঢ়া স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গেই নীচে নেমে এলেন।

ভোর হতেই আমাদের ব্রেক্‌ফাষ্ট শেষ হবার পর আমরা সকলে নীচে নেমে এলুম। নীচে নেমে দেখি একটা ভ্যান নিয়ে গাইড আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সকলেই এক এক করে আমরা বাসে এসে উঠলাম। মিঃ চেং তাঁর যুবতী স্ত্রীর হাত ধরে ধীরে ধীরে বাসে উঠিয়ে দিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে বসে পড়লেন। আর তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে পেছনের আসনে গিয়ে বসলেন। আর আমার পত্নী তাঁর ধারের জায়গাটি দখল করে বসে পড়লেন। একটু পরেই বাসটি ছেড়ে দিল। মিঃ চেং-এর ব্যবহারে এখন আর আমার সঙ্গীরা ঠাট্টা তামাসা করেন না বা মুচকি মুচকি হাসেন না। এখন তাঁরা এসব দেখে বেশ অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। আমার স্ত্রী হাসতে হাসতে আমাকে শোনান "বৃদ্ধার যুবতী স্ত্রী হওয়া চের ভাল, মিঃ চেং তাঁর স্ত্রীকে কত যত্ন আর ভালবাসছেন দেখেছ"।

"এ জন্মে ত আর বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হতে পারবে না আসছে জন্মে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।" কথাগুলো ওঁর কানে কানে শুনিয়ে দিই। উনি শুনে মুখ ফিরিয়ে সহরের ভীড় দেখতে থাকেন।

বাস চলেছে জনকোলাহলমুখর প্রশস্থ রাজপথের ওপর দিয়ে, রাস্তাটি ভীড়ে ভীড়। বাসের গতি এখানে [illegible] মনে হয় যে আমরা যেন শিয়ালদার ষ্টেশনের ধার দিয়ে চলে [illegible] পথ দিয়ে নানারকমের যানবাহন চলেছে, ঠেলাগাড়ী, মানুষ টানা রিক্সা, ট্যাক্সি, ট্রাম, বাস সবই কাতারে কাতারে চলেছে। দু'ধারের প্রশস্থ ফুট-পাতের ওপর দিয়ে অসংখ্য মানুষ চলেছে। ওদের যাতায়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারি। ফুটপাতের পাশেই কুড়ি বাইশ তলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথমবার হংকংএ এসে এই সব দোকানে কিছু কেনাকাটি করতে ঢুকেছিলাম। এর মধ্যে এক একটা সুপার মার্কেট রয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে হেন জিনিষ নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। একদিকে কাপড় জামা বেচাকেনা হচ্ছে, অন্যদিকে দরজীরা কোটপ্যাণ্ট করেই চলেছে। তারপর ক্যামেরা, রেডিও, টেলিভিসন, ঘড়ি ও নানারকমের সোনার তৈরী জিনিষ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিক্রয় হচ্ছে। পৃথিবীর সবদেশেরই জিনিষ রয়েছে। জাপানী তৈরী জিনিষই সবচেয়ে বেশী এখানে দেখতে পেলাম। সিঙ্গাপুর, হংকং ও পেনাং ফ্রিপোর্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে জিনিষপত্র কিনলে কোন কাষ্টমস্ ডিউটি দিতে হয়না। তামাক, মোটর কার, ঘড়ি ও মদের ওপর

ট্যাক্স দিতে হয়। তবে সিঙ্গাপুরের জিনিষ কিনে দেখেছি আর এখানেও দর করে দেখলুম, দুটোর তফাৎ অনেক। এখানে দাম বেশী পড়ে। তার কারণ এরা ট্যাক্স না নিলেও ডিসকাউন্ট বাদ দেয়না। কিন্তু সিঙ্গাপুরে কখনও কখনও এত বেশী ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে বিক্রেতারা বিক্রি করেন তা শুনলে চমকে উঠতে হয়। তাই আমরা কোন জিনিষ পেনাংএতেও না কিনে সিঙ্গাপুরেই কিনতাম। হংকংএ আমরা দামী জিনিষ বেশী কিছুই কিনি নি।

বাসটি এত ধীরে ধীরে চলেছে বলে গাইড ভদ্রলোকটি আমাদের বললেন যে কাউলুন সহরের পরিধি যদিও তিন মাইল আর এর রাস্তা সবশুদ্ধ ১০½ মাইল তবুও এখানে এত লোকসংখ্যা বেশী যে প্রত্যহ যানবাহন ও লোক চলাচলের খুব বিঘ্ন ঘটে থাকে। আমাদের পেছনের আসন থেকে মিঃ চুয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'এখানকার জনসংখ্যা কত হবে বলে আপনার মনে হয়?'

"হংকং দ্বীপ, কাউলুন আর নিউ টেরিটরি নিয়ে সবশুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ান লোক হবে, তবে বেশীরভাগ লোকের বসতি কাউলুন আর হংকং দ্বীপে। নিউ টেরিটরিতে খুব কম লোকই বসবাস করে থাকে। তারা হাক্কা আর ক্যান্টনীজ সব। তারা সেখানে চাষবাস করে, আর মাছ ধরেই সংসার চালায়।"

"এত লোক হবার কারণ কি? আর যদি এখানে ভীড় না করে তারা যদি নিউ টেরিটরিতে গিয়ে বাস করত ত'হলে এখানে এত লোকের ভীড়ের চাপ সৃষ্টি হতে না। সেই সব জায়গাতেও বেশ সহর গড়ে উঠতে পারত।"

কথাটা বল্লেন মিঃ সিয়া তিনি মালয়ে শিক্ষকতা করেন। গাইড তার উত্তরে জানালেন "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যারা জাপানের ভয়ে চীনে ফিরে গিয়েছিল তারা আবার ফিরে এসেছে। আর তাদের সঙ্গে আরও এসেছে প্রায় দেড় মিলিয়ান লোক। বছরের জন্মহার খুব বেড়েছে আর তারপর চীনদেশ থেকে অনবরত রিফুজি এসে এখানে আস্তানা পাতছে। এই দুটো কারণের জন্যে প্রতি বছর একলাখের ওপর জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। হংকং সরকার কিছুতেই তা বাধা দিতে পারছে না। আমাদের জন-জীবনের ওপরই বেশী চাপ পড়ছে। এদেশের লোকেদের আয় কমে যাচ্ছে আর জীবন যাত্রার মানও খুব নেমে আসছে। নিউ টেরিটরিতে আজকাল দু'একটা ফ্যাক্টরী খুলেছে। সেখানেও লোক যাচ্ছে না যে তা নয়, তবে সকলেই মনে করে যে সহরে গিয়ে থাকলে তারা কাজ পাবে ও ভাল খেতে পাবে তাই তারা ওদিকে না গিয়ে এখানেই বাস করতে চায়। তার ফলে তাদের থাকতে হয় বেশীর ভাগ পাহাড়ের মাথায় ঝুপড়ি তৈরী করে আর না হয় সমুদ্রের ওপর নৌকাতে ঘর করে। কারণ এদেশে জমি পাওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা। এখানে কোথাও একটুকরা জমি পাওয়া যাবে না। সব জায়গাতেই লোকালয়ে ভর্তি।"

"আমি জিজ্ঞেস করলাম "হংকং দ্বীপের সব জায়গাতেই রাত্রে আলো জ্বলে কিন্তু একদিকটা একেবারে অন্ধকার, ওদিকটায় কি লোকজনের বসতি নেই?"

সব জায়গাতেই লোকালয় রয়েছে। যেদিকটা আপনি দেখেছেন সেদিকটা দরিদ্রের লোকালয়। হাজার হাজার লোক পাহাড়ের মাথায় ঝুপড়ি বেঁধে বসবাস করছে। রাত্রে সেখানে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বলেনা, তাই আপনি সেখানে অন্ধকার দেখেছেন।" তিনি আমায় জানালেন।

মিঃ চুয়া তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করেন "গত যুদ্ধের পূর্ব্বেও কি এত লোক ছিল, না চীনদেশ থেকে লোকজন আসাযাওয়া করে থাকে?"

তিনি উত্তরে বললেন "না, এতলোক এখানে কোন কালেই ছিলনা, দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা জানতাম যে এখানকার লোকসংখ্যা দেড় মিলিয়নের কিছু বেশী ছিল, যুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যের ভয়ে বেশীর ভাগ

লোক চীনদেশে পালিয়ে যায় তা ত আগেই জানিয়েছি। ১৯৪৫ সালে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ, তারপর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯৫০ সালে চীনা সরকারের সঙ্গে হংকং সরকারের এক চুক্তির ফলে লোকজনদের যাতায়াতের সুবিধা হয়। তারপরই ক্রমাগত লোকজন চীনদেশ থেকে এসে এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এর ওপর চীনদেশের দারিদ্র্যতা ও শাস্তির ভয়ে সেখান থেকে হাজার হাজার লোক এখানে পালিয়ে এসে রিফুজী হয়ে রয়ে গেছে।"

"এখানকার জনসংখ্যা কি বেশীর ভাগই চীনা নয়?" অন্য একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ বেশীর ভাগই চীনা অধিবাসী, তবে এর মধ্যে অনেক জাতির সংমিশ্রণ রয়েছে। আমার প্রপিতামহ, পিতামহ সকলেই ক্যান্টনে থাকতেন, যুদ্ধবিগ্রহ অর্থাভাব আর দারিদ্রতায় নিপীড়িত হয়ে এদেশে রোজগার করতে প্রথমে আসেন। তারপর এখান থেকে আর তাঁরা দেশে ফিরে যাননি। নিজের দেশ ছাড়তে যে তাঁদের কত কষ্ট হয়েছিল তা আমার ঠাকুর্দার মুখে আমি একদিন শুনেছিলাম।"

আমি বললাম "পরের দেশ আর কোথায়? এও তো চীনদেশেরই একটা অংশ, চীন সরকার কয়েক ঘণ্টা নোটিশ দিলেই বৃটিশদের এখন এদেশ ত্যাগ করতে হবে।"

"তা হতে পারে, কিন্তু এখান থেকে চীন সরকার অনেক কিছুই সাহায্য পেয়ে থাকে। যদিও চীনদেশ আজ একটি শক্তিশালী জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে তবুও তাদের মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে যার জন্যে আজও সে পশ্চিম দেশগুলোকে ভয় করে থাকে।"

"রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে, রাশিয়ার বুদ্ধি আর চীনের লোকবল পৃথিবী জয় করতে পারে।" আমি তাঁকে বললাম।

"তা হয়ত পারে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হওয়ায় রাশিয়া বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বুঝতে পারি, রাশিয়ার সঙ্গে হয়ত এমনি বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে।"

"তার কারণ?" মিঃ চুয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"রাশিয়া চীনকে সবসময়ে তাদের অধীনে রাখতে চায়। চীন তা চায়না। তাই দুজনের মধ্যে শীঘ্রই একটা ভাঙ্গন হয়ত ধরতে পারে, আমরা কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছি। অন্য কথা কওয়া যাক। ক্যান্টন কাছে বলে এখানে বেশীর ভাগ লোক ক্যান্টনীজ, তারপর সাংহাই থেকে অনেকে এসেছে। তারপর নিউ টেরিটরিতে হাক্কা আর ক্যান্টনীজরা রয়েছে। আমেরিকান আর বৃটিশ মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার হবে। তারপর ভারতীয়, পর্তুগীজ আর অন্যান্য জাতি মিলিয়ে প্রায় ছয় সাত হাজার হবে।

সহরের ভীড় পার হয়ে আমাদের বাসটি এখন সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে। আমরা একটু আগে বাঁ দিকে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ক্যাথে সিনেমার স্বত্বাধীকারী রামি শ'র (Rummy Shaw) ষ্টুডিওর বাড়ীটি ছাড়িয়ে এলাম। এদের সিনেমা হাউস অসংখ্য, মালয় আর সিঙ্গাপুরের প্রায় সর্বত্রই ক্যাথে কোম্পানীর সিনেমা রয়েছে, হংকং-এও অনেক সিনেমা আছে। এরা ইংরাজী ছবি ভাড়া করে দেখায়, আবার নিজেদের ষ্টুডিও থেকে অনেক মালয়ী ও চীনা ছবি তৈরী করে নানা জায়গায় দেখিয়ে থাকে। আমাদের বম্বের পরিচালক শ্রীফণী মজুমদার ওখানে কয়েকবছর চাকরী করেছিলেন। তিনি অনেকগুলি মালয়ী ছবি তৈরী করেছিলেন সিঙ্গাপুরে তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়। তাঁর বাড়ীতেও একদিন আমি গিয়েছিলাম। ভদ্রলোকের ব্যবহার খুবই সুন্দর ছিল ও বাঙ্গালী মহলে তাঁর খুব নাম ছিল, এখন শুনেছি তিনি বোম্বাইতে ফিরে গেছেন।

সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা চলেছি, এদিককার রাস্তা প্রশস্ত ও খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে ভীড় নেই বললেই হয়। আমরা কিছুক্ষণ পরেই নিউ টেরিটরিতে এসে পড়লাম। রাস্তার ধারে ধারে ধানক্ষেত রয়েছে। তারপর সেই ক্ষেতের পাশদিয়ে রেললাইন

চলেগেছে। সমুদ্র এখান থেকে বেশ দূরে। শস্যক্ষেত-গুলো সুদূর পাহাড়ের কোলে গিয়ে মিশেছে। এদিকে অনেকগুলি ছোট বড় পাহাড় রয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে রেল লাইন চলেছে, একটু আগেই একখানা মালগাড়ী চলে গেল। গাইডের মুখে শুনলাম যে এটা হংকং সরকারের সম্পত্তি। পূর্ব্বে কাউলুন রেলষ্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে ক্যান্টন সীমান্তের কাছে গিয়ে থেমে যেত। এর দূরত্ব ২১ মাইল, তারপর সেখানে গিয়ে চীন সরকারের ক্যান্টন হ্যানকাও রেলওয়ে লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনটা সরাসরি চীনদেশে চলে যেত। প্যাসেঞ্জার-দের গাড়ী থেকে নেমে আর ট্রেন ধরতে হত না। ১৯৪৯ সালে অন্য নিয়ম হয়েছিল, সমস্ত যাত্রীদের সীমানার ধারে নেমে পাশপোর্ট দেখিয়ে অন্য ট্রেনে গিয়ে উঠতে হ'ত, এতে যাত্রীদের খুব হয়রান হতে হ'ত। এমন কি মালগাড়ী থেকে মালগুলোকেও নামানো আর উঠানো হ'ত। ১৯৫০ সালের পর থেকে মালবাহী জাহাজগুলো একেবারে সোজা চীনদেশে চলে যায়, ওঠানো আর নামানোর আর দরকার হয়না।

মিঃ হুয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "নিউ টেরিটারির আয়তন কত হবে মিঃ চান? আর কতদিন এটা বৃটিশের দখলে রয়েছে?

গাইড বললেন, "নিউ টেরিটারির আয়তন হবে প্রায় ৩৬৫ বর্গমাইল। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট চীনা সরকারের কাছ থেকে ১৮৯৮ সালের পয়লা জুলাইতে নিরানব্বই বছরের জন্যে লীজ নিয়েছে। পরে আবার লীজ বাড়িয়ে নেবে কিনা কে জানে।"

আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "লাইফ ম্যাগাজিনে পড়লাম, যে চীনদেশ এ্যাটমবোমা তৈরী করেছেন। আর সেই এ্যাটমবোমাটি একজন চীনা বৈজ্ঞানিক তৈরী করেছেন তিনি নাকি আমেরিকা থেকে এসে এই হংকং-এর পথ দিয়েই গোপনে চীনদেশে প্রবেশ করেন।"

"হ্যাঁ, তা আমরা জানি। আমেরিকা থেকে এসে এই কাউলুনে নেমে ট্রেনে করেই তিনি চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর হংকং-এর রাস্তায় চলার ফটোটা লাইফে দেখেছি। নিজের মাতৃভূমির আকর্ষণ আর ভালবাসার জন্যেই তিনি চলে এসেছিলেন। সকল নাগরিকেরই এগুলো করা কর্ত্তব্য বলে আমার মনে হয়। আমাদের মাতৃভূমি যে একদিন বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে, সকলের কাছ থেকে সম্মান পাবে, সেই আশাতেই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। যতই আপনি গুণী হন পরের দেশে বেশী সম্মান আপনি আশা করতে পারেন না।"

যেতে যেতে ডানদিকের একটি বড় পাহাড় আমাদের নয়ন গোচর হ'ল। তিনি এপাহাড়ের একটি অংশ দেখিয়ে আমাদের বললেন যে এই পাহাড়ের নাম "লোভারস্ হিল"। স্বামী যুদ্ধে গেছে আর তার স্ত্রী পাহাড়ের ওপর বসে বসে তারই প্রতিক্ষা করছে। সত্যই পাহাড়টার একটি অংশ একটা মহিলার আকৃতি ধারণ করেছিল। এমন ভাবেই সেটা রয়েছে যে মনে হয় যেন সে কারোও জন্যে প্রতিক্ষা করছে। প্রবল বাতাসের আঘাতে আঘাতে পাহাড়ের এই অংশটা একটা মহিলার আকৃতিতে পরিণত হয়েছে তা বুঝতে পারলাম। ভারতেও এই রকম পাহাড় অনেক দেখেছি। টাইফুনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন যে টাইফুন প্রতিবছরই হংকং-এর কিছু না কিছু ক্ষতি করে যায়। সম্পত্তির ধ্বংস ত হয়ই, তাছাড়া অনেক মানুষের প্রাণহানি পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে প্রতিবছর টাইফুন দেখা দেয়, এই সময় সকলেই সাবধান হয়ে যায়।

আমাদের বাসটা সীমান্তের কাছাকাছি একটা পুরাণো বাড়ীর কাছে এসে থেমে গেল, বাসথেকে নেমে আমরা সকলেই সেই পুরাণো একতলা বাড়ীটার মধ্যে ঢুকলাম। কেউ বাধা দিল না। ভেতরে ঢুকে মনে হ'ল যেন আমরা একটা পুরাণো গরীব বস্তির মধ্যে এসে ঢুকলাম, গাইড বাড়ীটাকে দেখিয়ে বললেন যে চার শ' বছরের পূর্ব্বে এই বাড়ীটা একটা চীনা জমিদারের বসতবাটী ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা এটা দখল করে বাস

করতেন। এইসব বাসিন্দারা সেই জমিদারেরই সব বংশধরেরা। এরা এখন বাড়ীটাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে এখানে বাস করছে। এখানে প্রায় শ' খানেক লোক বসবাস করে থাকে। যারা অংশ পায়নি তারা পাশের জমিতে ঝুপড়ি বেঁধে রয়েছে, এরা সকলেই কেউ শ্রমজীবি বা ভিক্ষুক। আমরা ওখানে যেতেই তারা মৌমাছির ঝাঁকের মত আমাদের ঘিরে ফেলল। সকলেই ভিক্ষা চায়, অল্পেই সন্তুষ্ট কিন্তু কতজনকে ভিক্ষা দেওয়া যায় সেটাই বিবেচ্যবিষয়। কারোও পরনে বস্ত্র নেই, কারও উদরে অন্ন নেই। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা-গুলো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছিল। অনেকেই রক্তাল্পতায় ভুগছিল। এদের কয়েকজনকে কিছু কিছু হংকং পয়সা দিলাম। এদের দেখে কাউলুন আর হংকং-এর বিরাট ধনী চীনাদের কথা মনে পড়ে যায়। নিজেদের পরিবারের ও নিজেদের বিলাস ব্যসন সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে কত হাজার হাজার ডলার এঁরা দিন দিন খরচ করে চলেছেন। তাঁদের কিছুটা সাহায্যে হয়ত কত শত দুস্থ চীনা পরিবার দুবেলা দুমুঠো অন্ন খেয়ে বাঁচতে পারত, কিন্তু তাঁরা তা করবেন না। পদবী, সম্মান আর নামের জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করতে চাইচেন। কিন্তু দুস্থদের জন্যে তাঁদের দানের দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। আমাদের সকলকে দেখে ওদের মুখ হাসিতে ভরে গিয়েছিল। ওরা আমাদের কাছ থেকে সকলেই কিছু কিছু প্রত্যাশা করেছিল। আমরা কয়েকটা ঘর দেখলাম। প্রত্যেকটি বাড়ী ঘোরা যায় না, তাই আমরা ধীরে ধীরে বাসের দিকে এগোলাম। তারাও আমাদের পেছনে পেছনে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে আর হাত পাততে পাততে আসছে. দেখলাম। আমাদের পেছনে আসতে দেখে আমি আরও কয়েকজনকে কিছু কিছু দিয়ে বাসে এসে বসলাম। আমাদের দুজনকে ছেড়ে তারা এবার অন্যান্যদের ঘিরে দাঁড়াল। ভিক্ষা দিতেই হবে, একবার দিলে আর রক্ষানেই। কাশী আর কালীঘাটের ভিক্ষুকদের মত এরা নাছোড়বান্দা। অন্যান্য পর্যটকেরা সকলকেই কিছু কিছু দিলেন। আরও ভিখারী এসে জুটতে লাগল। তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই তাদের তাড়া করলেন। তাড়া খেয়েও তারা তাঁদের ছাড়তে চায় না। কোনক্রমে তাদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে তাঁরা বাসে উঠে পড়লেন।

গাইডের ওপর অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন দেখলাম। তাঁরা বললেন যে এখানে এই ভিখারীর দলের মধ্যে তাঁদের নিয়ে এসে কি লাভ হ'ল, দেখার জিনিষ ত এখানে কিছুই নেই। আবার অনেকে দেখলাম বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন, এ বাড়ীটা তাঁদের না দেখালে চার শ' বছরের একটা ছোট্ট ইতিহাসের ধারা কেউ জানতে পারতনা। আমরাও ছিলাম শেষের দলে। আমাদের এ বাড়ীটা দেখে খুব ভাল লেগেছিল। আমরা কিছুটা দূরে যেতেই দেখতে পেলাম যে কয়েকজন চীনা কৃষক আমাদের দেশের মত গরু আর লাঙ্গল দিয়ে জমি কর্ষণ করছে। এখানে একটি ছোট্ট গ্রাম রয়েছে, সেখানে লোকজনের যাতায়াত দেখতে পেলাম। তবে এদিকে মোটেই ভীড় ছিল না। একটু দূরেই রয়েছে সীমান্তের রেলষ্টেশন, চেকপোষ্ট কাষ্টমস্ আর পুলিশের ঘর। কয়েক শ' গজ দূরেই রয়েছে মাও সেতুং-এর বিরাট চীন মহাদেশ। এখানে কয়েকটি মালগাড়ী আর ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের বাসটি ডানদিকের একটা ছোট গলি দিয়ে একটা উঁচু টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়ে গেল। বাস থেকে আমরা সকলে নেমে দাঁড়ালাম. গাইড ভদ্রলোকটি হাত দিয়ে কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট সরু নদী দেখিয়ে বললেন যে ঐ নদীটি হচ্ছে দু'দেশের মধ্যের সীমানা। নদীর ওপারে মহাচীনের ক্যান্টন প্রদেশ। ক্যান্টনের মধ্যে সুদূর প্রসারিত ক্ষেত আমাদের চোখে পড়ল। সবুজ শস্যে ক্ষেতটি পরিপূর্ণ। দূরে বেশ বড় একটা উঁচু পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের মাথার ওপর সূর্য্যের প্রখর তাপ এসে পড়ছিল। মাথায় একটা রুমাল বাঁধলাম আমার স্ত্রী ঘোমটা টেনে দিলেন। ওপারের কয়েকটি ফটো আমি আমার ষ্টীল ক্যামেরায় তুলে নিলাম। ওদিকের সীমান্তে চীনা পুলিশ প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল।

এপারের চীনা পুলিশ প্রহরীর সঙ্গে একেবারে বাক্যালাপ বন্ধ, এপারের প্রহরীরা ওপারে যেতে ভয় পায়। ওপারের প্রহরীরা হয়ত এপারে আসার জন্যে ব্যগ্র। কিন্তু তারা দুজন দুজনকে ভয় পায়, দুজনের হাতেই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র, একটু এদিক ওদিক হলে হয়তঃ তাদের বন্দুক গর্জে উঠতে পারে তাই তারা যে যেখানে ছিল মুখ বুঁজে চোখ চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ভাবলাম যে একই দেশের দুজন লোক একই ঈশ্বরের সৃষ্টির দু'জন মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সাম্রাজ্যলোভীরা দু'ভাইকে আলাদা করে রেখেছে তাদের মধ্যে শত্রুতা বাধিয়ে বসে আছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কি অপূর্ব বুদ্ধি! তাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না, তাদেরই বুদ্ধিতে আজ ভারত বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, ভেরী হয়েছে ভারত আর পাকিস্থান, দু'জনই আজ দু'জনের ঘোরতর শত্রু। সকলেই বুঝতে পারছে যে এ সবই সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত। কিন্তু বোকা হয়েই আজ সব বসে রয়েছে, তারা বুঝেও বুঝছে না, তারা পরস্পর পরস্পরকে শুধু চোখ রাঙিয়েই চলেছে।

এদিকেও প্রচুর ভিখারী রয়েছে, সবই চীনদেশের লোক। চীনদেশে খেতে না পেয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর বৃদ্ধার দলেরাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছে, ওদের পুরুষরা আর বালক ও যুবতীরা মাঠে আর না হয় কোন ফ্যাক্টরীতে গিয়ে খাটছে, আর না হয় মাছ ধরে অর্থোপার্জন করছে শুনলাম। আমাদের ইচ্ছা হ'ল ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তুলি, কিন্তু ওরা সরাসরি না করে দিলে! ওরা গাইডকে জানাল যে ওদের গোটাদশেক টাকা দিলে তবে ওরা আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফটো তুলবে। গাইডের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ দর কষাকষি হল, দশ টাকা থেকে চার টাকাতে নামল, কিন্তু আমি দু'টাকাতেই রয়ে গেলাম। ওরা রাজী হয়ে গেল, ওরা ওদের চীনদেশের বড় বড় কুলোরমত টুপি মাথায় দিয়ে আর কালো রঙের জরাজীর্ণ পোষাক পরে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। গাইড ভদ্রলোকটি আমাদের ক্যামেরাতে আমাদের ফটো তুলে নিলেন। ওদের দুটো টাকা দিয়ে আমি বাসে উঠে এলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী অন্যান্য চীনা মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে একটা সুভেনিয়রের দোকানে গিয়ে ঢুকলেন দেখলাম। সুভেনির দেখলেই তিনি তা কেনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর কাছে কয়েকটি হংকং মুদ্রা ছিল তাই দিয়েই তিনি কিছু জিনিষ কিনে বাসে এসে আমার পাশে বসে পড়লেন। তাঁর হাসি হাসি মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম "কি ব্যাপার, অত হাসি খুশী কেন?"

কয়েকটি ছোটো পাথর দেখিয়ে তিনি বললেন "এই পথরগুলো মালয়ে খুব বেশী দাম, এখানে খুব সস্তায় পাওয়া গেল, মেয়েদের জন্যে কিনে নিলুম, তুমি এত কমদরে কিনতে পারতে না, তোমাকে ওরা নিশ্চয় ঠকাত।"

পাথরগুলো কিনে যে তিনি নিজেই ঠকেছেন তা আর তাঁকে আমি বললাম না, শুধু মুখখুলে বললাম "চমৎকার জিনিষগুলো, আর বেশ সস্তায় পেয়েছ।" তিনি বললেন, "রুনুকে বেশ মানাবে।" আমার ছোট মেয়ে রুনু, তারই কথা তিনি বললেন।

আমাদের বাসটি যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই আবার ফিরে গেল, আমরা বাসে বসে বসে দু'ধারের পরিচিত দৃশ্য আবার দেখতে লাগলাম। স্বাধীন কম্যুনিষ্ট চীনদেশের দুর্দশা আজ নিজের চোখে দেখে এলাম, কম্যুনিষ্ট প্রোপাগাণ্ডাটাই খুব বেশী চোখে পড়ল। এই সংঘবদ্ধ প্রচার কার্য্যের ফলে অনেক মালয় চীনা ছেলেমেয়েরা স্বইচ্ছায় মালয় ত্যাগ করে কম্যুনিষ্ট চীনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫৫ সালে। আমি যখন মালয়ের সেরাম্বানে থাকতাম তখন ওদের সংঘবদ্ধ প্রচার কার্য্যের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আমার কয়েকটি বন্ধুর ছেলে স্বইচ্ছায় মালয় দেশ ছেড়ে চীনদেশে চলে যায়। তাদের সঙ্গে সমস্ত মালয় দেশ থেকে প্রায় কয়েকশত ছাত্রছাত্রীও যোগদান করেছিল।

এদের প্রত্যেককে খাওয়াপরা হাতখরচ দিয়ে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে বলে চীন সরকার ওদের জানিয়েছিল। ওরা দেশমাতৃকার উন্নতির জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন পেরাকের সিতিওয়ান (Sitiwan) গ্রামের চিন পেং-এর নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘরে ঘরে শুধু তারই নাম চীনাছেলেরা জপ করতে থাকত। তিনি ছিলেন কম্যুনিষ্ট গরিলা দলের প্রধান। তাঁরই জন্যে মালয় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন বেশ ওলট্ পালট্ হচ্ছিল। মালয়ের প্রত্যেকটি গরীব চীনা তাঁকে তখন সাহায্য করত। ধনীরা মরণের ভয়ে তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য হ'ত। চিন পেং-এর দল ধনীদের আর বিশ্বাসঘাতকদের ওপর যে শাস্তি দিয়েছিল তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বৃটিশ, ফিজি, মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে মালয় সরকার তখন কম্যুনিষ্ট দলকে দমন করতে ব্যস্ত ছিল।

—ক্রমশঃ

তুমি এস করুণায় নেমে

অধ্যাপক—শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী।

বিশ্বাসেরে দৃঢ় করো আত্মদৈন্য হোক্ মোর দূর,
লুপ্ত হোক্ ছদ্ম-আবরণ—
সংকোচেরে চূর্ণ করো তোমারি সে দীপ্তমহিমায়
হোক্ সেই নম্র নিবেদন।
হৃদয়ের সিংহাসনে হে বিশ্বরাজন্ দেব!
তুমি এস করুণায় নেমে,
সকল হৃদয়খানি আজ শুধু ভরে যাক্
তোমারি সে সুগভীর প্রেমে।
আনন্দের বর্ণ আনো জীবনের উদার মাধুর্য্যে,
ধূলির পরশ হোক্ অমৃত সমান—
তাই যদি সত্য হয় জানি মোর মুছে যাবে
সংসারের সাধ অপমান।
আমারে পাগল করো তোমার আনন্দে শুধু
আর কিছু চাহিনা ধরায়,
সেই হবে সত্য জানি সংসারের সব আয়োজন
তোমারি সে পরম ক্ষমায়।

আত্মার বিদায়

—নীহারকণা দাস-দে।

জীর্ণ বস্ত্রের মত
আমার জরাজীর্ণ অস্থি-চর্ম্মসার দেহটাকে
বিদায় জানাতে হবে।
ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।
জীবনের রূপ-রস-গন্ধ ভোগ করার
আর শক্তি নেই তার।
বিদায় বন্ধু, বিদায়!
আমার একান্ত আপন জন,
একান্ত বিশ্বাসী সাথী আমার
প্রণতি জানাই তোমায়।
তোমাকে ত্যাগ করে'
চলে' যাবার প্রাক্কালে,
আমার অশরীরী নয়ন
মায়া-ভরা-চোখে তাকিয়ে আছে
তোমার পানে।
পেছনে-ফেলে-আসা স্মৃতির-দুয়ার
আজ খুলে' গেছে তার সামনে।
সেখানে দেখা যাচ্ছে তোমার শৈশবের
নবীন, নধর মসৃণ দেহচ্ছবি।
[দৃ]শ্যের পট বদল হ'ল।
আবার কে, চিনতে পারছি না ত।
[ঐ] চঞ্চলা, হাস্য-মুখরা কৌতুকময়ী
কে ঐ নারী—
যার শিহরিত সহস্র-রোমকূপ,
স্বর্গের সহস্রলোচন ইন্দ্রের মত
প্রতি রোম-নয়ন দিয়ে
ধরার সৌন্দর্য্য লেহন করেছে—
দুঃখের শত হৃদয়-বিদারক অনুভূতি
যাকে কর্ম্ম-জীবনে
ক্লান্ত করতে পারেনি—
চঞ্চলা তরঙ্গিনীর মত যে আপন ছন্দে
নেচে-নেচে চলেছে জীবনের বন্ধুর পথে—
জীবন-সংগ্রামে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিকে
যে দৃপ্ত-ভঙ্গিতে অবহেলা জানিয়েছে।
আজকের পক্ককেশ
তোমার বলিরেখাময় মুখমণ্ডলে
ওর নিশানা কোথায়?
হে স্থবির শুষ্ক মনুষ্যাকৃতি,
এই সুন্দর ফুলে-ফলে-ভরা জগতে
আজ তোমার কর্ম্ম শেষ হ'ল।
চির-নূতন আমি,
তাই আবার নূতনের সন্ধানে চলিলাম।
হে আমার পুরাতন জরাজীর্ণ দেহপিঞ্জর,
বিদায় জানাই তোমায়॥

জানলা

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

মাষ্টারমশায় ছিলেন নিঃসঙ্গ। বাবা-মা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। ভাই-বোন বলতেও সংসারে কেউ নেই। আর তিনি নিজে অবিবাহিত। ছাত্ররাই তাঁর সব কিছু। তাদের নিয়েই তাঁর কেটে যায় সারাদিন। স্কুলের পরেও তাঁর বিশ্রাম নেই। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই ছেলেরা এসে হাজির হয়। কেউ অঙ্ক নিয়ে আসে, কেউ বিজ্ঞান, কেউ বা ভূগোল। বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তারা পড়াশুনা করে, আর তাই সব সময় গুলজার হয়ে থাকে বিভূতি মাষ্টারের ঘরটা।

স্কুলের বেতন ছাড়া কারো কাছ থেকেই পারিশ্রমিক নিতেন না মাষ্টারমশাই। যে তাঁর কাছে পড়তে আসত তাকেই তিনি পড়াতেন। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় বলে কোন ভেদ ছিল না। সবাই ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। বলতেন, তোরাই তো আমার ছেলে। কে বলে আমি নিঃসঙ্গ, আমার কেউ নেই ?

বিভূতিবাবুর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু স্বাস্থ্য ছিল অটুট। দেখলে মনে হতো তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। যেমন নিষ্ঠাবান, তেমনি ছিলেন আদর্শবাদী।

বলতেন ; যার মধ্যে আদর্শ নেই সে তো মানুষ নয়, সে হচ্ছে পশু।

ছাত্রদের সামনে সব সময় আদর্শ তুলে ধরতেন মাষ্টারমশায়। বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দের মতো হও, নেতাজী সুভাসচন্দ্রের মতো হও। তাঁরাই তো ছিলেন সত্যিকারের মানুষ।

আমরা সবাই পড়তে বসতাম মাষ্টারমশায়কে ঘিরে। পড়াশুনার সময়েও কিন্তু আমাদের নজর থাকতো তাঁর মুখের দিকে। আমরা চেয়ে থাকতাম তাঁর হাসি দেখবো বলে। একটা মানুষের হাসি যে আর সবাইকে এমন ভাবে মুগ্ধ করতে পারে, তা বোধ হয় বিভূতিবাবুর হাসি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এমন শান্ত, সৌম্য, আপন ভোলা হাসি আর কখনো দেখিনি। সে হাসির মধ্যে যে কত স্নেহ, কত আলিঙ্গন, কত আন্তরিকতা ছিল তা কল্পনা করতেও ভাল লাগে।

অথচ তিনি রেগে গেলে আর রক্ষা ছিল না। ভয়ানক শাসন করতেন আমাদের। কান-মলা, নাক খত ওঠ-বস, আরো কত শাস্তি! তাঁর হাতের বেত আমাদের পিঠে কতবার যে ভেঙেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

রাগ একটু পড়লে, তবে আমরা নিশ্চিন্ত হতাম। তখন আদর করতেন আমাদের, হেসে কথা বলতেন। এমন কি ইয়ার্কি-ঠাট্টাও করতেন।

শেষে বলতেন, আমার বেতটা তো গেল ভেঙে, কাল আরেক গাছা বেত এনে দিস তো মন্টে।

যাকেই হুকুম দিতেন, তাকেই ছুটতে হতো বেত সংগ্রহ করবার জন্যে।

কোন কোন দিন স্কুল থেকে ফিরতে মাষ্টারমশায়ের

বেশ দেরী হতো। আমরা কিন্তু যথারীতি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতাম। তাঁর চাকরটা ঘর খুলে দিতো, আমরা সেখানে বসে পড়াশুনা শুরু করে দিতাম। মাষ্টার মশায়ের হুকুম ছিল, কেউ সময় নষ্ট করতে পারবে না।

এমনি একটি দিনে আমরা অন্তরীক্ষবাসিনী মা-সরস্বতীকে সাক্ষী রেখে পড়াশুনা করছিলাম খুব মনোযোগ দিয়ে। মাষ্টারমশায় তখনও আসেন নি। মন্টু অঙ্ক কষছিল। শম্ভু বিজ্ঞান-বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগ দিয়ে ফুলের পরাগ-সংযোগের ছবি দেখছিল। বিশুর সামনে খোলা ছিল একখানা জ্যামিতি, কিন্তু ও তাকিয়ে ছিল শম্ভুর বিজ্ঞানবইখানার দিকে। আমার মনোযোগটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। ভূগোলে গোল্লা পাওয়ায় দু-দুবার স্কুল ফাইনাল ফেল করেছি। তাই ভূগোলে ভাল নম্বর নেবার জন্তে একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগেছিলাম। দেখছিলাম নর্মদা নদীটা আমেরিকায় না আফ্রিকায়।

এমন সময় শম্ভু হঠাৎ আমার গায়ে একটা ধাক্কা মেরে বললে, দ্যাখ; পাশের বাড়ীর মেয়েগুলো আমাদের দিকে দেখছে।

এক ঝটকায় আমি নিজেকে টেনে তুললাম মানচিত্র থেকে। বললাম কোথায় রে মেয়েগুলো?

—ওই তো, দ্যাখ না? পাশের বাড়ীর বারান্দার দিকে ইসারা করল শম্ভু।

আমাদের ঘরের জানালাটা খোলা ছিল। দেখলাম পাশের বাড়ীর বারান্দায় একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেই কি বলাবলি করছে, আর সলজ্জ হাসিতে রক্তিম হয়ে উঠছে সকলে। মেয়েগুলো বোধ হয় স্কুলের গণ্ডী এখনও পেরোয়নি। আমাদেরই প্রায় সমবয়সী হবে। কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনে পড়েছে।

ওদের হাসি দেখে আমাদের মন আনচান করে উঠলো। এক লাফে আমি জানলার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। আমার দেখাদেখি শম্ভু, মন্টু, বিশু সবাই ছুটলো জানলার দিকে। উত্তেজনায় প্রায় সকলেই উন্মত্ত। আমরা এমন জোরে কথা বলতে লাগলাম যাতে মেয়েগুলো শুনতে পায়।

দুদিকেই হাসির ফোয়ারা। আমাদের ইয়ার্কি-ঠাট্টা শুনে মেয়েগুলো কখনো লজ্জায় মুখ ঢাকছে, কখনো ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

শম্ভু আমার কানে কানে বললে, কোন্ মেয়েটাকে তোর পছন্দ হয় রে?

—ওই লাল শাড়ী-পরা মেয়েটাকে।

—তাহলে তো বড় বিপদ হলো। শম্ভু বললে, লাল শাড়ীটাকে যে আমিও পছন্দ করেছি রে মনে মনে।

—উঁহু তা হবে না। আমি বললাম, লাল শাড়ীকে আমিই নেবো। তোর আগেই আমিই ওকে পছন্দ করেছি।

শম্ভু হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে তবে আয় ওর সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই। বলে আমাকে একেবারে জানালার ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে একটু উঁচু গলায় মেয়েগুলোকে বললে, এই যে শুনুন, আপনাদের মধ্যে লাল শাড়ী-পরা মেয়েটিকে আমার এই বন্ধুটি পছন্দ করেছে।

মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠলো।

একটি মেয়ে বললে, এই রেখা তোর নামে কি বলছে শোন। তোকে বিয়ে করবে ঐ ছেলেটা।

রেখা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো মুখ নিচু করে চাপা গলায় বললে, যাঃ, অসভ্য।

আমার বন্ধুদের মধ্যেও তখন দারুণ উত্তেজনা।

মন্টু নিজের মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে বিশ্রীভাবে একটা শিস্ দিল।

একটা মেয়ে বললে, কি অসভ্য রে ছেলেগুলো।

মন্টু বললে, দেখো, আমাদের নামে যা-তা বোলো না বলছি, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—ইস্, ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। মেয়েটা বললে, কি করবেন আপনারা?

মন্টু বললে, কি করবো তা ঠিক সময়ে জানতে পারবে।

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

হঠাৎ গলা শুনতে পেলাম রেখার। বারান্দার রেলিঙের কাছে এগিয়ে এসে রেখা বললে, আপনারা অভদ্র, আপনারা ইতর।

—আর তোমরা কী? কথাটা বলেই চমকে উঠলাম আমি। তাকিয়ে দেখি মাষ্টারমশায় দাঁড়িয়ে আছেন পেছনেই। আমার জামার কলারটা টেনে ধরেছেন। তাঁর দু চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে তখন।

আমার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। মন্টু, শম্ভু, বিশু কাউকে দেখতে পেলাম না আমার পাশে। ওরা যে কখন সরে পড়েছে, তা জানতে পারিনি। দেখলাম নিজের নিজের জায়গায় বসে অঙ্ক কষছে খুব মনোযোগ দিয়ে।

মাষ্টারমশায় হঠাৎ আমার মাথাটা দুম্ করে ঠুকে দিলেন দেওয়ালে।

বারান্দা থেকে মেয়েগুলো সব দেখছিল। একটি মেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে, বেশ হয়েছে। পাজি বদমায়েস।

রাগে মাষ্টার মশায়ের মুখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে বললেন, মন্টে, আমার বেতটা কোথায়?

বেতটা মাষ্টারমশায়ের হাতে এগিয়ে দিল মন্টু। মাষ্টারমশায় সপাং সপাং করে বেত মারতে লাগলেন আমার মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে হাত পায়ে। চামড়া কেটে কেটে রক্ত পড়তে লাগলো। অনেকবার মার খেয়েছি মাষ্টারমশায়ের হাতে, কিন্তু এত শাস্তি কখনো পাইনি। সমস্ত শরীরটা আমার জ্বালা করছিল। কতক্ষণ আমি দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। জ্ঞান হলো যখন, দেখলাম ঘরের মেঝেয় আমি শুয়ে আছি। আর মন্টু, বিশু, শম্ভু সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটী করছে। কেউ জল ঢালছে আমার মাথায়, কেউ পাখার বাতাস দিচ্ছে আর কেউ বা মলম লাগাচ্ছে আমার কাটা জায়গাগুলোয়।

মাষ্টার মশায়কে দেখতে পেলাম না ঘরের মধ্যে। মন্টু বললে, বরফ আনতে গেছেন।

রিক্সা করে সেদিন ওরা বাড়ী পৌঁছে দিল আমাকে।

মা বললেন, কি হয়েছে রে? মারামারি করেছে নাকি?

মন্টু বললে' না মাসিমা, মারামারি করেনি। আজ পড়া পারেনি বলে মাষ্টারমশায় ওকে মেরেছেন।

—বেশ হয়েছে। পিসিমা বললেন, কি বছর পরীক্ষায় ফেল করছে তবু লজ্জা হয় না। পোড়ারমুখো ছেলে।

কাটা ঘাগুলোর জন্যে বেশ কিছুদিন ভুগতে হলো আমায়, প্রায় এক সপ্তাহ স্কুলে যেতে পারলাম না। মাষ্টারমশায়ের কাছেও যাওয়া হয়নি।

একদিন শম্ভু এল আমার বাড়ীতে। কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল ওকে। মুখটা থমথমে। জিজ্ঞেস করলো, কবে ইস্কুলে যাবি?

—পরশু হয়তো যেতে পারবো। ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

শম্ভু কি যেন চিন্তা করলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, কাল একবার বেরুতে পারবি?

—কেন?

শম্ভু একটা ঢোক গিলে বললে, রেখা তোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

—তার মানে? মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠলো আমার।

—রাগ করছিস কেন? শম্ভু বললো, দেখা করতে তোর আপত্তি আছে?

—নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। প্রায় চিৎকার করে বললাম, আমি দেখা করতে রাজি নয়। মেয়েটাকে বলে দিস।

শম্ভু চলে গেল। ও চলে যেতে, মনে পড়লো, একটা ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে আমার। আমার জানা উচিত ছিল, রেখার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে ওর? আমার সঙ্গেই বা কোথায় দেখা করতে চায়? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার বিরূপ হয়ে দাঁড়ালো। ভাব-

লাম, কি হবে ওসব জেনে ? আমার জানবার প্রয়োজন কী ?

কিন্তু একটা অদ্ভূত অস্বস্তি আর উত্তেজনা মনটাকে বার বার দোলা দিতে লাগলো। সেদিন রাত্রে ঘুম হলো না ভাল করে। যেন একটা মিষ্টি স্বপ্ন এসে ঘোরাফেরা করতে লাগলো আমার চারপাশে।

পরের দিনই স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। ক্লাসের বন্ধুরা সবাই ছুটে এলো। সকলের চোখেই একটা জিজ্ঞাসা কি হয়েছিলো ? আসল ব্যাপারটা কী ?

কিন্তু কারো সঙ্গে কথা না বলে আমি শেষের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে শম্ভু আমার কাছে এসে বললে, তুই আজ ইস্কুলে এলি যে ? দু-এক দিন পরে আসবার কথা ছিল তো ?

বললাম, সুস্থ হয়ে গেছি, আর স্কুল কামাই করে কি হবে ? তাই চলে এলাম।

শম্ভু আমার কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি বললে, আজ একবার যাবি ওই পার্কে ?

আমাদের স্কুল থেকেই একটা পার্ক দেখা যায়। পার্কের একদিকে আমাদের স্কুল, আরেকদিকে মেয়েদের স্কুল।

আমোকে চুপ করে থাকতে দেখে শম্ভু বললে, যাবিতো ছুটির পর ?

—কেন ?

—রেখা ওখানে থাকবে। সে তোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

—আমার সঙ্গে দেখা হবে না রেখাকে বলে দিস।

স্কুল ছুটি হওয়ার পর আমি গিয়ে হাজির হলাম মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে। দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।

দেখলাম মাষ্টারমশায় বসে আছেন একটা চেয়ারে, আর তাঁর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রেখা আর সেদিনের সেই মেয়েগুলো। মাষ্টারমশায় কি যেন বোঝাচ্ছেন ওদের।

মাষ্টারমশায় আমাকে ডাকলেন, ভেতরে এসো।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকতেই মেয়েগুলো জড়োসড়ো হয়ে দেয়ালের কাছে সরে গেল। আমি একটা জায়গায় বসে অঙ্কের বই খুলে যথাসম্ভব মনোযোগ দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মাষ্টারমশায় মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, আমার ছাত্ররা তোমাদের অপমান করেছে জেনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, মা। তাদের শাস্তিও দিয়েছি আমি। কিন্তু যদি কোনদিন শুনি যে তারা আবার তোমাদের অপমান করেছে, তাহলে আমি তাদের হাজতে পাঠাতে ছাড়বো না। তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, মা। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের, আমি নিজে এব্যাপারে নজর রাখবো।

মেয়েগুলো কথা বললে না। তারা শুধু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মাস্টারমশায়কে প্রনাম করে ওরা সবাই চলে গেল ঘর থেকে।

আমার মনে হলো, মেয়েগুলো নালিশ করতে এসেছিল। নইলে দল বেঁধে আসবে কেন, আর মাষ্টারমশাই ওদের নিরাপত্তার জন্যে অত প্রতিশ্রুতিই বা দেবেন কেন ?

অথচ দোষ কি শুধু আমাদেরই ছিল ? ওদের ছিল ? ওরা কি একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা ? তবে আজ নালিশ করতে এসেছিল কোন্ যুক্তিতে ? ওদের দুঃসাহসের কথা ভেবে সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলতে লাগলো।

মেয়েগুলো চলে যেতে মাষ্টারমশায় আমার দিকে ফিরে বললেন, ওই জানলাটা এবার থেকে বন্ধ রাখবে। কেউ খুলবে না।

—আচ্ছা স্যর। আমি বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলাম।

তবু মাষ্টারমশায় রুক্ষভাবে বললেন, আমি যেন আর কোনো-দিন ওটা খোলা অবস্থায়—না দেখি। তোমাদের অভদ্রতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সেদিন থেকে জানলাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল পাশের বাড়ীর বারান্দাটা একেবারে আড়াল হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে থেকে।

এরপর বেশ নিরুপদ্রবেই আমাদের পড়াশুনা চলতে লাগলো। আমরা যখন রাত্রে বাড়ী ফেরার জন্য তৈরী হতাম, তখন মাষ্টারমশায় বলতেন, আমি চাই তোমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠো, শিক্ষিত হয়ে ওঠো, মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শেখো, নারীর মর্য্যাদা দিতে শেখো।

আমরা মনে মনে মানুষ হবার সংকল্প করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সংকল্প করি যে ওদিকের জানলাটা কিছুতেই খুলবো না। মাষ্টারমশাইয়ের হুকুম আমরা মেনে চলবো।

বাস্তবিক আমরা প্রত্যেকেই মাষ্টারমশাইকে অত্যন্ত ভালবাসতাম। তাঁর আদর্শ, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ আমাদের কাছে বেদবাক্যের মতো সত্য বলে মনে হতো।

মাষ্টারমশাইয়ের কঠোর আদেশ সত্বেও শম্ভু কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কাছে ওই মেয়েগুলোর প্রসঙ্গ তুলতো। আমার কানে কানে বলতো, জানিস্, রোজ বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বললাম, আমাদের জানলাটা বন্ধ থাকে বলেই ওরা দাঁড়াতে সাহস পায়। জানলাটা খোলা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই ওখানে দাঁড়াতো না।

—ইস্, দাঁড়াতো না বৈকি। দেখতাম তখন।

বললাম, তাই যদি হতো, তবে ওরা দল বেঁধে মাষ্টারমশাইয়ের কাছে নালিশ করতে আসতো না।

—তুই কি করে বুঝলি ওরা নালিশ করতে এসেছিল? শম্ভু জিজ্ঞেস করলো।

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, এই সামান্য ব্যাপারটাও তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে? শুধু শুধু কেউ আসে?

শম্ভু বিশ্বাস করতে চাইল না আমার কথা। বললে, অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

বললাম, ওদের সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের কথাবার্তা আমি নিজের কানে শুনেছি কিছু কিছু। সেই কথাবার্তা থেকেই আসল ব্যাপারটা বুঝেছি।

—হাই বুঝেছিস্। শম্ভু একটু হেসে বললে, তোর মত বোকা আর দুনিয়ায় নেই।

আমি কিন্তু নিজেকে খুব চালাক বলেই জানি। তাই শম্ভুকে নিজগুণে ক্ষমা করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলাম না।

আরো বেশ কিছুদিন কেটে গেল নিরুপদ্রবে। তারপর হঠাৎ যেন একটা অঘটন ঘটে গেল। মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে ঢুকতেই দেখলাম জানলাটা খোলা আর তার ঠিক সামনেই পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েগুলো। আমাকে দেখেই ফিক্ করে ওরা হেসে ফেললো, আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো রেখা।

ঘরে কেউ ছিল না। তবু আমি কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। মনে হলো, ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত। নইলে আজ আবার একটা বিপদ ঘটতে পারে।

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, কি বাড়াইনি তখনও, মাষ্টারমশায় এসে ঘরে ঢুকলেন। জানলায় চোখ পড়তেই আমার দিকে ফিরে একটু রুক্ষভাবে বললেন, কে জানলা খুলেছে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম আমি জানি না স্যর। আমি খুলিনি।

মাষ্টারমশায় জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে মেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে আবার কেউ অভদ্র ব্যবহার করেছে?

মেয়েগুলো জবাব দিল না। শুধু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

মাষ্টারমশায় জানলাটা বন্ধ করে দিলেন ওদের মুখের ওপরেই। তারপর চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কে খুলেছিল জানলা?

চাকরটা বললে, আমি সকালে খুলেছিলুম হুজুর, বন্ধ করতে ভুলে গেছি।

একটু আশ্বস্ত হলেন মাষ্টারমশায়। শুধু বললেন, এই জানলাটা কখনো খুলবি না।

যে আজ্ঞা।—বলে চাকরটা চলে গেল।

সেদিনও পড়াতে বসে আমাদের অনেক উপদেশ দিলেন মাষ্টারমশায়। কিন্তু তাঁর উপদেশ শুনতে শুনতে বারবার আমার মনে হতে লাগলো, তিনি যেন আমায় সন্দেহের চোখে দেখছেন।

তাঁর সন্দেহ থেকে—কি করে মুক্ত হব, সেই চিন্তা করতে করতেই সেদিন বাড়ী ফিরলাম। সে-রাত্রে ঘুম-টাও হলো অস্বস্তিকর। পরদিন সকালে স্কুলে যাব বলে তৈরী হচ্ছি, শম্ভু আমার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। চুপি চুপি বললে, খবর শুনেছিস্?

—কি খবর?

—মাষ্টারমশায়কে পুলিসে ধরেছে।

চমকে উঠলাম আমি, কি বলছিস্ তুই! মাষ্টারমশায়ের মতো লোককে পুলিশে ধরেছে! একি সম্ভব?

শম্ভু সে কথায় জবাব দিলো না। শুধু বললে, তুই আয় আমার সঙ্গে। এখন ইস্কুলে যেতে হবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে শম্ভুকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কেন পুলিশে ধরলো মাষ্টারমশায়কে? কি করেছিলেন তিনি?

শম্ভু বললো, পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তিনি নাকি ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতেন অশ্লীলভাবে।

—এ অসম্ভব। আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, পুলিশের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শম্ভু বললে, রাস্তায় চিৎকার করলে তো কিছু হবে না, অভিযোগ যে মিথ্যা তা প্রমাণ করতে হবে কোর্টে, নইলে মাষ্টারমশাইকে জেল খাটতে হবে।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, তাহলে উপায় কি?

—ভাল একজন উকিল চাই। শম্ভু বললো, সেই জন্যেই তো তোকে নিয়ে এলাম সঙ্গে। ব্যবস্থা তো আমাদেরই করতে হবে। মাষ্টারমশায়ের আর কে আছে?

সারাদিন ঘুরে ঘুরে একজন উকিলের ব্যবস্থা করা হল। মাষ্টারশায়ের চাকরটাও সঙ্গে ছিল আমাদের। সাক্ষীর যদি প্রয়োজন হয়, তাই ওকে আমরা উকিলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমেই মাষ্টারমশায়কে অন্ততঃ জামিনে খালাস করতে হবে। কালই সেই বোমাপড়ার দিন। আজ সারা দিনরাত তাঁকে থাকতে হবে হাজতে।

সন্ধ্যের সময় মাষ্টারমশাইয়ের চাকরটাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আমি রাস্তায় নামতেই একটি ছোট ছেলে পেছন থেকে আমায় ডাকলো, এই যে শুনুন!—

পেছন ফিরতেই ছেলেটি বললে, একবার আসুন না আমাদের বাড়ীতে?

—কেন?

—দিদি ডাকছে।

দেখলাম, পাশের বাড়ীটার দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে রেখা। আর তার পেছনে রয়েছে অন্য মেয়েগুলো আমি যেতেই ওরা আমায় একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর আমার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রেখা জিজ্ঞেস করলো, আজ আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে যে? কি হয়েছে?

ওর দুচোখে কেমন যেন একটা কৌতুক।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, মিথ্যা অভি-যোগে মাষ্টারমশায়কে পুলিশে ধরেছে।

—তাই নাকি? পুলিশে ধরেছে? একটা অদ্ভুত আনন্দে যেন ভরে উঠলো রেখার দুচোখ, কিন্তু কে নালিশ করলে আপনার মাষ্টারমশায়ের নামে?

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সব মেয়েগুলো।

ওদের হাসি দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলে উঠলো।

রেখা বললে, কিন্তু যাই বলুন, যারা নালিশ করেছে তাদের যে বুদ্ধি আছে, এটা আপনাকে মানতেই হবে। নইলে কি জব্দ করা যেত আপনার মাষ্টারমশাইকে?

আমি চোখ রাঙিয়ে বললাম, তবে কি এ কাণ্ড তোমাদেরই? একজন নিরীহ মানুষের নামে অকারণ নালিশ করতে লজ্জা হলো না তোমাদের? আমার মাষ্টারমশায় কি সত্যই কোনদিন তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছেন?

—আমরা কি তাই বলছি?

—তবে কেন এই মিথ্যা অভিযোগ? রাগে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

আমার কথায় ওদের হাসির মাত্রা কিন্তু আরো বেড়ে গেল। হাসতে হাসতে ওরা ঢলে পড়তে লাগলো একজন আরেকজনের গায়ে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই রেখা কোন রকমে হাসির ধাক্কা সামলে বললো, আপনার মাষ্টার-মশায়কে বলবেন, উনি যেন ওই জানলাটা বন্ধ না করে এবার থেকে খুলে রাখবার ব্যবস্থা করেন। নইলে কিন্তু আমরা আবার তাঁকে হাজতে পাঠাবো।

পুনর্যাত্রা—স্মৃতিপথে

পরিমল গোস্বামী

গতবারে সাধুসাবধান প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য ছিল। আমি বলেছিলাম, সাধু দেখলেই বিনা সংকোচে আমরা তার পায়ের ধুলো মাথায় মাখি দেখে চোরেরা সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তাদেরই সংখ্যা এখন বেশি। প্রকৃত সাধু পথেপথে ভক্ত খুঁজে বেড়ান না। যারা যারা পথেপথে ঘোরে তারাও যে সবাই অসাধু তা বলি না, কিন্তু সন্দেহ যেন জাগে। চোর প্রতারকের পায়ের ধুলো নিতে নিতে আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গেল। শুধু মেরুদণ্ড নয়, ভাগ্যও বেঁকে দাঁড়িয়েছে। নইলে কোনো সভ্য দেশে সাধুবেশধারী এত প্রতারক প্রকাশ্য পথে ঘোরে কি করে? সন্দেহ করারই দায় শুধু পুলিশের হাতে না দিয়ে আমাদের নিতে হবে। আমাদের মধ্যেও পুলিশ-সুলভ সন্দেহ জাগাতে হবে, একমাত্র তা হলেই সমাজের বুকের এমন একটা সর্বনাশা প্রতারণা দূর হবার সম্ভাবনা। সাধুকে যত সাধুই মনে হোক, "যাই হোক তোরা ঘটি বাটি সামলা।"—নীতিটি যেন ভুল না হয়।

তবে সন্দেহেরও একটা সীমা থাকা উচিত। সন্দেহের বাড়াবাড়ি হলে জিনিসটা কি রকম হাস্যকর হয়ে উঠে তার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন বারট্রাণ্ড রাসেল। তাঁর একটি রচনায় তিনি বলেছেন, পিরো-বাদের প্রতিষ্ঠাতা পিরোর মতে কোনো একটা কর্ম-নীতি অন্য একটি কর্মনীতি থেকে বেশি ভাল কি না, বা ন্যায়সঙ্গত কিনা তা নিশ্চয় করে জানবার মতো জ্ঞান আমাদের নেই। পিরোবাদ বা (Pyrrhonism সন্দেহবাদেরই পুরাতন নাম)। পিরোর যৌবনকালে একদিন অপরাহ্নে তিনি স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এমন সময় পথে হঠাৎ দেখতে পান তাঁর দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক একটি গর্তে পড়ে গিয়ে এমন আটকে গিয়েছেন যে মাথাটা টেনে বার করতে পারছেন না। পিরো সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ভাবলেন এই শিক্ষককে উদ্ধার করলে তিনি এই কাজের দ্বারা সমাজের প্রচুর উপকার করবেন কি না তা বুঝে উঠতে পারছেন না। মনে তাঁর এই সন্দেহ জাগাতে তিনি ওখান থেকে সরে গেলেন, তাঁকে আর উদ্ধার করা হল না। পিরো এই শিক্ষকের কাছ থেকেই সন্দেহবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

এটি সন্দেহবাদ বা স্কেপটিসিজম ঠিক নয়। এর নাম সন্দেহবাতিক। যার সোজা বাংলা সন্দেহবাই। যাই হোক, সন্দেহ করা ভাল, শুধু তা বাতিকের সীমানায় না পৌছলেই বাঁচা যায়।

রোম্যান্স কাকে বলে

এই প্রশ্নটি করেছিলেন পানকুনির অপূর্ব চক্রবর্তী। আরও প্রশ্ন ছিল রোম্যান্স সাহিত্য ও রোমাঞ্চকর সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ কি?

প্রশ্নটি ভীষণ কঠিন। কারণ, রোম্যান্স শব্দের শব্দ-গত ইতিহাস থেকে অর্থগত ইতিহাস দীর্ঘ। Semantics এর বিস্তীর্ণ সীমানায় এসে যায় সবটাই। আমি তার ভিতর থেকে দু'একটি অর্থ বেছে নিচ্ছি। আমি ১১।৬।১৯৫৭ তারিখে লিখলাম—

আজ যখন সমস্ত কলকাতা ও কলকাতার বাইরে নূতনত্বের হাওয়া বইছে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় দলে দলে লোক শুয়ে পড়ছে, তখন স্বভাবতই মনে নতুন করে রোম্যান্স জেগে উঠছে।...অতিরিক্ত রং ফলিয়ে কোনো কাহিনী বিবৃত করাকে ইংরেজিতে "রোম্যান্স করা" বলে। শব্দটি এখানে ক্রিয়া পদ। সাম্প্রতিক ইনফ্লুয়েঞ্জাও এই রোম্যান্স করার সুযোগ দেয় নি? গত ইনফ্লুয়েঞ্জা সপ্তাহে কলকাতার অনেক বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু যদি বলি অনেক ক্ষেত্রেই বর বাসরে প্রবেশ করার আগে বিয়ের আসরেই শুয়ে শুয়ে মন্ত্রপাঠ করেছে, এবং আসরে শোয়া কনেকে বধূরূপে গ্রহণ করেছে, এবং বাসর জেগেছে হাসপাতালে গিয়ে, তা' হলে তাকে কি বলা হবে ?

আমার বিশ্বাস এই একটি ক্ষেত্রে রোম্যান্স ও রোমাঞ্চ এক হয়ে গেছে।

প্রণয়কালে মনকে যে স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব আচ্ছন্ন করে থাকে, তাকেও রোম্যান্স বলা হয়। কিন্তু তার ভিতরে রোমাঞ্চ অংশ শতকরা ৫০। দুইয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিয়ের ব্যাপারে এই রোম্যান্স ও রোমাঞ্চ এবারের জ্বরে অত্যন্ত স্পষ্ট। বরের তাপ মাত্রা ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট ও কনের ১০৪ ডিগ্রী। প্রথম প্রণয়ে যেসব আবোল তাবোল ভাষা মুখ থেকে অবিরাম নির্গত হতে থাকে, ঠিক সেই জাতীয় প্রলাপ বকছে দুজনে হাসপাতালে—জ্বরের ঘোরে।

আবার অতিরিক্ত রং চড়িয়ে যেসব কাহিনী রচিত হয় তা সব সময় রোম্যান্স না হতে পারে। কয়েক দিন আগে একটি খবর ছাপা হয়েছিল ১৪০ জন পুলিশের লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত। এ খবরটিতে যদি কেউ রোম্যান্সের শিহরণ পেয়ে থাকেন, তা'হলে সেটি হবে ১৪০ জোল্টের শিহরণ, যা অনুভব করার আগেই সেকটি বেঁচে যাবে। অবশ্য পরদিনই এ খবরের প্রতিবাদ বেরিয়েছিল. বলা হয়েছিল মাত্র কয়েকজন পুলিশের লোক আক্রান্ত হয়েছিল। অর্থাৎ ১৪০ নয় ২২০। বিপজ্জনক দুঃসাহসিকতা বা রহস্যপূর্ণ অনেক কাহিনীকেও রোমাঞ্চ বলা হয়, অতএব সেদিক থেকে ধরলে সবই রোম্যান্সের আওতায় এসে যাবে। আজগুবি কাহিনীও আসবে। আর সেজন্য আমাদের সিনেমাগুলো প্রায় সবই রোম্যান্স।...অবশ্য এ জিনিস একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ভাল লাগে। মাথার ঘাম পা পর্যন্ত নামতে আরম্ভ করলে রোমাঞ্চ আর ভাল লাগে না।

তাজমহল প্রসঙ্গ

তাজমহল নির্মাণের তথ্যপথে দুঃসাহসিক ভ্রমণ যদি রোম্যান্স হয় তবে কলিকাতা-২১ থেকে সজল-কিশোর দত্ত আমাকে যে সংকলিত উদ্ধৃতিগুলি পাঠিয়েছেন সেগুলি কি ? তিনি আমার মতামত চেয়ে সংকলনগুলি পাঠিয়েছেন। এগুলি সত্যই উল্লেখযোগ্য। এতে তাজমহল নির্মাণ বিষয়ে বিবিধ ইতিহাসলেখকের মত আছে।

আর. সি. মজুমদার, এইচ. সি. রায়চৌধুরী ও কে. কে. দত্ত।

এঁদের লেখা অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া বই এর ৪১৯ পৃষ্ঠার আছে :-

The Tajmahal, a splendid mausoleum built by Shahjahan at a cost of fifty lacs of rupees...

ভিনসেন্ট স্মিথ

তাঁর দি অক্সফোর্ড হিষ্টরি অভ ইণ্ডিয়া বইয়ের ৪১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

The Taj began in 1632 was completed with all the appurtenances nearly twenty two years later in 1653 but the central mausoleum was ready in 1643.

এস লেন পুল

তাঁর মিডীভ্যাল ইণ্ডিয়া বইতে লিখছেন—

Tavernier saw it building, and says 20,000 workmen were continuously employed.

(কত সময় সে বিষয়ে নীরব)

ডঃ কালিদাস নাগ

তাঁর স্বদেশ ও সভ্যতার ২৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ১৬৩২ হইতে ১৬৫৩ খৃঃ অধিক দীর্ঘ ২১ বৎসর ইহার নির্ম্মাণ কার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। কত টাকা ও কত লোকের দ্বারা হয়েছিল তা বলেন নি।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস বইয়ের ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কুড়ি হাজার লোক কুড়ি বৎসরে (১৬৩২—১৬৫৩) পরিশ্রম করিয়া তাজমহলকে জগতের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়াছিল। নির্মাণে ৩০ কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

আশুতোষ দেব

তাঁর অভিধানে লিখছেন ইহার নির্মাণ কার্য ১৬৩১এ আরম্ভ হয় এবং ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। ২০,০০০ কারিগর ১৭ বৎসর ধরিয়া এই নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইহা শেষ করে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিমলকান্তি মজুমদার

তাঁদের ভারতের ইতিবৃত্ত বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মর্মর সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। (কত সময়, কত কর্মী বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।)

মনীন্দ্রকৃষ্ণ কুমার

পরিক্ষার্থীদের জন্য পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ দশম সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তাজমহল বহু অর্থ ব্যয় করে সৃষ্টি করে গেছেন। ১৬৩১—১৬৫৩ এই দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে এর স্মৃতি সৌধ গড়ে উঠেছিল।

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী অনিলচন্দ্র ঘোষ

আমরা ভারতবাসী বইয়ের ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই সমাধিভবন ১০ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ২০ হাজার লোকের ২০ বৎসরের পরিশ্রমের ফল।

ফনীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অমলনাথ লাহিড়ী

তাঁদের লেখা আমাদের দেশ বইয়ে ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ২২ হাজার লোক ২২ বৎসর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া শিল্প কৌশলের এই অত্যাশ্চর্য নিদর্শন নির্মাণ করে।

জ্যোতির্ময় লাহিড়ী

প্রবেশিকা ইতিহাসের ২০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এই স্মৃতিমন্দির কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ২১ বৎসরে নির্মিত হইয়াছিল।

মন্মথনাথ রায়

ছোটদের ভারতের ইতিহাসের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহু...মূল্যবান প্রস্তর... এই সৌধ নির্মাণ করিতে ২০ হাজার লোকের ২২ বছর সময় লাগিয়াছিল।

আমি এই রচনা লেখার সময় আরও কিছু যোগ করে দিচ্ছি—

Everyman's Encyclopaedia

Tajmahal, a famous mausoleum at Agra built by Shah Jehan about 1629—50 as a tomb......

(আরম্ভ ও শেষের সময় অনুপাত ঠিকই আছে, কেবল

Pears Cyclopedia

...Over 20000 men were occupied for over 20 years in its erection.

The New Pictured Encyclopedia

Built by Shah Jahan about 1630—1650.

ভারতকোষ

তাজমহল পরিচয়ের লেখক বিজয়কৃষ্ণ দত্ত ফরাসী পর্যটক তাভের্নিয়ের এর মত উদ্ধৃত করে বলেছেন ১৬৩২ তে শুরু, ১৬৫৩ তে শেষ।

(পুনে লেন পুলের উক্তিতেও তাভের্নিয়েরের কথা আছে, কিন্তু ভদ্রলোকের উদ্ধৃতি অসম্পূর্ণ।)

এত রকম মত, তার কারণ এবিষয়ে কোন ইতিহাসও হিসাব তখন লেখা হয় নি। সবই আনুমানিক। এবং যারা তারিখ ও ব্যয় লিখেছেন তাঁদের তারিখ ও ব্যায়ের পরিমাণের আগে 'প্রায়' বা "অনুমান" কথা বসিয়ে দিলে ঠিক হয়। পিয়ার্সের বইতে 'over' দেওয়া আছে। নিউপিকচার্ড এনসাইক্লোপীডিয়াতে about দেওয়া আছে। এই রকম দেওয়াই ঠিক। এভরিম্যানস এর কোষেও about যোগ করা আছে। ভিনসেন্ট স্মিথ nearly বসিয়েছেন এতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, দেশী লোকেরা সবাই নির্দিষ্ট সময়, ব্যয় ও শ্রমিকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিদেশীরা তা করেননি।

দণ্ডকারণ্য, বিরাধ রাক্ষস ও বিধানচন্দ্র রায়

কত হাজার বছর কে জানে, যখন এই অরণ্য বিখ্যাত ছিল। আবার এর কথা উঠেছে। লিখলাম ২৩।৬।১৯৬৭ তারিখ।

রামায়ণের যুগের থেকে এই প্রথম দণ্ডকারণ্য প্রসঙ্গ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। সেকালে এখানে মুনিঋষিরা ও মাঝে মাঝে রাক্ষসেরা বাস করতেন, এবং তখন কাগজ ছিলনা প্রেস ছিল না, সব দিক দিয়ে মুনি ঋষিরা আত্মরক্ষনা নীতি পালন করতেন। এখানে রামচন্দ্র,

সীতা ও লক্ষণ সহ প্রবেশ করিলেন, তাই এর নাম আমরা জানতে পেরেছি।

সম্প্রতি দণ্ডকারণ্যে প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তুর বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানকার পরিবেশ মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলে, ভোগ বাসনা সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় আবদ্ধ থাকতে চায়। চুলে জট পাকায়, দাড়ি স্বাধীন ভাবে বাড়তে থাকে এবং পার্থিব বহু বিষয়ে আকর্ষণ কমে যায়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। তাঁদের অনেকেরই ঋষি হবার সম্ভাবনা থাকবে।

স্থানটি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে পড়ে আছে। জমির পরিমাণ ৮০,০০০ বর্গমাইল। সব দিকেই ভাল, কিন্তু সব ভাল এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। এখানকার নিবিড় শান্তির মধ্যেও একটা উৎপাত আছে। এক সমাজ বিরোধী রাক্ষস—নাম বিরাধ—এখানকার শান্তি ভঙ্গ করে বেড়াচ্ছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যেও সে তাই করে বেড়াবে এই আশঙ্কায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুলিসের আই-জি ও সেক্রেটারিসহ দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করলেন। তখনও বহু উদ্বাস্তু আগমন হয় নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিরাধের দেখা হলে কি ঘটবে, তা আমি স্পষ্ট অনুমান করতে পারছি। দুচারজন বাঙালী উদ্বাস্তু যারা আগে এসে বসবাসের আয়োজন করেছেন, তাঁদের মুখপাত্র বিধানচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—কিন্তু যা বলবেন তা আমি রাজশেখর বসুর অনুবাদের ভাষায় বলছি—মুখপাত্র বলবেন, হে বিধানচন্দ্র, তুমি লোকের ধর্মরক্ষক, শরণ্য, যশস্বী পূজনীয়, মান্য, দণ্ডধর এবং মুখ্যমন্ত্রী। নগরে বা বনে যে খানেই তুমি থাক আমাদের রক্ষা কর্তা, আমরা তোমার রক্ষনীয়। আমরা দণ্ডদানে বিমুখ জিত ক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়। সেজন্য শিশুর তুল্য আমাদের রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। এই কথা বলে তাঁরা এঁদের তিনজনের নানা ভাবে সৎকার করবেন। যা ঘটবে, তা ঘটে গেছে ধরে নিয়েই লিখছি।

বিরোধের সঙ্গে বিরোধ

পরদিন সকালে বিধানচন্দ্র সঙ্গীগণ সহ অরণ্য মধ্যে যাত্রা করলেন কিছুদূর গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন সেই রাক্ষসকে। দৈর্ঘ্যে সে বিধানচন্দ্রের দ্বিগুণ তার কণ্ঠস্বর কর্কশ, মুখ বিস্তৃত, উদর বিকট। মুখে রক্ত, পরনে বাঘছাল। বিধানচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে এই রাক্ষস কৃতান্তের ন্যায় ধাবিত হল এবং সাহসা তাঁর সেক্রেটারিকে তুলে নিয়ে দূরে গিয়ে বলল, তোমরা এ অরণ্যে এসেছ কেন? আমি বিরাধ রাক্ষস, আমি এখানে রেফিউজীদের মাংস খেতে এসেছি, আমি তোমাদের মাংসও খাব।

সেক্রেটারি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিধানচন্দ্র আই-জির দিকে তাকালেন। আই-জি বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাবহ, কোন ভয় নেই। আমি একে বন্দুক দিয়ে বধ করব। —বলে তিনি রাক্ষসের দিকে বন্দুক নিশানা করলেন। —বিরাধ বলল, আমি যবের পুত্র, শতহ্রদা আমার মাতা। ব্রহ্মার বরে কেউ আমাকে অস্ত্রে মারতে প্যারবে না কিন্তু তবু বিধানচন্দ্র তাঁর নিজের পিস্তলের সাহায্যে একটি গুলি ছুড়লেন। কিছুই হল না। বিরাধ তখন সেক্রেটারীকে ফেলে একটা শূল নিয়ে দুজনকে আক্রমণ করল। মুখ্যমন্ত্রী এবং আই-জি দুজনেই গুলি চালাতে লাগলেন। আই-জির গুলিতে শূল ভেঙে গেল। তখন মুখ্যমন্ত্রী ও আই-জিকে সবলে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। সেক্রেটারি চিৎকার করতে লাগলেন।

এঁরা দুজনে রাক্ষসের ঘাড়ে বসে বন্দুকের আঘাতে তারা দুখানা হাত ভেঙে দিলেন। সেক্রেটারিকে আদেশ দিলেন কবর খোঁড়। শেষে বিরাধকে পেড়ে ফেলে বিধানচন্দ্র তার গলায় পা রেখে চাপ দিতে লাগলেন। বিরাধ গলা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, পুরুষ শ্রেষ্ঠ, মোহবশে তোমাকে চিনতে পারিনি, তোমাকে তোমাদের তিনজনকেই চিনতে পেরেছি। আমি তুম্বুর নামক গন্ধর্ব, কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছি। তখন অনুনয় করলে কুবের বলেছিলেন বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় তোমাকে বধ করলে তুমি স্বরূপে স্বর্গলাভ করবে—বলে রাক্ষস পুনরায় গলা বিধানচন্দ্রের পায়ের নিচে স্থাপন করে বলল, আজ আমি শাপমুক্ত হলাম।

এর পর থেকে দণ্ডকারণ্যে সবাই নিশ্চিন্ত মনে বাস করবে এবং দেশ ছেড়ে অনেকেই সেখানে যেতে চাইবে—অবশ্য যারা আমাদের মতো ঋষিতুল্য জীবন কাটাতে চায় তারাই।

১৭ বছর আগের এই অনুমান কতটা মিলেছে কিছুই জানিনা তবে মাঝে মাঝে এসব কৌতুক কথা মনকে হাল্কা করার জন্য লিখতে হয়েছে আজীবন জমানর চেষ্টায়।

জাতিভেদ

জাতিভেদ নিবন্ধনই এদেশবাসীদিগের পক্ষে পরের দাসত্বপাশ গলে ধারণ করা সহজ হইয়াছে।...এই জাতিভেদ হইতে সমূহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদ প্রথা ভারতে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে; কায়িক শ্রমকে নিকৃষ্ট করিয়াছে; শিল্পবাণিজ্যের দুর্গতি করিয়াছে; দারিদ্র্য-যাতনা বৃদ্ধি করিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আনয়ন করিয়াছে, সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে; হিন্দুগণের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া কাপুরুষতার বৃদ্ধি করিয়াছে; বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি দূষিত রীতিসকল প্রসব করিয়াছে, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পথরোধ করিয়াছে; শত শত বৎসর ধরিয়া নিম্ন-জাতীয়দিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে এবং সর্বশেষে এদেশবাসীদিগকে পরের দাসত্বপাশবহনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। আর কি শুনিতে চাও? এমন প্রথার স্বপক্ষে আবার কথা কও? আমি যখন এই সকল অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি, এই জাতিভেদপ্রথা যদি কোন রোগ বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হস্তে সজোরে ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিতাম। ইহা উন্নতির কণ্টক ও দেশের শত্রু।

—শিবনাথ শাস্ত্রী (তত্ত্ব-কৌমুদী)

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা

চট্টগ্রামের স্বনামধন্য জাতীয়তাবাদী নেতা স্বর্গত যাত্রামোহন সেনের পুত্রবধূ ও স্বর্গত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পত্নী দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা দীর্ঘকাল রোগশয্যায় অতিবাহিত করিবার পর গত ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭৩ (৬ই কার্তিক ১৩৮০) ৮৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পতিকুলের পিতৃভূমি বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রামে বাস করিতেছিলেন এবং শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অনুরোধক্রমে চিকিৎসার্থে কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় আসেন। ইংরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি বিবাহসূত্রে ভারতকেই স্বদেশরূপে বরণ করিয়াছিলেন ও স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী হইয়া ইংরাজ-শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে কারাবাস, নির্যাতন প্রভৃতি অশেষ দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছিল। আজীবন তিনি নানা দেশহিতকর ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। বিগত ২৮ অক্টোবর ১৯৭৩ (১১ই কার্তিক ১৩৮০) ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজভবনে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কার্য করেন। শ্রীযুক্তা রমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমবেত মহিলাগণের অনেকে ব্রহ্মসংগীত করেন। খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, ইসলাম, জরথুষ্ট্রীয় প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহের পক্ষ হইতে শাস্ত্রপাঠ ও নিবেদন করা হয়। 'লোরেটো হাউস'এর ধর্মযাজিকাগণ সমবেত কণ্ঠে সংগীত পরিবেশন করেন। শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনগুপ্ত পরলোকগতার জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার স্নেহপরায়ণ হৃদয়ের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রাদ্ধবাসরে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের আত্মীয়স্বজন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। (তত্ত্ব-কৌমুদী)

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন

বর্ত্তমান কারখানাকেন্দ্রিক জগতে যে সকল বস্তু উৎপাদন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যে গুলির উৎপাদনের উপর অন্য বহু বস্তুর উৎপাদন নির্ভর করে, তাহার মধ্যে লৌহ এবং ইস্পাত সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতেই লৌহ এবং ইস্পাতের প্রয়োজন হয় এবং এই কারণে যেসকল দেশ কারখানাতে সমৃদ্ধ সেই সকল দেশের লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনও সেই অনুপাতে বিরাট। পৃথিবীতে কারখানা গঠন, পরিচালনা ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির কারবারের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম দেশ হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। তৎপরেই স্থান হইল সোভিয়েট রুশিয়ার। এই দুই দেশেরই লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ হইল বহুশত লক্ষ টন। জাপান, জার্ম্মান, বৃটেন প্রভৃতি দেশেরও লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন যথেষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কমবেশী ১৪ কোটি টন কাঁচা ইস্পাত উৎপন্ন হয়। রুশিয়ায় হয় প্রায় ১২ কোটি টন। জাপান জার্ম্মানী ও বৃটেনের কাঁচা ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ৮·৫ কোটি, ৪·৫ কোটি এবং ২·৫ কোটি টন। ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত মূলধনে গঠিত তিনটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে। এই তিনটি হইল টাটা আয়রণএণ্ড স্টীল কোঃ, ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোঃ এবং মাইশোর আয়রন এণ্ড স্টীল কোঃ। টাটার পরিকল্পনা অধিকতম ২০ লক্ষ টন কাঁচা ইস্পাত উৎপাদনের। ইণ্ডিয়ান আয়রন ১০ লক্ষ ও মাইশোরের ১ লক্ষ টন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আয়রন বর্ত্তমানে উৎপাদন অত্যান্তই অল্প করিতেছে। সরকারী কারখানাগুলির মধ্যে ভিলাই ১৯ লক্ষ টন উৎপাদন করিয়াছে। রাউর কেলা করিয়াছে ১০ লক্ষাধিক টন ও দুর্গাপুর প্রায় ৫।৬ লক্ষ টন। আর একটি বৃহৎ লৌহ ইস্পাতের কারখানা রুশ দেশের সহায়তায় গঠিত হইতেছে। সেটি হইল বোকারো স্টীল কোঃ। ইহা ক্রমে ক্রমে ৫৫ লক্ষ টন কাঁচা ইস্পাত উৎপাদন করিবে বলা হইতেছে। যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে সকল কিছু মিলিয়া ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা সহজে এক কোটি টনের উপরে যাইবে না। অর্থাৎ ভারতের কারখানা গঠন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া খুব দ্রুতগতি অগ্রগমন করিবে বলিয়া বোধ করা যাইতেছে না। যদি আমেরিকার একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার বর্ণনা বিচার করা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে কারখানা গঠন কি কারণে এত কঠিন ও ব্যয়সাধ্য বিষয়। এই কারখানাটি হইল আমেরিকার পিটসবার্গ শহরের ইউনাইটেডস্টেটস্ স্টীল কোম্পানী। ইহা পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ লৌহ ইস্পাত কারখানা। ১৯৭১ খৃঃঅব্দে এই কারখানা ৪৯৬৩২০০০০ অর্থাৎ প্রায় ৫০০ শত কোটি ডলারের মাল বিক্রয় করে (৩৭৫০০০০০০০০ কোটি টাকা)। কোম্পানীটি ১৮৩৯৪০ জন কর্ম্মী নিয়োগ করে এবং ইহার ধন-সম্পদ হইল $৫২৮২৮০০০০ (কমবেশী ৪০০০ কোটি টাকা)। আমেরিকার অন্য একটি কোম্পানী, বেথেলেহেম স্টীল কোঃ মেরিল্যাণ্ড, বৎসরে নব্বই লক্ষ টন কাঁচা ইস্পাত উৎপাদন করে। আমেরিকার ইস্পাত উৎপাদন কাজে লাগে নানা ভাবে। যথা জেনারেল মোটরস গাড়ী ও লরী তৈয়ার করে বৎসরে ৭৫।৮০ লক্ষটি। এইগুলির মূল্য হইবে কমবেশী ২৫০০০ কোটি টাকা। জার্ম্মানীর ফল্‌ক্‌সভাগেন গাড়ীর কারখানায় দৈনিক ৫০০০ গাড়ী নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় ২০ লক্ষটি গাড়ী। বৃটেনের র‍্যালে কারখানায় বৎসরে ১৭ লক্ষ বাইসিকল নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে লৌহ ইস্পাতবর্জ্জিত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ প্রায় হয়ই না। যন্ত্রাদিব্যতীত যে সকল অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে লৌহ ইস্পাত না হইলে চলে না তাহা হইল গৃহনির্ম্মাণ, রেল পথ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ, জল ও গ্যাসের নল, টাইপরাইটার যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, ছুরি কাঁচি সুচ ইত্যাদি, তার পেরেক লাঙ্গলের ফাল, চাকার হাল, জাহাজ স্টীমার নৌকার কাঠামো ও অংশাদি, শেকল, তারের দড়ি, টেলিগ্রাফ টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের তার লাগাইবার থাম ইত্যাদি ইত্যাদি। লৌহ ইস্পাতের ব্যবহার অসংখ্য ক্ষেত্রে ও অগণ্য ভাবে হইয়া থাকে।

সাময়িকী

ভারত-বন্ধু ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলার

(ম্যাক্সমুলারের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে "আশ্রম" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত প্রবন্ধের আংশিক উদ্ধৃতি)

যেকজন বিদেশী পণ্ডিত ভারততত্ত্ব চর্চায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে জার্মানীর প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ফ্রেডরিখ ম্যাক্সম্যুলারের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সুকবি উইলহেম ম্যুলারের পুত্র ম্যাক্স-ম্যুলার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ম্যাক্সম্যুলার ভাষা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি লেইপজীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রথম অধ্যাপক ব্রকহাউরের উপদেশে ম্যাক্সম্যুলার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হিতোপদেশ অনুবাদই তাঁর সংস্কৃত চর্চার প্রথম ফল হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পি, এইচ, ডি, লাভ করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে বিখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী ফ্রানজ বপের নিকট তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ঐ একই সময় তিনি বিখ্যাত দার্শনিক শিলিং-এর নিকট হিন্দু দর্শন চর্চা করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারীস যান এবং প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ বার্নুফের তত্ত্বাবধানে গভীরভাবে সংস্কৃত চর্চায় নিজেকে নিয়োগ করেন। সে সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার ও বৈদিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা রোথ। ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক বার্নুফ তাঁর ইনষ্টিটুটে ড ফ্রান্সে ম্যাক্সম্যুলারের সঙ্গে প্রিন্স দ্বারকানাথের পরিচয় করিয়ে দেন। এই পরিচয় প্রসঙ্গে ম্যাক্সম্যুলার পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যা বলেছিলেন তার অংশ বিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হল—

"দ্বারকা নাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হলেও সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞান তাঁর বেশ ছিল—যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত, তখন আমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও প্রায়ই সারা সকালটা তাঁর সঙ্গে থাকতাম। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং ফরাসী ও ইতালীয় সঙ্গীত বিশেষ পছন্দ করতেন। তাঁর গানের সঙ্গে আমি পিয়ানো বাজাতাম। আমি একদিন তাঁকে খাঁটি ভারতীয় গান গাইতে বললাম। খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মুচকি হেসে বললেন তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না। তারপর আমার অনুরোধ রাখার জন্য একটি গান নিজে গাইলেন। বাস্তবিক কিছু উপভোগ করলাম না।… দ্বারকানাথকে এ কথা বলায় তিনি বললেন—'তোমরা সকলেই এক রকমের।…তোমরা বল আমাদের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়। আমাদের দর্শন দর্শনই নয়।…আমরা যেমন তোমাদের সঙ্গীত-বিদ্যা, কাব্য, দর্শন আলোচনা করি, তোমরাও যদি তাই করতে তাহলে তোমরাও আমাদের দেশের বিদ্যাগুলির মর্ম বুঝতে পারতে এবং আমাদের যে অজ্ঞ ও ভণ্ড মনে কর, বাস্তবিক আমরা তা নই, বরং অজ্ঞাত বিষয়ে তোমরা যা জান, আমরা হয়তো তারো অধিক জানতে পেরেছি দেখতে।' বাস্তবিক তিনি নিতান্ত ভুল বলেননি।" তাঁর পরিণত বয়সে ম্যাক্সম্যুলার দ্বারকানাথের কথা বিশেষভাবে অনুভব করেন এবং পাশ্চাত্য-বাসীদের বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রধানতঃ অধ্যাপক বার্নুফের অনুপ্রেরণায়ই ম্যাক্স-ম্যুলার সায়ন-ভাষ্য সম্বলিত ঋগ্বেদ সম্পাদনার কাজে

আত্মনিয়োগ করেন। ঋগ্‌বেদের পাণ্ডুলিপি নকল ও মিলিয়ে দেখার জন্য, মাক্সমুলার ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং ব্যারন বুনসেন ও অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার প্রথম বোডেন অধ্যাপক উইলসনের চেষ্টায় মাক্সম্যুলারকে ঋগ্‌বেদ সম্পাদনার কাজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিয়োগ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অক্সফোর্ড ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় মাক্সম্যুলার 'বাংলাভাষা এবং অন্যান্য আর্য্যভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাক্সম্যুলার স্থায়ীভাবে অক্সফোর্ডে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় সৃষ্টি—ঋগ্‌বেদ-এর প্রথম খণ্ড ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের মুদ্রিত রূপ ভারতবর্ষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গোঁড়া হিন্দুরা তুমুল প্রতিবাদ তুললেন এবং ছাপা গ্রন্থাংশের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। উদারপন্থীরা, এমনকি কিছু প্রাচীনপন্থী হিন্দুও এই প্রশংসনীয় কাজের জন্য মাক্সম্যুলারকে হিন্দুর পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অদ্বিতীয় প্রবক্তা বলে অভিনন্দন জানায়। প্রথম যাঁরা মাক্সম্যুলারের ঋগ্‌বেদ সংস্করণকে স্বীকৃতি দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার রক্ষণশীল দলের শিরোমণি রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮৫১ সালের নভেম্বরে রাজা রাধাকান্ত মাক্সম্যুলারকে এক প্রশস্তিবাচক পত্রে লেখেন...."আপনার পরিশ্রমের ফলে এই প্রথম বেদের সমস্ত সংহিতার পূর্ণ সংকলন বৈদিক পণ্ডিতদের হাতে গিয়ে পৌঁছবে, যার বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ঘরে আবদ্ধ ছিল। এবং এর ফলে, পবিত্র বেদের মুখশ্রীর সামনে এতদিন যে পর্দা পড়েছিল, অতীত ইতিহাসের ছাত্ররা তা টান মেরে সরিয়ে দেবে; প্রাচীন প্রাচ্যের এমন কি প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাসের—উপাদান যোগাবে তারা এবং তার দ্বারা আপনার জন্য এক স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলবে যা পিতলের চেয়েও স্থায়ী হবে।" স্বামী বিবেকানন্দের মতে মাক্সম্যুলারের ঋগ্‌বেদ সংস্করণ এক মহান কীর্তি; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই মত প্রকাশ করেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাক্সম্যুলার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ডে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান চর্চার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। তুলনামূলক ধর্ম ও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পুরাণ কথা সমূহের তুলনামূলক আলোচনার ধারাও তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। সমগ্র বিশ্বকে একসূত্রে গাঁথার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সেক্রেড বুক্স অব দি ইষ্ট' গ্রন্থমালা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় এই বিশাল গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'থ্রি লেকচারস্ অন দি বেদান্ত' প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সিক্স সিষ্টেম অব ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' ভারতীয়দের জীবন বেদান্ত দর্শন দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি সে কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

মাক্সম্যুলারের পাণ্ডিত্য ছিল অসীম এবং তার পরিচয় মেলে তাঁর দেওয়া অসংখ্য বক্তৃতায় এবং রচিত গ্রন্থে। 'চিপস্ ফ্রম জার্মান ওয়ার্কসপ' 'এসেস্ অন মিথলজি অ্যাণ্ড ফোকলোর,' 'ইণ্ডিয়া, হোয়াট ক্যান ইট টিচ আস্' ও 'দ্যা সায়েন্স অফ থট' গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মাক্সম্যুলারের জীবনী মূলক রচনা 'বায়োগ্র্যাফিক্যাল এসেস্' পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৯৮ সালে দু খণ্ডে প্রকাশিত 'আউল্ড লাংগ জাইনে' তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। মাক্সম্যুলারের ভারতসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অসীম গভীরতা ও মানসিক শক্তির দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লেখেন..."মাক্সম্যুলার ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালবাসেন আমি আমার মাতৃভূমিকে তার শতাংশের একভাগ ভালবাসতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করতে পারতাম।"

অক্সফোর্ডে তাঁর নিবাস ছিল তৎকালীন ভারতীয়-

দের পীঠস্থান। মাক্সম্যুলারের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এখানেই সাক্ষাৎ করেন। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মালাবারী এবং আরও অনেক ভারতীয় তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে পরিচিত হন। এই পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে যে তর্ক-বিতর্কের শুরু হয় সে কথা সর্বজনবিদিত। মাক্স-ম্যুলার রামমোহনের পন্থাকে সমর্থন জানান এবং রাধা-কান্তদেব ও তাঁর অনুচরদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে সতীদাহ-প্রথার সমর্থনে কিছু পাওয়া যায় না। এ বর্বরোচিত প্রথা স্বার্থ প্রণোদিত ও ধর্মের অপব্যাখ্যার ফল।

ফরাসী কবি ও সাংবাদিক মালাবারী বাল্য বিবাহ রোধে কেশবচন্দ্র সেনের পথ অনুসরণ করে যে আন্দো-লন গড়ে তোলেন তার সমর্থন জানান মাক্সম্যুলার। মালাবারী যে আংশিক সাফল্য লাভ করেন তার কিছুটা কৃতিত্ব মাক্সম্যুলারের। একথা স্বয়ং মালাবারী বার বার স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষের নব-জাগরণের প্রত্যুষে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের প্রকাশ ও বক্তৃতা মাধ্যমে মাক্সম্যুলার যে ভাবে ভারতের মহিমা কীর্তন করেন তার প্রভাবে পরাধীন ভারতবাসীরা তাদের হৃত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদের জোয়ার দেখা দেয়। একথা জাতীয়তাবাদী নেতা লোকমান্য তিলক অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ দত্ত মাক্সম্যুলারের নিকট ভারতবাসীর এ ঋণের কথা অকপট চিত্তে স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট হিন্দু ধর্ম তথা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির যে চিত্র মাক্সম্যুলার তুলে ধরেন সে কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেন এই ঋণ ভারতীয় জনসাধারণ কোন দিন শোধ করতে পারবে না।

রাজদ্রোহের অপরাধে তিলক যখন কারারুদ্ধ হন তাঁর মুক্তির জন্য মাক্সম্যুলার বিশেষ চেষ্টা করেন। ইংরাজের হৃদয়হীন শাসন এবং ভারতীয়দের প্রতি চরম অবজ্ঞার প্রতিবাদ মাক্সম্যুলার বহুবার করেছেন। ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসার জন্য তিনি ইংরাজ শাসকশ্রেণীর কাছে বিশেষ অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের প্রতি অনুরাগ ও সেবার জন্য মাক্সম্যুলারকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব দিলে লর্ড সালিসব্যারি ও তাঁর সহকর্মীরা তার বিরোধিতা করেন।

আধুনিক সভ্যতা ও ঐশ্বর্যে গঠিত পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে মাক্সম্যুলার বলেন, যে জাতি এমন দিনেও একজন রামমোহন, একজন কেশবচন্দ্র, একজন মালাবারী ও রামাবাঈ-এর জন্ম দিতে পারে সে জাতি মৃত নয়। এই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—যেমন ছিল তার চার হাজার বছরের গৌরবমণ্ডিত অতীত। স্বামী বিবেকা-নন্দ-এর কথার প্রতিধ্বনি করে এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়—মাক্সম্যুলারের মত এমন অকৃত্রিম ভারতবন্ধু ইউরোপে আজ আর নেই।

নন্দ মুখার্জি

দেশ-বিদেশের কথা

অপুষ্টি দূরীকরণে নতুন প্রোটিনসমৃদ্ধ পাঁউরুটি

বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির পুষ্টির অভাব দূরীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিসহায়ক খাদ্যনীতির যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার সাম্প্রতিকতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সুসমৃদ্ধ ও শক্তিসমন্বিত ময়দা উদ্‌ভাবন। এই ধরনের ময়দা দিয়ে প্রোটিন-সমৃদ্ধ পাঁউরুটি তৈরি করা যায়।

সাধারণ প্রচলিত গমের ময়দার সঙ্গে সয়াবিনের ময়দা এবং ময়দার রূপান্তরণে সহায়ক একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে এই ধরনের ময়দা তৈরী করা হয়। ক্যানজাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গবেষণার ফলে এই ময়দা আবিষ্কৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্ত-র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থানুকূল্যে ঐ গবেষণা কার্য সম্পাদিত হয়। ঐ ময়দা থেকে যে পাঁউরুটি তৈরী হয়, রংয়ে- রূপে-স্বাদে-গন্ধে তা অবিকল জনপ্রিয় সাদা রুটির মত। জনসাধারণের কাছে এর চাহিদাও তেমনি।

তবে প্রচলিত পাঁউরুটির সঙ্গে একটা বিরাট পার্থক্যও রয়েছে। সেই পার্থক্য প্রোটিনের তারতম্যে। এই রুটি শতকরা ১৬·২ ভাগ বেশী প্রোটিন সমৃদ্ধ হতে পারে। পুষ্টির বিচারে রুটিতে এত বেশী মাত্রায় প্রোটিন এর আগে আর দেখা যায়নি। শিশু, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, প্রসূতি আর দিন-মজুরদের পুষ্টির অভাব পূরণে এই রুটির জুড়ি নেই। এরাই সাধারণতঃ অপুষ্টিতে ভোগে। ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি যেসব অঞ্চলে চাল ও অন্যান্য শস্যই হল প্রধান খাদ্য সে সব জায়গায় এই রুটির চাহিদা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। শান্তিসহায়ক খাদ্য কর্মসূচী রূপায়ণে ময়দার পরিবর্তে সয়াবিনের তৈরী এই প্রোটিনসমৃদ্ধ ময়দা সর্বত্র প্রচলিত হওয়ার দিন আর বেশী দূরে নয়।

মরক্কো আর পাকিস্তানে এই রুটি ইতিপূর্বেই পরখ করে দেখা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে ভারত আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই ধরনের শক্তিসমৃদ্ধ ময়দা কিছু কিছু পাঠানো শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, চিলি, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, হণ্ডুরাস, পেরু, নিকারগুয়া, গিয়ানা আর গুয়াতেমালা প্রভৃতি দেশেও এই ময়দা পাঠানো হচ্ছে।

এই ময়দা দিয়ে পাঁউরুটি, বানরুটি, চাপাটি প্রভৃতি যে দেশের যেমন সে-দেশের তেমন খাবার খুব সহজে তৈরী করা যায়।

প্রধান খাদ্যে পুষ্টির উপাদান বর্ধিতমাত্রায় যুক্ত হলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৩ জনই পাঁচ বছরে পা দিতে না দিতেই অকালে প্রাণ হারায়। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে পুষ্টির অভাব। দৈনন্দিন খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিন অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাণের অভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে না। এই অবস্থায় শিশুরা বেঁচে থাকলে বড়দের মতই পুষ্টির অভাবজাত নানা রোগে ভোগে অথবা দেহ ও মনের পুরোপুরি জোর এরা কোনও দিনই পায় না। শিশু সমাজের এই নির্জীবতা দেশের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের এক বিরাট অন্তরায়।

উন্নত দেশের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ডিম, মাংস এবং দুধ প্রভৃতি খায় বলে তাদের প্রোটিনের অভাব কোন দিনই হয় না। কিন্তু উন্নতশীল দেশে এই সব খাদ্যসামগ্রী এমন অগ্নিমূল্য আর দুর্লভ যে, ঐ সব দেশের লোকেরা এই সবের কাছে ঘেঁষতেও সাহস পায় না। কাজেই সেই সব দেশের লোকদের বাধ্য হয়েই অল্প প্রোটিনযুক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসব্জীর ওপরই নির্ভর করতে হয়। ফলে তাদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটতে বাধ্য। উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ভুট্টা এবং গম প্রভৃতি জন্মানো যায় বটে কিন্তু তাতে প্রচুর সময়ের

প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি কম খরচে প্রোটিন উপাদান বাড়াতে হলে মূল খাদ্যবস্তুর সঙ্গে প্রোটিন উপাদান যুক্ত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়নসংস্থার ব্যবস্থাপনায় ক্যানজাস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গমকে ঐভাবেই প্রোটিন-সমৃদ্ধ করা হচ্ছে।

এই কাজের প্রাথমিক দায়িত্ব নেন ডঃ সি সি সেন আর ডঃ উইলিয়াম জে হুভার। এঁরা হলেন ক্যানজাসের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড এণ্ড ফুড গ্রেন ইনষ্টিটিউটের কর্মী। এঁদের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্রচলিত ময়দার সঙ্গে সয়াবিনের ময়দা এবং ময়দায় রূপান্তরণে সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ সোডিয়াম স্টিয়ারওয়ান-২ ল্যাকটিটেট (এস এস এল) মেশানো হয়। ময়দায় এস এস এল মেশানো হলে প্রোটিনের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। অথচ রুটির মান মোটেই কমে না।

আগে তৈলবীজ-জাত প্রোটিন সাদা রুটিতে মাত্রায় বেশী মেশানো হলে পরিমানে রুটি কেবল কমেই যেত না শস্যের খাদ্যগুণও নষ্ট করে দিত। ফলে এই পাঁউরুটি ক্রেতার গ্রহনযোগ্য হত না।

শান্তিসহায়ক খাদ্য কর্মসূচী অনুযায়ী এযাবৎ যে সাধারণ ময়দা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রোটিন ছিল ১১ শতাংশ মাত্র। বর্তমানে তার সঙ্গে সয়াবিনের ময়দা মেশানোর ফলে ঐ ময়দার প্রোটিনের সর্বনিম্নমান দাঁড়িয়েছে ৫২ শতাংশ। শতকরা ৬ ভাগ সয়াবিন ময়দা মেশালে শক্তিসমন্বিত ময়দার প্রোটিন গুন ১৪ শতাংশ বেড়ে যায়, আর শতকরা ১২ ভাগ মেশানো হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮·২ শতাংশে। অতিরিক্ত লাভ এই যে, প্রোটিনে যে এ্যামিনো এসিড রয়েছে সয়াবিনে ময়দা তা গ্রহণের জন্য মানবদেহের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এই এসিড মানবদেহের বৃদ্ধির পক্ষেই খুবই প্রয়োজন।

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাধারণ ময়দা খেলে প্রাণীদেহের যে বৃদ্ধি হয় সয়াবিনের ময়দায় তার চেয়ে সাত গুণেরও বেশী বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

শিশুদের আহার্য হিসেবে এই নতুন ময়দা ভারত আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উভয় দেশেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ঐ দুই দেশে ওয়েষ্টার্ণ হুইট এ্যাসোসিয়েটসের প্রতিনিধিরা শান্তিসহায়ক খাদ্য কর্মসূচীর অফিসার আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। তাঁদের এই কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে রুটি তৈরীর পদ্ধতি ও কৌশলের উন্নতিসাধন। শুধু ভারতের আধুনিক যন্ত্রসমন্বিত রুটির কারখানায় নয় গ্রামের ছোটখাট সাধারণ রুটির কারখানায়ও যাতে তাঁদের এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সে দিকেও তাঁদের নজর আছে।

ফিলিপাইনসে শতকরা ১২ ভাগ সয়াবিন দ্বারা সমৃদ্ধ ময়দা মিশিয়ে বানরুটি তৈরী করে দেখা হয়েছে এই রুটি উচ্চ পুষ্টিকর সম্পন্ন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় থেকে ফিলিপাইন সরকার ১৯৪৭ সালের স্কুলের পুষ্টিবিধান সংক্রান্ত কর্মসূচী রূপায়নে পুরোপুরি এই নতুন ময়দা ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেছেন। এই কর্মসূচী রূপায়িত হলে প্রায় ২০ লক্ষ পুষ্টিহীন শিশু উপকৃত হবে।

যে সব জায়গায় উচ্চপ্রোটিনযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন সেখানে ১২ শতাংশ পুষ্টিসমৃদ্ধ সয়াবিন ময়দার ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। স্কুলের ছাত্রদের জন্য এবং যেসকল শিশু স্কুলে ভর্তি হয়নি তাদের জন্য বিশেষ করে এই আহার্য প্রয়োজন। আর স্কুলবাড়ী নির্মাণ, স্যানিটারি কূপ তৈরী, খামার থেকে বাজার পর্যন্ত রাস্তা তৈরী প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত সেসব মজুরদের কাজের ভিত্তিতে মজুরি হিসেবে খাদ্য দেওয়া হয়, তাদের ৬ শতাংশ পুষ্টি-সমৃদ্ধ সয়াবিনের ময়দার তৈরী রুটি দেওয়া হবে।

শান্তিসহায়ক খাদ্য কর্মসূচী অনুযায়ী উন্নতশীল দেশগুলিতে যে খাদ্য বণ্টন করা হচ্ছে তাতে সম্প্রতি সয়াবিনের সুরক্ষিত ময়দা মেশানো হচ্ছে। উন্নতশীল দেশের জনসাধারণের খাদ্যে পুষ্টির অভাব মোচনের জন্য কতগুলি উচ্চপ্রোটিনযুক্ত স্বল্পমূল্যের খাদ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে শতকরা ৬৮ ভাগ ভুট্টা-সয়াবিনের তেল, সরতোলা দুধ, ২৫ শতাংশ সয়াবিন ময়দা আর শতকরা ৫ ভাগ চর্বিহীন গুঁড়ো দুধ। এই খাদ্য শিশু আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে খুব উপযোগী।

খাদ্য হিসাবে পাঁউরুটির ব্যবহার বিশ্বের নানা দেশে ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। মানুষের এই প্রধান খাদ্য যদি প্রভূত প্রোটিন সমৃদ্ধ হয় তাহলে তার ফল আরও সুদূরপ্রসারী হবে। এতে মানবজাতির অপরিসীম কল্যাণ সাধিত হবে। (মার্কিন বার্তা)।

।। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ।।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৪তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৮১

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিদেশী গুপ্তচরের কার্য্য বৈচিত্র্য

বিদেশী গুপ্তচরেরা কি করে এবং কিই বা না করে? একভাবে যে সকল গুপ্তচর সর্ব্বত্র ঘোরাফেরা করিয়া উচ্চপদস্থ ভারত সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে তাহারা কখন সাক্ষাৎভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা করে, কখনও বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে মধ্যে রাখিয়া পরোক্ষভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্ক সৃজন আয়োজন করে। উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে একই; বন্ধুত্ব করিয়া যাহা জানা যাইতে পারে তাহা জানিবার চেষ্টা। জ্ঞাতব্য বিষয় সামরিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক কিম্বা আভ্যন্তরীণ গুপ্তকথা হইতে পারে। সাক্ষাৎভাবে তাহা জানা না যাইলে মধ্যবর্ত্তী কাহাকেও কোন উপায়ে কার্য্যে লাগাইয়া তাহার মারফতে কথাটা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বিশ্বের প্রায় সকল জাতিই অন্যান্য দেশে কিছু কিছু গুপ্তচর রাখিয়া থাকেন; এই সকল গুপ্তচর নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। কোন কার্য্য হইল শুধুই নিজ জাতির প্রতি অপর জাতির বন্ধুভাব অথবা শ্রদ্ধা জাগ্রত করিবার চেষ্টা। যথা অনেক জাতিই ধর্ম্ম প্রচারের আয়োজন করিয়া অন্য দেশে প্রচার কেন্দ্র অথবা "মিশন" প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রচার করিলেই বহু চেলা ও ভক্ত জুটিয়া যায় এবং এই সকল ধর্ম্মভাবআকৃষ্ট ব্যক্তি, যাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথায় অনেক কিছুই করিতে প্রস্তুত থাকেন। ধর্ম্মের প্রসার অথবা ধর্ম্ম সংরক্ষণ হেতু কখন কখন অনেক দুষ্কার্য্যও করাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন ভক্তকে শিখাইয়া পড়াইয়া কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করিবারও ব্যবস্থা করিতে গুপ্তচর ধর্ম্মযাজকগণ চেষ্টা করিতে পারেন। যথা ধরা যাউক জননেতা অমুককে সরাইয়া দিতে পারিলে গুপ্তচর নিয়োগকর্ত্তা জাতির আন্তর্জাতিক "পলিসি" বা মতলব হাসিল হওয়া সহজ হয়। সুতরাং ধর্ম্মপ্রচারক গুপ্তচরগণ একজন অমযুক্ত

ভক্তকে ক্রমাগতই বুঝাইবেন যে অমুককে সরাইয়া দিলে ধর্মরক্ষা সরল ও সহজ হইবে। এই ভক্তের নাম তমুক ধরা যাউক। অপর কোন গুপ্তচর এখন তমুকের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিবে ও তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে তাহার দেশের আদর্শের ও ধর্ম সংরক্ষণের বিশেষ সুবিধা হইবে যদি অমুককে সরাইয়া দেওয়া যায়। তমুক ক্রমে ক্রমে অমুক বিনাশ কার্য্যকে একটা মহান আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইবে এবং এই দ্বিতীয় গুপ্তচর কোন সময় তমুককে হত্যা কার্য্যের সাধন সুবিধার হাতিয়ার প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। অতঃপর একদিন কোন সভা সমিতিতে অথবা পথে গমনকালে তমুক যাইয়া অমুকের উপর গুলী চালাইবে এবং এইভাবে গুপ্তচর নিয়োক্তা জাতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি, নিগ্রো জননেতা মার্টিন লুথার কিং, অথবা মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকার্য্য যাহারা যেভাবে সাধিত করিয়াছিল তাহাতে আন্ত-র্জাতিক কাহারও কিম্বা দেশের ভিতরের কোন গোষ্ঠী বা দলের অপচেষ্টা কতটা ছিল কিম্বা ছিলনা তাহা অনু-সন্ধানের বিষয়। এখনও যে সকল গুপ্তচর নানাদেশে নানাপ্রকার ভেক্ ধরিয়া নিজেদের অপকর্ম করিয়া চলিয়াছে তাহারা কোথাও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিতেছে কিনা তাহাও গভীর ভাবনার বিষয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল গুপ্তচর আছে তাহারা নানাদেশে নানাপেশা অবলম্বন করিয়া নিজে-দের কার্য্য চালাইয়া চলিয়া থাকে। কেহ কেহ কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলিয়া নিযুক্ত এবং তাহারা যে কার্য্য করে সেইকার্য্যে সবিশেষরূপে পারগ। যথা অনেকে চিকিৎসক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক অথবা যন্ত্র-বিশারদ বলিয়াই অন্য দেশে নিযুক্ত আছেন। ইহারা নিজ নিজ কার্য্য প্রকাশ্যে যথাযথভাবে চালাইয়া চলে এবং গোপনে কার্য্য করে খবর সংগ্রহের অথবা অন্ত-র্ঘাতক লোকেদের আমেরিকার মতলব অনুযায়ী পথে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে। কোন কোন আমেরিকান শিল্পকলা কার্য্য লইয়া থাকে কিম্বা যে দেশে আছে সেই দেশের প্রচলিত রীতিনীতি অনুকরণ করিয়া চলিবার অভিনয়ে সুদক্ষভাবে পারদর্শী। অর্থাৎ খৃষ্ট-ধর্ম ত্যাগ করিয়া বহু সময়ে তাহারা বৌদ্ধ, হিন্দু অথবা মুসলমান সাজিয়া ঘোরাফেরা করে। শুনা যায় এক সময় বহু আমেরিকান গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া ভিয়েতনামে বৌদ্ধভিক্ষু সাজিয়া জনসাধারণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন চেষ্টা করিত। এবং পরে ঐ সকল ভিক্ষু-গণই সন্ন্যাসের সাজ ছাড়িয়া সৈনিকের উর্দি পরিধান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা হইয়া অবতীর্ণ হয়। ভিক্ষুর বেশে আমেরিকানগণ সর্বত্র যাতায়াত করিতে সক্ষম ছিলেন। এবং তাহাদের ভিয়েটনাম দেশের অলি-গলি পথঘাট সবই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। যখন তাহারা যুদ্ধ করিতে নামিয়া পড়িল তখন তাহাদের কোন কিছুই অজানা অচেনা ছিলনা। আমেরিকানগণ এইভাবে বহু দেশে পুরোহিত ইত্যাদি হইয়া দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহারা নানাভাবে বিদেশের সমাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও কিছু কিছু আমেরিকান নানাপ্রকার ছদ্ম পরিচিতি ও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ ভারতীয়দিগের সহিত সহযোগে মন্দির নির্মাণ ও পূজাপার্ব্বণ অনুষ্ঠান ইত্যা-দিও করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সকল উপায় অবলম্বনে ইহারা অল্পবুদ্ধি ও অল্পবয়স্কগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর ইহারা কি করিবার চেষ্টা করে তাহা সঠিক বলা যায় না।

অপর দেশে গিয়া তাহাদের দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কারাদির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এবং সাধারণ মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া যাহা সাধন করা যায় তাহা কোন দেশের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক হইতে শ্রেষ্ঠ স্তরের মানুষের সহিত সখ্য স্থাপনের সহিত তুলনীয় হইতে পারেনা। সকল দেশেই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইলে,

যাহাদিগকে দিয়া সেই কার্য্য সাধিত হইবে তাহাদেরও জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। গুপ্তচরদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার থাকিতে পারে কিন্তু একসঙ্গে যেখানে অনেক ব্যক্তি কাজ করে সেখানে বহু সংখ্যক শিক্ষিত গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া রাখা সহজ নহে। বিদেশে গিয়া বিজ্ঞান, শিল্প-কলা প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গঠন ও স্থাপন করিয়া বিদেশের ধীমান ব্যক্তিদিগকে নিজেদের অনুগত করিয়া লওয়া অতি কঠিন কার্য্য। ইহা কঠিন এই জন্যই যে যাহাদের বুদ্ধি ও শিক্ষা অধিক তাহারা সহজে কোন অপর জাতীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সখ্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েনা। তাহারা গুপ্তচরের কার্য্য কেহ করিলে তাহাদের মতলব ও অভিসন্ধিও সহজেই বুঝিয়া ফেলে। সুতরাং গুপ্তচরেরাও শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সহিত সংস্রবে আসিতে চায়না। অল্পবুদ্ধি ও স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিতই গুপ্তচরদিগের মেলামেশা সহজ ও লাভজনক হয়। কার্য্যসিদ্ধিও সহজ হয় এবং ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে অল্প। এই সকল কারণেই গুপ্তচরমহলে উচ্চ শিক্ষা ও দর্শন বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ কেহ নড়ে-চড়ে না। যতদূর সম্ভব সাধা-রণের চলিত জীবনযাত্রার সহিতই মেলামেশা ও সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা করা হয়। সেই পরিবেশেই নিরাপদে অবস্থান ও মতলব হাসিল সহজ হইবার অধিক সম্ভাবনা। দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া অতি সাধারণ সামাজিক সং-স্কারের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া ও থাকা যে বেশএকটা অর্থহীন ব্যাপার তাহা বুঝিলেও লোকে বুঝিতে চাহেনা। উহা যে সন্দেহজনক ব্যাপার তাহাও অনেকে বুঝিয়া অনুসন্ধানের চাকু চালাইয়া ভিতরের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। বিশেষ কিছু ফল হয় বলিয়া মনে হয় না। চেষ্টা হয়ত কিছু কিছু হয়।

অর্থনীতির ক্রম অবনতি

ভারতের আর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া এখন সম্পূর্ণ অচল অবস্থার দিকে অগ্র-সর হইতেছে। অর্থাৎ সরকারী খরচা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে, রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর কঠিন হইতেছে। দেশবাসীর আয়ের তুলনায় তাহাদের শাসক-দিগের খরচের ফিরিস্তি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে এবং ভোগ্য বস্তু উৎপাদন-বৃদ্ধির গতিবেগ দ্রুততর না হইয়া মন্দগতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলে দেশের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চলিতে থাকিলেও সেই অনুপাতে উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে না। রাস্তা, পথঘাট, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদির অভাব ক্রমশঃ কঠোর-ভাবে অনুভূত হইতেছে। খাদ্য যথেষ্ট নাই, বস্ত্রও নাই, চিকিৎসার ঔষধ নাই, পাঠের পুস্তক বা লিখিবার খাতাকাগজ নাই। ইহার উপরে গৃহনির্ম্মাণের জন্য যে ইস্পাত, সিমেণ্ট আবশ্যক তাহা দুষ্প্রাপ্য এবং অতি দুর্ম্মূল্য। ইষ্টক পূর্ব্বে যেখানে ৫০।৬০ টাকা হাজার দরে পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য হইয়াছে ২০০শত টাকা। চুন, বালি, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতিও পাওয়া অত্যধিক মূল্য দেওয়ার হিসাবে পড়িয়াছে। যদি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কথায় আসা যায় তাহা হইলে দেখা যায় উনান্ ধরাইবার কয়লা সরবরাহ সরকারী হস্তে যাওয়ার পরে কয়লার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। কেরোসিন তেল লাইন দিয়া দাঁড়াইয়া বহুকষ্টে আহরণ করিতে হয়। গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি এই আছে ত' এই নাই ভাবে—প্রায়ই পাওয়া যায় না। মূল্যবৃদ্ধিত হইয়াইছে। সাবান, তৈল ইত্যাদি মহামূল্যবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক টাকার সাবানের মূল্য হইয়াছে আড়াই টাকা এবং তৈল হইয়াছে চার-পাঁচ টাকা হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া ১৫।১৬ টাকা। চা, চিনি, পান, সুপারি প্রভৃতিও আগডালে উঠিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় কোন কিছুই সহজলভ্য নহে। মূল্য এবং সরবরাহ, কোনও দিক দিয়াই। চাকুরী ও উপার্জ্জনের ক্ষেত্রেও সরকারী প্রতিশ্রুতি মত কোনও কিছুই ঠিকমত হয় নাই। লোক-সংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে চাকুরীর সংখ্যা সেইভাবে বাড়িতেছে না। উপার্জ্জনের পথও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে এবং জনসাধারণের রোজগার ক্রমে ক্রমে হ্রাসই হইতেছে।

বাড়িতেছে সরকারী খরচ। সামরিক ব্যয় না হয় বাড়িবেই, কেননা দেশরক্ষার ব্যবস্থা কোনমতেই ঢিলা হইতে দেওয়া যায় না। কিন্তু নানাপ্রকার বিভাগ সৃষ্টি করিয়া এবং যে বিভাগগুলি আছে সেইগুলির খরচা বাড়াইয়া যে অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে তাহা সীমিত করা হয়না কেন? সরকারী দফতর ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে গমন করিলে মনে হয় না যে সকল বেতনভোগীরই অনেক কাজ আছে। মনে হয় যে অনেকেরই কোন কাজই নাই অথবা থাকিলেও অতি অল্পই আছে। অর্থাৎ সরকারী বিভাগগুলির লোকসংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব এবং করা আবশ্যক। অনেক বিভাগ আছে যাহার কার্য্যকলাপ যথাযথভাবে জনহিতকর নহে। কোন কোন বিভাগ চলে আমলাদিগের সুবিধার জন্ত এবং সেই কারণে ঐ সকল বিভাগ শুধু সরকারের জনাপ্রিয়তা নষ্ট করে, বিরাট আকারের বিভাগ রাখিয়া শাসকদিগের কোনও বিশেষ সুবিধা বা লাভ হয়না। এই সকল বিভাগের কার্য্যকলাপ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া সেইগুলির পুনর্গঠন ব্যবস্থা করিলে ব্যয়লাঘব এবং কার্য্যব্যবস্থার উন্নতি উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে। মনে হয় যে সরকারী সকল খরচ কমাইবার চেষ্টা করিলে যদি শতকরা দশ কিম্বা পনের টাকা কমান যায় তাহা হইলে সেই কার্য্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিতে পারিলে মোট ৪০০।৫০০ শত কোটি টাকা খরচ বাঁচান সম্ভব হইতে পারে। এই অর্থ যদি ভোগ্যবস্তু উৎপাদন কার্য্যে লাগান হয় তাহা হইলে তাহার ফল বিশেষভাবে জনমঙ্গলকর হইবে বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন বস্তুর উৎপাদনবৃদ্ধি দেশবাসীর সুখসুবিধার জন্ত একান্তভাবে আবশ্যক কিন্তু সেই সকল বস্তুর তালিকা দীর্ঘই হইবে এবং সকল কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ৪০০।৫০০ শত কোটি টাকায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। অন্য উপায় হইল ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা করা এবং তাহা করিতে হইলে ব্যক্তির উপর সরকারের অলৌকিক শোষণ চেষ্টা ও আমলাদিগের উপদ্রব ও জুলুম হ্রাস করিতে হইবে। নতুবা ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রচেষ্টা বৃদ্ধি হইবে না।

দেশ আগে না দল আগে

মানুষ যখন নিজের পরিবারের সহিত নিজের গৃহে বাস করে তাহার তখন যে মনোভাব সর্ব্বব্যাপ্তভাবে অন্তরের অনুভূতিকে সজীব করিয়া জাগ্রত রাখে সে অনুভূতি ও মনোভাব তাহার নিজের পরিবারকেই কেন্দ্র করিয়া জীবন্ত থাকে। সে যদি পরে কখনও সকল গ্রামবাসী অথবা পাড়ার সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া কোনও কিছু করিবার জন্ত উদ্যোগী হয় তাহা হইলে তাহার মনোভাব একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র পাইয়া আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে। সে তখন পরিবার বিশেষের অঙ্গমাত্র আর থাকে না; তাহার স্বরূপ তখন গ্রাম বা পাড়াকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর আকার ধারণ করে। সেই মানুষই গ্রাম বা পাড়াকে অতিক্রম করিয়া জেলা, প্রদেশ, রাষ্ট্র অথবা দেশকে অবলম্বন করিয়া আরও অধিক প্রসারিতরূপ ধারণ করিতে পারে. সেই বিস্তৃতি ভাষা, ধর্ম বা জাতির ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইলে তাহা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করিতে পারে। মানুষ কি ভাবে ও কিসের সঙ্গে জড়িত করিয়া নিজেকে দেখিবে তাহা অবস্থা অনুসারে পরিবর্তন লাভ করে। সে যদি ভাবে আমি অমুকের পুত্র ও অমুকের পিতা তাহা হইলে তাহার নিজত্ববোধ সীমিত আকার ধারণ করে ও সে একটা বিশেষ পরিবারের মানুষ বলিয়াই সমাজে চলিবে মনে করে। সেই একই মানুষ অবস্থান্তরে তাহার নিজত্বকে অন্য অন্য রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। সে ভাবিতে পারে সে হিন্দু, বাঙ্গালী, ভারত-বাসী বা অপর কিছু। তাহার চরিত্রের বহুরূপ। সেই সকল রূপের মধ্যে কোনটি কখন প্রকটভাবে ব্যক্ত হইবে তাহা অবস্থা অনুসারে স্থির নির্দিষ্ট হয়। ভারতবাসী অথবা হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে ব্যক্তি-বিশেষের গোষ্ঠীতে বহুকোটি মানুষ আসিয়া পড়ে; কিন্তু উহা অপেক্ষাও সুদীর্ঘ বিস্তৃত পরিচিতির দাবী পেশ করা যাইতে পারে যথা যদি কেহ বলে যে সে এশিয়া-বাসী অথবা বিশ্ব মানবজাতীর মানুষ তাহা হইলে তাহার সঙ্গে জুটিয়া যায় কয়েক লক্ষকোটি একরূপের দাবী।

বর্তমান কালে কোন মানুষের পক্ষে মানবতার দাবী করাও অস্বাভাবিক হয় না। যে সকল মানুষ জীবিত আছে এবং যাহারা পূর্ব্বেই ধরাধাম ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর খেলা শেষ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন; সকলকেই মানব হিসাবে দলে টানা যাইতে পারে। তাহা হইলে মানবগোষ্ঠী সহস্র সহস্র কোটিতে গিয়া দাঁড়ায়।

সেই অসংখ্য ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ও দৈহিক আকৃতির জনগণ গঠিত, সময়ের ক্রোড়ে সুদীর্ঘরূপে বিস্তৃত মানবকাহিনীর আরম্ভ কোথায় ও তাহা শেষই বা হইবে কখন ও কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এই কথাই শুধু বলা যায় যে মানবজাতি বহু বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছে ও করিতেছে। তাহা ভবিষ্যতে অনন্ত শূন্যপথে দূর দূরান্তরে অপরাপর গ্রহ ও নক্ষত্রজগতে বিস্তৃত হইবে কি না তাহাও বিবেচনার বিষয়। ইহা হইল তাহার জীব-দেহধারী অস্তিত্বের ভিতরের মূল গুণাগুণ নিবিষ্ট ঐক্যের কথা। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যও আছে আকৃতি প্রকৃতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রকমের অনেকানেক। ইহার ভিতরের কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে মানুষ যেরূপ পরস্পরের সহিত একজোট বা মিলিত হইয়া থাকিতে চাহে, সেইরূপই সে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের ও নিজের একান্ত নিকটের লোকের সহিতই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র গণ্ডি গঠন করিয়া নিজ বৈশিষ্ট্যকে জোরাল করিয়া রাখিতেও আগ্রহশীলতা প্রদর্শন করে। দেশ ও জাতিগত বিরাট সমষ্টির সম্প্রদায় সৃজন করিলেই দেখা যায় যে মানুষ সেই বিরাট সংঘের মধ্যে নানাপ্রকার বিভাগ ও বিভেদ খাড়া করিতেছে। এই সকল বিভাগের মধ্যে কেহ কাহারও সঙ্গে এবং অন্য কেহ অপরের সহিত বিরুদ্ধতায় রত। অর্থাৎ যেখানেই বৃহৎ সমষ্টি ও বহু মনুষ্যের একত্র থাকা সম্ভব হয় সেইখানেই ও সেই সঙ্গেই তাহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাখা প্রশাখা গড়িয়া উঠে। সেই-গুলি গঠিত হয় নানা প্রয়োজনে, বিভিন্ন আবেগের ফলে ও বহুধারায় প্রবাহিত প্রেরণার টানে। সমষ্টির শাখা সমষ্টি, জাতির শাখা জাতি, দলের অঙ্গ ক্ষুদ্রতর দল ইত্যাদি সকল সময়ই গড়িয়া উঠে।

এখন কথা হইতেছে যে বৃহত্তর আদর্শ বা উদ্দেশ্যজাত যে বৃহত্তর সমষ্টি তাহাকে রক্ষা করা অধিক প্রয়োজন; কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে ক্ষুদ্রতর মতলব হাসিল করিবার আগ্রহে মানুষ বড়কথাটা ভুলিয়া বসিয়া থাকে। ছোট ছোট সুবিধার অনুসরণে সে গিয়া পড়ে এমন পারম্পরিক সংঘাতের আবর্ত্তে যাহাতে মহত্তর বিরাটতর অভিপ্রায় সে বিস্মৃত হইয়া বসিয়া থাকে। যথা আমরা প্রায়ই দেখি যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দলগুলির শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় অনেক সময়েই দলপতিগণ এমন কার্য্য করিতেছেন যাহাতে জাতির নৈতিক প্রতিষ্ঠা আহত হইয়া বিশ্বের দরবারে দেশের সুনামের হানি হয়। দলের প্রতিষ্ঠা যথাযথ ভাবে সবল রাখিবার জন্য রাষ্ট্রনেতাগণ নানাপ্রকার অন্যায়ের আশ্রয়ে দলের লোক-বল ও অর্থবল বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, এবং অপর দলগুলির শক্তি যাহাতে হ্রাস করা যায় সেই জন্য নানা মিথ্যা আচরণ ও অপপ্রচার করিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করা হয়, অর্থাৎ সুনীতির পথ বর্জ্জন করিয়া দুর্নীতি অবলম্বনে অগ্রগমন করিতে গিয়া দেশের ও জাতির চরিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা মানব সভ্যতা ও সমগ্র জাতির উন্নতি ও প্রগতির দিক দিয়া কতটা ক্ষতিকর সে কথা রাষ্ট্রীয় দলের নেতা ও কর্মীগণ সর্ব্বদা মনে রাখিতে চাহেন না। ইহার ফলে দেশের ও জাতির অন্যায়, অধর্ম ও পাপকার্য্যের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইতে আরম্ভ করে ও সকলেই সেই সৎ ও দুর্ বিভেদের অনস্তিত্ববাদে আসিয়া পড়ে যেখানে কোনও পাপই আর পাপ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। রাষ্ট্রীয় দলকে সবল করার জন্য সকল উপায়ই অবলম্বন করা ন্যায্য; তজ্জন্য কোনও মিথ্যাই বর্জ্জনীয় নহে, কোনও ঘৃণনীয় কার্য্যই করিলে দোষ হইবে না এবং নরহত্যা, উৎকোচ গ্রহণ, অপরাধীকে শাস্তি হইতে রক্ষা করা ও প্রবঞ্চকের সমর্থন করা রাষ্ট্রনীতির সরল পন্থা অনুসরণ বলিয়াই

লাভ হইবে। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন যে দেশের পক্ষে কতটা অনিষ্টকর ও জনমঙ্গলবিরুদ্ধ তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে দেশের বহু বুদ্ধিমান ও জনপ্রিয় নেতা ঐরূপ ভাবে কর্মক্ষেত্রে সকল অন্যায়কেই মানিয়া লইতে কোনও দ্বিধা প্রদর্শন করিতেছেন না। ন্যায়বানতার যে খ্যাতি তাহা অর্থ দিয়া ক্রয় করা যায় না। অন্যায়বোধহীনতা দোষও কোনও উপায়ে নাকচ করিয়া দেওয়া যায় না।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধ

ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সভ্য জগতের একটা সর্বজন স্বীকৃত সম্মানজনক পন্থা। পরের চাকুরী করা অপেক্ষা নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ক্রয়-বিক্রয়াদি করিয়া উপার্জনের ব্যবস্থা করা অধিকভাবে মানুষকে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে সাহায্য করে। ইহা ব্যতীত ব্যবসাতে যদি কোনও অন্যায় উপায় অনুসরণ না করিয়া কেহ সুনীতিগত রীতি অনুসরণ করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথ খুলিয়া গিয়া মানুষকে অধিক হইতে অধিকতর উপার্জন করিতে সক্ষম করে এবং সেই উপার্জন বৃদ্ধির কোন সীমা থাকে না। যাহারা ব্যবসাতে সুনীতির পথ ছাড়িয়া অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত লাভ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের সুখ সুবিধা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহার কারণ এই যে ব্যবসায়ীগণ যাহাই করুন না কেন, সকলেই চাহেন যে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোনও শঠতা কিম্বা প্রবঞ্চনার আবির্ভাব যেন কোন সময়েই না হয়। সুনীতি অনুগমন ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ নানা কারণে সকল সময়ে সুনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে সক্ষম হ'ন না। ইহার মধ্যে যে সকল কারণ প্রায়ই অপ্রত্যভাবে প্রবল হইয়া উঠে তাহার আলোচনা করিলে বিষয়টা কিছু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ধরা যাউক কোন ব্যবসাদার মাল সরবরাহের অথবা ঠিকাদারের কার্য্য করিতে চাহেন। এই কার্য্যে সক্ষম হইতে হইলে তিনি বুঝিবেন যে তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবঞ্চনা ও উৎকোচ দান প্রভৃতি করিতে হইবে নতুবা তিনি ঐ কার্য্যে সফলতা কোনও রূপেই আহরণ করিতে পারিবেন না। সরেস মাল নমুনা হিসাবে দেখাইয়া পরে সরবরাহের ভার পাইলে পরে নিকৃষ্ট মাল চালাইয়া দিয়া অতিরিক্ত লাভ করিয়া সেই বাড়তি লাভের টাকা দিয়া ক্রেতার পক্ষের নানান ব্যক্তিকে উৎকোচ দিয়া খুশী করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ না করিলে কোন সরবরাহের কার্য্য পাওয়া কঠিন হইবে। মালের গুণাগুণ, তাহার পরিমাণ, ওজন, মিশাল প্রভৃতি নানা কথাই এই কার্য্যে সর্বদাই উঠিয়া থাকে।

মাল যাহারা নিজ কারখানায় উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করেন তাঁহারা পূর্ব্ব উল্লিখিত বাধা বিপত্তি ব্যতীত আরও নানা প্রকার প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইয়া থাকেন। যথা কারখানায় শ্রমিকদের সহিত দেনা পাওনা লইয়া দর কষাকষি। অনেক সময় মজুরির খরচা অতিরিক্ত হইয়া যাইলে ব্যবসায়ী বাধ্য হইয়া নানা প্রকার অন্যায়ের আশ্রয়ে একদিকের লোকসান অপরদিকের অন্যায় লব্ধ লাভ দিয়া পূরণ করিয়া লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীর যদি কারখানা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে কাঁচামাল পাইতে, মাল আনা-পাঠানোর রেলওয়াগণ পাইতে, কয়লা পাইতে, কারখানা পরীক্ষকদিগকে, আয়কর, বিক্রয়কর প্রভৃতির কর্মচারীদের খুশী রাখিতে, আমদানী মাল ছাড়াইতে ও নানা স্থলের নানান ঘাটোয়ালদিগের নেক নজরে থাকিতে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। শ্রমিকদিগকে খুশী রাখা অনেক সময়েই মাস্তান দলপতিদিগকে খুশী করার কথায় দাঁড়ায়। ইহার সহিত শ্রমিক নেতাদিগের সংযোগ থাকিবেই এবং খরচ উভয় থাকেই হইবে ধরা যাইতে পারে। বিভিন্ন বিভাগীয় রাজকর্মচারীদিগের উপস্থিতির কথা ত আছেই এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের দিকে রাখাও আবশ্যক। সুতরাং ব্যবসা, বাণিজ্য করা যতটা সহজ ও সরল বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আসলে ঠিক তাহা হয় না। সরকারী

বেসরকারী নানা প্রকার কর্ণধারগণ কার্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়েন এবং তাঁহাদিগের যথাযথভাবে মন জোগাইয়া রাখিয়া তবেই ব্যবসায়ী অগ্রগমনে সক্ষম হইতে পারেন। ইহাই ব্যবসার পূর্ণ কাহিনী নহে। ব্যবসা করিতে যাইলেই মূলধন ও খরচের জন্য টাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। মূলধন তোলার নানান ব্যবস্থা ও আয়োজন আছে। তাহা যথাযথভাবে করা ব্যয় ও চেষ্টাসাধ্য। খরচের টাকা সচরাচর ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া যায়। তাহার ব্যবস্থাও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদিগের অভিরুচির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এখানেও বিলি ব্যবস্থার কথা উঠিতে পারে। অর্থাৎ ব্যয়ের কথাও উঠা সম্ভব হইতে পারে।

ব্যবসা বাণিজ্য তাহা হইলে শুধু ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন, চালান, সরবরাহের কথাই নহে। তাহার সফলতার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন নানান ব্যক্তির, সরকারী বিভাগের ও সুপারিসকারীর সহায়তার। এই সহায়তা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি সহায়তার স্থলে বিরুদ্ধভাব সক্রিয় হইয়া দেখা দেয় তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ব্যবসাদারকে এই দফতর হইতে ঐ দফতর, এই মুরুব্বির নিকট হইতে ঐ মুরুব্বির নিকটে, এই দলপতির শিবির হইতে অপর কোনো দলপতির শিবিরে ছুটাছুটি করিয়াই দিন কাটাইতে হইতে পারে এবং এই সকল পূজার ভোগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতেই ব্যবসার লাভের গুড় দেবসেবাতেই নানান মন্দিরের পিপীলিকাদিগের খাদ্যেই পূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া যায়। এই সকল কারণ থাকার জন্যই আজকাল ক্রমে ক্রমে কেহ আর স্বাধীন ব্যবসাতে হাত লাগাতে প্রস্তুত থাকিতেছেন না। ব্যবসার স্বাধীনতা আমলাতন্ত্রের সর্বগ্রাসী জঠরাগ্নিতে যে কোথায় পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে তাহার কোন পাত্তা পাওয়াই আর সম্ভব হইতেছে না। যে ব্যবসাতে হয়ত দশ হাজার টাকাও লাভ হয় না তাহার দরজায় নোটিশ, সমন, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, সার্টিফিকেটের ভিড়ে ব্যবসার পরিচয়ের আকর আর কেহ খুঁজিতেই পাইবে না। ইহা ছাড়াও আছে এই ধর্ম সেই ধর্ম ভাঁওতা, প্রয়োজনের অনন্তব্যাপী কিরিকিরির সুদীর্ঘ উপস্থিতি আরও কত কিছু, যাহার ক্রিয়াকর্ম যথাযথভাবে শেষ করতে দস্তুরমত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। উকিলের পরামর্শ ত লইতেই হইবে সদা সর্বদাই কারণ সরকারী নিয়মকানুন রীতিপদ্ধতি চির পরিবর্তনশীল ও তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। নিয়ম ও নির্দেশের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সকলেই নিমজ্জমান, সেই জলস্রোতের সফেন বুদ্বুদমালার ভিতর লুক্কায়িত স্বর্ণকণিকা যাহাদিগের চোখে লাগিয়া যায় তাহারা সাধু নহে এবং তাহাদের সেবাই সকল চেষ্টার লক্ষ্য বলিয়াই ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এখন সকলে স্বীকার করিয়া থাকে।

কল্পনার অনন্ত যাত্রা

কল্পনা সকল সময়েই অসীমের অজানা অচেনা পথের যাত্রী। বাস্তবে যাহা দেখা যায় না, যে ঘটনা ঘটিতে পারে না, যে মিলন বা বিচ্ছেদ, যে সংঘাত বা সংগতি অসম্ভাব্য, সেই সকলই কল্পনার মায়াস্পর্শে মানসক্ষেত্রে রূপধারণ করিয়া জীবন্ত জাগ্রত হইয়া উঠে। কল্পনা সকল রসের সৃষ্টিতেই সক্ষম। সুন্দর, কদর্য্য, রম্য, আদরণীয়, সুরছন্দমাধুর্য্যময়, বিকট প্রলয়ংকরী-সকল কিছুই কল্পনার শক্তি প্রয়োগে সম্ভাব্যের মধ্যে আসিয়া উদ্‌গত হইতে পারে। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে যাহাই খাড়া করা যাইবে তাহাই সৃজন কার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে এমন কথা কেহ স্থিরনিশ্চয়ভাবে বলিতে পারে না। কষ্টকল্পিত বস্তু বা ঘটনা এমনও হইতে পারে যাহা কাহারও নিকট গ্রহণীয় বলিয়া আদৃত হইবে না। আবার বহু অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া কল্পনা এমন সৃজন সাধন করিতেও পারে যাহা হইতে পারে না জানিয়াও মানুষ তাহা সাগ্রহে গৃহীত ও বরিত হইতে দিয়া থাকে। হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত উঠাইয়া লইয়া এক লম্ফে সিংহলে পৌঁছান। রাবণের দশমুণ্ড অথবা নৃসিংহ অবতারের বিচিত্র রূপ সকলই কল্পনার অসম্ভব সৃজনক্ষমতার নিদর্শন। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রে কল্পনা যাহা করিয়াছে তাহাতে মানব-মন এমন কিছুই পাইয়াছে যাহা

যাহা তাহার রস অনুভূতির ও মহান উপলব্ধির প্রাণ প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে। শিশুবেলার গল্প, বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতিও মানবমনকে গতিশীল করিয়া আকাঙ্ক্ষিত অনন্তের সুদূর প্রান্তে গমন করিতে সক্ষম করিয়াছে এবং সেই হেতু ঐ সকল কাল্পনিক কাহিনী সকলের নিকট চিরআদৃত ও উপভোগ্য রহিয়াছে। যাহা রাগ সঞ্চার করে অথবা যাহা প্রীতি অভিলাষ লোভ ইত্যাদি জাগ্রত করে সেইরূপ মনোভাবসৃজনকারী কাল্পনিক কাহিনীর আকর্ষণী শক্তি থাকে বলিয়া সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু যে সকল কল্পনা সরল ও সুরঞ্জিত ভাবে কোনও কিছুই সাজাইয়া গুছাইয়া উপস্থিত করিয়া মানবমনকে রস অভিভূত করিতে পারে না সেইরূপ কল্পনার রসজ্ঞমহলে কোনও মূল্য থাকে না। বিরুদ্ধ রসের একত্র সমাবেশ করিয়া রসভঙ্গকারী যে কল্পনা তাহাও সৃজনশীল নহে, তাহা হয় ধ্বংসকারী কল্পনার সৃজনশীল ব্যবহার দ্বারা যে চরিত্র ও ঘটনা সমাবেশ করা হয় সেই সকল চরিত্র চিত্রন ও যাহা ঘটে তাহার সকল অঙ্গের ছন্দবদ্ধতার রক্ষা যথাযথ রূপে করিতে পারিলে। চরিত্র চিত্রনে যদি পরস্পরবিরোধী রেখা ও রঙএর আবির্ভাব হইতে থাকে, বিপরীত ভাবের সংঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহা হইলে সে কল্পনা-জাত যাহা কিছু চিত্রিত হয়, সকলই উদ্ভট হইয়া দাঁড়ায়। ঘটনার ক্ষেত্রেও এরূপ কিছু ঘটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যাহা না ঘটাইলে রসসৃষ্টি সহজ ও সরল পথে চলিতে পারিত। যাহা ঘটিল তাহা না ঘটিলেই রসসৃষ্টির সকল আদর্শ পূর্ণ রক্ষিত হইত।

বর্তমানকালে সকল সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাস ও গল্প লিখিত হইতেছে সে সকল সমস্যা-গুলি লেখক পাঠক সকলেরই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ লেখকগণ যেসকল চরিত্র সৃজন করিয়া সমস্যাগুলির রূপায়ন চেষ্টা করেন, অনেকক্ষেত্রেই সেই সকল কল্পনাজাত চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত হইয়া অসম্ভবের কোঠায় গিয়া পড়িয়া থাকে। উচ্চ শিক্ষিত যুবক এম, এ, পাশ করিয়া বাঁদর নাচাইয়া দিনগুজরান করিতেছে ও পরে তাহার হাতে শিখান বাঁদরটি অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করিয়া তাহার প্রচুর অর্থোপার্জনে সাহায্য করিতেছে—গল্প হিসাবে কল্পনার উচ্চ শিখরের উদ্ভাবনার উদাহরণ হইলেও আজগুবি গল্প বলিয়াই চলিবে মনে হয়।

সমস্যার কাহিনী বাদ দিয়া যদি এমনি সাধারণ কাহিনীর বিষয় উদ্ভাবনার কথা লইয়া আলোচনা করা হয় তাহা হইলেও দেখা যায় যে অতি প্রাচীন উপাখ্যা-নের মধ্যে প্রেরণার অনুসন্ধান করিয়াও সেই প্রেরণাকে আধুনিক সজ্জায় ভূষিত করিয়া যাহা সৃষ্টি করা গিয়াছে তাহাও উদ্ভট কল্পনার চরমে পৌঁছায়। পরমা সুন্দরী উচ্চ বংশের কন্যা স্বয়ংবরা হইবার ব্যবস্থা করিতেছেন লটারী করিয়া। টিকিট বিক্রয়কালে দেখিয়া লওয়া হইতেছে যে যাহারা টিকিট ক্রয় করিতেছেন তাঁহারা অবিবাহিত ও অপরভাবে বিবাহযোগ্য ব্যক্তি কি না। কষ্টকল্পনা ও বক্র দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ আরও অনেক দেখা যায়। কিন্তু তাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রক্ত করবী : রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঋতুপর্যায়ে যেমন মাঝে মাঝে ঘটেছে পালা-বদল তাঁর নাট্য প্রবাহেও তেমনি ঘটেছে ধারা-বদল। কখনো রঙ্গনাট্য, কখনো প্রহসন, কখনো গীতিনাট্য। কিন্তু রূপক ও সাংকেতিক নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই—দৃষ্টান্তরহিত।

'রক্ত করবীর' আবির্ভাব যে যুগে রবীন্দ্রনাথ তখন শিল্পসাধনার ঊর্ধ্বক্রম অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ় ও প্রজ্ঞা-সমাসীন। প্রেয়-শ্রেয়, রূপ ও অরূপ, রস ও লীলা, তাঁর সুচিক্কণ চেতনায় গতি ও গীতির ঐকতানে সুমেল জোড়বন্দী। এই যুগের প্রায় প্রতিটি রচনায় এই অভিজ্ঞতা-পরিপুষ্ট রসদৃষ্টি ও যৌবনোত্তর দার্শনিক যুগ-চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নাট্যশিল্পেও তার ব্যতিক্রম নেই। এবং নাটক যেহেতু যৌবন ও গতি-প্রাণতার কৃতিকর্ম বোধকরি সেইহেতু শেষ বয়সে তিনি আর নাটক রচনায় লেখনীকে প্রশ্রয় দেন নি। ফলে, 'মুক্তধারা' ও 'নটীর পূজা'র সমকালীনত্বকে বাদ দিলে 'রক্তকরবী'ই রবীন্দ্র-নাট্যকলা শিল্পের প্রায় শেষ কথা। যদিচ, উৎকর্ষাপকর্ষের ফলশ্রুতি হিসাবে নাটকটির গুণাগুণ বিচারসাপেক্ষ ও বিতর্কবহুল।

মাটির অভ্যন্তরে যক্ষপুরী এমন একটি খনিজ কারখানার জগৎ যেখানে মানুষ নিয়মমতো কাজ করে, নিয়মমতো ঘর করে এবং নম্বরমতো পরিচয় দেয়। কেউ ৪৭ক, কেউ ৬৯ঙ। এদের তদারকির ভার পদানুসারে কয়েকজন সর্দারের উপর। তাছাড়া আছেন বস্তুবিদ্যাবাগীশ অধ্যাপক, যার কাজ শুধু যন্ত্রের কলা-কৌশল বোঝানো এবং খনিজ পদার্থের গুণাগুণ বিচার আর আছেন হরিনামের নামাবলী গায়ে গোসাইবাবাজী —যার কাজ শ্রমিকদের বোঝানো যে প্রশ্নহীন তর্কহীন দাসত্ব স্বীকার ও মনিবের স্বার্থ-সিদ্ধতে মদৎ জোগানই জীবনের পরমার্থ। ভগবৎভক্তি মানে হল মন খারাপ হলে হরিনাম করা ও নির্দিষ্ট দিনে মাখন-চণ্ডী, ধ্বজা পূজা ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে যোগদান করা। এ ছাড়াও আছে পুরাণবাগীশ, চিকিৎসক, পুলিশ ও পালোয়ান। এই জগতের সর্বময় কর্তা ও একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হলেন একজন রাজা। যিনি জালাবরণের অভ্যন্তরে থাকেন নেপথ্যে। শ্রমিকদের সুন্দরী স্ত্রী ও কন্যারা অধিকাংশক্ষেত্রেই উপরিতলার সর্দারদের ভোগ্য। এবং এ নিয়ে বিশেষ কোন আলোড়নও নেই ক, খ, গ, ঘ, ঙ সমাজে। কাজে কামাই বা কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ হলে আছে সর্দারদের চাবুক। তারপর বন্দীশালা। তারপর শোচনীয় মৃত্যু। এই শেষেরটির অধিকার একমাত্র রাজার। শ্রমিকরা বাস করে ক, খ, গ, ঘ, ঙ চিহ্নিত বিভিন্ন বস্তীতে। এবং তাদের খবরদারি করবার জন্য আছে কয়েকজন বশংবদ মোড়ল। তারা সামান্য কিছু কৃপা বা মুনাফার লোভে সংবাদ সরবরাহ করে সর্দারদের কাছে মহল্লায় কে কি ভাবছে বা কে কি করছে। সুযোগমত চেষ্টায় থাকে কি করে সর্দারদের ভজিয়ে নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের চাকুরী দেয়া যায়। এ জগতের রং অন্ধকার এবং দৃষ্টি অন্ধত্ব। রাজা যদিচ এই জগতের সর্বময় কর্তা ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু কার্যতঃ সর্দাররা হল এক একটি স্বয়ংচালিত Executive Head

এ পর্যন্ত নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে কোন গোলমাল নেই। এক ঐ 'জালাবরণের' রহস্যটি ছাড়া পরিবেশ বর্ণনা ইউরোপ, আমেরিকা ও এতদ্দেশীয় বড় বড় কল-কারখানার জগতের সঙ্গে প্রায় হুবহু এক। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজে রক্তকরবীকে real বলেই মনে করেন— allegory বা রূপক বলতে তাঁর মন সায় দেয় না।

কিন্তু গোলমালটা আরম্ভ হল ঐ যক্ষপুরীতে যখন আগমন ঘটল নন্দিনী রঞ্জনের। এরা কে? এরা কেন? ওদের সম্পর্কটা কি। এমনকি যক্ষপুরীর খোদাইকরেরা পর্যন্ত জানবার জন্য উন্মুখ—এরা কে? কি কাজে রাজা এদের এনেছে?

রক্তকরবী নাটকের অজস্র সংলাপের মধ্যে কুত্রাপি এইসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই। উত্তরের নাম করে যে সব সংলাপ দেওয়া হয়েছে তা' ভাষায় 'লিপিকা'-জাতীয় বিশিষ্ট গদ্য কবিতা আর ভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ লিরিক্। পড়তে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে, উপযুক্ত শিল্পীর হাতে পড়লে হয়তো দেখতেও মন্দ লাগবে না, কিন্তু বুঝতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমায় কুলিয়ে ওঠে না—কখনো রূপক কখনো সংকেতের ইঙ্গিতময়ী ভাবমার্গে মনটিকে উধাও করে দিতে হয়। আর এখানেই নাটকের ক্রিয়াশীলতা বোধিগম্যতার অভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত উৎপাদন করে। নন্দিনীর হাতে রক্তকরবীর কঙ্কন, রাজার বাঁ-হাতে বাজ পাখীর অবস্থান, কখনো রাজার ডান হাতে মরা ব্যাঙ, রঞ্জনের মৃত্যু, জালাবরণের অভ্যন্তরে রাজার একাকীত্ব... যক্ষপুরীর উপরি উল্লিখিত অতি পরিচিত অতি বাস্তব পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর সৃষ্টি করে। অথচ, রবীন্দ্রনাথ নির্বিরোধ অবিচলতায় পাঠক ও দর্শকবৃন্দকে আহ্বান করলেন, "এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়েই তাঁর আত্মপ্রকাশ।...নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তাহলে সে দায় কবির নয়।" দায় তো 'কবি'র নয়ই। কিন্তু 'কবি' যদি নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন—তাহলে? তাহলে, বুঝতে চেষ্টা করবো না, রক্তকরবী কিসের প্রতীক? তাঁর নাটকের অধ্যাপকই তো প্রথম প্রশ্নকর্তা। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলী। সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে? আসলে, অধ্যাপকের অন্তরালে নাট্যকার নিজেই জানতেন যে তাঁর ব্যবহৃত রক্তকরবীর প্রতীকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। তাই অধিক ব্যাখ্যানের দায় থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি প্রস্তাবনায় জানিয়ে রাখলেন, "আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ করলেই তার সার্থকতা চলে যায়; হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।" বক্তব্যের সারবত্তা ও উপমার ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না তাঁর অপরাপর রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলি সম্বন্ধে—যেমন রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, চতুরঙ্গ ও মুক্তধারা। কিন্তু রক্তকরবীতে তিনি যখন নিজে নিষ্ঠুরতম বাস্তব আবহাওয়ার মুখে আমাদের ঠেলে দিলেন তখন আচমকা ঐ নন্দিনী, রঞ্জন, রক্তকরবীর রহস্যময় আভাস-ইঙ্গিতগুলিকে সত্য পটভূমিকায় বিচার করে বুঝবার প্রকারান্তর অধিকারও তিনি আমাদের দিয়েছেন। ফলে, 'নন্দিনী একটি মানবীর ছবি', বা ঐ হৃৎপিণ্ডের উপমা প্রভৃতির আড়াল দ্বারা আমাদের কৌতূহলের মুখে ইট চাপা না দিয়ে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে এলেন যাতে আমাদের বোঝা-টা তাঁর অভীপ্সিত বক্তব্যের সাথে সহকর্মী হ'য়ে ওঠে। "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে...কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে ত্রেতাযুগে তারই রূপকাটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।"

এই এতক্ষণে রক্তকরবীর পরিকল্পনা ও তার ভাবাদর্শের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আমরা খুঁজে পেলুম; তৎসহ চমৎকৃত হলুম রামায়ণের ঐ মায়ামৃগের অনবদ্য রূপকাবরণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা শুনে—যেমন চমৎকৃত হই তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'—রচনাটি অনুধাবন করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে রক্তকরবীকে

রূপকরূপে মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা থাকলেও তার তত্ত্বব্যাখ্যায় রূপকের আশ্রয় নিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই। কেন এতো সাবধানতা ?

বোধকরি এই সাবধানতার কারণ অনুসন্ধানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রক্তকরবী সম্পর্কিত নানা-সংশয়-বিজড়িত সমস্যাগুলির বীজ। রক্তকরবী রচনা যে যুগে ঠিক তার অব্যবহিত পূর্বে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ঘটে রবীন্দ্রনাথের জীবনে। একটি, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়া, অপরটি, মনীষী বের্গসঁর সঙ্গে পরিচিতি; তৃতীয়টি, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

প্রথমটির প্রতিক্রিয়া তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক: 'কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু উদগারের অন্ধ-গহ্বরের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের অন্ধ ভাণ্ডারে বন্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম।' ইউরোপ, আমেরিকা ও এতদ্দেশীয় টিটাগড়ের চটকল—প্রমুখ এবং যন্ত্রদানব ও অতিকায় কলকারখানার আধিপত্য মানুষের সহজ, সরল ও স্বাভাবিক জীবনধর্মকে কিরূপ নিঃসার, নিরানন্দ ও স্বর্গহীন করে তোলে রবীন্দ্রনাথ সেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থাটি নাটকাকারে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন রক্তকরবীর পারকল্পনা ও পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না বিষয়বস্তু যত প্রত্যক্ষ, যত বাস্তব ও যতই সময়োপযোগী হোক না কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিধর্ম বহির্ভূত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। ভাবাদর্শের রূপায়ন ও পার্থিব পরিস্থিতির মূল্যায়ন দুটি ভিন্ন ব্যাপার। গল্পাকারে 'গুপ্তধনের' মৃত্যুঞ্জয়ের অভিজ্ঞতায় যে সত্যটি উজ্জ্বল, কবিতাকারে 'বলাকার' চঞ্চলায় যে অনুভূতিটি ভাবানুবাদের অপূর্বতায় সার্থক এমন কি রূপকাকারে 'মুক্তধারা'তেও যে বক্তব্যটি ব্যক্ত-সম্পন্ন—রক্তকরবীতে তার ব্যতিক্রম অনিবার্য। মুক্তধারার মত রক্তকরবীতে কেবল যন্ত্রদানব নেই, আছে কল-কারখানার যন্ত্রজীবন, তার কর্মপদ্ধতি, তার প্রশাসন-বিধি, তার অর্থনৈতিক পরিণাম। এই সবগুলির সামগ্রিক নেতিবাচক মূল্যায়নে ভাবাদর্শ একদেশদর্শী হ'য়ে উঠতে বাধ্য এবং নাট্যকারকে অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় বহু জটিল প্রশ্নের জবাবদিহির মুখে এসে পড়া একান্ত অপরিহার্য। Heavy industry সম্পর্কে আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কি? অর্থনীতির বিরোধ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় আপনার আস্থা আছে কি না? প্রশাসন ব্যবস্থার মানবীকরণ বলতে আপনি কি বোঝেন? সোশ্যালিজম্-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারী কলকারখানার প্রসার ও খনিজ পদার্থের প্রয়োগ আপনার অভিপ্রেত কি না?—ইত্যাদি এই শতকের দৈনন্দিন জিজ্ঞাসাগুলি প্রকারান্তর দায়িত্বের মতো প্রতীক্ষা করে থাকে সুচিন্তিত চিন্তাধারার নাটকটির ফলশ্রুতির ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ব্যবহারিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও শ্রমিক মজদুরীর দায়িত্ব পালনে মোটেও আগ্রহশীল নন—বরং শতহস্ত দূরে। তাঁর কাব্য-জীবনে একটি মানবনীতি, অপরটি বিশ্বনীতি। একটি মর্ত জীবলোক অপরটি অমৃত আনন্দলোক। মাঝখানে আছে অন্ধত্ব, অন্ধকার, আবদ্ধতা ও পশুবোধ। এই মাঝখানের ব্যাপারগুলি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য কিন্তু এই শতকের লজিক্। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে এই লজিকের বিতর্ক-গুলিকে যক্ষ পুরীর লজ্জার আড়াল রেখে নন্দিনী রঞ্জনের সহায়তায় জীবলোক ও আনন্দলোকের স্বধর্মে ফিরে এসেছেন। ফতুর করে দিয়ে, যক্ষপুরী সম্পর্কে এ-যুগের সতত-প্রতীক্ষ্যমান প্রশ্নগুলিকে।

এই ফিরে আসাতে সাহায্য করেছে উপনিষদের শিক্ষা ও বের্গসঁর দর্শন। বস্তু-কেন্দ্রিক কর্ম ও বস্তু-কেন্দ্রিক জ্ঞান যদি 'অ-বিদ্যা' ও 'বিদ্যা' দ্বারা অভিধা প্রাপ্ত হয় তো উপনিষদ বলেন:

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহ বিদ্যামুপাসতে।

(যাহারা অবিদ্যাতার অর্থাৎ বস্তু-কেন্দ্রিক কর্মের অনুসরণ করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।) যেমন, যক্ষপুরীর খোদাইকরেরা।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

(আর যাহারা কেবল বিদ্যা অর্থাৎ বস্তু-কেন্দ্রিক জ্ঞানে রত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।) যেমন অধ্যাপক ও রাজা।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

(যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একত্র অর্থাৎ পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্মদ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ প্রাকৃতজীবন হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন।

উপনিষদের এই সত্যদৃষ্টি আশ্চর্যরূপে বের্গসঁর গতি-প্রাণ দর্শনশাস্ত্রেরও মর্মবাণী। আধ্যাত্মবোধ জীবনের প্রাকৃতবোধ থেকে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হলেও, তার রস ও রুচি ভিন্নকলাশ্রিত হলেও, অধ্যাত্মকে জীবন থেকে বিযুক্ত করে দেখা জীবনধর্মের পরিপন্থী। জীবনের বাস্তবকে গ্রহণ করেই বস্তু বোধের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত হতে হবে। শুধু ত্যাগ অথবা শুধু ভোগ উভয়ই অ-শুদ্ধ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ অথবা ভোগের দ্বারা ত্যাগ জীবনধর্মের দুই বিশিষ্ট দিক। জালাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে রাজার আত্মশুদ্ধি ভোগের দ্বারা ত্যাগ আর রঞ্জনের মৃত্যু ত্যাগের দ্বারা ভোগ, উভয়েরই অভিসার নন্দিনীর নন্দন-লোকে। সংকেতের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী রঞ্জনের ভাবমূর্তি দিয়ে অধ্যাত্মকে জীবনের বাস্তববোধের সঙ্গে সমন্বিত করবার এক বের্গসঁীয় প্রচেষ্টা করেছেন। এখানে রাজা হলেন শুদ্ধ কর্ম ও শুদ্ধ জ্ঞানের অতিশক্তিশালী আধার এক সচেতন আবদ্ধ 'আমি'—ঐ আমি'টির গতিশীলতা হল রঞ্জন আর আনন্দ হল নন্দিনী।

এই নন্দিনী রঞ্জনের সম্পর্কটি নিয়ে নানা সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নন্দিনীর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজে দিয়েছেন: "মাটির উপরিতলে যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সহজ সৌন্দর্যের।" এই বর্ণনায় নন্দিনীর যে রূপটি আমরা পাই সেটি রবীন্দ্রনাথ নিজে বললেও যত না বেশী 'মানবী' তার চেয়ে বেশী 'মানসী'—তবে তার যৌবনের নয়, যৌবনোত্তর কালের, রূপের নয়—অরূপের!

আর রঞ্জন, সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোন স্পষ্ট উক্তি নেই। নাটকের শেষের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বোঝাই যায় না রঞ্জনের কোন রক্তমাংসের অস্তিত্ব আছে কিনা। কেবল নন্দিনীর ব-কলমে উচ্ছ্বাসময় উক্তির আভাসে ইঙ্গিতে তার আবির্ভাব। তখন তাকে জীবনের প্রাণ-শক্তি রূপে কল্পনা করে রসাস্বাদন করতে কোন অসঙ্গতি হয় না। কিন্তু অধ্যাত্মকে জীবনের পটভূমিকায় সংস্থাপিত করবার বের্গসঁীয় প্রয়োজনে তাকে হঠাৎ রক্তমাংসের রূপ দিয়ে বিপ্লবের ছলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নাটকীয় পরিবেশে এমন এক অতিনাটকীয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে যে অভিজ্ঞ সমালোচককে পর্যন্ত বলতে বাধ্য করা হয়েছে: "একদিকে তাহার এই অত্যন্ত অশরীরী, অতীন্দ্রিয় স্পর্শ অপরদিকে তাহার মৃতদেহ—এই দুয়ের মধ্যে একটা বিষম অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে, যাহা আমরা কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিতে পারি না। এই কল্পনাগত অনৈক্য আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে নিরন্তর পীড়িত করে।—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'

এই অনৈক্যের জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনানুভূতি ও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আপাতত যে কোন বিষয়বস্তুর উপর পড়ুক না কেন তাঁর অন্তর্চক্ষু বিচরণ করে জগৎ ব্যাপারে 'মানুষের ধর্মের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে'। মানুষের 'বড়ো ওঠা' তাঁর কাছে হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবোধের নিগড় থেকে মানবত্মাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভূমালোকে উন্মীলন করে তোলা। এই উন্মীলনের গতিপথে শুধু কাজ কেন প্রয়োজনাসিদ্ধি অতিরিক্ত সঞ্চয়ের মত্ততা, অপরকে পীড়ন করার প্রভুত্ববোধ, প্রয়োজনমতো স্বার্থের অনুকূলে শাস্ত্রব্যাখ্যা ইত্যাদি পরিদৃশ্যমান মর্ত-ক্রিয়াগুলি এক একটি চলচ্ছক্তি হীন স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা।' এই বাধার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় রাষ্ট্রগতভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ও ব্যক্তিগত অধ্যাত্মের অনুশীলন। অধ্যাত্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অধীতবিদ্য ও

বিরৎবৎ। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা ভারতীয় ঐতিহ্য-কেন্দ্রিক রক্ষণশীল ও গঠনমূলক। মহাত্মাগান্ধী প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাঝে তিনি তাঁর আদর্শের ভাবগত ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং চম্পারণ কৃষক বিদ্রোহের বিজয়ী নায়ক মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীকে তিনিই সর্বপ্রথম 'মহাত্মা' নামে বিশ্ববন্দিত করেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল অন্যায়ের জুলুম থেকে মানবিক দাবীগুলি পূরণ করবার জন্য আমরণ সংগ্রাম —অস্ত্র দ্বারা নয়, আত্মশক্তির দ্বারা, দরকার হলে, মৃত্যু বরণের দ্বারা। পীড়ন যত প্রবল হবে সত্যাগ্রহীর ত্যাগ তত উজ্জ্বল হবে। সেই মহৎ ত্যাগই অদৃশ্য অস্ত্রের মতো মারণাস্ত্রের পীড়ণ যন্ত্রে হানবে শক্তিশেল। পশু পরাস্ত হবে, মানব হবে জাগ্রত। তাই বন্দীশালা ও মৃত্যুবরণ রবীন্দ্র-নাট্যকলায় বিশিষ্ট সম্মানের স্থান লাভ করেছে। রঞ্জনের মৃত্যুর সেই আত্মশক্তির শক্তি-শেল।

কিন্তু অনৈক্যের হাত থেকে রেহাই নেই। রঞ্জনের রূপক দ্বারা যা বলতে চাওয়া হয়েছে এবং রূপক রূপেই যা রসোপলব্ধি সিদ্ধ, রঞ্জনের বাস্তব—উপস্থিতির চাক্ষুষ-অস্তিত্বে ক্রিয়াশীলতা ও রসানুভূতির সে সতত প্রতীক্ষমান আবেগ-সঞ্চার নেই।

আরও নেই শুষ্ক সেতুবন্ধন নন্দিনী রঞ্জনের যুগ্ম সম্পর্ক পরিকল্পনায়, ভাবমার্গে রঞ্জন-নন্দিনীকে মানবাত্মার প্রাণলোক ও আনন্দলোক রূপে প্রতীক চিহ্নিত করলে রাজার জীবনে রঞ্জন-নন্দিনীর আবির্ভাবের একটা সুষ্ঠু মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু লৌকিকরূপে নন্দিনী রঞ্জনকে কৃষিপল্লীর মুক্ত আলো হাওয়ায় উজ্জীবিত এক সুখী পরিবার কল্পনা করে নিলে ভাব-সম্ভোগের সে রসনিষ্পত্তি ঘটে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসোচিত ঐরূপ একটি সুখী পরিবারের reality তাঁর ব্যাখ্যায় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন যদিও নাটকের সংলাপে তার কোন প্রমাণ নেই। তার প্রমাণ আছে তারাশঙ্করের কাহিনীগুলির পাতায় পাতায় যেখানে জীবনের দিনদিন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দিয়ে দেখানো হয়েছে কেমন করে "কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে।" পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে তোরা আয় আয়" গানটির বার বার ব্যবহারেও নাটকটি কৃষি-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে বলে কোনরূপ প্রতীতি হওয়া সম্ভব হয় না।

আসলে রক্তকরবী নাটকটীতে একটা সমান্তরাল বিরোধ পাশাপাশি বর্তমান থেকে বক্তব্য ও ব্যক্ত এতদুভয়ের মধ্যে রসবিভেদ ঘটিয়ে তুলেছে। তিনি যা বলবো বলে মনস্থ করেছিলেন 'তা' হয়তো অনেকটা শিল্পবিপ্লব ও কৃষি-জাতীয় একটা বিচার। এবং পরিকল্পনা মতো 'জালাবরণের' অবরুদ্ধতাকে সাক্ষী রেখে মাটির অভ্যন্তরে খনিজাতীয় এক ভারী শিল্পের আবহাওয়া সৃজন ক'রে পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনান্তে যেই তিনি তাঁর বলা আরম্ভ করলেন অমনি শিল্পবিপ্লব ও কৃষির ধারে কাছে না গিয়ে স্বভাবধর্ম মতো তিনি তাঁর মানব ধর্ম ও পশুশক্তি বিষয়ক তর্ক বিতর্কের মুখে মুখে সংলাপ দিয়ে চললেন humour অলঙ্কারপটুতা ও সঙ্গীত মাধুর্যের দ্বারা। রক্তকরবীতে সত্যিই তিনি যা' বললেন তার সার সংক্ষেপে আছে পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে।

"পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায় —সে যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলেছে। সেই ধ্বংশ শাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয় গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে। এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনই সইবে না।"

ফলে, এক নন্দিনী ছাড়া অধিকাংশ পাত্র পাত্রীর সংলাপের সঙ্গে চরিত্রের কোন মিল নাই। পাত্র পাত্রীরা সেখানে রবীন্দ্র ভাবধারার পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ মাত্র।

এমন কি 'রাজা' ও অধ্যাপকের সংলাপ-ও মাঝে মাঝে এমন রহস্যময় ও lyrical হ'য়ে পড়েছে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাদের মুখে সরস্বতীর মতো ভর করেছেন। নন্দিনী ও 'বিশু পাগল' রবীন্দ্র নাট্যকলাশিল্পের অতি প্রিয় দুই মানস সহচর। একজন রস দেবী, অন্য জন রসিক-ভক্ত।

কয়েকটি রহস্যময় প্রতীক দ্বারা রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের পৃষ্ঠভূমি রচনা করেছেন। রাজার ডান হাতে মরা ব্যাঙ আর বাঁহাতে বাজপাখী। বাজপাখী পায়রার শত্রু। আর, পায়রা হল সুখী কৃষি পরিবার। কলকারখানার প্রশাসনিক প্রতিভূ রাজা বাজপাখীর মতো উজাড় করে দিচ্ছে কত কত সুখী কৃষি পরিবারকে। আর, ব্যাঙ হল কূপমণ্ডূক। নিজের চারিদিকে আড়াল দিয়ে অন্ধকার গহ্বরে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দেয় শুধু অস্তিত্বের স্থিতিটুকু সম্বল করে। যেমন অন্ধকার যক্ষপুরীতে রাজার অবস্থা। গতিহীন জড়ত্বের বিরাট কূপমণ্ডূক। ঐ ব্যাঙকে মেরে রাজা তার অস্তিত্বেরমধ্যে প্রাণের গতিশীলতা আনবার জন্য উন্মুখ।

নাটকটির নামকরণের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ বীজ রূপে গুপ্তাহিত রেখেছেন সমস্ত পালাটির সাংকেতিক তাৎপর্য। আত্মত্যাগের দ্বারাই আত্মপ্রকাশ। রক্ত সই আত্মত্যাগ, আর করবী হল, আত্মপ্রকাশ। 'মল্লিকা ছিল, মালতী ছিল, ছিল চামেলী,' তবু রক্তকরবী কেন? না, রক্ত করবীর অনুষঙ্গে বিধৃত আছে বিন্যাসহীন পল্লীপ্রকৃতির অনাড়ম্বর আনন্দ ও সুখ। তার আধারটিও বড় শক্ত; লতানো নয়।

এইরূপে বাস্তবনিষ্ঠ বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রয়োজন-মতো রূপক ও সংকেতের সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ তার দর্শন, কাব্য ও অধ্যাত্মবোধকে একই আধারে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে ওদের মধ্যে রস ও বুদ্ধির সমান্তরাল বিরোধ ঘটে গেছে। এমন কি যে সংলাপে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই, তারই সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ রক্তকরবীতে করেও সংলাপ শুধু অলঙ্কারই থেকে গেছে অঙ্গের শোভা বর্ধন করে নি। বরং কোথাও কোথাও অঙ্গের চেয়ে অলঙ্কার বেশী ভারী হয়ে গেছে।

আলোচনার সমাপ্তি টানার পূর্বে নাটকটির একটি বিশেষ সংলাপের তাৎপর্য উল্লেখ না করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চাপা থেকে যায়। গতি ও আনন্দের অভাবে 'রাজার মধ্যে যখন এক অভাববোধ অসুস্থতার মতো দানা বেঁধে ওঠে তখন রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের জন্য সর্দাররা ডাক দেয় চিকিৎসককে।

"চিকিৎসক—দেখলুম। রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন, এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার—এর প্রতিকার কি?

চিকিৎসক—বড় রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।"

বর্তমান বিশ্বের অন্তর রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিবর্গের কূটনৈতিক চালগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরভেদী দৃষ্টি দিয়ে অতি সহজেই তুলে ধরেছেন।

ধর্মমহাসম্মেলন ও স্বামী বিবেকানন্দ

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকার চিকাগো সহরে ধর্ম-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম-মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল অনেকগুলি কারণে।

(১) পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কতখানি মিল রয়েছে তা খুঁজে বার করা।

(২) পৃথিবীর সব দেশে নানা রকমের সমস্যা রয়েছে। দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, শিক্ষা ও শ্রম এদের মধ্যে প্রধান। ধর্ম এই সব সমস্যার কতখানি সমাধান করতে পারে তা আলোচনা করা।

(৩) পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা।

(৪) বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা।

(৫) মহান ধর্মগুলির প্রধান প্রতিনিধিদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া।

(৬) বিভিন্ন ধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করা।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন মাদ্রাজে, সময়টা ১৮৯৩ সালের মার্চ মাস। বহু ভদ্রলোক স্বামিজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামিজী বেদ বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপর আলোচনা করলেন। স্বামিজীর প্রভাব যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। স্বামিজী যুবকদের বললেন, তিনি বিদেশে যাবেন, তিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্ববাসীর সামনে প্রচার করবেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ইউরোপে পরিবেশন করবেন, কিন্তু এরজন্যে টাকার প্রয়োজন, সেখানে যেতে গেলে টাকা চাই, সেখানে/থাকতে গেলে টাকা চাই। যুবকরা স্বামিজীর কথা শুনে বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলতে সুরু করে দিলেন, তাঁরা পাঁচশ টাকা তুলে স্বামিজীর হাতে দিলেন।

স্বামিজী মাদ্রাজ থেকে গেলেন হায়দ্রাবাদে। রাজা শ্রীনিবাস রাও, মহারাজ রম্ভা রাও, নবাব জঙ্গ বাহাদুর তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানালেন। স্বামিজী সকলকে তাঁর ইউরোপ যাওয়ার কথা বললেন, কেন তিনি ইউরোপ যাওয়ার কথা বললেন, কেন তিনি ইউরোপে যেতে চাইছেন তা তিনি জানালেন। রাজা মহারাজারা তাঁকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু স্বামিজী সে দান নিতে চাইলেন না। তিনি যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি, তিনি সেই সব মানুষের প্রতিনিধি যারা দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না, তিনি গরীবদের পয়সাতেই বিদেশে যাবেন। স্বামিজী রাজা মহারাজাদের মনে দুঃখ দিতে চাইলেন না; তিনি জানালেন, এখনই দান নেওয়ার সময় হয়নি, সময় হলে নিশ্চয়ই জানাব।

স্বামিজী আবার ফিরে এলেন মাদ্রাজে। তিনি শিষ্যদের জানালেন, তিনি চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগ দেবেন। শিষ্যরা মহা-উৎসাহে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিলেন, তাঁরা আহার নিদ্রা ভুলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থসংগ্রহ করছেন। প্রচুর অর্থ স্বামিজীর হাতে এসে পড়ছে, তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে, এ সবই সেই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে। শুভ-প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না, মহৎ উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না।

খেতাড়ির মহারাজা স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত। স্বামিজীর আশীর্বাদে তিনি পুত্রলাভ করেছেন। পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা চলেছে, মহারাজার সেক্রেটারী

জগমোহনলাল। মহারাজা স্বামিজীকে নিয়ে আসতে জগমোহনলালকে পাঠালেন। স্বামিজী তাঁর পুত্রকে আশীর্বাদ করে যাবেন। এদিকে স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রা করতেই শুধু বাকী। জগমোহনলাল এসে স্বামিজীকে মহারাজার আমন্ত্রণের কথা জানালেন, মহারাজা জানিয়েছেন, স্বামিজী যদি তাঁর বাড়ীতে না আসেন, স্বামিজী যদি এই শুভদিনে তাঁর পুত্রকে আশীর্বাদ না করে যান, তিনি মনে বড় ব্যথা পাবেন।

স্বামিজী কারো মনে কষ্ট দিতে জানেন না। তিনি জগমোহনলালকে জানালেন, তিনি মহারাজার ছেলেকে আশীর্বাদ করতে যাবেন। এটাও ঠিক হল, তিনি বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠবেন।

স্বামিজী মহারাজার প্রাসাদে এলেন। তিনি মহারাজার ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। মহারাজা স্বামিজীর পোষাক অর্ডার দিয়ে করিয়ে দিলেন। জাহাজের একখানা প্রথমশ্রেণীর টিকিট কেটে দিলেন। যদিও স্বামিজী চেয়েছিলেন তিনি গরীবদের পয়সাতেই বিদেশে যাবেন, তিনি মহারাজার এই স্নেহের দয়া উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে মহারাজার দান গ্রহণ করলেন।

এবার যাত্রা। স্বামিজীর পরণে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, মাথায় গৈরিক পাগড়ী, সারা দেহে রাজ-রাজেন্দ্রের ঐশ্বর্য। জাহাজ ছেড়ে দিল, তিনি চল্‌লেন বহুদূরে। তিনি তাঁর প্রিয় গুরুভাইদের ছেড়ে চল্‌লেন, ছেড়ে চল্‌লেন তাঁর প্রিয় শিষ্যদের, ছেড়ে চল্‌লেন অগণিত বন্ধুবান্ধব ও ভক্তদের। স্বামিজীর মনে পড়ল জীবনের আদর্শপুরুষ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাঁর আদেশে তিনি চলেছেন বিদেশের পথে, যাঁর শুভ আশীর্বাদ তাঁর জীবনে হয়েছে পরম পাথেয়, মনে পড়ল পরমাপ্রকৃতি শ্রদ্ধান্বিতা সারদামণিকে যিনি তাঁকে বার বার উপদেশ দিয়েছেন, মনে পড়ল জননী ভুবনমোহিনীকে যিনি বীরেশ্বর শিবের কাছে বার বার পুত্রের মঙ্গল কামনা করেছেন।

দুই

এক সপ্তাহের মধ্যে জাহাজ কলম্বোতে এসে পৌঁছল। জাহাজ এক দিন বন্দরে থাকবে, এখানে বুদ্ধদেবের এক মন্দির আছে, তিনি জাহাজ থেকে নেমে মন্দিরে এলেন। তিনি সারা শহর ঘুরে ঘুরে দেখলেন, স্বামিজী সিংহলী ভাষা জানেন না, তিনি এখানে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলেন না।

জাহাজ পেনাঙে এল। ছোট শহর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবার জাহাজ সিংগাপুরের পথে এগিয়ে চলল, সিংগাপুর থেকে জাহাজ হংকং চলল। স্বামিজী হংকঙে তিনদিন ছিলেন, তিনি ক্যান্টন দেখতে গেলেন, হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে। স্বামিজী জাহাজে করে ক্যান্টনে গেলেন। একটা বিরাট শহর, নদীর ধার বরাবর শহর গড়ে উঠেছে, শহর বড়, লোকসংখ্যা অনেক, বড় অপরিচ্ছন্ন শহর।

স্বামিজী হংকং থেকে জাপানে বেড়াতে গেলেন। তিনি নাগাসাকি, কোবি, ওসাকা, ইয়োকোহামা, কিয়োটো, টোকিও প্রভৃতি বড় বড় শহর বন্দর দেখলেন, শহর বন্দরগুলো যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাপানীরা তেমনি ফিট্‌ফাট্, এখানের সবই যেন সুন্দর, ছোট ছোট বাড়ীগুলো ছবির মত, পথঘাট ঝক্‌ঝকে, প্রতিটি বাড়ীর পিছনে সুন্দর সাজান বাগান। স্বামিজী জাপান থেকে প্রিয় শিষ্যদের লিখলেন, তোমরা কি দরদী? সারা জীবন কেবল বাজে বকছ; এসো, এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা কি বলো দেখি! আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ। তোমরা তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরাণিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা'হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্যে, উন্নত হবার জন্যে চেষ্টা করি। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দারিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে।

স্বামিজী আগষ্ট মাসে জাপান থেকে ভ্যাঙ্কুবারে এসে পৌঁছলেন। স্বামিজীর সঙ্গে ভাল গরম জামা নেই, অথচ এখানে প্রচণ্ড শীত, প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে জাহাজ চলেছে, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। ভ্যাঙ্কুবার থেকে কানাডা, কানাডা থেকে স্বামিজী চিকাগোতে গিয়ে পৌঁছলেন। স্বামিজীর পরণে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী, এমন অদ্ভুত সাজপোষাক শহরের লোকেরা কখনও দেখেনি, ছেলেবুড়ো সকলেই স্বামিজীকে বিদ্রূপ করতে লাগল। স্বামিজীর ভাল খাওয়া জুটছে না, কোন কোন দিন একেবারে অনাহারে কাটাতে হচ্ছে, শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু স্বামিজী মাথায় করে এনেছেন গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরম আশীর্বাদ। তিনি জানেন মহৎ কাজের সামনে বাধা আসে অনেক, শুভ কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হয় না। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, স্বামিজী হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন। তিনি চিকাগোতে বারো দিন কাটালেন।

ট্রেনের কামরায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে স্বামিজীর আলাপ হয়েছিল, ভদ্রমহিলার বাড়ী বোষ্টনের এক গ্রামে, ভদ্রমহিলা স্বামিজীকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। স্বামিজীর প্রতিদিন থাকা খাওয়ার খরচ পড়ছিল এক পাউণ্ডের মতন অর্থ, এই খরচটা বেঁচে গেল।

একদিন এক অধ্যাপকের সঙ্গে স্বামিজীর আলাপ হয়। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর রাইট। ডক্টর রাইট হার্ভাড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। অধ্যাপক রাইট স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করে খুশী হন। তিনি স্বামিজীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে খুশী হন, রাইট সাহেব স্বামিজীকে ধর্ম-মহাসম্মেলনে বক্তৃতা করতে অনুরোধ জানালেন। সাহেব বললেন, ওই সভায় বক্তৃতা করলে আমেরিকানদের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হবে। স্বামিজী বললেন, আমি কাউকে চিনি না, আমাকে কেউ চেনেন না, আর তা'ছাড়া ধর্ম-মহাসম্মেলন থেকে আমি কোনরকম আমন্ত্রণ পাইনি!

অধ্যাপক রাইট বললেন, ডক্টর ব্যারোজ ধর্ম-মহাসভায় বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। আমি ডক্টর ব্যারোজকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনি এই চিঠিখানা নিয়ে চিকাগো শহরে ডক্টর ব্যারোজের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ধর্ম-মহাসভায় বক্তৃতা করবার সুযোগ দেবেন। রাইট সাহেব তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপকের মিলিত জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী। এই ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসীকে যেন প্রতিনিধিদের দলে স্থান দেওয়া হয়।

স্বামিজী রাইট সাহেবের চিঠিখানা নিয়ে চিকাগো শহরে এলেন। এত বড় শহরে ব্যারোজ সাহেবকে খুঁজে বার করা সহজ নয়, অচেনা, অজানা, সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে স্বামিজী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, দিনের আলো নিভে গেল, স্বামিজী হতাশ হয়ে হোটেলে হোটেলে ঘুরতে লাগলেন কিন্তু কোন হোটেলই তাঁকে জায়গা দিল না। রাত কাটানর জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে পেলেন না স্বামিজী। এই আলখাল্লা পোষাক, আর পাগড়ী দেখে সবাই দূর দূর করে দিল।

স্বামিজী রেলষ্টেশনে চলে এলেন, হাড়-কাঁপানো শীত, তিনি ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছেন। তিনি দেখলেন, ষ্টেশনের এক কোণে কটা কাঠের প্যাকিংবাক্স পড়ে রয়েছে, স্বামিজী এই একটা প্যাকিংবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করলেন, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ তাঁর মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, নরেন তোকে লোকশিক্ষা দিতে হবে। আমাদের দেশে ত্রিশ কোটি লোক। এদের মধ্যে দুঃখীই বেশ, তোকে এইসব দুঃখী লোকেদের দুঃখ দূর করতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে। ঠাকুর যেন স্বামিজীর কানে কানে বলে দিলেন, দুঃখ করিস নি, তুই জয়ী হবি। তোর কোন সমস্যাই থাকবে না।

রাতটা কেটে গেল। স্বামিজী ভোরবেলায় প্যাকিং বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিকে আর

এক বিপদ, রাইট সাহেবের ডক্টর ব্যারোজকে লেখা চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। স্বামিজীর আগের দিন খাওয়া হয়নি, শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। তিনি রাস্তার ওপরেই বসে পড়লেন, ঠিক এই সময় সামনের বাড়ীর দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। এই ভদ্রমহিলার নাম মিসেস্ হেল।

মিসেস হেল স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন। আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি। স্বামিজী মিসেস হেলের কথা শুনে খুশী হলেন। তিনি বললেন, তিনি ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে চান। তিনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন।

স্বামিজী মিসেস হেলকে বললেন, অধ্যাপক রাইট আমাকে একখানা পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন সেটা হারিয়ে ফেলেছি, আমি ধর্মমহাসভার অফিস খুঁজে পাইনি, আমি ডক্টর ব্যারোজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। মিসেস হেল বললেন, আপনি পথশ্রমে খুব ক্লান্ত, আমার বাড়ীতে আসুন, বিশ্রাম নিন, আমি ধর্মমহাসভার অফিস চিনি, সেখানে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

স্বামিজী একথা শুনে অত্যন্ত সুখী হলেন। তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। একটু আগে অনেকে তাঁকে শুধুমুখে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাঁর চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মিসেস হেল নিজে থেকে এসে স্বামিজীকে আশ্রয় দিতে চাইছেন, তাঁর বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে বলছেন।

মিসেস হেল স্বামিজীকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তিনি স্বামিজীকে যত্ন করে খাওয়ালেন। তিনি স্বামি-জীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামিজীর মনে হল, মিসেস হেল যেন তাঁর অতি আপনজন, যেন তাঁর এক পরম আত্মীয়া।

মিসেস হেল স্বামিজীকে ধর্মমহাসভার অফিসে নিয়ে গেলেন। স্বামিজী ডক্টর ব্যারোজের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তিনি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিত্ব করতে চান। ডক্টর ব্যারোজ স্বামিজীকে জানালেন, তিনি ধর্ম-মহাসভায় যোগ দিতে পারেন। মিসেস হেল স্বামিজীর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান সুরু হল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা এখানে এসেছেন। প্রতিনিধিরা বসলেন প্ল্যাটফর্মের ওপর। এঁরা সকলেই বিশিষ্ট পণ্ডিত। বিরাট হলঘরে প্রায় সাত হাজার দর্শক হাজির হয়েছেন। স্বামিজী এত লোক দেখে মনে মনে ভাবলেন, তিনি বক্তৃতা করতে পারবেন ত। তিনি দেখলেন, প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তৃতা কাগজে লিখে এনেছেন। তিনি কিছুই লিখে আনেন নি।

স্বামিজীর ডাক পড়ল। ডক্টর ব্যারোজ স্বামিজীর পরিচয় দিলেন। স্বামিজী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পরণে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গৈরিক পাগড়ী, সারা দেহে রাজ রাজেন্দ্রের মহিমা, চোখ মুখ থেকে যেন এক অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। তিনি ভারতীয় প্রথায় সকলকে অভিবাদন জানালেন। স্বামিজী আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ বলে বক্তৃতা সুরু করলেন। চারপাশ থেকে দর্শকেরা করতালি বাজিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। দর্শকরা মুগ্ধ হয়েছেন যখন স্বামিজী উপস্থিত সকলকে ভাই, বোনেরা বলে সম্বোধন জানালেন। এর আগে অনেক প্রতিনিধি বক্তৃতা করে গেছেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন, লেডিজ এণ্ড জেন্টেলমেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন এই সহরেরই অধিবাসী। আর এই তরুণ সন্ন্যাসী যিনি এসেছেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে, তিনি কত সহজেই সকলকে আপন করে নিতে পারলেন, এঁর হৃদয় কত মহৎ এঁর মন কত উঁচু।

স্বামিজী দুমিনিট থেমে বক্তৃতা সুরু করলেন। তাঁর ইংরাজী বিশুদ্ধ। উচ্চারণ অপূর্ব। তিনি পৃথিবীর সকল ধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। স্বামিজীর প্রিয়দর্শন চেহারায়, বিশুদ্ধ ইংরাজী অনুপম বাণী, উদাত্ত সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর, বিরাট ব্যক্তিত্ব, প্রশান্ত গাম্ভীর্য, সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব সহজেই সকলকে অভিভূত করে ফেলল। পর পর ক'দিন তিনি বক্তৃতা করলেন, সকলের মুখে এই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা। ইনিই সেই সন্ন্যাসী যাঁকে কিছুদিন আগে এই সহরের

অধিবাসীরা এক মুঠো ভিক্ষা দিতে রাজী হননি, ইনিই সেই তরুণ সন্ন্যাসী যিনি একটু আশ্রয়ের জন্যে হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে রেল ষ্টেশনের প্যাকিং বাক্সে ঢুকে রাত কাটিয়েছেন।

স্বামিজী বললেন, সমুদ্র এক, এই সমুদ্রের জলে বিভিন্ন নদীর জল এসে মিশেছে। এই বিভিন্ন নদী এক জায়গা থেকে আসেনি। এসেছে বিভিন্ন উৎস থেকে, তেমনি এই বিশাল পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মানুষ রয়েছে, এদের রুচি আলাদা, এদের ভাষা আলাদা, এদের মত আলাদা, এদের পথ আলাদা, কিন্তু এদের সকলের লক্ষ্য একজনের দিকে যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি ভগবান।

স্বামিজী অনেক গল্প বললেন। অনেক উপদেশ দিলেন। প্রতিটি দর্শক তাঁর বক্তৃতা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন, নিজেদের মধ্যে স্বামিজীর কথা আলোচনা করতে করতে বাড়ী ফিরেছেন।

ধর্মমহাসভা সুরু হয়েছে এগারোই সেপ্টম্বর। চার দিন কেটে গেছে। সেদিন পনেরই সেপ্টম্বর। স্বামিজী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। সকলেই বলতে চেয়েছেন তার নিজের ধর্ম সবচেয়ে বড়। স্বামিজীর মনটা বড় ব্যথিয়ে উঠেছে। তিনি একটি গল্প বললেন।

একটা কুয়োর মধ্যে একটা ব্যাঙ থাকে। ওই কুয়োটাই ব্যাঙের পৃথিবী। ধারণা এর চেয়ে বড় পৃথিবী আর আর নেই। একদিন একটা সমুদ্রের ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। সমুদ্রের ব্যাঙ বলল, কুয়োটা বড় ছোট, সমুদ্র অনেক বড়। কুয়োর ব্যাঙ বলল, এই কুয়োর চেয়ে বড় কিছু থাকতে পারে না। মিথ্যা। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি এখান থেকে চলে যাও। হিন্দুরা ভাবছে হিন্দুধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম, খৃষ্টানেরা ভাবছে, খৃষ্টধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম, মুসলমানরা ভাবছে, ইসলামের মত বড় ধর্ম আর নেই। এ ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব রাখতে হবে। আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যত মত তত পথ। বিভিন্ন জাতের মানুষ চলেছে বিভিন্ন পথ দিয়ে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সকলে পৌঁছবে। আর একদিনের অধিবেশনে স্বামিজী বুঝিয়ে বললেন, বেদ কি, বেদ কাকে বলে, বেদ কি শিক্ষা দিয়েছে, বেদান্তের কি ব্যবস্থা। তিনি উপনিষদের বাণী, গীতার অনেক শ্লোক সহজ সরল ভাবে বুঝিয়ে বললেন।

স্বামিজী খৃষ্টানদের বললেন, প্রাচ্যে যে সমস্যাটি বড়। সেটি অন্নসমস্যা। স্বামিজী আর একদিনের অধিবেশনে বললেন। ভারতবর্ষের লোকেরা বুদ্ধকে ভগবান বলে মনে করে। হিন্দুধর্ম এমন ধর্ম যা বৌদ্ধধর্ম ছাড়া চলতে পারে না। তেমনি বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না। শেষ দিনে স্বামিজী বললেন, বিবাদ করে কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। মিলে মিশে থাকতে হবে। ধর্মমহাসম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

যুবরাজের বঙ্গদর্শন

শৈলেনকুমার দত্ত

কলকাতা চিরকালই হুজুগে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার যত সুনামই থাক না কেন, লঘুগুরু সব ব্যাপারে একটু বেশী রকমের হুজুগে। হুজুগের অবশ্য অনেক উপলক্ষ্য আছে—পূজো-আচ্চা, খেলাধুলা, রাজনৈতিক বিপ্লব; অর্থ নৈতিক সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সভাসমিতি এতো আছেই, এছাড়া আছে অতিথিদের শুভেচ্ছা সফর। এমন একটি ভ্রমণ পব নিয়ে কল্লোলিনী কলকাতা একবার কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল কলগুঞ্জনে।

সেটা ১৮৭৫ সাল।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস তখনও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড হননি। তিনি একবার ভারত পরিভ্রমণে আসেন। বৃটিশ যুবরাজের সেই প্রথম ভারত দর্শন। সেই ভ্রমণ পর্ব নিয়ে কলকাতা যে কি রকম ভাবে মেতে উঠেছিল, আজও তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই সম্ভবতঃ!

সুয়েজ খাল তখন সবে খোলা হয়েছে।

সেই খোলাপথে 'সেরাপিস' জাহাজ যোগে যুবরাজ প্রথমে এলেন মাদ্রাজ তারপর সেখান থেকে ২২শে ডিসেম্বর এসে পৌছালেন ডায়মণ্ডহারবারে। তখন বঙ্গেশ্বর ছিলেন ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল। তিনি তখনই সেখানে ছুটে গেলেন সম্বর্ধনা জানাতে। পরের দিন যুবরাজের জাহাজ ভিড়ল কোলকাতায়। সেখানে পারিষদ নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন বড়লাট নথব্রুক। তারপর চলল সেই বিরাট শোভাযাত্রা।

বৌ বাজার দিয়ে বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে এগিয়ে চলল সেই অগণিত মানুষের মিছিল। সেদিন আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল গোটা রাস্তাটা। তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ হগ সাহেব। যুবরাজের অভ্যর্থনায় তিনি কোন খুঁত রাখলেন না। জোর করে রাস্তার দুপাশের সব বাড়ী ঘর চুনকাম করালেন তিনি। যেখানে জোর করেও কাজ হল না, সেখানে সরকারই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন। সহরের কানাখোঁড়া দীনদুঃখী মানুষগুলোকে সরিয়ে ফেলা হল বেলেঘাটায়। যুবরাজ যেন দারিদ্র্যের এই বিকৃত চিত্র দেখতে না পান।

সরকারী অভ্যর্থনার পর এগিয়ে এলেন রাজা মহারাজারা। পাইকপাড়ার বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়িতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল। সে এক এলাহী ব্যাপার। প্রীতিভোজের আয়োজন হল যেমন রাজকীয়, ততবড়ই হল গানের জলসা। যুবরাজকে অভ্যর্থনা করার জন্য ধনী সম্প্রদায়ের যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, তার একটি ব্যঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক রচনায়—

হিন্দু

ব্রাহ্মণ — ঠাকুর গোষ্ঠী

কায়স্থ—শোভাবাজারের দেবেরা

নবশাখ ও তেলি তাম্বুলি ইত্যাদি —বাবু কৃষ্ণদাস পাল

মুসলমান

আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর আর একজন ঢাকাই মুসলমান

পাড়াগেঁয়ে জমিদার

রাজা প্রমথনাথ

বৃদ্ধ

রাজা রামনাথঠাকুর

অর্ধবৃদ্ধ

বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র

নব্য সম্প্রদায়

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

বালক

পাইকপাড়ার কুমারেরা

কানা

শেখ আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর

কালা

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল

জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কবিরাও মেতে উঠলেন। সাহিত্যেও যুবরাজ অভিষেক শুরু হয়ে গেল। সে একেবারে রমরমা ব্যাপার। নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় বলতে গেলে—এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতদর্শনে শুভাগমন করেন। সেই উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান পাতিবার যো নাই। প্লাবনে অবশ্য নবীনচন্দ্রও বাদ পড়েননি।

মোটামুটিভাবে সে সময় কাব্যে যেসব স্তুতি বন্দনা রচিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল—

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	ভারত ভিক্ষা
নবীনচন্দ্র সেন—	ভারতউচ্ছ্বাস
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—	ভাবীপতি, রাজোন্নতি নিকেতন, । শ্রীলশ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির অভ্যর্থনা
রাজকৃষ্ণ রায়—	ভারত যুবরাজ
হরিশচন্দ্র নিয়োগী—	ভারতে সুখ
অম্বিকাচরণ গুপ্ত—	ভারত লক্ষ্মী
মহেশচন্দ্র দাস—	যুবরাজ আগমন
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—	যুবরাজের ভারতভ্রমণ
গোপালচন্দ্র দে—	রাজোপহার
কালীশ্বর মুখোপাধ্যায়—	কুমার মঙ্গল
অখিলচন্দ্র দত্ত—	যুবরাজের আগমনে জয়-ধ্বনি
মধুসূদন সরকার—	ভারতে যুবরাজ
নীলকান্ত গোস্বামী—	ভারতে কুমার
ব্রজলাল সাহা—	যুবরাজ আগমন
প্রসন্নময়ী দেবী—	যুবরাজ প্রিন্স অবওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন ইত্যাদি।

বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষে তখন রাজভক্ত শতদলের যুগ। বিদেশী শাসনের প্রখর মধ্যাহ্ন। তাই বন্দনায় বাড়াবাড়ি দেখা গেল। হেমচন্দ্র লিখলেন—

পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ
অর্ঘেতে সাজাবে আজি রাজপদ
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়
ভারত নক্ষত্র বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

এবং সবশেষে—

ভারতে আজরে বিরাজে কুমার
ভারতে অরুণ উদিল আবার
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে
জয় ভিক্টোরিয়া কুমার জয়।

ইংলণ্ডের ক্রাউন পার্ফিউমারি কোম্পানি এতদুপলক্ষে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার ঘোষণা করলেন। প্রায় তিনশ'র মত কবিতা জমা পড়ল। বাংলায় 'ভারত-উচ্ছ্বাস লিখে নবীনচন্দ্র সে পুরস্কার লাভ করলেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর The Ode in welcome to Prince Albert লিখে ইংরেজি কবিতার বিশেষ পুরস্কারটি লাভ করলেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত আটটি কবিতা নিয়ে একটি সুদৃশ্য সংকলনও প্রকাশিত হল।

ঘটনার এত ঘনঘটার মাঝে অঘটনও ঘটল।

যুবরাজ ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে, তিনি বাঙালী মেয়েদের অন্তঃপুর দেখতে ইচ্ছুক: প্রস্তাবে আর কে রাজী হবেন। না, তাও মিলল। হাইকোর্টের জুনিয়র প্লীডার জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজী হলেন। তিনি তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে যুবরাজের মনস্কামনা পূরণ করবেন।

১৮৭৬ সালের ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে যুবরাজ এসে দাঁড়ালেন জগদানন্দের ভবানীপুরের বাড়ির অন্তঃপুরে। বাড়ীর মেয়ে বউয়েরা হিন্দু পদ্ধতিতে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানালেন।

নিন্দায় সহস্রমুখ হল কলকাতা! চারদিকে ধিক্কার উঠল। উপেন্দ্রনাথ দাস 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন লিখে ফেললেন। গিরিশচন্দ্র তাতে গান জুড়লেন—'জজ হতে চাও গজ গিরিধর।' অভিনয় শুরু হতে না হতেই পুলিশ তা বন্ধ করে দিল। নাটকের নাম পাল্টে 'হনুমান চরিত্র, রাখা হল এবং পুনরায় অভিনয় শুরু হল। পুলিশ তাও বন্ধ করে দিল। শুধু কি তাই! নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ এবং রসরাজ অমৃত লাল বসুর একমাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল।

হাইকোর্টের সিনিয়ার গভঃ প্লীডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জুনিয়ার জগদানন্দের এতখানি রাজভক্তি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সহকর্মী কবি হেমচন্দ্রকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। হেমচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে লিখে ফেললেন বাজীমাৎ;

বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পো খেলো ভালো চোটে
তোমার খেলায় রাং রূপো হয় গোবরে শালুক
ফোটে।

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুল তলায়
পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গলার মাসে
পর্দাখুলে কুলবালা সন্তোষে ইংরাজে।
কোথায় কৈশবী দল বিদ্যাসাগর কোথা
মুখুর্জ্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা।
হরেন্দ্র নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি।
ধন্য মুখুর্জ্যের বেটা বলিহারি যাই
সস্তাদরে মজা কিনে নিলে ভাই॥

'এবং শেষ পর্যন্ত অন্তঃপুরের মহিলাদের উদ্দেশে লিখলেন—

আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিসো তারে?

শেষ পর্যন্ত সব অভিলাষ পূর্ণ করে দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর সফরের মাশুল দিতে হল পরাধীন ভারতবর্ষকে। মাত্র তিন লক্ষ টাকা!

সুতপা

(উপন্যাস

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল, আর আলোচনার মাধ্যমে এটাই পরিস্ফুট হয়েছিল যে সুতপা এখন শুধু মেয়েই নয়, ভবিষ্যতে অনুপমবাবুর চাকুরীর অবসরের সময়ে সংসারের অনেক ঝুঁকি হয়ত ওকেই নিতে হবে। অবশ্য আইবুড়ো মেয়ের রোজগার বুড়োবুড়ি আমরণ ভোগ করবে, এতে ভবিষ্যতের বুড়ো ও বুড়ি দু'জনেরই ঘোরতর আপত্তি, তবুও নিয়তির কথা স্মরণ করে ওটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া গেল না।

এখনও তাই অনুপমবাবু বিশেষ কোন একটা মীমাংসায় আসতে পারেন নি। আর সুতপার মন সম্বন্ধে যা জানার তা' ওর মায়ের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। ওসব মেয়েলী ব্যাপারে ওরাই পোক্ত। তবে আগের ধারণা সত্যিই পাল্টাতে হল। সুতপার বিয়ের আগের দিনও কোন মেয়ে নিজে দেখে বিয়ে করছে শুনলে তিনি আঁৎকে উঠতেন নিজের মেয়ের কথা ভেবে, কিন্তু মেয়েই আজ তাঁকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, মেয়েই বা কেন, অনুপমবাবু আরও তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন, বোধহয় বর্তমান জগৎই এমন যেখানে মেয়ের নিজে-দেখা পাত্রের ওপর অনেকটা আস্থা রাখা চলে। তা'হলে এদেশে যুগ যুগ ধরে যে মেয়ে দেখার রেওয়াজ সেটা কি খারাপ যে একমাত্র অন্ধকারের বন্দিনীদের পক্ষেই তা প্রযোজ্য? দুবছাই মাথা গরম হয়ে যায়, যত বাজে ভাবনায় বিরক্তি আসে, বিড়বিড় করে বলেন, বোধহয় জাতটা তাই যুগযুগ ধরে পরাধীনতার পুজো করেছে, স্বাধীন মন নিয়ে ফুঁড়ে-ফুঁড়ে উঠতে পারেনি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সুতপা অনিমার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করে শেষে কাপড়চোপড় পরে বেরিয়ে পড়ল। সুনন্দাকে বলে গেল, অনিমা কেন এলনা একবার দেখতে যাচ্ছি।

ওদের বাড়ী ঢুকেই বাইরের ঘরে জেঠামশায়ের সঙ্গে দেখা। অনিমা ওখানেই ছিল, কিন্তু জেঠামশাই ওঁর কাছে বসতে বলায় বসতে হ'ল।

'তারপর? কি ঠিক করলে?'

'প্র্যাক্‌টিস্ ত' করবই, আর চেষ্টা করব কোন হাসপাতালে স্টাফ থাকার।'

'বেশ বেশ খুব ভাল। এখানকার মেয়ে এখানে প্র্যাক্‌টিস্ করবে, কত আনন্দের কথা।'

'কিন্তু এছাড়া ত' কিছু করারও নেই জেঠামশাই।'

'নাইবা রইল, ভাল কাজ করা ছাড়া যদি কিছু করার না থাকে, ত' ভাগ্যের কথা।'

ওরা তিনজনেই হাসে।

'না সেত বটেই।' সুতপা বলে।

জেঠামশাই বলেন—'আমাদের এদিকে ত' লেডি ডাক্তার কেউ নেই, তোমার প্র্যাক্‌টিস্ মনে হয় ভালই চলবে। আর তা' ছাড়া তুমি ত' তোমার বাবা-মার ছেলের কাজ করছ।'

সুতপা নীরব থাকে। কিই বা বলা যায়।

'তুমি হাসপাতালে ছিলে বলে অনিমার ভাবনা আমাদের কিছুই ভাবতে হয়নি।'

'আমার যেটুকু করার করেছি। এ আর এমন কি?

'জানেন জেঠাবাবু, অনিমা বলে ওর বাবা-মা ওর বিয়ের কথাও বলে মাঝে মাঝে।'

'তাই নাকি। তাত বলবেই।' উনি একটু চিন্তান্বিত হন, 'হাজার হলেও মেয়ে ত' বটে, একটা অবলম্বন চাই বই কি। নইলে বাবা-মা'র স্বস্তি কোথায়? সে যা'

হোক্ হয়ে যাবে, তার জন্তে চিন্তা কি? তবে বিয়ে হলে ভালই, ডাক্তারী-পাশ করা অভিজ্ঞ গৃহিণীর আমাদের সমাজে অনেক দরকার।'

'আচ্ছা জেঠাবাবু, অনিমা বলে, সুতপা যদি ডাক্তারী না পড়ে আমাদের মত বিয়ে থা করত সেটা ভাল হ'ত না? আপনি কি বলেন?'

'জেঠাবাবু কি যেন ভাবেন, বলেন তুমি জিজ্ঞেস্ করছ বেড়ালগুলো যদি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করত আর কুকুরগুলো যদি ভেড়ার মত ভ্যা ভ্যা করত ত' সেটা ভাল হ'ত কিনা।'

'সুতপা হাসতে থাকে, অনিমা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

'কেন? কেন?'

'মানুষের জীবনের গতি জানবে তার প্রবৃত্তি অনুসারে। যার যেমন প্রবৃত্তি তার জীবনের ধারাও ঠিক সেইভাবে বয়ে যায়, সে ভালই বল আর মন্দই বল। আসলে একটা জ্ঞান-পিপাসা ওর অবচেতনমনে নিশ্চয়ই ছিল, সেই জন্তে একটা সামান্ত অঘটন ওকে একেবারে এইখানে এনে ফেলেছে। এই বা ক'জনের হয় বল? আর সংসার বলছ? ওত পড়েই রয়েছে তাতে বাধা কোথায়? বরং ভাল বলেই আমার মনে হয়।'

'মানুষের প্রবৃত্তিতেই তার জীবন চলে?' সুতপা জিজ্ঞেস করে।

'নিশ্চয়ই। যে যা করছে বা হচ্ছে এটা তার প্রবৃত্তির নির্দেশ,তবে এটা গভীর মনে থাকে বলে মানুষ এটাকেই নিয়তি বা ভাগ্য বলে। অন্ততঃ আমার ত' তাই মনে হয়। তাছাড়া গীতাতেও ত' তাই বলেছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি······পড় নি? পড়বে। এসবও আবার পড়া উচিত। ধার্মিক হবার জন্তে না হলেও অন্ততঃ সত্যকে জানার জন্তে। জীবনে অনেক কাজে লাগে।'

'এসব কিছু বুঝি না জেঠামশাই। এক এক সময়ে ঠিক বুঝতে পারি না যে আমি কি চাই। মনটা এমন খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এ অবস্থায় কি করা যায় বলুন ত'?'

হাসেন জেঠামশাই,—'তোমার এ প্রশ্ন ত' চিরকালের, নতুন কিছু নয়। শরীর থাকলে যেমন কখন ভাল কখনও খারাপ, মনও তাই। তবে ওসব ভাবকে এড়িয়ে যাবে, প্রশ্রয় দেবে না।

'মানে, আমার কি চাওয়া উচিত, সেটাই যেন মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ে জেঠামশায়ের—বিড় বিড় করে আপন মনে বলেন, 'কি যে চাওয়া উচিত সে আর তোমায় কি বলব? সমস্ত চাওয়া যেখান থেকে ওঠে আর যেখানে মিলিয়ে যায় সেটাই এক চাইতে পার······ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজের দিকে মন দাও। ডাক্তার হয়েছ, একজন নামজাদা ডাক্তার হও দিকি। পার না পার এগিয়ে যাও, চেষ্টা কর, মন যত শান্ত সংযত হবে দেখবে ক্রমশঃ নিজের প্রশ্নের জবাব নিজের ভেতর থেকেই পাচ্ছ।' এখন ছেলেমানুষ, উঠ্‌তি বয়স, মন এখন চঞ্চল কৌতূহলী। তবে ওরই সঙ্গে মাঝে মধ্যে এই সব বই একটু আধটু পড়বে, উনি একখানা বই তুলে দেখান, সুতপা দেখল একটা ধর্মগ্রন্থ 'ভক্তি' সম্বন্ধে লেখা বলে মনে হ'ল।

'এসব বইতে অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়, না?'

'হ্যাঁ পাবে। তবে প্রশ্নটা যতক্ষণ না ভেতর থেকে উঠে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তোমায় চ্যালেঞ্জ করছে ততক্ষণ এসব বইএর জবাব ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে না। শুধু বইতেই কি আর সব পাওয়া যায়। উনি উঠে পড়েন নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে।

অনিমা সুতপাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে গিয়ে দেখে এলাহি কাণ্ড, সমস্ত বাঁধাছাঁদা শেষ, বড় একটা হোল্ডলে বিছানা বাঁধা, দু'টো তোরঙ্গ তিনটে সুটকেশ, পোঁটলাপুটলি······একি রে কবে যাচ্ছিস্?

'কাল সন্ধ্যায়।'

'কই বলিস নি'ত।'

'ঠিক ছিলনা। হঠাৎ বাবা বললেন, আর নয়, ওখানে ও একলা আছে, অসুবিধে হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলা হ'ল। তোকে ত বলতে যাব বলে তৈরী হচ্ছিলুম।

'তোর বেণী দেখে চলে এলুম। যাক্ তালই, চল তোর ছেলেকে একবার দেখে যাই।'

অনিমা সুতপাকে পাশের ঘরে নিয়ে এল।

'বেশ বড় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে যে।' কোলে নিয়ে সুতপা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এ ধরায় ডাক্তার সুতপা হারিয়ে গিয়ে শুধু সুতপার রূপান্তরিত হ'ল আবার, অনিমার চোখ এড়াল না, কিন্তু তার মুখের মুচ্‌কি হাসি সুতপার চোখ থেকে অনেক দূরে রয়ে গেল।

অবশেষে অনিমা চলে গেল, তার স্বামীর ঘরে। সঙ্গে নিয়ে গেল স্বামীকে উপহার দেবার মত তার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদটি।

এরপর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে। সুতপা একটি হাসপাতালে থেকে বাড়ীতেই প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করেছে। এ ব্যাপারে আর এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাতে সুতপাকে তার পরিবারের সঙ্গে মতানৈক্যের বোঝা-পড়ায় নামতে হয়। আত্মীয়মহলে তার নাম বিশেষ-ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়ালেও, ওর কাছে এসে মনে সম্ভ্রম-বোধ জাগেনা এমন পরিচিত লোক ওর সমাজে বিরল বল্‌লেই হয়। তবুও সকালে জল-খাবার খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাসপাতাল সেরে দুপুরে বাড়ী ফেরা আর সন্ধ্যায় নিজের চেম্বারে বসার অভ্যাস প্রায় রপ্ত হয়ে গিয়েও যখন মাঝে মাঝে নিরালা চেম্বারের নির্জ্জনতায় ওর মানস-লোকে অনিমা, অমিতা, হাসি, আনন্দবাবু আরও অনেকে একে একে এসে ভিড় করে আর তার সঙ্গে অতীত-জীবনের বিপ্লবটা স্মরণ-পথে জেগে উঠে তখন ও ভুলে যায় ও ডাক্তার সুতপা রায় এম-বি-বি-এস।

নিজেকে নিজের থেকে আলাদা করে ভাবা এক আর নিজেকে নিজের ভেতরে রেখে ভাবা সে আর এক, বোধহয় এখনই ও এই কথাটা বুঝতে পারছে। আগের জীবনে ছিল ছাত্র-জীবনের গতি আর একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিজের বয়সকে রঙিন করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছে আজ যেন মনে হয় একটা যেন একটা অস্বাভাবিকতা পেরিয়ে স্বাভাবিকতায় আসা। মনে হয় যেন জীবনের এখনও অনেক অনেক বাকী। সামনে সুবিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান তাকে দু'বাহু তুলে আয় আয় করে ডাকছে। নিজেকে নিজের থেকে আলাদা করে নিলে জগৎটা এমন হয়ে যায় কি করে? ও বোঝার চেষ্টা করে। জেঠামশায়ের কথা-গুলো কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞেস করলে কেমন যেন অন্যদিকে কথা ঘুরে যায়, অথচ এই উদ্দেশ্যের ওপরই যেন জোরটা বেশী দিতে চান। 'বড় ডাক্তার হও' এই কথাটাই কি উনি বলতে চান? অনিমার চিঠি পড়ে বোঝা যায় ও ভালই আছে বেশ, কিন্তু ওরই বা লক্ষ্য কি? আসলে সুখে থাকলে আর কেউ লক্ষ্যের জন্যে মাথা ঘামায় না, দুঃখই বোধহয় জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়। ও আপন মনে যেন একটু হেসে ওঠে। জীবন-সন্ধিক্ষণে এসেই বোধহয় আজ ও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ভাবনায় পড়েছে। আনন্দবাবুর ধারণা সুতপার মনে পড়ে— 'ভোঁতাবুদ্ধির লোকগুলোই জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়।' সুতপার ভীষণ খারাপ লেগে-ছিল একথায়—কেন? একথা বলছেন কেন? আদর্শ-বাদী পুরুষ, যাঁরা বিশ্ববাসীর পূজা পেয়েছেন তাঁরা কি জীবনের লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামান নি?'

'একেবারেই না। একটু ভাবলেই দেখতে পাবেন, সে এগিয়েছিল তার নিজের পথে, কিন্তু সত্যিই সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছিল কিনা, সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল কিনা, বিশ্ববাসীর পূজো দিয়ে তার বিচার হয়না।' আনন্দবাবু বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন।

সুতপা এত চটেছিল সেদিন যে একথার আর জবাব দেয় নি। কিন্তু সেদিনের সেই মতানৈক্যটাও আজ যেন কত মিষ্টি বলে মনে হচ্ছে। তখন নিশ্চিন্ত মনে কত তর্কই করা গেছে। আনন্দবাবুও হয়ত লণ্ডনের কোন এক ঘরে বসে এই সব ভাবছে। চিঠিও অনেক দিন আসে নি, তবে ফেরার সময় হয়ে গেছে।

সেদিন দুপুরে অমিতা এসে হাজির, বছর পাঁচেকের ছেলেটাকে নিয়ে।

'কিরে কেমন আছিস্? এখানে এসেছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁরে এখানে ক'দিন আছি, তাই একবার ঘুরে চলে এলুম। জানি তুই এসময়ে থাকিস।'

'খুব ভাল করেছিস। সময় কাটছিলনা, বোস বোস।

'তোর হাসপাতালে আমার এক দেওর নাকি কাজ করে, চিনিস্?

'কি সে? ডাক্তার?'

'নাঃ অফিসে কাজ করে।

'নাম কি?'

'কি হরিদাস দত্ত, না, কি যেন।'

হেসে ফেলে সুতপা, 'দেওরের নাম জানিস না, অথচ তার খবর জিজ্ঞেস্ করছিস্?

'না না খবর না এমনি বলছিলুম।'

একটু ভাবে সুতপা, বলে—হ'তে পারে, আমি ঠিক জানি না যে, কত লোকই ত' আছে।'

'এখন দেখছি পাড়ায় প্রায় সবাই তোকে চিনে গেছে, ডাক্তার হিসেবে বেশ নাম কিনেছিস কিন্তু।'

সুতপা শুনে খুসীই হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

'এইবার এপাড়ায় তুই একজন গণ্যমান্য হয়ে উঠলি।'

'দুর দুর, ওসবে আমার রুচি নেই রে ভাই, এখন ভাল করে দিন চালাবার মত পয়সা পেলে বাঁচি। জানিস, বাবার কত টাকা লোকসান করে দিয়েছি?'

'সে আর তুই কি করবি?'

'না তবু বল, আমারও ত' একটা কর্তব্য আছে। এখন আমার মাথায় কেবল ওই ঘুরছে, বুঝলি?'

'তা' ত' বুঝলুম, কিন্তু বাপু তোমার কি হবে? নিশ্চয়ই ওদিককার চেষ্টাও ওঁরা করছেন।'

'না না আমার এখন ওসব করলে ত' চলবে না। তোদের তবু বেশ গেছে দিনগুলো। এখন আর বাড়ীতে কোন গোলমাল নেই?'

'দুর দুর ওসব যে থাকবে না সে আগেই জানতুম। থাকে নাকি ওসব? বিয়ের লেঠা কম? মেয়ে জন্মালে পাপ বললেই ত' আর সব গোলমাল মিটে যাবে না।'

'সেত বটেই। আমার এখন মনে হয়, বলে সুতপা, তুই বাপ-মার বরং উপকারই করেছিস্। আমাদের সমাজটা কেমন জানিস? যেন সেই পুরোণ যুগের ব্যাপার, দলতায় পড়লে লোকে দোষ ধরবে নিজে করবে, কিন্তু মীমাংসায় আসতে দেবে না।'

যা বলেছিস।'

'আচ্ছা তোর সঙ্গে আলাপ ত' গানের ব্যাপারেই না?'

'হ্যাঁ, আমি কোন অনুষ্ঠানের ব্যাপার হলেই দেখি কোন ভাল গাইয়ে আসবে কিনা। যেই দেখতুম বেশ নামকরা অন্ততঃ একজনও আছে, যেতুম। আর ও, ও দেখতুম ঠিক আছে।'

'তারপর? সুতপা বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।'

'আমি ঠিক যে ফাংশনটায় যাই, দেখি ঠিক উনিও হাজির। অথচ আগে কোন আলাপ বা কথাবার্তা কিছুই ছিল না। ও ত আমাকে দেখত, আমিও ওকে দেখতুম। একবার হ'ল কি, মহাজাতি সদনে সেবার বিরাট জলসা; নামকরা সব ওস্তাদদের নিয়ে ব্যাপার, আর ভিড়ও হয়েছিল খুব।

'কি কার্ডের ব্যাপার ছিল? না টিকিট কেটে যাওয়া?' সুতপা জিজ্ঞেস করে।

ওরে বাবা টিকিটের দাম শুনলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্টে আমার এক সম্পর্কে কাকার হাতে পায়ে ধরে কোনরকমে একটা গেট-কার্ড জোগাড় করেছিলুম। উনি ওদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। সে কি ভীড়, মেয়ে-পুরুষের কোন বাচ-বিচার নেই। টিকিট কেটেও কতলোক দাঁড়িয়ে। ফুটপাতে লোক বসে গেছে, মাইকে শুনবে বলে। আমার গেট-কার্ডেও কোন জায়গা পেলুম না......'

'উঃ কি নেশারে তোদের, নমস্কার নমস্কার'—সুতপা হাতজোড় করে অমিতাকে নমস্কার করে।

অমিতা বলেই চলে—'আমি শুনছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একমনে। বেশ কয়েকজনের পর পর হয়ে গেল, আর বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ মনে হল

আমার গায়ে কে যেন অল্প অল্প টোকা মারছে। আমি ভয়ে চমকে উঠে পাশে তাকিয়েই দেখি উনি, সিটে বসে আছেন। আমায় বললেন আসুন আসুন এইখানে বসুন। দেখি তার পাশের সিটটা খালি। আমি ত' তড়বড় করে গিয়ে ভাল করে বসি, তারপর একটু স্বস্তি পেলে উনি বললেন—আমার বন্ধুটি চলেযেতেই এদিকে তাকালুম দেখি আপনি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বোধহয়।'

'মানে সেই থেকেই আলাপ।' সুতপা বলে উঠে—

-তা বলতে পারিস। পাশাপাশি বসেছিলুম ত' অনেক আলোচনা হ'ল। অবশ্য ওই গানের ব্যাপারেই। সেদিনই জেনেছিলুম যে উনিও গানটান করেন, তাই বাড়ীতে বলেছিলুম '

'তোদের বাড়ীতে শুনেছি ওঁকে বেশ খাতির করে সবাই।'

'হ্যাঁ তা' সেটা ছিলই। অবশ্য ওর প্রকৃতির গুণে ভাই, নিজের লোক বলে বাড়িয়ে বলব না, এটা আমি দেখেছি যে যা চায় সে তা পায়। আর গান ও ভালই গায়।'

'তা' বিয়ের ব্যাপারেই বাড়ীতে একটু মন-কশাকশি হ'ল।'

'কি আর করি বল, ওটা হবেই। কেননা সেই ব্যাপার, যা বললি। তবে……মা'র অমত ছিল না ভেতরে ভেতরে, কিন্তু বাবার অমত ছিল সংসারের কথা ভেবে। আরও ত' বোন রয়েছে, তাদের বিয়ের ব্যাপারে যদি কেউ কোন কথা তোলে।'

হেসে ফেলে সুতপা—'তা' হল কি ক'রে? তোদের তিন বোনের ত'হয়েই গেল পরপর।'

'তা' তখন ত' আর বোঝা যায়নি। যাক্, কিন্তু তুই কি করছিস্? দেখ, সময় থাকতে থাকতে ক'রে ফেল, সময় চলে গেলে তখন কে আর কাকে দেখবে? অবশ্য যদি করিস।'

সুতপা দীর্ঘশ্বাসটা সামলে নেয়—

'ও যা হয় দেখা যাবে, এই ত' অবস্থা দেখছিস। কি বলিস? আমার কি এখন বিয়ে করে কনেটি সেজে পরের ঘরে যাওয়া চলে?'

'সেটা অবশ্য আমার পক্ষে বলা শক্ত, কিন্তু জানিস এটাকে এড়িয়ে গিয়ে বেশী বয়সে নিজেকে ভুলে থাকার মত হয়ত কিছু নাও পেতে পারিস।'

'বুঝছি রে কিন্তু……'

'ওর কিন্তুটা কিন্তুই থেকে যায়। অনিতার ছেলেটা কি একটা নিয়ে খেলা করছিল আপন মনে, তাকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে। তারপর চলে যায় অনিতা।

'আরে কেন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, ওসব হবেনা, ভুলে যাও।'

'হাঃ তুমি ত' সবই বুঝে ফেলেছ আমার ধারণাগুলো বড় একটা মিথ্যে হয়না এ আমি দেখেছি অনেকবার।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপর থেকে তখন সন্ধ্যার লাল আভাটা মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে। চারদিকে মেয়ে-পুরুষ আর তাদের কাচ্চাবাচ্চাগুলো দিব্যি ঘোরাফেরা করছে। যেখান থেকে মেমোরিয়ালের পুরো ছায়াটা জলের ওপর দেখা যায়, সেখানে এসে ওরা দু'জনে বসে পড়ল।

'তোমার তৈরী করা ধারণা তোমারই থাক, এখন মেয়েকে আর বিয়েতে না জড়িয়ে ভাল করে প্র্যাক্টিসটা বুঝতে দাও।'

'কেন দিদির সম্বন্ধটা খারাপ কি? বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যাদ বিলেতে যায় ত' যাক্ না। এতে তোমার আপত্তি কেন?'

'আপত্তি তোমার আশা দেখে, বলেন অনুপমবাবু, ছেলের যা পরিচয় দিচ্ছ, অতবড় ইঞ্জিনিয়ার এই বয়সেই, তাতে ও সুতপাকে পছন্দ করবে কিনা, তার ওপর খাঁই কত, এসব দিকও ত আছে। শুধু শুধু মেয়েটার মনটা উসকে দিয়ে কি ভাল হবে?'

'এখন ওকে পছন্দ না হওয়ার কোন কারণ নেই,, এ ধারণা আমি পাল্টাতে পারব না, তারপর দেনা-পাওনার কথা আগের মত উঠবে না, কেননা মেয়েও ডাক্তার, কথাটা চালিয়ে যাওনা, না হয় না হবে।'

'না না আমি ওর মধ্যে নেই, মেয়েদের নিজেরও এখন মত বলে কথা আছে। তার ওপর দেখাশাকাতের পর বিয়ে না হলে, জিনিষটা ঠিক হবেনা।'

'কিন্তু বয়স থাকতে থাকতে হলেই ত' ভাল, বুড়ো বয়সে হ'লে তখন কে তাকে দেখবে বলত ?'

অনুবাবু চিন্তিতভাবে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ, তারপর বলেন—

'সে হয়ে যাবে। এখুনি এমন কিছু করা ঠিক নয় যাতে ওর মনটা চঞ্চল হয়ে যায়। বিয়ের দেখাশুনোর কথা ওর কাছে লুকোতে পারবে না, ও জানবেই, আর বয়স কাঁচা মনস্থির করা শক্ত হয়ে উঠবে। তবে দিদিকে লিখে দাও কোন ছুতো করে আমাদের বাড়ীতে আসুক না ছেলেটি। দেখা যাক না, তারপর যা'হয় চিঠিতেই বলা যাবে।'

আমিও ত' তাই বলছি। তা'ছাড়া আমরা যে সম্বন্ধ দেখছিই সেটা কি তোমার মেয়ে বোঝে না বলে ভাব ? ও সব বোঝে, কচি খুকি নয়, বরং তুমি জেনে রাখ হয়ত আমাদের ওপরই ভরসা করে বসে আছে।'

দু'জনেই হাসে।

'সুতপার কি বিয়ে করার ইচ্ছে সত্যিই আছে ? ও যেভাবে সেবার বেঁকে বসল, আমার ত' ধারণা ওর ওসব ব্যাপারে সে রকম আগ্রহী নয়। নেহাৎ সবার কথায় রাজী হওয়া গোছের ব্যাপার।'

'না গো না, সুনন্দা বলে, 'ইচ্ছে খুবই আছে, তবে চাপা। মেয়ে তোমার নিজের গোঁ এর তলায় আসল ইচ্ছেকে লুকোতে ওস্তাদ।'

'যাই হোক্ বংশের নাম রেখেছে এই সান্ত্বনা।'

দূরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। দু'জনেই তাকান দূরে রাস্তার দিকে, একটা বড় মিছিল চলেছে, হাতে পতাকা ফেষ্টুন সব নিয়ে। স্লোগান শোনা যাচ্ছে কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

'কিসের ওটা ?' সুনন্দা জিজ্ঞেস করে স্বামীকে।

'কিসের আবার ? কোন ক্যাটেগরীর দাবীদাওয়া নিয়ে ব্যাপার আরকি। দীর্ঘশ্বাস পড়ে অনুপমবাবুর—তখন সেই পচা পুরোন বিকোত কেটেপড়ে মিছিল হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। এই মিছিলগুলো জমতে জমতে আবার একটা বিপ্লবের রূপ নেবে, এই আর কি ?'

'পারবে ওরা বিপ্লব আনতে ?' সুনন্দা কথার কথা হিসেবে অন্যমনস্কভাবে একটা ঘাস দাঁতে কাটতে কাটতে বলে।

'না পারার কি আছে ? তা' ছাড়া ওদের পারতে বাধ্য করবে।'

'কারা ?'

'কারা আবার ? দেশের অবস্থা পরিবেশ।

সুনন্দা নীরবে শোনে, তাকিয়ে থাকে দূরে। হেসে ওঠেন অনুপমবাবু—

'আমরা পারলুম কি করে ?'

অবাক্ হয়ে তাকায় সুনন্দা স্বামীর দিকে।

'আমরা কি ক'রে পারলুম বল ? আমাদের পরিবারে এই যে বিপ্লবটা হয়ে গেল, এঁ্যা ? সুতপা নিজের বিয়ে নিজেই ভেঙে দিলে, তারপর আমরা এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি বল। আমাদের বাড়ীর মেয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে এখন যদি নিজের স্বামী নিজে খুঁজে নেয় কিছু কি অবাক্ হবার আছে ? মা বাধা দিতে পার ? অথচ দশ-বছর আগে হ'লে শুধু তুমি কেন আমিও শুনলে চমকে উঠতুম।'

'তা' বটে এও এক বিপ্লব বইকি।' সুনন্দা অন্যমনস্কভাবেই বলে। আজকের এই কাকামাঠের স্বামীর সংসর্গ-মাখা সন্ধ্যাটি তার বড় ভাল লাগছে।

'পুরোণ মেয়ে দেখার রীতিকে কি ভাবে তোমার মেয়ে আঘাত করল বলত। মনে পড়ে, তারপর তারাই যখন শুনল সুতপা ডাক্তারী পড়ছে, তখন শুধু পায়ে ধরতে বাকী রেখেছিল ?'

'খুব খুব মনে আছে।'

'এই যে তুমি এখানে এই বয়সেও বসে বসে হাওয়া খাচ্ছ এটাই কি আগে ছিল ?'

'তা' যা বলেছ। আমাদের এসব কিন্তু বয়সকালে বড় একটা হয়নি, গুরুজনদের শাসনটা একটু বেশী ছিল।'

এখন দেখছে ওকজনরাও মানিয়ে নিচ্ছে। বিপ্লবের ঢেউ জীবনের সব জায়গায় এসে লাগছে, এই মিছিলে যেন আমরাও আছি।'

'কিন্তু মিছিল কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে।' দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুনন্দার।

'না-না' তুমি আর উদাসীন হয়ে থেকনা,' একটু যেন অনুনয় ঝরে পড়ে সুনন্দার স্বরে, মেয়েটার বিয়ের চেষ্টা কর, ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থেক না। এখনও বয়স আছে, মনটা কাঁচা আছে, এখন ঘর বাঁধলে সুখী হবে, মানিয়ে নিতে পারবে। পরে ডাক্তারী করতে করতে এমন হয়ে যাবে যে তখন মান-মর্য্যাদা এইসব এসে পড়ে আরও বাধার সৃষ্টি করবে……যেমন কালোদার বোন, মোটাসোটা ভারিকি, মাষ্টারি করে, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, মাগো, এখন বিয়ে করলে কে কাকে সুখী করবে?'

অনুপমবাবু গা এলিয়ে দিয়ে ঘাসের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় একটা ঘাস দাঁতে কাটতে কাটতে কি যেন ভাবতে থাকেন। বেশ একটা সাজ্যালমেজ যেন সারা দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছে। স্ত্রীর কথা সবই শুনছেন, বুঝছেন সবই, মেয়ের সংসার দরকার। সত্যিই মেয়েকে আর কিছু দিতে না পারলেও, যদি স্রেফ একটা শান্তির সংসার গুছিয়ে দেওয়া যায়, সেটাই যেন আজ মনে হয়, তাকে সবথেকে ভাল জিনিস দেওয়া। কিন্তু সে ত' আর সব সময় নিজের ইচ্ছেমত হয় না। সুনন্দা যা বলছে সবই ঠিক, এর মধ্যে মেয়ের জন্তে মায়ের চাওয়ার অতিরিক্ত কিছু নেই কিন্তু……দেখা যাক্।

'তুমি তোমার দিদিকে এই কথাই লিখে দাও। তারপর দেখা যাক্ না কি হয়। বেশত বল্‌ছো তখন চেষ্টা করা যাক্।

'না না আমি বল্‌ছি বলে নয় তুমি নিজেও ভেবে দেখ।

সোমবার সন্ধ্যায় সুতপা নিজের চেম্বারের উদ্দেশ্যে পথ থেকে ফিরছে, কানে গেল বাবা-মার কথাবার্তা, কই যেন একটু জোরে, একটু ব্যস্তভাবে। যা ওর কাছে একটু অবাস্তব বলে মনে হল। টুকরো কথার মধ্যে শুনল—টেলিগ্রা,…কাল ভোরেই……হয়ত মন খারাপ করবে…ওর বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। ঠিক ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না ত'। পদক্ষেপ মন্থর হয়ে এল, কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। অনুমানে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করতে করতে নিচে নেমে আসতেই দেখে বাবা-মা দুজনেই দাঁড়িয়ে। ওদের মুখে কোন ভয়-ভাবনার চিহ্ন না দেখে আশ্বস্ত হ'ল।

'ওরে সুতপা, তোর নামে এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম এল,' বাবা বল্‌লেন।

সুতপা নিরব জিজ্ঞাসু।

'সেই যে যে আনন্দবাবু,' এবার মা ওর কৌতূহলের যবনিকা-পাত ঘটায়।

'বিলেত থেকে ফিরছে কাল ভোরে, তোকে এরো-ড্রোমে যেতে বলছে। দাও না, দাও ওকে ওটা।'

অনুপমবাবু টেলিগ্রামটা ওরদিকে বাড়িয়ে দেন, সুতপা নির্লিপ্তভাবে হাত বাড়ায়।

'কিন্তু বাড়ীতে ওর অত লোক থাকতে আমাকে যেতে বলার মানে?'

'বাড়ীর লোক ত' যাবে নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে মনে হয় তোর মত পুরোণ বন্ধুদেরও একটা করে টেলিগ্রাম ছেড়েছে ফেরার আনন্দে; বলেন অনুপমবাবু।

'তা বটে,' সুতপা নিজের ঘরে চলে যায়। ভেতরে একটা অহেতুক উল্লাসের ঝরণা-পাত সুরু হয়েছে, তা' যতক্ষণ চেপে রাখা যায় ততক্ষণই ভাল! চেয়ারে বসে ভাল করে টেলিগ্রামটা দেখল। হ্যাঁ তাই বটে, নতুন কিছু নয়, তারিখটা আগামী-কালের, সাধারণ-ভাবে নির্দিষ্ট সময় সকাল ছ'টা, বিমান-বন্দরে দেখতে পেলে খুসী হবেন, এই আর কি?

বাড়ী ফেরার কি আনন্দ, ভাবে সুতপা, যতগুলো বন্ধুদের ঠিকানা পাওয়া গেছে একটা করে টেলিগ্রাম ছেড়ে দিয়ে জানান দেওয়া। কিন্তু যাওয়া কি সম্ভব? সেই ভোরে উঠে, রাস্তাও ত' কম নয়। দেখারই বা কেমন? এক গাঁদ ফুল বেঁধে যাওয়া যেত' হ'ত……হঠাৎ মা ঘরে ঢোকে।

'ফিরে যাবি নাকি কাল ?'

'পাগল নাকি, সেই ভোরে উঠে যাওয়া কাজকর্ম ছেড়ে ?'

'কিছু মনে করবে না ?'

'মনে করলে আর কি করব ? উনি না হয় আনন্দের আতিশয্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, তা' বলে আমার ত' সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটি করে তার জানানি দেওয়া চলে না। উনি এলে, এসে দেখা করবেন এখন। তখন বললেই হবে সময় পাইনি।'

'হ্যাঃ তা যা বলেছিস্। এমন অসময়ে যাওয়া কি হয়ে ওঠে ? বরং সন্ধ্যেটন্ধ্যে হলে না হয় বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া যেত।'

একটি মহিলা বাইরের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে হেসে সুতপাকে নমস্কার জানায়, সুতপাও প্রতি-নমস্কার দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দেয়। সুনন্দা ঘর থেকে চলে যায়।

মহিলাটির বয়স প্রায় পঞ্চাশের ওপর, সাধারণ বেশ-ভূষা, কিন্তু আধুনিকতার ছাপ আছে। তাঁর মেয়ের সম্প্রতি সন্তান হওয়ায়, তার শরীর কিছুদিন খারাপের দিকে যাওয়ার জন্যে সুতপার চিকিৎসাতেই আছে। উনি এসেছিলেন রোগিনীর খবর জানিয়ে পরামর্শ নেবার জন্যে।

আজকাল রোগীর আসা-যাওয়া মন্দ হয়না সুতপার কাছে। মন তখন ওর হয়ে ওঠে অন্যরকম। মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা যে ঠিক কোন পর্য্যায়ে গিয়ে তাকে চিকিৎসকের হাতে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করে, ও যেন তা' স্পষ্ট দেখতে পায়। আজ কিন্তু মন ওর চঞ্চল, কেন কে জানে ? কিংবা কে বা আর না জানে যদি তার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

অবশেষে একদিন পড়ন্ত বেলায় হাজির হলেন আনন্দবাবু। সুতপা তখন খাওয়া সেরে দুপুরের তন্দ্রা-টুকুর শেষ-প্রান্তে এসে সবে চেয়ারে বসেছে, আলুথালু-কেশ ঘুমভাঙা ফোলা ফোলা মুখে। হরি এসে জানাল, সেই বাবুটি এসেছেন। কোন বাবুটি সুতপা অনুমানে বুঝে তাকে আসতে বলে মাকে ডাকতে গেল। সুনন্দাকে নিয়ে যখন ঘরে এল, দেখল আনন্দবাবু দিব্যি ধুতী-পাঞ্জাবী পরে ফুলবাবুটি সেজে চেয়ারের ওপর পা-মুড়ে বসেছেন। ওদের দেখেই দাঁড়ালেন এবং যথা-রীতি অভিনন্দন এবং কুশল দেওয়া-নেওয়ার পরে আবার আগের মতই চেয়ারে বসলেন পা-মুড়ে।

সুনন্দা বলে, 'দেশে সাহেব হয়ে থেকে, বিলেত থেকে বাঙ্গালী হয়ে ফিরলে কি রকম ?'

হেসে ওঠে তিনিজনেই। সুতপা বলে বসে—'ঠিক বিলেতেই গিয়েছিলেন ত' না কি মাদ্রাজ কিংবা আসামটাকেই আমাদের কাছে বিলেত বলে চালিয়ে দিয়েছেন ?'

'না-না তা হতেই পারে না, সুনন্দার সান্ত্বনা, চেহারাতেই রয়েছে বিলেতের ছাপ, সেকি আর ধুতী-পাঞ্জাবীতে চাপা পড়ে ?

'কেন ? আমাকে এতে মানায় না ?'

'খুব মানায়, সেটা তোমার চেহারার গড়নের জন্যে, কিন্তু বিলেত থেকে সত্ত ফেরার ছাপ তোমার চেহারায় আছে।'

'যাক্,' ও একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'তা'হলে আপনি বিশ্বাস করছেন।'

'কেমন কাটালে বল ? পরীক্ষা-টরিক্ষা সব চুকিয়েই এসেছ ত', না আবার যেতে হবে ?'

'নাঃ ও সব চুকিয়েই এসেছি, এখন আর যাবার ভাবনা কিছু নেই, এখানেই স্থিতি। আর বাড়ীকেও সেটা চায় না।'

অনেক কথাই হ'ল, দেশের বিদেশের মিলিয়ে। সুতপা সুনন্দা শুনল, ভাবল অনুমান করল, কল্পনায় ভাল করে দেখার চেষ্টা করল অনেক কিছু। এবার আনন্দবাবুর চিন্তা কি করে এখানে একটা কাজ যোগাড় করা যায়। অবশ্য ওদের সঙ্গতি যা তাতে দুর্ভাবনার সঙ্গে ছুটোছুটি করার দরকার কিছু নেই এই যা।

কথায় কথায় সুতপা জিজ্ঞেস করেছিল—'আচ্ছা আপনার দু'জন আত্মীয়ও ত' আপনার সঙ্গে ছিল না ? ইঞ্জিনিয়ারিং না কি যেন পড়তে ? তারাও কি আপনার সঙ্গেই ফিরল ?'

'একজন ইঞ্জিনিয়ারিং আর একজন ডাক্তারিতে ছিল বটে। কিন্তু তারা ফিরবে কেন?' একটু হাসেন আনন্দবাবু।

'কেন তাদের কোর্স বুঝি শেষ হয় নি?'

'শেষ হয়েছে আমার সঙ্গেই, কিন্তু সেটাই তো হল কাল। অতবড় কোয়ালিফিকেশন নিয়ে এখানে এসে দাম পাবে?'

'কিন্তু……'সুতপা কি যেন বলতে গেল।

'ও বলার কিছু নেই,' থামিয়ে দেন আনন্দবাবু, কোয়ালিফিকেশনের দাম যেখানে উঁচুপোস্টের মোটা মাইনের সেখানে দেশ-বাড়ী-আত্মীয় সব তুচ্ছ। আপনাকে কিন্তু এয়ার পোর্টে আশা করেছিলুম।'

'সেখানে ত' গেলে কত ভাল হ'ত বলে সুনন্দা, কিন্তু কি করেই বা যায়।'

'যাব কখন বলুন? আপনার টেলিগ্রাম এল আগের দিন সন্ধ্যায়। পরের দিন সকালে হাসপাতাল—ফেলে যাই কি করে বলুন? বিকেলের দিকে হ'লে অসুবিধে হ'ত না।

'তা' বটে। অবশ্য আমিও ওই রকমই একটা অনুমান করেছিলুম।'

'কে কে গিয়েছিল?' সুতপা জিজ্ঞেস করে।

'বাড়ীর সবাই, একেবারে ঝেঁটিয়ে যাকে বলে।' হাসে ওরা।

'আর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে?'

সুতপার এই প্রশ্নে আনন্দবাবু একটু অবাক্ হ'ন—

'তারা জানবে কি করে? চীনেবাজারের লোককে টেলিগ্রাম করে জানাব নাকি যে আমি আসছি, আর এসে তাদের মাথা কিনছি। অবশ্য এসে সবারের সঙ্গেই দেখা করেছি।'

সুনন্দা আসছি বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে যায়।

ওরা অনেকক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা করে। অনুপমবাবু অফিস থেকে ফিরেছিলেন, তিনিও একবার ঢু' মেরে যান।

—ক্রমশঃ

ইঁদ পরব

ভাগবতদাস বরাট

বার মাসে তের পার্ব্বণ কথার অর্থ এই নয় যে বৎসরের গুণোত্তনীত বারটি মাসের মত তেরটি পরব। বাঙালী হিন্দুর পার্ব্বণ বা পরবের সংখ্যা বহুবিধ। কথার তাৎপর্য্য এই যে উৎসবাদির সংখ্যা এত বেশী যে তা বার মাসেও পূরণ হবার নয়। দেশ, জাতি ও কাল ভেদে বিভিন্ন পার্ব্বণ অনুষ্ঠান। এসবের সূচনা আজকালের কথা নয়,—বহুযুগ আগের থেকেই চলে আসছে। তবে আগের তুলনায় খানিকটা জাঁকজমক হয়ত হ্রাস পেয়েছে। হয়ত আগের মত পাড়া-প্রতিবেশী জনগণকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা বড়একটা হয়না। কিন্তু তা হলেও পুরাণো কাঠামো ঠিক বজায় আছে। পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রবর্তিত প্রথা আজও চালিয়ে আসছে তাঁদের বংশধরেরা। সাংসারিক নানাবিধ অভাব-অনটনকে ভুলে থাকতে উৎসবানুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে আজও জিইয়ে রেখেছে। যেমন বিষাদে মন ভারাক্রান্ত হলে অতীতের সুখ স্মৃতি চিন্তা করে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মনকে চাঙ্গা রাখতে চেষ্টা করে, এও ঠিক সেইরূপ। আমাদের উৎসবাদিও তেমনি মন-ভুলানো বাতিক বিশেষ। অবশ্য এ বিষয়ে মতানৈক্য থাকা স্বাভাবিক। উৎসবানুষ্ঠানকে যিনি যেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছে সেই তাঁর মত—উৎসবের সংজ্ঞা। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এসবের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। যা আলোচ্য বিষয় তা হল ইঁদ পরব।

মুসলমানদের ঈদ আর ইঁদ পরব এক নয়। চাঁদ-সূর্য্যের তফাৎ। দুর ছাই, কথাটা ঠিক হলনা বরং বলা চলে, আকাশ পাতালের ফারাক্। ফুর্ত্তি বা আনন্দেই যা সাদৃশ্য। আর তা তো থাকবেই। পরব অর্থেই তো ফুর্ত্তি। আনন্দের উৎস। ধর্মভিত্তিক দেশে আনন্দ স্ফুরণের বিবিধ পন্থা। প্রয়োজনে নয়, মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্ররোচনায়।

এদেশের মানুষের মন ঈশ্বরভাবাপন্ন। ব্রহ্মকে পেতে অহরহ ব্যাকুলতা। সে কারণে মনে আনন্দ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। হয়ত সে কারণেই উৎসবানুষ্ঠানের সূত্রপাত।

আনন্দই ব্রহ্ম। মন যদি আনন্দের বর্ণাধারায় অবগাহনে উৎসুক হয়, আর, সাবেসাক্ষে যদি মনে আনন্দপ্রাপ্তির ইন্ধন জ্বলে তা হলে আমরা আনন্দময় পরম ব্রহ্মের সান্নিধ্য সুখ কিছু না কিছু পাবই। হয়ত এই সব কথা চিন্তা করেই আগের দিনের জনমানব এই সব নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণের প্রচলন করে গেছেন। ইঁদ পরবও সেইরূপ একটি আনন্দদায়ক উৎসব বিশেষ। এবং তা পূজার মাধ্যমে উপভোগ্য। যেমন, গোলাপের সৌন্দর্য্যের মাধ্যমে সুবাস।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য-উৎসবের নাম ইঁদ পরব। এই পরবের মাধ্যমে বৈদিক হিন্দু দেবতা ইন্দ্র এবং অনার্য্যদের বৃক্ষদেবতা একই সঙ্গে মিশে গেছেন। ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই পরব। এই অনুষ্ঠানটি বর্ষার দেবতা ইন্দ্রের পূজা এবং তা বৃক্ষ পূজার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। গ্রামের ময়দানে কুড়ি-পঁচিশ হাত লম্বা শালখুঁটি পুঁতে তার মাথায় একটি লাল শালুর ছাতা ঢেকে সেই শালখুঁটিকে নানা উপ-চারে পূজা করা হয়। ঐ খুঁটিই তখন ইঁদ নামক দেবতার প্রতীক। লোকে বলে ইঁদ কাঠ, এই উৎসবে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী ও গ্রাম্য মানুষের দল মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে, মদ বা সুরাপানে মত্ত হয়, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের রাজবংশের উৎসবের সঙ্গে এই ইঁদ পরবের সাদৃশ্য দেখা যায়।

ঝাড়গ্রামের ইন্দ্রদেবের পূজায় মুর্গী ইত্যাদি বলি দেওয়ার প্রথা আছে, অনেকদিন ধরে নাচ-গান ও উৎসব চলে, অনেকের মতে অতিবৃষ্টি নিবারণের উদ্দেশ্যে ভাদ্র মাসে এই উৎসবানুষ্ঠান, কিন্তু তাই কি? তা যদি হয়, তা হলে যে বৎসর অতিবৃষ্টি হয় না সেই বৎসর কেন ইঁদ পরব হয়? পর্ব্বের পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে। পৌরাণিক কাহিনী এই যে অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, ইন্দ্রের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে একটি ধ্বজা প্রদান করেন, সেই ধ্বজা নিয়ে ইন্দ্র আবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং অসুরদের পরাজিত করে স্বর্গ হতে বিতাড়িত করেন। আর চেদীপতি সেই ধ্বজা নিরাশংকায় পূজা করেন। তাঁর সেই পূজায় ইন্দ্রদেব তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করে বলেন যে, যদি কোন রাজা ধ্বজা পূজা করেন তা হলে তাঁর ঐশ্বর্য্য লাভ, রাজ্যে শস্যবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটবে। সেই থেকে পূজা সুরু। ইঁদ পরবের সূচনা।

এ বিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য :—"আর্য্যরা যখন যুদ্ধে অনার্য্যদের পরাজিত করেছেন, রাজা হয়েছেন, তখন এভাবে বিজয়োৎসবের পালন রীতি প্রচলিত করেছেন। যুদ্ধে যে তাঁরা অনার্যদের সহজে পরাজিত করতে পারেন নি তার আভাস সুস্পষ্টভাবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে।

"অনার্য্যরা জঙ্গলে বাস করত এবং অনেকে জঙ্গলের বড় বড় গাছও পূজা করত। সেই অনার্য বৃক্ষোৎসবকেই রাজকীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আর্য্যরা ধ্বজা উৎসবে পরিণত বা রূপান্তরিত করেছেন। এরই কারণ হলাবে দেখা যায়, শালবৃক্ষের খুঁটি যদি অনার্য্যদের বৃক্ষপূজার প্রতীক হয়, তবে তার মাথার উপর ছত্র হল আর্য্যদের জয়ের প্রতীক চিহ্ন। আর ঐ চিহ্নই আর্য্যদের জয়লাভের ইঙ্গিত করে, কিন্তু পরবর্তী কালে আর্য্য ও অনার্য্যরা যখন পাশাপাশি বসবাস করতে শুরু করেছে, তখন তারা একীভূত হয়ে পড়েছে। সংঘর্ষের কথা ভুলে গিয়ে তারা তখন উভয়েই ইঁদ পরবে মেতে উঠেছে, সুতরাং ইঁদ পরব আর্য্য ও অনার্য্যদের সংমিশ্রিত পূজা—যদিও এই পূজায় অনার্য্য অনুষ্ঠানের আধিক্য বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্‌প্রসঙ্গে এরই কারণ হিসাবে বাংলা ভাষা, আর বাঙালী জাতির গোড়ার কথা প্রসঙ্গে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য বলে মনে করি। তিনি বলেছেন—"এই সব আর্য্যবর্ত্তীয় ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে উত্তর ভারতের সঙ্গে তাঁদের যোগ হারিয়ে ফেলেন, আর অতীতের অন্ধকারময় যুগে যার ইতিহাস আমাদের জানা নেই, সেই যুগে স্থানীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বা ব্রাহ্মণেতর অন্য জাতের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে মিশে গিয়েছিলেন এবং এরই ফলে যে মিশ্র ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক মানস তৈরী হয়েছিল বাংলাদেশে তারই পরিচয় আছে—পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে ও ব্রত-কথায়।"

মানভূম, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, বাঁকুড়া জেলার খাতড়া ও অন্যান্য থানায় ও গ্রামে ইঁদ পরব অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার খাতড়ায় যে ভাবে ইঁদ পরব অনুষ্ঠিত হয়, সেই কথাই বলছি। খাতড়ার রাজা অর্থাৎ জমিদার উক্ত পর্ব্বের উদ্যোক্তা। যদিও বর্ত্তমান কালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত, তবুও পুরাণো রীতি অনুযায়ী ঐ জমিদার বা তদ্‌বংশীয় স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত পর্ব্বানুষ্ঠান আজও চালু আছে। ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে ইঁদপর্ব্বের নির্দিষ্ট তারিখ। এখানে ইঁদ কাঠকে মাটিতে পোঁতা হয়না। দু'পাশে দুটো পোঁতা কাঠের অবলম্বনে দু'ধার থেকে দড়ি বেঁধে তুলা হয়, কাঠের শীর্ষদেশ আকাশমুখী থাকে, প্রথম দিনে ইঁদকাঠকে একটু হেলান অবস্থায় রাখা হয়, পরদিন দড়ি টেনে সোজাভাবে তুলা হয়, পরব চলে দু'দিন, খাতড়ার রাজবংশীয় ব্যক্তিই উক্ত ইন্দ্রদেবতার পূজারী, ইঁদকে ঐ ভাবে সোজা উর্দ্ধমুখে তুলে রাখার নাম ইঁদ উঠা, রাজবাড়ীর কাছাড়ি প্রাঙ্গণে প্রশস্ত ময়দানে ইঁদ উঠে, রাজা পুরাতন প্রথা অনুসারে পাল্কি চড়ে রাজবাড়ী হতে পরবক্ষেত্রে হাজির হন, দু'পাশে

রাজপথে অগণিত জনতা, যারাই পূজারী। তাঁর পূজা হলেই পরব সুরু, সাঁওতালরা নাচ-গান সুরু করে, মাদল বাজে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য জাতীয় লোকও মেতে উঠে, নাচের ঐক্যধ্বনি বাতাসে ভাসতে থাকে, আর সেই সঙ্গে সাঁওতালি গানের সুর, মহুয়ার নির্য্যাস পানে মনে নূতন আবেগ, ঢালো ঢালো আরো ঢালো এখনো ভরেনি ভাল পাত্র।

এই লৌকিক উৎসবে জাতিভেদ নেই, সর্ব্বস্তরের সব মানুষই আনন্দ লাভে মেতে উঠে, আশপাশের চারধারে নানা দোকানপাঠ বসে, ক্রেতা বিক্রেতার সমাগমে প্রাঙ্গণ কোলাহলে মুখরিত হয়। হাট ও কেনা-বেচার মেলা বসে, দু'দিন পর সব ফাঁকা, দোকানদার দোকানপাট তুলে নিয়ে চলে যায়, আর ইঁদকাঠ ফাঁকা প্রান্তরে মাথায় ছত্র ধারণ করে দণ্ডায়মান থাকে। দড়িবদ্ধ অবস্থায় তাকে তুলে সোজাভাবে দাঁড়ান অবস্থায় রাখা হয়, ঐ দড়িকে ইঁদের দড়া বলে, এই অবস্থায় সাতদিন থাকে, তারপর দড়ি কেটে ওকে মাটিতে ফেলা হয়, ওকে বলে ইঁদ পড়া, শুদ্ধ ভাষায় বলে ইন্দ্রপতন।

এখানে লোকমুখে প্রবাদ এই যে ইঁদের দড়া ধরে শীত নামে। অর্থাৎ ইঁদ পড়ার পরই একটু একটু শীত পড়তে সুরু হয়। ইঁদ উত্থান অর্থে বর্ষার সমাপ্তি এবং শীতের সমাগম, সাতদিন ইঁদউত্থান অবস্থায় থাকে, তারপর ইঁদ পড়ে। ছেলেবেলায় নানা উপকথার সঙ্গে দিদিমা ইঁদের কথাও তুলতেন, বলতেন ইঁদের দড়া সাতদিন পর আপনা আপনি ছিঁড়ে যায়, কথায় বিস্ময় জন্মালেও বিশ্বাস করতাম, কিন্তু পরে জেনেছি ইঁদ আপনা আপনি পড়ে না, সপ্তাহ অন্তে তার দড়ি কেটে ফেলা হয়, উন্মুক্ত নির্জ্জন প্রান্তরে ইঁদকাঠ সেই থেকে পড়ে থাকে। নিশ্চুপে এক বছরের প্রহরগুলো হয়ত সে কারণে নিকর্মা অলস প্রকৃতির মানুষকে এদেশের লোকেরা ইঁদকাঠের সঙ্গে তুলনা করে।

স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস ইঁদ উঠার পর থেকে এই সাতদিন কালের মধ্যে বৃষ্টি-ঝড় হবেই। আর তা হয়ও। অন্ততঃ মেঘ করেও মেঘকাটে, ঝড়-বৃষ্টি হয় না, অধিবাসীরা তখন আক্ষেপের সুরে বলেন,—কালের পরিবর্ত্তনে মানুষের ধর্মকর্ম্মের রীতি যেমন পাল্টেছে তেমনি দেখ মহিমারও ওলট্ পালট্ অবস্থা। আর যদি ঝড়-জল হয় সামান্য একপশলা বৃষ্টিপাত কিম্বা সামান্য একটু ধুলো-বালি উড়ে যদি দমকাহাওয়ায় স্বল্পতম বিপর্য্যয় ঘটে, তা হলে তাঁরা বলেন—ইঁদের মাসী-পিসী কাঁদছে, কিন্তু কেন কাঁদছে? উত্তরে শুনি ইঁদ যে পড়ে যাবে সেই দুঃখে-শোকে ওদের ক্রন্দন।

লৌকিক উপকথায় ইঁদ উপদেবতা, আমাদের মত তাঁর মাসী-পিসী আছে, অর্থাৎ মানুষের মতই দেবতা। আমাদের যেমন মাসী-পিসী থাকে তেমনি ইঁদ-ঠাকুরেরও, দেবতাকে আপনার মত ভেবে মানুষ নিজেদের মত কল্পনা করেছে। বর্ষাবিধৌত আকাশে শীতের সঞ্চার পথের সূচনা হওয়ার ইঙ্গিত জানায় ইঁদ-ঠাকুর, শীতের আক্রমণ প্রতিহত করতে মানুষকে তৎপর হওয়ার নির্দ্দেশ জাহিরও করেন সেই সঙ্গে। সাঁওতাল প্রভৃতি অনগ্রসর জঙ্গলবাসী জনগণের অনেকেরই এই ইঁদপরবে ইঁদেরমাঠে হয়ত ইঁদকে সাক্ষী মেনেই বিবাহাদি সংগঠিত হয়। সুতরাং ইঁদ পরব বৃক্ষ বিবাহের রূপান্তর, তবে পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ ইঁদপরবের তারিখে ইন্দ্র পূজা বা ইন্দ্রলোকাদি পূজা লেখা থাকে, অবশ্য একথাও বলা চলে যে ইঁদপরব ইন্দ্রদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের উৎসব এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

বর্ষা অন্তে এই উৎসব, বর্ষায় বৃষ্টিপাত ভালভাবে না হলে শস্য উৎপন্ন হবেনা, সুতরাং কৃতজ্ঞতা না জানালে ইন্দ্রদেব ও বৃক্ষদেবতা উভয়েই রুষ্ট হবেন, এই ভয়ে হয়ত মানুষ ইঁদ পূজার প্রবর্ত্তন করেছিল। মানুষ সেকালে ভেবেছিল ওদের তুষ্টিবিধান না করলে পর বৎসর সুবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। আর বৃষ্টিপাতের কারণস্বরূপ পৃথিবীর বিশালকায় পাদপকুল—বৈজ্ঞানিকরাও একথা স্বীকার করেন। সুতরাং এদের উভয়েরই কর্ত্তব্যের খাতিরে পূজার্চ্চনায় তুষ্ট করা কিসের।

মানুষ নিজেদের মত দেবতাদেরও ভেবে নিয়েছে। মানুষের যেমন মনে রাগ, দ্বেষ, অভিমান ইত্যাদি জেগে উঠে তেমনি দেবতাদেরও জাগবে, আর তা হলে মানুষেরই বিপদ, নানা ক্ষয়ক্ষতি। সুতরাং ইঁদ পুজায় দেবতার প্রতি কর্তব্যবোধ জাহির করা হলেও, যতটা না, ভক্তির পূজা তার চেয়ে বেশী ভয়ের পূজা। আর ইঁদঠাকুরকে ভয় করে বলেই সাঁওতাল প্রভৃতি অনগ্রসর জাতিরা অনেকেই ইঁদ পুজায় বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। ইঁদকে সাক্ষী মেনে বিবাহ, যাতে ভবিষ্যতে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে বর্জন না করে। সাধারণতঃ আমাদের অনেক উৎসব শস্য-উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। এই ইঁদপরবও তেমনি একটি শস্য-উৎপাদক উৎসব বিশেষ।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় খাতড়া গ্রাম ছাড়াও বিষ্ণুপুর মহকুমায় এবং ইন্দপুর, জামজুড়ি ও অন্যান্য পল্লী অঞ্চলে ইঁদপরব অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ যেখানে ক্ষত্রিয়বংশীয় সামন্তরাজা অর্থাৎ জমিদারদের প্রাধান্য ও একাধিপত্য সেখানেই এই পর্বের অনুষ্ঠান। সর্বত্রই পরবের একই রীতি তবে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে হয়ত সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। সামন্তরাজারাই ইন্দ্রের পূজারী, দেবরাজ ইন্দ্রদেব যখন দেবতাদের রাজা, তখন তিনি সামন্তরাজগণেরও পূজনীয়। এই ভাব মনে জেগে উঠায় রাজবংশের আদিপুরুষ ইঁদপরবের মাধ্যমে ইন্দ্রপূজার পত্তন করেছেন। ইন্দ্রের প্রতি অপরিসীম ভক্তি জেগেছে বলেই তাঁরা ইন্দ্রপূজা সুরু করেছেন, প্রজারা যাতে বিদ্রোহী না হয়, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং স্বীয় শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হওয়ার মানসে তাঁদের এই পূজানুষ্ঠান। নদী যেমন আপন গতিপথে একইভাবে বয়ে চলে তেমনি এই পর্বানুষ্ঠানও সুদূর অতীত হতে একই ভাবে অনুসৃত হচ্ছে, মনস্কামনা কতখানি যে পূরণ হল তা কোন কালে কোন জমিদারই খতিয়ে দেখেন নি, মানুষের বিশ্বাস, ভক্তি বা ভয় যে কারণেই এই উৎসবের উৎপত্তি হোক না কেন,—এই উৎসব যে আনন্দ-প্রকাশক তা দর্শনার্থী মাত্রই বুঝতে পারবেন। অনার্য্য অনুষ্ঠিত আর এক পরব "করমপরবের" সঙ্গে এই পর্বের সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট। সে বিষয়ে পরবর্ত্তী কালে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ত হতে পারি, তবে অনেকে যে বলেন করমপরবের থেকে ইঁদপরব চালু হয়েছে,—তা ঠিক নয়, মনগড়া কথা, করম উৎসব আলাদা উৎসব, যেমন পাশাপাশি দুই নদীর গতিবেগ ভিন্নতর, এও ঠিক সেইরূপ। যদিও একই সময়ে দুই পর্বের অনুষ্ঠান তবু তাকে এর অঙ্গীভূত বলাও সমীচীন হবে না। করম পরবও বৃক্ষপূজার নামান্তর।

কংগ্রেস-স্মৃতি

দ্বিচত্বারিংশ অধিবেশন—মাদ্রাজ—১৯২৭।

গিরিজামোহন সান্যাল

মুলতুবীর পর অপরাহ্ন ৫টার অধিবেশনের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হল।

মণিলাল কোঠারী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন:—

এই কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত অভিমত প্রকাশ করছে যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে শাসক ও জনসাধারণ উভয়েরই স্বার্থে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

প্রস্তাব উপস্থিত করে কোঠারী মশায় প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

এস্ সত্যমূর্ত্তি যোরালো ভাষায় প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পরবর্ত্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যমনালাল মেহেতা।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ওয়ার্কিং কমিটীর সাময়িক সার্কুলার অনুসারে প্রাপ্ত বিভিন্ন মুসাবেদা এবং সাজেসন বিবেচনা করে এই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীকে অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির কমিটীর সাজেসসন বিবেচনা করে স্বরাজের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার ক্ষমতা দিচ্ছে এবং উক্ত খসড়া বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতা ও প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বিধান পরিষদে সভ্য দ্বারা গঠিত বিশেষ কমিটীর নিকট মার্চ্চ মাসের মধ্যে উপস্থিত করতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মেহেতা মশায় বললেন যে স্বদেশ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতের ভার সাইমন কমিশন বা পার্লামেণ্টের নিয়োজিত অন্য কোন কমিশনের উপর দেওয়া যেতে পারেনা। ভারতের আশা সম্বন্ধে লর্ড উইনটারটনের মত পার্লামেণ্টের সকল সদস্যই অজ্ঞ। লর্ড উইনটারটন ভুল না করে ভারত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতাও দিতে পারেন না। তাঁর অজ্ঞতার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে তিনি পার্লামেণ্টে বলেছেন যে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য অতিশয় প্রবল। (এতে সভায় হাস্যরোল উঠল।)

ডাঃ বরদারাজালু প্রস্তাব সমর্থন করে যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিলেন।

নিম্বকর মশায় প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে এই প্রস্তাব স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপন্থী।

হরি সর্বোত্তম রাও প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মন্তব্য করলেন যে প্রস্তাবটি বোকামীর দৃষ্টান্ত।

যমনা দাস মেহেতা সংক্ষেপে বিতর্কের প্রত্যুত্তর দিলেন।

তিনি মত প্রকাশ করলেন যে যদিও কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা তথাপি একটি সর্বসম্মত সংবিধানের মুসাবেদা প্রস্তুত করার পক্ষে কোন বাধা নেই।

ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্ত্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মশায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস ব্রিটিশ পণ্য সম্বন্ধে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব পুনর্ব্বার স্বীকার করেও সিদ্ধান্ত করেছে যে এই বর্জ্জন কার্য্যকর করার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হোক—যেন তারা নিজ ২ প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা করে বাছাই করা ব্রিটিশ পণ্যের বর্জ্জন সংগঠন করে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে চক্রবর্তী মশায় সংক্ষেপে ইংরাজীতে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করলেন।

আবদুল হামিদ খাঁ এই প্রস্তাব উর্দু'তে সমর্থন করলেন।

অন্ধ্রের শ্রীমতি তিলকম আম্মল এবং পুরুষোত্তম রায় কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সদস্যদের ফি ১০ দশটাকা ধার্য্য করা হল।

সভাপতি মশায় স্বয়ং একটি প্রস্তাব দ্বারা বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ আলী আয়েঙ্গার এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে ধন্যবাদ দিলেন। এবং আগামী বৎসরের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু এবং সোয়েব কুরেশীকে সাধারণ সম্পাদক এবং যমনালাল বাজাজ ও রেবা শঙ্করকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

কংগ্রেস তারপর আগামী বৎসরের অধিবেশনের জন্য কলিকাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হওয়ার পর ডাঃ এম্. এ. আনসারী মশায় তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দিলেন। তিনি বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, সাইমন কমিশন বয়কট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উল্লেখ করে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করলেন।

সভাপতি মশায় তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুলিঙ্গ মুদালেয়ার মশায়কে এবং স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাবাহিনীকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে স্বেচ্ছা সেবকদের ক্যাপ্টেন বাজারাম পাণ্ডে এবং স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

পরিশেষে সভাপতি মশায় বললেন যে তিনি মাদ্রাজের আতিথ্য ও মহানুভবতা চিরদিন স্মরণ রাখবেন।

সভাপতিমশায়ের আসন গ্রহণের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুথুলিঙ্গ মুদালেয়ার কংগ্রেসের সভাপতিমশায়কে এবং সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল এবং "মহাত্মা গান্ধীজি কি জয়" "আনসারী জি কি জয়" "বন্দে মাতরম্" প্রভৃতি ধ্বনি দিতে লাগল।

প্রথানুসারে প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে ধন্যবাদ দিতে মঞ্চে আরোহণ করলেন লালা শঙ্করলাল কিন্তু গোলমালে তাঁর একটি কথাও শোনা গেল না।

প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে কংগ্রেসের বিচত্বারিংশ অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

(১৫)

কংগ্রেস অধিবেশনের ফাঁকে ২ আমরা দল বেঁধে মাদ্রাজসহরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতে যেতাম। মাদ্রাজের হাইকোর্টের উপরিভাগে সমুদ্রগামী জাহাজের পথ নির্দেশের জন্য আলোকস্তম্ভ (সার্চ লাইটের স্তম্ভ) সন্নিবেশিত ছিল। মাদ্রাজের বন্দর কলিকাতার বন্দরের তুলনায় ক্ষুদ্র।

সহরের অভ্যন্তরের গোপুরম্ শোভিত একটি পার্থ সারথীর মন্দির দেখতে গেলাম। অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি অতি মনোহর। অর্জুনের সারথীরূপে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনের জন্য মাদ্রাজ প্রদেশের নানা স্থানে বহু মন্দির নির্মিত হয়েছে।

একদিন মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশন দেখতে গেলাম। আশ্রমের অধিকাংশ কর্মীই তামিল বাঙালীও কিছু কিছু আছে। একজন বাঙালী ব্রহ্মচারীর মূর্তি এখনও আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে। এমন আনন্দসুন্দর মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। তা ছাড়া তাঁর মুখমণ্ডল একটি জ্যোতির্ময় আভায় উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল।

মাদ্রাজের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে মেরিন ড্রাইভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের উপকূলে নির্মিত বাঁধের উপর প্রশস্ত রাস্তাটি অতি সুন্দর। রাস্তাটি প্রায় ৪ মাইল দীর্ঘ। এখানে নগর বাসীরা দলে ২ সান্ধ্য

ভ্রমণে আসেন। যৌবন ড্রাইভে সমুদ্রের উপকূলে একটি একোয়েরিয়াম নির্মাণ করে তাতে নানাবর্ণের এবং নানা আকারের সামুদ্রিক মৎস্য রাখা হয়েছে। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় এডেয়ারে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির বিশ্ব সম্মিলন আহূত হয়েছিল। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ উক্ত সম্মিলনে যোগদানের জন্য অ্যাডেয়ারে সমবেত হয়েছিলেন।

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একদিন ঐ সম্মিলন—দেখতে গেলাম। সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে দেখি আমার সতীর্থ বন্ধু জলপাইগুড়ির উকিল নলিনীরঞ্জন ঘোষ প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সম্মিলনে উপস্থিত আছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই নলিনী আক্ষেপ করে বলল যে আরএকটু আগে এলেনা কেন। তা হলে রুক্মিনী দেবীর (রুক্মিনী আরেনডেল ডঃ অ্যানি বেশান্তের শিষ্য ও সহকর্মী আরেনডেল সাহেবের পত্নী এবং দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর কন্যা) বক্তৃতা শুনতে পেতে। তাঁর বাঁশীর সুরের ন্যায় কণ্ঠস্বর শুনতে না পাওয়া খুবই আক্ষেপের বিষয়। রুক্মিনী দেবী পরবর্তী কালে নৃত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রুক্মিনী দেবীর বক্তৃতা শুনতে না পেলেও আমাদের ভাগ্যে কৃষ্ণমূর্তির অভিভাষণ শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত কৃষ্ণমূর্তিকে আবিষ্কার করে তাঁকে জগৎসমক্ষে দেবদূতরূপে (মেসেয়া) প্রচার করেছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণমূর্তির নাম সমস্ত পৃথিবীতে সুপরিচিত ছিল। তাঁর চেহারাও ছিল অপূর্ব সুন্দর। বিশেষতঃ তাঁর চোখ দুটির মত এমন পদ্মপলাশলোচন সচরাচর দেখা যায় না। এ রকম চোখ আর একজনের মাত্র দেখেছিলাম। সেই চোখের অধিকারী ছিলেন সি, পি, রামস্বামী আইয়ার।

কৃষ্ণমূর্তিকে তখন অনেকে দেবতার ন্যায় পূজা করতেন। বাংলা দেশের দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায় তাঁর একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে কৃষ্ণমূর্তি একবার বক্তৃতা দেন। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সভার উদ্যোক্তাগণ ডায়াসে কেবল মাত্র কৃষ্ণমূর্তির জন্য মাত্র একখানা চেয়ার রেখেছিলেন। তাঁর পাদদেশে তাঁর ভক্তগণ ডায়াসের তক্তার উপর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ও ছিলেন।

কৃষ্ণমূর্তি ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে থিওসোফিক্যাল সোসাইটির বিশ্ব সম্মিলনে ইংরাজিতে অতি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন।

কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতার পর আমরা আডেয়ার আশ্রম পরিদর্শন করলাম। আশ্রম পূর্ব দিকে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অন্যান্য স্থান দেখার পর আমরা সমুদ্র উপকূলের দিকে রওনা হলাম। সমুদ্র উপকূলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা মূল আশ্রমের দিকে আসতে লাগলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়কে কৃষ্ণমূর্তির ভাষণের সময় চোখে পড়ে নি। কাজেই তাঁর অনুপস্থিতি ধরে নিয়েছিলাম এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। এমন সময়ে পথের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি তখন সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে তখন বললাম যে আমরা তাঁর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিলাম।

ফেরবার সময় দেখি যে একস্থানে প্রচুর লোকের ভীড়। ব্যাপার কি জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে অগ্রসর হতেই দেখা গেল একটি উন্মুক্ত নাট-মন্দিরের মত স্থানে কৃষ্ণমূর্তি বহুসংখ্যক বালকদের সহিত ক্রীড়া করছেন এবং তাদের বেষ্টন করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোক যুক্তকরে সেই অপূর্ব বাল্যলীলা দেখছেন। জনতার মধ্যে পার্শী ছিলেন, মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকও ছিলেন। এই দৃশ্য খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে আমরা আমাদের ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলাম।

(১৬)

কংগ্রেস অধিবেশনের পর আমরা কয়েকজন দক্ষিণ

ভারত ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের দলে আমি ছাড়া বাঁশবেড়ের (বংশ বাটিকার) মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, রংপুরের নলিনী মোহন রায় চৌধুরী রাজসাহীর ক্ষিতিশচন্দ্র সরকার, তিনকড়ি মজুমদার, সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী রামগোপাল চৌধুরী এবং হিলির প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

দক্ষিণ ভারতে জানুয়ারী মাসেও লেশমাত্র শীত না থাকায় মাদ্রাজ থেকে আমাদের বাহুল্য শীতবস্ত্রাদি বন্ধুদের মারফৎ কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে আমরা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বের হলাম।

প্রসিদ্ধ কাঞ্চিপুরম দর্শনমানসে আমরা মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে রওনা হয়ে প্রথমে চিঙ্গলীপুট ষ্টেশনে অবতরণ করলাম, তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হওয়ায় আমরা ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি চৌলট্রিতে (পান্থনিবাস বিশেষ) রাত্রি কাটালাম। পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদির পর ঝটকা যোগে (গো শকট) আমরা কাঞ্চিপুরম অভিমুখে রওনা হলাম। সহরের নিকটবর্তী হতেই মন্দিরগুলির সুউচ্চ গোপুরমগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কাঞ্চিপুরম দুইভাগে বিভক্ত। একটি শিবকাঞ্চি অপরটি বিষ্ণুকাঞ্চি উভয় দেবতার উপাসকদের মধ্যে মাঝে ২ দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় শুনলাম। সহরের প্রধান পথটি অতি প্রশস্ত। উভয় কাঞ্চির মন্দির অতি সুন্দর। মন্দির গাত্রের পাথরে খোদাই মূর্তিগুলি চিত্তাকর্ষক। উভয় মন্দিরই অতি সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত।

কাঞ্চিপুরম থেকে ফিরে আমরা চিঙ্গলিপুটে এলাম। ষ্টেশনের অদূরবর্তী একটি মন্দিরের চত্বরে আমাদের মাধ্যাহ্নিক আহার সমাধা করলাম। সেখানে সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কার) ত্রিঙ্কামালাই সহরের জনৈক মুসলীম আইয়ারের সহিত আলাপ হল। তিনি তাঁর কন্যা সহ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। আমাদের সিংহল দ্বীপ ভ্রমণের কল্পনা শুনে তিনি একখানি পত্র লিখে আমাদের হাতে দিয়ে বললেন যে তালাইমানার বন্দরে পৌছে রেলকর্তৃপক্ষের যে কোন ব্যক্তির নিকট পত্রখানি দিলে আমাদের উপকার হবে।

আহারাদির পর আমরা নিকটবর্তী পক্ষীতীর্থে দুটি পক্ষীর নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে পুরোহিতের হাত থেকে প্রসাদ ভক্ষণের দৃশ্য দেখতে গেলাম। তীর্থটি একটি পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত। পাহাড়টি দুরারোহ। আমরা পর্ব্বত শিখরে পৌছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা প্রায় দুটার সময় দুটি পাখী আকাশে দেখা দিল, ক্রমে তারা পাহাড়ে নেমে পুরোহিতের হাত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে চলে গেল। বহু শতাব্দি ধরে এই ঘটনা ঘটছে। এ সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তীজড়িত গল্প প্রচলিত আছে।

সেখান থেকে আমরা সুপ্রসিদ্ধ মহাবলি পুরমে গেলাম। চিঙ্গলিপুট থেকে একটি রাস্তা সোজা মহাবলিপুরমে গিয়েছে। আমরা বাসে চড়ে মহাবলিপুরমের সন্নিকটে সমুদ্রের একটি খাঁড়ির সম্মুখে নামলাম। সমুদ্রের খাঁড়িটি মহাবলিপুরমকে মূলভারত ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি দ্বীপে পরিণত করেছে। নৌকা যোগে খাড়ি পার হয়ে আমরা মহাবলিপুরমে পদার্পণ করলাম।

অল্প কথায় মহাবলিপুরমের অপূর্ব ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্যের কথা বর্ণনা করা যায় না। প্রথমেই বৃহৎ ২ প্রস্তর খণ্ড (বোলডার) থেকে প্রস্তুত ভীমের রথ, অর্জ্জুনের রথ প্রভৃতি দেখলাম। বোলডার থেকে তৈরী একটি বৃহৎ হস্তী মূর্তিও দেখলাম। তারপর পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অর্জ্জুনের তপস্যা নামক পশুপক্ষী সমন্বিত কারুকার্য্য শোভিত চিত্র দেখলাম। এই চিত্র বিশেষভাবে আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। আর কয়েকটি ভাস্কর্য্য দেখে আমরা সমুদ্রতীরবর্তী একটি সুন্দর মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরের অবস্থানটি অতি মনোহর। মন্দিরের সম্মুখস্থ গরুড় স্তম্ভটি তখন খানিকটা নিমজ্জিত ছিল। (স্তম্ভটি পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে)। শুনলাম যে পুরাকালে এই রকম ৭টি মন্দির মহাবলিপুরমের সমুদ্রতীরের শোভা বর্দ্ধন করত।

মহাবলিপুরম দর্শনের পর আমরা ক্রমে ২ শ্রীরঙ্গম্ ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর মাদুরাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-

তীর্থ দর্শন করলাম। মাদুরাইয়ের বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত সুদৃশ্য নাটমন্দিরে প্রস্তর-নির্মিত বহু মূর্তি স্থাপিত ছিল। তাদের মধ্যে শিব-পার্বতীর বিবাহের মূর্তিটি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পার্বতীর সলজ্জ মুখমণ্ডলের কথা আমার স্মৃতিপটে মুদ্রিত আছে।

মাদুরাইয়ের একটি কৌতুককর ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না। সর্বত্র আমরা ব্রাহ্মণ হোটেলের নিরামিষ আহার করেছি। অবশ্য দলের সকলকেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতে হয়েছিল। এখানে সহর প্রদক্ষিণের সময় একটি অব্রাহ্মণ ভোজনগৃহে মাংসের বিজ্ঞাপন দেখে আমার বন্ধু নলিনী বাবুর মাংস খাওয়ার লোভ হল। তিনি সকলকে নিয়ে সেই হোটেলে ঢুকলেন। কিরকম মাংস দেখতে চাওয়ায় হোটেলের কর্মচারী দুই হাত হাঁড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে মাংস বের করে দেখালো। কাণ্ড দেখে মাংস খাওয়ার লোভ পরিত্যাগ পূর্বক নলিনী বাবু সদলবলে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন।

মাদুরাই থেকে আমরা রামেশ্বরম্ দেখতে রওনা হলাম। ট্রেনে রামেশ্বরমে যাওয়ার সময় পমবম ও মণ্ডপম্ সেতু অতিক্রম করতে হয়। সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র শাখা রামেশ্বরম্ দ্বীপকে মূল ভারত ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। রামেশ্বরমের একটি উচ্চ টিলার উপর থেকে এই দ্বীপের পূর্ণাকৃতি স্পষ্ট দেখা যায়।

সমুদ্রের উপর দিয়ে এই সেতুপথ অতিক্রম করার দৃশ্যটি অতি সুন্দর।

রামেশ্বরমে পৌঁছে আমরা প্রথমে সমুদ্রে স্নান করলাম। সেখানকার সমুদ্র সমুদ্র বলেই মনে হচ্ছিল না। শৈবালদামে পূর্ণ নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে কোন প্রকারে স্নানান্তে আমরা রামেশ্বরের বিশাল মন্দির ও দেবমূর্তি দর্শন করলাম। রামেশ্বরমে আমরা দুদিন ছিলাম।

রামেশ্বরম থেকে সিংহলের জাহাজ ধরার জন্য আমরা ধনুস্কোটি রওনা হলাম। সেখান থেকে রাজকুমার কলিকাতায় ফিরে গেল। আমরা ৮ জন সিংহলের জাহাজে চড়লাম।

(১১)

ধনুস্কোটি থেকে সিংহলের তালাইমান্নার বন্দরে যেতে প্রায় ৫ ঘন্টা সময় লেগেছিল। যাত্রাপথে জাহাজ এমনভাবে দুলতে লাগল যে আমাদের প্রায় সকলেই বমনের বেগ সম্বরণ করতে পারলেন, আমি অতি কষ্টে বমন চেপে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আমরা তালাইমান্নারে পৌঁছে জাহাজ থেকে বন্দরে অবতীর্ণ হলাম। মধুসূদন মশায় যে পত্রখানি আমাদের দিয়েছিলেন তা তালাই-মান্নার রেলষ্টেশনের জনৈক কর্মচারীর হস্তে দেওয়া হল। পত্রখানি ম্যাজিকের মত কাজ করল। কর্মচারীটি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একখানি প্রথমশ্রেণীর কামরাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পরিবর্তন করে তাতে আমাদের স্থান করে দিলেন। সেই কামরায় বসে অতি উৎকৃষ্ট চা পান করার পর আমরা স্বস্থ হলাম। এতক্ষণে জাহাজে ভ্রমণের ক্লান্তি অপনোদন হল। তারপর অনুরাধাপুরের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে আমরা সেই কামরায় শয্যা গ্রহণ করে নিদ্রাভিভূত হলাম।

অতি প্রত্যূষে ট্রেন থেকে অনুরাধাপুর ষ্টেশনে অবতরণ করলাম। একটি হোটেলে আমাদের বাসস্থান ঠিক করে হাত মুখ ধুয়ে আমরা চা পানের জন্য নিকটস্থ বাজারে গেলাম। চায়ের দোকানগুলিতে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে নানা আকারের ভাতের মণ্ড সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে সিংহলকে বিদেশ বলে মনে হল না। তামিলনাড়ুরই প্রলম্বিত অংশ বলে মনে হল।

চা পানের পর আমরা অনুরাধাপুর দেখতে বেরুলাম। অনুরাধাপুর প্রাচীন সিংহলের রাজধানী ছিল। এখনো বহু হিন্দু দেবদেবী মন্দিরের ধ্বংসা-বশেষ ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হলো। বৃহৎ ২ কয়েকটি বৌদ্ধ

ডাগোবা (স্তূপ) দেখলাম। একটি পাহাড়ের গায়ে খোচিত অতি বৃহৎ শয়ান অবস্থায় বৌদ্ধমূর্তি দেখলাম। অনুরাধাপুরের প্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম ও তৎসংলগ্ন বৌদ্ধ মন্দির একদিন পরিদর্শন করলাম। বুদ্ধগয়া থেকে মূল বোধিদ্রুমের একটি শাখা নিয়ে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা সিংহলে পৌঁছে অনুরাধাপুরে রোপণ করেন এবং কালে তা মহামহীরুহে পরিণত হয়। বোধিদ্রুমটি অতি প্রাচীন। তার জীর্ণ কাণ্ডসকল স্থানে রক্ষার জন্য লৌহের আংটা দ্বারা তাদের বেষ্টন করে বেড় দেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধগয়ার আদি বোধিদ্রুমের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, সেখানে অন্য একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এখন অনুরাধাপুরের বোধিদ্রুমের শাখা ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে নানা স্থানে রোপিত করা হয়েছে।

বোধিদ্রুমের নিকটবর্তী বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম ভক্ত উপাসক ও উপাসিকাবৃন্দ ধূপ ধুনা প্রদীপ জেলে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি পূজার অর্ঘ দিচ্ছে। সিংহলে এখানে এবং অন্য সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মকে অতি জীবন্ত দেখলাম।

অনুরাধাপুরে দুদিন থেকে সেখান থেকে বাসে করে আমরা মিহিনতালে গেলাম। এই মিহিনতালেতেই মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা প্রথমে উপস্থিত হন। যেখানে তাঁরা অবস্থান করেছিলেন সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের বৌদ্ধভিক্ষুগণ আমাদের যত্ন করে মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যান দেখালেন।

মিহিনতাল থেকে আমরা বাসে চড়ে দাম্বুলা ও সিগিরিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করলাম। সিগিরিয়া ফ্রেসকো চিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। সিগিরিয়ার একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ডের (বোল্ডারের) উপর নিরাপত্তার জন্য জনৈক রাজা তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। বোল্ডারের এক পাশ দিয়ে উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি নির্মিত আছে। সিঁড়িতে থেকে উপরে ওঠার সময় অবলম্বনের জন্য লোহার রেলিংয়ের ব্যবস্থা আছে। সুনীলবাবু ছাড়া আমরা বাকী ৭ জন ঐ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দেখবার বিশেষ কিছু নেই, অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। পুনরায় নীচে এসে বোল্ডারের তলদেশে গুহার সিলিংয়ে অঙ্কিত অপূর্ব সুন্দর ফ্রেস্কো চিত্রাবলী দেখলাম।

সেখান থেকে আমরা বাসে চড়ে সিংহলের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী ক্যাণ্ডি শহরের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে নেমে আরো ২।১টি স্থান দর্শন করলাম। বাসটি রাস্তা ধরে চলল, চতুর্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য। সমস্ত সিংহল দ্বীপটিই একটি সুবৃহৎ উদ্যান বলে মনে হয়। এখন জানুয়ারী মাস - কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের বর্ষাকালের মত মনে হল। পথের দুধারে কোথাও গাছে ২ আম ঝুলছে, কোনো কোনো টিলা সম্পূর্ণ নারিকেল বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন। পথের পার্শ্বে কো কো ও কফির গাছও দেখলাম।

ক্যাণ্ডিতে পৌঁছে আমরা একটি হোটেলে উঠলাম। এখানকার কোন হোটেলে বিছানার কোন প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয়ান হোটেলের মত বিধি-ব্যবস্থা। এখানকার হোটেলগুলির মালিকদের নাম শুনে মনে হয় যে তাঁরা ইউরোপীয়, কিন্তু আসলে তাঁরা বৌদ্ধ। এই সকল হোটেলে গোমাংসও প্রচলন থাকায় আমরা তামিল ব্রাহ্মণ পরিচালিত ব্রাহ্মণ হোটেলে আহারের ব্যবস্থা করেছিলাম।

ক্যাণ্ডি শহরটি দেখতে ছবির মত। শহরের অভ্যন্তরে একটি লেক আছে। শহরের বিপণিশ্রেণীতে স্থানীয় নানাপ্রকার কাঠের ও হাতীর দাঁতের কারুকার্য-খচিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত থাকে। আমি কয়েকটা আবলুস কাষ্ঠে নির্মিত হাতীর মূর্তি এবং পিতলের ডাগোবা প্রভৃতি কিনলাম।

শহরের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য হল দন্ত মন্দির। ঐ দন্তমন্দিরে (দলদ মালিগাওয়া) ভগবান বুদ্ধদেবের একটি দন্ত রক্ষিত আছে। বৎসরে একবার মাত্র সেই দন্ত মন্দির থেকে বের করে অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে শোভাযাত্রা করা হয়। অন্য সময়ে সে দেখার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অত্যন্ত নিকট

থেকে দন্তটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমরা মন্দির পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনলাম যে ভিক্ষু উত্তম (প্রসিদ্ধ কংগ্রেস সেবক) ব্রহ্মদেশের কয়েকজন বৌদ্ধ সহ এখানে এসেছেন এবং তাঁর বিশেষ অনুরোধে তাঁদের দন্ত দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে আমরাও মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়ে জানালাম যে আমরা সুদূর বাংলা দেশ থেকে এসেছি এবং প্রার্থনা করলাম যেন ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে আমাদের দন্ত দর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে কর্তৃপক্ষ আমাদের আবেদনে সম্মত হলেন। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষু উত্তমের দলের সহিত মিলিত হয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম, মন্দিরের প্রধান ভিক্ষু মন্দিরের কক্ষ থেকে স্বর্ণ রৌপ্যখচিত একটি আধার নিয়ে এলেন এবং তা উন্মোচন করে দন্তটি আমাদের দেখালেন। দন্তটি সাধারণ মানুষের দাঁতের অপেক্ষা বৃহত্তর। আকারও ঠিক মানুষের মত নয়। কারও কারও মতে আসল দাঁতটি অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংশ হয়ে যায়। পরে তার স্থলে একটি কৃত্রিম দাঁত রাখা হয়।

কাণ্ডির পেরাডানিয়া বটানিকাল গার্ডেন জগৎ বিখ্যাত। এখানে ঝিলে হস্তীযূথের স্নানলীলা দেখলাম। ভারতে দুষ্প্রাপ্য নানাপ্রকার বৃক্ষের এখানে সমাবেশ আছে। নানাপ্রকার মসলার তরুলতা এখানে যত্নে লাগানো। একটি ঝুলন্ত ফলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। নিকটে গিয়ে দেখি যে একটি ফলের খোসা ফেটে গিয়েছে এবং তার ভিতর থেকে কালো এবং হরিদ্রাভ রংয়ের আভা দেখা যাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানলাম যে এটি জায়ফল। ফলের বিচি জায়ফলরূপে এবং ফলের শাঁস জয়িত্রী নামে পরিচিত। এ তথ্য আমি জানতাম না, আমার পরিচিত কেউও এ তথ্য জানত না। কয়েকটি ফল সংগ্রহ করে দেশে এনেছিলাম।

কাণ্ডিতে আমাদের দল দ্বিধা বিভক্ত হল। ও আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে তিনজন অস্থির হয়ে উঠল এবং আমাদের পরিকল্পিত পোলান্নরুয়া দর্শনের সঙ্কল্প ত্যাগ করে কলম্বো যাওয়ার জন্য জিদ ধরল, আমরা ৫ জন তাঁদের কথায় রাজি হওয়ায় তাঁরা আমাদের দল পরিত্যাগ করে কলম্বো রওনা হয়ে গেলেন। আমরা বাকী ৫ জন পোলান্নরুয়া দেখার জন্য কাণ্ডিতে রয়ে গেলাম।

আমরা কাণ্ডি থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটি ট্যাক্সী ভাড়া করে সিংহলের গ্রীষ্মাবকাশ পোলানরুয়া সহর দেখতে রওনা হলাম। কাণ্ডি হতে পোলানরুয়ার পথটি অতি সুন্দর। ট্যাক্সীটি ক্রমোন্নত পর্বতশ্রেনীর চক্রাকার পথ অতিক্রম করে উঠতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে যতদূর দৃষ্টি চলে অসংখ্য চা-বাগান শোভা পাচ্ছিল। আমরা যতই উপরে উঠি চা-বাগান আমাদের সঙ্গ ছাড়ল না। অবশেষে এক সময় চা-বাগান আর দৃষ্টিগোচর হল না। তৎপরিবর্তে পথের দুধারে সুন্দর অরণ্যশ্রেনী দেখা দিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর, ক্রমে সীতাএলা নামক এক স্থানে উপনীত হলাম। সিংহলে রাম রাবনের যুদ্ধের কথা জানে না। সীতার নামের সহিত সীতাএলা নামের কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। স্থানটির নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর। যদি এখানেই সীতাকে বন্দী করে রাখা হয়ে থাকে তা হলে এই স্থানটি অশোকবনের উপযুক্ত বটে।

পোলান্নরুয়ায় যখন পৌঁছলাম তখন অপরাহ্নকাল এখানে পৌঁছে শীত অনুভব করলাম। পোলান্নরুয়া গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ধনাঢ্য সিংহলবাসীদের প্রমোদ ভবন। গভর্ণমেন্টের কতকগুলি অফিস দেখলাম। সহরটি ক্ষুদ্র। সহর প্রদক্ষিণের পর একটি ভোজনালয়ে চা-পান করে কাণ্ডিতে ফিরে এলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে কাণ্ডি থেকে ট্রেনে কলম্বোতে গেলাম। সেখানে একটি তামিল ব্রাহ্মণ পরিচালিত ধর্মশালায় উঠলাম।

কলম্বো সহরটি অতি সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কলম্বোতে ট্রাম থেকে সহর প্রদক্ষিণ করে প্রধান ২ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখলাম। এখানকার মিউজিয়মে অতি সুন্দর ২ মূর্ত্তি সকল রাখা হয়েছে। কলম্বোর

বন্দরটি বিখ্যাত।

এখানে সমুদ্রের উপকূলে 'গল ফেস' নামে একটি ইউরোপীয়দের হোটেল আছে। হোটেলটি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত। হোটেলের চত্বর সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত? সেখানে বসবার জন্য কয়েকটি বেঞ্চ পাতা আছে। আমরা একটি বেঞ্চে বসে বিশ্রাম করলাম। সমুদ্রের উপকূলে পৃথিবীর আর কোন স্থানে সবুজ ঘাস দেখা যায় না, একমাত্র গল ফেসেই সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন আছে।

গল ফেসের এই চত্বরে বহু সিংহলবাসী ভ্রমণ উপলক্ষে আগমন করে। সেখানে একজন সিংহলী যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। সে বলল তাঁর পূর্বপুরুষ বাংলা দেশ থেকে এসেছিলেন। বস্তুত সিংহলের অনেককেই বাঙালী বলে ভ্রম হয়।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল সিংহল ভ্রমণের পর কলম্বো থেকে জাহাজে করে আমরা টুটিকরনে যাব। সেখান থেকে কন্যাকুমারী; কেরল প্রদেশ; উটকামণ্ড, কোদাই কানাল, মহীশূর প্রভৃতি দর্শন করে কলকাতায় ফিরব। দল দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় নিরুৎসাহ হয়ে আমাদের পূর্ব পথেই দেশে ফিরলাম। ভাগ্যে আর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ দেখা হল না।

(১৮)

কলিকাতায় ফিরে আসার দুই একদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে তার যদুনাথ সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোট আদালতের উকিল অনাদিনাথ সরকারের বাসায় গেলাম। সেখানে আমার পূর্ব পরিচিত একজন সি, আই, ডি, সাব ইনস্পেক্টর উপস্থিত ছিলেন। আমি উপস্থিত হতেই তিনি বললেন আপনারা ত বেশ দেশভ্রমণ করে এসেছেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি জানলেন কি প্রকারে। যা শুনলাম তাতে বিস্ময়ান্বিত হলাম। তাঁর নিকট শুনলাম একদল টিকটিকি কলিকাতা থেকে বাংলা প্রতিনিধিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মাদ্রাজ গিয়েছিল। আমরা যখন মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণ ভ্রমণে যাই তখন বাংলার টিকটিকিরা তামিলনাড়ুর টিকটিকিদের আমাদের দলের সকলের নাম জানিয়ে আমাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে বলেছিল। তারপর তামিলনাড়ুর টিকটিকিরাও সিংহলের টিকটিকিদের আমাদের উপর নজর রাখতে বলেছিল। অথচ আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানতে পারি নি আমাদের মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় নি।

ক্রমশ

প্রাক্ আর্য যুগে ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতি

গোপীনাথ সেন

প্রাক্ আর্য যুগে ভারতে কোন আদিবাসী ছিল কি না তার মূল অনুসন্ধান করতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্রের আলোচনা করতে হবে। ভারতে প্রাক্ ঐতিহাসিক মানুষের সন্ধান পেতে হলে ভৌগোলিক আবিষ্কারের আশ্রয় ব্যতীত কোনরূপ মূল সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। পুরাতন প্রস্তর যুগ অর্থাৎ প্লিসটোসিন যুগে মানবসভ্যতার স্তর দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল একটি উচ্চতর আর অপরটি নিম্নতর অর্থাৎ এটি সূর্যের বিকিরণ অনুসারে ভাগ হয়েছে। প্লিসটোসিন যুগে প্রাকৃতিক পরিবর্তন মানবগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুষার যুগে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে প্যালিওলিথিক মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্যালিওলিথিক যুগ থেকে আদিম মানবের সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায় তাদের প্রস্তরের নানা রকম কলাকৌশলে। প্লিসটোসিন যুগে যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রে ক্রমোন্নতিতে আদিমযুগের মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে নতুন দিক খুলে দেয়। প্যালিওলিথিক বা প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইংলণ্ডের প্রস্তর অস্ত্রগুলি একই ধরনের।

প্রস্তরযুগে আদিম জাতিরা এক একটি দলবদ্ধভাবে বা একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বাস করত এবং তারা শীকার ও খাদ্য আহরণ করে বেড়াত। এই প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি আজও তাদের অবিনশ্বর প্রস্তরখণ্ডগুলির সাক্ষ্য বহন করে আসছে। উচ্চস্তরের প্যালিওলিথিক যুগের কোন মানুষ বসবাসের চিহ্ন দেখা যায় না হয়তো বা সেখানে কোন শীকারের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্নস্তরে প্যালিওলিথিক মানুষের ও তাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায় ঐ যুগের ক্রমিক শিল্পচেতনার মধ্য দিয়ে। প্রায় কোটি বছর আগে শিকারীগণ কৃষি আবাদ সুরু করেছিল এই সূত্র থেকে প্রাক্ ঐতিহাসিক ভারতীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত। হিমালয়ের নিম্নস্থানগুলিতে অর্থাৎ কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের নানা স্থানে তুষার যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চ প্যালিওলিথিক ম্যাগডালেনীয় সভ্যতার নিদর্শন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কার্নুলে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় হাড়ের যন্ত্রপাতি এবং স্তন্যপায়ী জন্তুদের শেষ ধ্বংসাবশেষ। উচ্চ প্যালিওলিথিক বা মেসোলিথিক যুগের মানবসভ্যতার আর একটি নিদর্শন গদা উপত্যকার প্রাপ্ত ধাতুর বলয়। এই যুগের আদিম জাতিদের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের পরিচয় তাদের গুহার চিত্রকলা মধ্যভারতের সিজানপুরে গুহাশিল্প থেকে পাওয়া যায়। মাইক্রোলিথিক ও নিওলিথিক যুগে যে সকল নতুন মানুষ ভারতে এসেছিল তাদের সঙ্গে উচ্চ প্যালিওলিথিক যুগের মানুষদের কারুকার্যের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের আদিম মানবসভ্যতার আর একটি নিদর্শন

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত প্রস্তর কুঠার শিল্পের নিদর্শন। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট তাঁর 'প্রি-হিসটোরিক' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় আদিম সংস্কৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) প্রস্তর কুঠার সংস্কৃতি—মার্টিমার হুইলার তাঁর মহীশূর রাজ্যে অনুসন্ধান করে মসৃণ প্রস্তরের কুঠার এবং মাইক্রোলিথিক শিল্পের বহু নিদর্শন উদ্ধার করেছেন। তিনি দুটি তামার পাত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এরকম নিদর্শন আর কোথাও দেখা যায় না। যে সকল চীনা মাটির বাসন পাওয়া গেছে তার সবগুলি হাতে তৈরী এবং এই বাসনগুলি অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রিত। এই যুগটির বহু শতাব্দী পূর্বে মেগালিথিক সভ্যতা এবং ঐতিহাসিক অন্ধ্র সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) মেগালিথীয় সংস্কৃতি—দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের পূর্বে মেগালিথীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। ঐ যুগকে লৌহ ব্যবহারিক শিল্পের যুগ বলা হয়। এখান থেকে ঘূর্ণিয়মান চক্রে মৃৎপাত্র নির্মাণ আরম্ভ হয়।

ঐতিহাসিক অন্ধ্র সংস্কৃতি—রোমের মুদ্রা প্রচলনের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্র সংস্কৃতি সুরু হয়। ঐ সময় থেকে উন্নত ধরণের অবিকামেহ্ মৃৎপাত্রের প্রভাব খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

নিওলিথিক সংস্কৃতিতে প্রস্তরের কুঠার নির্মাণের যে-সকল নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে ও কাশ্মীরে শ্রীনগরের কাছ থেকে পাওয়া গেছে তাহা প্রাগৈতিহাসিক মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেয়। ভারতের নিওলিথিক জিনিসপত্র-গুলি মেসোপটেমিয়াবাসীর সংস্কৃতির বহু যুগ পূর্বের তার পরিচয় ঐতিহাসিকগণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ প্রাক্ আর্যযুগের মানব সংস্কৃতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন—(১) কোয়েটা সংস্কৃতি (বোলান গিরিপথে পাহাড়ের উপর খোদাই করা চিত্র-কলা দেখা যায়) (২) আমিরনাল সংস্কৃতি (সিন্ধু ও বেলুচিস্থান থেকে কোলওয়া চিত্রকলা ও মৃৎপাত্র (৩) কুলি সংস্কৃতি (দক্ষিণ বেলুচিস্থান থেকে কোলওয়া হ্রদের নানাপ্রকার চিত্রকলা কালপালিশ করা মাটীর তৈরী গহনা ও জিনিষপত্র থেকে কুলি সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়।

প্রাক্ আর্য সংস্কৃতির যে নিদর্শন যাহা বেলুচিস্থানে পাওয়া গিয়েছিল তার প্রবাহ পঞ্চনদীর মধ্যে দিয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। বেলুচিস্থানের কৃষিশ্রেণীদের সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশের আদিম মানব সভ্যতার বিশেষ মিল পাওয়া যায়। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে সিন্ধুর মাটিতে যে গম যব ও অন্যান্য ফসল যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত তাহা অতীতের অতল তলে ডুবে গেছে। এখন তাহা বালুকা পাথরে ঘেরা মরুপ্রান্তর। সিন্ধুপ্রদেশে হরপ্পায় যে সুপ্রাচীন উন্নত সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে আদিম মানুষের অবদান কত বৃহৎ ছিল তাহা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ মহেঞ্জোদারোর কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে এর হুবহু মিল দেখা যায়।

হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর প্রাচীন মানবগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আদিম প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড বা আদি অস্ট্রালাকার জাতি থেকে উদ্ভূত। অনেকে মনে করেন ঐ যুগের প্রাচীন মানবগণের সঙ্গে সিংহলের আদিম অধিবাসী ভেদোয়াদ জাতির সঙ্গে মিল আছে। হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর কৃষ্ণকায় আদিমজাতি অষ্ট্রেলিয়ায় ও সিংহলে বসবাস শুরু করে। দক্ষিণ ভারত থেকে ঐরূপ কৃষ্ণকায় উপজাতি মেলেনিশিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। আজও দক্ষিণ ও মধ্যভারতে যেসকল আদিবাসী বাস করে তারা হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর কৃষ্টির বাহক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো থেকে যেসকল মানুষের মাথার কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার বংশধর যে বর্তমান দ্রাবিড় জাতি ও মুণ্ডা আদিবাসী তাহা নৃতত্ত্ব-বিদ্গণ প্রমাণ করেছেন। বর্তমান যুগে বহু উপজাতি ভারতের আর্য জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে কিন্তু এখনও

ভাষার মাধ্যমে সেই হারানো উপজাতিদের স্বরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় যদি তাহা বিশেষ মনযোগের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখান যেতে পারে মুণ্ডা ও দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনগণ প্রাক্ আর্য ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডি, এন, মজুমদার তাঁর 'ফরচুন অফ প্রিমিটিভ ট্রাইব' নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন 'খাসাস' নামক উপজাতি তাদের নিজেদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ করেছে বটে কিন্তু আর্য ভাষায় তারা মনের ভাব আদান প্রদান করে থাকে।

প্রাক্ আর্যযুগে আদিবাসী সভ্যতা কিরূপ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছিল তাদের ভাষার বিবরণ থেকে জানা যায়। কোল মুণ্ডা ভাষা থেকে বহু শব্দ সংস্কৃত ভাষায় স্থান পেয়েছে। উপরিউক্ত দুটি উপজাতি ব্যতীত মধ্যপ্রদেশের প্রখ্যাত আদিবাসীরাও তাদের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়দের ভেতর কুইকুভিদের মিল দেখা যায়। এছাড়া উড়িষ্যার কোরাপুট অঞ্চলের আদিবাসী কোণ্ডাদের ভাষা গণ্ড থেকে উদ্ভূত। এককালে গণ্ডদের প্রভাব মধ্যভারতের সীমা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিল।

দ্রাবিড় সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যায়। ভারতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদিবাসীদের মধ্যে 'কুরুখ' বা ছোটনাগপুরের ওরাঁও উপজাতি। এরা পশ্চিমের নর্মদা উপত্যকায় বাস করত পরে বিহারের নিকট শাহাবাদ জেলায় বসবাস সুরু করে। কুরুখদের সঙ্গে কেনারীদের মিল দেখা যায়। কোল ও মুণ্ডাগণ এই কুরুখদের মত দ্রাবিড়দের স্থান থেকে এসে ছিল। প্রাক্ গণ্ড ও প্রাক কোল উপজাতিদের মধ্যে বহু আদিবাসীদের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু তাদের নামকরণ এখনও নৃতত্ত্ববিদ্গণ করেন নি। যাদের নাম জানা যায় তাদের মধ্যে বৈগা উপজাতিগণ বিশেষ পরিচিত। বাঙ্গালা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এদের বিরাট বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ভেরীয়ার এল উইন তাঁর বিখ্যাত 'বৈগা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন বৈগাগণ অন্যান্য উপজাতিদের অপেক্ষা এই দেশে প্রথমে বসতি স্থাপন করে।' ভূঁয়, ভুইয়া, বৈগা প্রভৃতি সুপ্রাচীন আদিবাসীগণ নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে কোল মুণ্ডা উপজাতিদের আশ্রয় নিয়েছিল। নৃতত্ত্ববিদ্গণ বলেন মধ্যভারতের আদিবাসীদের মধ্যে ভীলগণও সুপ্রাচীন উপজাতি। তারা কোর কুউ উপজাতিদের সঙ্গে বসবাস স্থাপন করে। ক্রমশঃ প্রাক্ আর্য আদিবাসীগণ দ্রাবিড় বা মুণ্ডা প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভুলে যায়।

ডাব্লু উ কোপার তাঁর ভিয়ানা থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ভীল উপজাতি গ্রন্থে প্রাক্ আর্য আদিবাসীদের সমস্যা সমাধান করেছেন। তিনি ভীলদের সঙ্গে একটি সুপ্রাচীন উপজাতি নাহালদের উল্লেখ করে বলেছেন নাহালগণ করকু উপজাতিদের সঙ্গে বসবাস করে নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরাওতি ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারের মতে নাহাল উপজাতিদের নিজস্বভাব লুপ্ত হয়ে যাবার পর করকু ও মারাঠি সংমিশ্রণে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচীন আদিমজাতিদের মধ্যে ভীলজাতিদের উল্লেখ আছে। ভীলদের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত সবর ও পুলিন্দ উপজাতিদের তুলনা করা যেতে পারে। উড়িষ্যার গঞ্জাম অঞ্চলে যে সবর উপজাতিদের দেখা যায় তারা কি ঐ প্রাক্ আর্য যুগের সবর জাতি কিনা তাহা এখনও সঠিক জানা যায় না।

ভারতে যে কয়েকটি প্রাক্ আর্য যুগের উপজাতিদের দেখা যায় ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত অন্ধ্রজাতির কথা পাওয়া যায়। শতবাহন সাম্রাজ্যের অন্ধ্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে তেলেগু ভাষী অন্ধ্রপ্রদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশটি রাজনৈতিক বিভাগ এর সঙ্গে প্রাক্ আর্য অন্ধ্র উপজাতিদের কোন যোগসূত্র আছে কি না তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেরারে অন্ধন উপজাতিদের পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রাক্ আর্যযুগের অন্ধ্র উপজাতি তাহা জাতিতত্ত্ববিদ্গণ প্রমাণ করেছেন।

আভির উপজাতি নামে আর একটি প্রাক্ আর্য যুগের আদিবাসীদের কাহিনী সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে

উল্লেখ আছে। তারা রাজস্থানে বসবাস করত। রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে সরস্বতী নদীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আভিরদের বিনাশ হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসে উল্লিখিত আছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে গুর্জর-জাতি রাজত্ব করত সেখানে আভিরগণ বসবাস স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন ভারতে হূণদের আসার সঙ্গে সঙ্গে আভিরগণও প্রবেশ করে। রাজস্থানে মাউন্ট আবু পর্বতে আভির উপজাতিদের বংশধরদের এখনও দেখা যায়। পৌরাণিক উপাখ্যানে গুহক মিত্র রামকে আভীর বন্ধু কৃষ্ণের কথা এখনও হিন্দুগণ স্মরণ করে থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বহু প্রাক্ আর্য উপজাতিদের নাম পাওয়া যায়। সিন্ধু নদীর উৎপত্তি স্থলে বারবারা নামে এক উপজাতিদের দেখা যায় তারা হয়ত গ্রীসদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। হিমালয় অঞ্চলে খাসা নামে আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। রামায়ণে যে নিষাদ উপজাতিদের কথা পাওয়া যায় তারা কুশান রাজত্বের পর উত্তর ভারতে রাজত্ব করত। আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন তাঁর 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—'আর্যেরা নদনদী বিল সমুদ্রের সঙ্গে বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁরা এসে যখন নাগ প্রভৃতি অনার্য অথচ সুসভ্য জাতিকে তাড়া দিলেন তখন নাগবংশীয়েরা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। মহাভারত প্রভৃতি দেখলে তা বেশ বুঝা যায় এই নাগ-কন্যার গর্ভজ জরৎকারু মুনির পুত্র আস্তিক। তিনি ব্রাহ্মণোত্তম ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা অনার্য বিবাহ করতেন। সন্তানেরা ব্রাহ্মণই হতেন। মহাভারত পুরাণাদি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। আগে এইসব বিবাহের সন্তান পিতার জাতিই পেতেন। কারণ আর্যদের মধ্যে প্রধান হল পুরুষ। তাকে বলে বীজপ্রাধান্য। পরে দ্রাবিড়াদি জাতির মাতৃতন্ত্র সমাজের প্রভাবে মায়ের জাতিই সন্তানেরা পেতে লাগলেন। তার নাম ক্ষেত্রপ্রাধান্য তা অনার্য প্রভাবের ফল।

• ভীম যখন কৌরবদের বিষে হতচেতন হয়ে জলে ভাসতে ভাসতে নাগদের দেশে গেলেন, সেখানে ভীমকে আত্মীয় বলেই নাগরাজ যত্ন করলেন। ভীমের সঙ্গে তাঁদের রক্তের যোগ ছিল। নাগেরা আর্য না হলেও খুবই সভ্য ছিলেন। জলের সঙ্গে সম্বন্ধ যেসব জিনিসের আছে তার অনেকই এই অনার্যদের কাছ থেকে পাওয়া। জালও সম্ভবত, নৌকা ও নৌকার অনেক কিছু এই সূত্রে এসেছে। মাছ খাওয়াটাও প্রধানত অনার্যদের কাছে শেখা। অনার্যেরা বেশির ভাগ মাংসই খেতেন। শাঁখা আর্যেরা জানতেন না, শাঁখা-সিঁদুর প্রভৃতি এয়োর চিহ্ন নাগদের কাছে পাওয়া।" এই নাগ উপজাতি থেকে দুটি উপজাতিদের শাখার সৃষ্টি হয়েছিল তার শিব এবং উত্তর প্রদেশের তার উপজাতি। কথিত আছে এই উপজাতিদের স্কন্ধে শিবলিঙ্গ ভর করেছিল। ঋগ্বেদে 'শিব' নামে একদল লোকের কথা পাওয়া যায়। এই সব আদিম মানবদের পূজ্য দেবতাই ছিলেন শিব।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে বহু প্রাক্ আর্য উপজাতিগণ আর্যজাতির সংস্পর্শে এসে চতুর্বর্ণ আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। যে সকল অনার্য রাজ্যগুলির নাম পাওয়া যায় সেই রাজ্যের রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলত। নিদর্শনস্বরূপ উড়িষ্যার ইতিহাসে এরকম বহু রাজ-পরিবারের উল্লেখ আছে। ভাউমাকর নামে একটি উপজাতি রাজবংশের নাম পাওয়া যায় তারা আদিম জাতি ভুমিজ ও ভুইয়াদের সঙ্গে যুক্ত। সংস্কৃত ভুমিজ শব্দ 'মানুষ'। এই ভারতে সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকগণ এই আদিম জাতি। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ইন্দো-ইউরোপীয় এবং চীন তিব্বতীয় গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। আজও মানবগোষ্ঠীগণ সেই অতীত সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছে। নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ বলেছেন 'সুতরাং দেখা গেল, ভারতবর্ষ নানা জাতির লোকের বাসভূমি। এদেশের এক এক অঞ্চলে এক এক জাতির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে

রাখতে হবে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এখানে এত বেশী হয়েছে যে, জাতিগত অঞ্চল বলে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা চলে না। তবে সাধারণভাবে জাতিগত বিভাগের কথা বলা যেতে পারে। যেমন, উত্তর ও পশ্চিম ভারত নর্দীয় অঞ্চল, অবশ্য ভূমধ্য ও প্রাচ্য জাতির লোকও এখানে আছে। দক্ষিণ ভারতের অংশ বিশেষকে প্রত্ন-ভূমধ্যদের দেশ বলা যায়। এদের দুপাশে আলপীয় ও দিনারীয় জাতিদের বাস। তবে ঐ সকল স্থানে অন্য জাতির লোকও বাস করে। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলেই এখানকার আদিম কৃষ্ণকায় জাতির বংশধরদের পাওয়া যায়। এদেশে যারা নীচু জাত বলে পরিচিত, তারা ঐ আদিম কৃষ্ণকায় জাতির সঙ্গে অন্যান্য জাতির, বিশেষভাবে প্রত্ন-ভূমধ্যদের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন সঙ্কর জাতি। মোঙ্গলয়েডজাতি উত্তর ও পূর্বদিকের সিন্ধু-পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। কিন্তু এদের ভিন্ন ভিন্ন ধারা ভারতবাসী অন্যান্য জাতির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গেছে।"

প্রাক্ আর্য উপজাতি সংস্কৃতি ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে বিশেষ অবদান রেখে গেছে তার পরিচয় পেতে হলে প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অতীত যুগ থেকে এই উপজাতিগণ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রের বুনিয়াদগুলিকে কঠিনভাবে নির্মাণ করেছিল যার জন্য আজও ভারতীয় সংস্কৃতির মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বহু উচ্চে।

স্বদেশীয় মানসে রামমোহন

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বহু বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অভিযাত্রার পথ অতিক্রম করেও রাজা রামমোহন রায় স্বদেশীয় মানসে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ময় পুরুষ। ১৭৭২ বা ৭৪ সালের বাইশে মে জন্ম যে মানুষটির তাঁর চিন্তা ও চেতনায়, তাঁর কর্ম ও ধর্মে এমন কি ছিল যা দেশবিদেশে বহু মনীষীকে আকর্ষণ করে? এমন কি ছিল যা আজও এই দ্বিশত বর্ষের অতিক্রান্তির পরের উৎসবভূমিতেও তাঁর স্মরণের ডালি সাজাতে উৎসাহিত করে?

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথিক রামমোহন' বলেছেন। ভারত-সাধনার কোলকেন্দ্রে অবস্থান করেছেন রামমোহন কিন্তু সেইখানেই তিনি স্থাণু হয়ে থাকেন নি—তাঁর জীবন ও মনন সদা চলোর্মি। নতুন নতুন স্রোতে অবগাহন করেছেন—কিন্তু তা ভারত-ভাবধারারই, তা ভারত-ঐতিহ্যের ও ঐশ্বর্যেরই। সদ্যআগত বৃটিশ রাজ-শক্তির মাধ্যমে আমদানী করা পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীন-আলোককে রাজা রামমোহন আগ্রহ করতে বললেন দ্রুত জাগৃতির সোপান-রূপে। প্রাচীন ও নবীনের ভাব ও ভাবনাকে একসূত্রে বেঁধে নিতে বললেন আত্ম-চেতনার জাগৃতির জন্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়—'রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।'

ভারতবর্ষের জীবনধারার যখন নানা বার্থপরতা ও

সংকীর্ণ মানসিকতা ক্রিয়াশীল সেই সময় রামমোহন এলেন পরিচ্ছন্ন মন ও পরিশীলিত অন্তর নিয়ে, এলেন জীবন ও কর্ম, মনন ও ধর্মকে একাত্ম করার উদ্দীপনা নিয়ে। বহু ভাব ও ভাবনায় খণ্ডে বিকৃত ভারতীয় মানসে তিনি দিলেন একের মন্ত্র। 'রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।' বলছেন রবীন্দ্রনাথ—'ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে, বিশ্বব্যাপী করে, প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা ; মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্যলাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।' নবযুগে বৃহত্তের মধ্যে ভারতসাধনাকে প্রতিষ্ঠার চিন্তায় যে মনীষী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়োজিত রাখেন তাঁকে প্রণাম—তাঁর নামের আগেও বলা যায় প্রাতঃস্মরণীয় অভিধাটিকে।

(২)

রাধানগর গ্রামের ব্রাহ্মণ অভিজাত বংশের সন্তান রামমোহন রায় জীবনের বহুবিচিত্র পথেই পরিক্রমা করেছেন। এই জীবনের সম্পর্কে এমন সব পরস্পর-বিরোধী বিষয় নিয়ে নানা সময়ে বহু বিতর্কও হয়েছে তবু সে সব বিতর্কিত বিষয়কে জীবনীকারদের যাচাই করার ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁর সামগ্রিক কর্মের উদ্দীপনা-টিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। আমরা গ্রহণ করতে পারি তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ চিত্রটিকে, কারণ, আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছি আজও তাকে নিয়েই গর্ব ও গৌরববোধ করতে পারি। তাঁর সতীদাহ-প্রথা-নিবারণবিধির সমসাময়িক ভূমিকাটি কেমন ছিল বা শিক্ষাপ্রসারে তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল তার চুলচেরা বিচার এড়বার বলেই এগিয়ে যাওয়া ভালো তাকে আরো নতুন কোনো ব্যাখ্যায়, আরো বৃহৎ কোনো মানসিকতার পরিমণ্ডলে রাজা রামমোহন রায়কে আমরা পেতে পারি কি-না দেখতে হবে। তাঁর যে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহৎ মনীষার কথা সমসাময়িক বা তাঁর প্রায় নিকটকালের বহু জনের লেখায় প্রকাশিত তাঁদের বহু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যেই একথা প্রমাণিত রয়েছে।

রামমোহন রচিত অছিপত্রে (ট্রাস্টডিড) বলা হয়েছে—'জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্তা, অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ভগবানই একমাত্র উপাস্য। যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন ধর্ম, যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, এখানে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে।' এই অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক মনভাব তাঁর ছিল। তিনি তন্ত্র-শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্ম প্রভৃতির মূল গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন এবং তার বিচার করেন। এই সব সমন্বয়ে তাঁর উদার হৃদয়ে ব্রহ্মমতের রূপ-রেখা তাঁর চিন্তায় আসে এবং তিনি একান্ত ব্রহ্মধ্যানী ছিলেন। তিনি যে একেশ্বরবাদী পাশ্চাত্য দেশীয় সমাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন তাও সর্বজনস্বীকার্য।

তিনি ভাবসমৃদ্ধ বাংলায় গীতিকবিতা রচনা করলেন ধ্রুপদাঙ্গ সুরে। তিনি 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করলেন। তিনি বাংলা গদ্যে, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করলেন। বাংলা গদ্যে বলিষ্ঠ, বাদপ্রতিবাদ, রচনা করলেন।—যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগেই তাঁর প্রচেষ্টা এবং তার সাফল্যও দেখা যায়। তিনি বেদ-উপনিষদের প্রথম বাংলা অনুবাদকের সম্মানে ভূষিত এবং আরো অনেক শাস্ত্রেরও। তিনি বাঙালী তথা ভারতপথিক হয়েও—বিশ্ববোধের পরিচয় নানাভাবে দিতে থাকেন।

স্বাধীনতার প্রতি প্রীতির উচ্ছ্বাস' রামমোহনের মনে কতখানি ছিল তা বোঝা যায় 'মিরাট-উল-আকবর'

পত্রিকার আয়র্ল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের সমর্থনে রচিত লেখাটিতে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের ১৮২৩-কে এক পত্রে লেখেন পাসপোর্ট প্রথা তুলে দেওয়ার কথা এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠনের কথা। ইউ-এন-ও গঠনের বহু পূর্বে আন্তর্জাতিক সংহতির ভাবনা রামমোহনের মানসেই প্রথম উদিত দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের ঋষির উদাত্ত আহ্বান 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—বিশ্ববাসীকে অমৃতপুত্র বলে ডাক দেওয়ার সার্থকতা তিনিই নিজের জীবনধারায় প্রমাণ করলেন। নিজে যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের সমস্ত বিধি মেনেও সাগরবুকে যাত্রা করলেন এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই।

রামমোহন একদিকে বিদেশের সঙ্গে সংযোগ করছেন আর একদিকে স্বদেশবাসীর জন্যে গ্রন্থঅনুবাদ করছেন। সংবাদপত্র সম্পাদনা করছেন। তিনিই প্রথম বাংলায় অন্যভাষা থেকে শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করে বহুল প্রচার করেন। তিনিই বল্লেন প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদায়ের আচারগুলিই হিন্দুধর্ম নয়, বেদ-উপনিষদ যে ব্রহ্ম ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছে তার মধ্যেই হিন্দুধর্মের মৌলভূমি, বিবরণস্থল। নারীকে ভোগ্য থেকে ভাগবতী ধারায় নিয়ে এলেন তিনি। সমাজে নারীর মর্যাদা, কৃষকের মর্যাদা, সাধারণ মানুষের স্বাধীন মর্যাদাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তাঁর সেকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে সংগ্রামী ভূমিকা তা এ যুগেও অভাবনীয়।

রামমোহন সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকমের মত প্রকাশ করে থাকেন। সমস্ত কিছুকে যেন ছাপিয়ে যায় যখন দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসসন্তান বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—'সেই মহান হিন্দুসংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটাই ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন।'

রামমোহনের জীবন ও বাণীর মধ্যে, কর্ম ও ধর্মের মধ্যে ছিল সমন্বয়ী দর্শন। তাই তিনি হিন্দুর প্রথা-সর্বস্ব আচারকে ধর্ম বলে মানতে পারেন নি। যদিও তিনি বংশের প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য আচার ও উপবীত ধারণ করেই থেকেছেন বিদেশে গিয়েও তথাপি যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ তার বিষয়ে লেখনীধারণ বা বক্তব্য উপস্থাপনে কখনও তিনি পিছু হটেন নি। নিজের কুলপ্রথা বজায় রেখেও তৎকালীন কুসংস্কারকে তিনি অন্ধমোহ বলে দেখিয়ে দিয়েছেন বারবার। পরবর্তী প্রজন্মে নবজাগৃতিই ছিল তাঁর প্রার্থিত। সেই নবজাগৃতির উত্তরাধিকারী ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজ, যে সমাজ আমাদের সত্য কথা বলতে, সত্য পথে চলতে এবং সত্যের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকতে দীক্ষা দিয়েছিল। তাই উচ্চারিত রবীন্দ্ররচনায়—'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।'

ভারতে যুক্তিবাদী চেতনার রামমোহনই যে পথিকৃৎ তা সর্বজনস্বীকার্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় মানস-গঠনেও তিনিই অগ্রনায়ক। আজ যে ভারতবর্ষে বহু দল ও মত, আজ যে ভারত-ভূখণ্ডে নবীন উৎসাহ তার পূর্বসূরী রামমোহন। তবে তবে আজকের এই অগ্রগতি।

(৩)

বিশ্বভ্রাতৃত্বের অগ্রদূত, ভারতপথিক এবং আধুনিক ভাবনার প্রবক্তা ছিলেন রামমোহন। তাই তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর মাহেন্দ্রলগ্নে সাহিত্যিক-চিন্তাবিদরা 'সাহিত্যতীর্থ'এর আমন্ত্রণে গত দু'বছর মিলিত হয়েছিলেন তাঁর মানিকতলার ১১৩ আপার সার্কুলার রোডের বাগান-ঘেরা বাড়িতে। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে নবজাগৃতির পুরোধা পুরুষ বলে রাজা রামমোহনকে চিহ্নিত করি কিন্তু তাঁর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্যে কিছুই করছি না। অনুরূপ আক্ষেপ আমহার্স্ট স্ট্রীটের তাঁর প্রাসাদের সামনে অনুষ্ঠিত সভাতেও জননায়করা প্রকাশ করলেন। রাজার জন্মগ্রামে রাধানগরেরও সভায় নানা আক্ষেপ করা হয়েছে অভাব স্মারক সভায় মধ্যেই।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তখন সেই সব প্রস্তাবও প্রকাশিত হল। সেই প্রস্তাবগুলি ছিল এই যে, বর্তমানে উত্তর কলকাতার উপনগরপালের কর্মকেন্দ্রের কেবল প্রাচীন ভবনটিকে রামমোহনের স্মৃতিসংগ্রহশালারূপে চিহ্নিত করা। এবং এটিকে পুলিশ-বিভাগের অধীনেই তাঁদের দ্রষ্টব্য সামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনশালা করা। এখানে উল্লেখ করা চলে যে স্বাধীনতা আন্দোলন কালের বহু স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের সংগ্রহে আছে। অনেক বিখ্যাত নাটকের পাণ্ডুলিপির কথাও অনেকেই জানেন যা লালবাজারে অন্ধকারে রাজবন্দী রয়েছে। আরও কত নথিপত্র রয়েছে যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত করতে পারে।

আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা, তুলনামূলকভাষাতত্ত্ব বা অনুরূপ আরো কোনো কোনো বিভাগের কেন্দ্রভবন করা। রাধানগরকে দ্রষ্টব্যস্থলরূপে সুসজ্জিত করারও প্রস্তাব হয়।

এখন তাই প্রার্থিত, রামমোহনের নবজাগ্রত মানসিকতার উত্তরাধিকারী আমরা তাঁর দ্বিশত বর্ষের জন্মদিন অতিক্রম করে এসে যেন যথার্থ স্মৃতিরক্ষায় তৎপর হই। ভারত সরকার রামমোহনের দ্বিশত জন্মবর্ষের স্মরণে গ্রন্থ ক্রয় ও বিতরণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন যা প্রশংসনীয় কিন্তু স্থায়ী স্মৃতিরক্ষায় তাঁর তিনটি কেন্দ্রভূমির দিকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায় না? আমরা কি শুধুই রামমোহনের নবচেতনার আলোক নিয়ে প্রজ্ঞাপ্রদ্যোতিত হয়ে থাকবো প্রাজ্ঞপুরুষের পূজাবেদী রচনা করতে পারবো না? আমরা কি ১৯০২ সালে উচ্চারিত রবীন্দ্ররচনার বাণী সার্থক করতে পারবো না, যেখানে তিনি বলছেন—

'হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।'

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েকদিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস দে

ছুরলেই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কেন্দ্রাহিল যাবার রাস্তায় বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার হেনরী গারনেকে (Sir Henry Garney) মালয়ের সন্ত্রাসবাদী কমুনিষ্ট দলগুলি হত্যা করে। তিনি যখন সপরিবারে ফ্রেজার হিলে বেড়াতে যাচ্ছিলেন তখন আতর্কিতভাবে পাহাড়ের গায়ে কমুনিষ্টদল তাঁর গাড়ীরওপর গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। তার গাড়ীতে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তিনি গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন ও কমুনিষ্টের গুলিতে প্রাণ হারান। কোয়ালালামপুরের কাছেই তাঁকে কবরিস্ত করা হয়। তাঁর পরেই আসেন স্যার জেরাও টেম্পলার মালয়ের হাইকমিশনার হয়ে।

জেনারেল টেম্পলার এসে কমুনিষ্টদের দমন করেছিলেন। টেম্পলারের পূর্ব্বে চিন পেং এর সঙ্গে মালয় সরকার শান্তি প্রস্তাব করে একটা বৈঠক ডেকেছিল। চিন পেংও জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসে বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বৈঠকের শান্তিপ্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াতে চিন পেং আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর আর কোন সংবাদ আমাদের কানে আসেনি। কেউ বলে তিনি মারা গেছেন। কেউ বলে তিনি চীন দেশে চলে গেছেন। তারপর মালয় দেশ কিছুদিন পরে স্বাধীন হ'ল।

যেসব ছাত্র ছাত্রীরা চীনদেশে গেল তাদের আর মালয়ে ঢুকতে দেওয়া হ'ল না। তবে বহু কষ্টে ও বহু তদ্বির করে কয়েকটী ছাত্র ছাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটী ছাত্রের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তাদের মুখেই শুনেছিলাম যে চীনদেশে শাসনকার্য খুবই প্রবল। বাড়ীর উঠানে যদি কেউ ফসল উৎপাদন করে বা কেউ মুরগী শুয়ারের চাষ করে সেই সব উৎপাদনের ফসল বা মুরগী শুয়ারের বাড়ীর কর্ত্তার না হয়ে সমস্ত সরকারের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। আর সরকার সেইসব জিনিষ গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যেই বন্টন করে দেয়। সেজন্যে বাড়ীতে আর কেউ কিছু করতে চায় না। তবে চুরি ডাকাতি ঘুষ নেওয়া একেবারেই চীনদেশ থেকে লোপ পেয়েছে। সকলেরই যে যার কাজ করতে যেতে হয়, গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার সরকারের লোকেদের। কাজের পর ছুটী হলে বাবা মায়া তাদের ছেলেমেয়েদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ডাক্তারী পরীক্ষা ঔষধ সবই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যান বাহনের খরচ খুবই কম। রেশন সব জায়গাতে নিয়ম মত বাঁধা। কেউ কম কেউ বেশী পাবে না।

মালয়ের ছেলে মেয়েরা এতে অভ্যস্ত নয়। তাই তারা কয়েকদিন থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তারপর বাবা মা আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে তাদের মধ্যে একটা হোমসিক ভাব দেখা দেয়। তারা দেশে ফিরতে পারেনা। তা বাবা মাকে অর্থ পাঠাতে হয়। ছেলেমেয়েরাও ওখানে বাবা মায়ের জন্যে চোখের জল ফেলতে থাকে আর বাবা মায়েরাও এখানে বুক চাপড়াতে থাকেন।

আমি মালয় ছেড়ে ভারতে ফিরে আসার পরও এ সমস্যা রয়ে গেছে। তাই এখন চীনদেশে যাবার জন্য এখন আর কোন চীনা ছেলে-মেয়ের প্রাণ কাঁদে না। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছুটা পূর্ব্বেই হোটেলে ফিরে এলাম।

দুপুরের আহারের পর আমি ঘন্টা খানেক বিছানায় বিশ্রাম নিয়েই উঠে পড়লাম। রাত্রিতে জাপানের বৈ

আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসব তিনি যেন বিছানায় বিশ্রাম নেন। তিনি কিন্তু রাজী নন, চির-সঙ্গিনী নিত্যসঙ্গ নিতে চান। অতি পরিশ্রমে অসুখ বিসুখ হবার ভয় দেখিয়ে তাঁকে বিশ্রাম করতে বলে আমি সেজেগুজে লিফ্‌ট দিয়ে নীচে নেমে এলাম। পূর্ব্বের লিফটের আলাপী মেয়েটীর আবার ডিউটি পড়েছে। সে আমাকে দেখলে মৃদু হেসে বলে উঠল "আপনি কবে এলেন?" "কাল এসেছি, ভাল আছতো?" তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে তার উত্তরে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। আমি লিফট থেকে নেমে বললাম "একটু দরকার আছে। পরে এসে কথা বলব।" বলে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই সূর্য্যের প্রখর তেজে আমার সারাটা গা পুড়িয়ে দিয়ে গেল। অসম্ভব গরম পড়েছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে এ গলি সে গলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাজারের কাছে এসে পৌঁছলাম। বাজারে লোকজন রয়েছে চলাফেরা হচ্ছে তবে খুব ভীড় নেই। রাস্তার ধারে চাষীরা সব্জি বিক্রি করছে। সব্জিগুলো খুবই টাট্‌কা লিচুর মত বড় বড় আঁসফল বিক্রি হচ্ছে দেখে আমি লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কেন তার জন্যে খুব লোভ হল। শ্যামদেশেই প্রথম এত বড় আঁসফল কিনে খেয়েছিলাম। আঁসফল গুলো খুব মিষ্টি আর রসে ভর্তি ছিল। ওদের কাছে থেকে একটা খেয়ে দুটাকার মত আঁসফল কিনে ব্যাগে পুরলাম। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্যে কিনে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু এখন কিনে নিয়ে গেলে খারাপ হয়ে যাবে। তাই যাবার দিন কিনলেই চলবে। পাশের দোকান থেকে দর কষাকষি করে একটা বাজারে বড় কাপড়ের ব্যাগ আর একটা ছাতা কিনলাম। ঘুরতে ঘুরতে আর একটি দোকানের কাছে গিয়ে দেখলাম যে তারা চীনা মাটীর প্লেটের উপর ওখানকার অনেক লোকের ছবি তুলেছে। ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম যে তারা দুদিনের মধ্যে প্লেট তৈরী করে দেবে তবে দাম, একটু বেশী পড়বে। এখানে আমরা দুদিন থাকব। আমরা প্লেট তুলে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব। তাই আর এদিক ওদিক না ঘুরে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। প্লেটের কথা জানাতে স্ত্রী বিশ্বাস করলেন না। আমি যে একজন জোচ্চোরের হাতে পড়েছি তা আমাকে তিনি জানিয়ে দিলেন। তবে আমার পীড়াপীড়িতে তিনি দোকানে গিয়ে ফটো তোলালেন। আমি তাদের অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে এলাম। দুদিনের দিন প্লেট গুলো পেয়েছিলাম। সবকটাই দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। ফটোর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম। রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরসের সামনে দোকানদারেরা সব প্র্যাণ্ড সেলের প্লাকার্ড টাঙিয়ে দিয়েছে। আর রক্ষে আছে? সেল হচ্ছে দেখে আমার স্ত্রী ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এমনভাবে সব কিনতে লাগলেন যে মনে হয় সব ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরসটা যদি মাথায় করে মালয়ে নিয়ে যেতে পারতেন তা হলে তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে যেতেন। কিন্তু সঙ্গে অল্প টাকা আছে তাই আর তিনি বেশী এগুতে পারলেন না। সমস্ত ক্রীত জিনিষপত্রের সঙ্গে তিনি বিনামূল্যে অনেকগুলি ছুরি চামচ কাঁটা ও একটা প্লাষ্টিকের ঝুড়ি পেলেন। তাঁর আনন্দ দেখে কে? "ভাগ্যিস এদিকে এসেছিলাম তা না হলে ত আর কেনা হত না" তিনি মন্তব্য করলেন। লোকে লোকারণ্য। কাউণ্টারে লাইন দিয়ে টাকা জমা দিতে গেলে বেশ খানিকক্ষণ সময় চলে যায়। মালয় দেশ থেকে যারা বেড়াতে এসেছেন তা তাঁদের সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়ে গেল। তাঁরাও সব কিনে নিয়ে চলেছেন। অন্যান্য জিনিষের দাম মালয় থেকেও অনেক কম। এখানকার একজন চীনা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে হংকংএ অনেক জিনিষ তৈরী হয়। প্রায় তার সব জিনিষই এখানে বিক্রি হয়। তবে তা থেকে ২৮ শতাংশ বাইরের দেশে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। এখানে নানা রকমের পোষাক পরিচ্ছদ, রবারের জুতো, বুট জুতো প্লাষ্টিকের ফ্লাস্ক, ইলেক্‌ট্রিক টর্চ, অন্যান্য টিনের খাদ্য দ্রব্য, সিমেন্ট, পটারি

চিনীর ও চিনি পরিস্কৃত করবার কারখানা আছে। এদিকে জাহাজ তৈরী ও সারানোর কারখানাও রয়েছে। তারপর রয়েছে ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠান। সেখানে লোহার রড, টিন বার প্রভৃতি তৈরী হয়। তারপর রয়েছে মাছের ব্যবসা। হংকং সরকার মাছের ব্যবসাতে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করেছে। মাছ ধরার জন্য আধুনিক জাহাজ ও বড় বড় চীনা জাঙ্ক রয়েছে। রাজপথের মাছও রপ্তানী হয়ে থাকে।

আমরা জিনিষ পত্র কিনে মহানন্দে সিং ওং (sing wong) রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চললাম। রাত্রি বেশ হয়েছে। সারা সহরটা আলোক মালায় সজ্জিত ছিল। মনে হয় যেন কোথাও কোন উৎসব হচ্ছে। এখন রাত আটটা লোকের ভীড় এখনো কমেনি। মনে হয় যেন অফিসের কাজের শেষে লোক চলেছে। অগনিত লোক, রাস্তা দিয়ে চলাই ভার হয়ে ওঠে। দূরে হংকং নগরী আলোকমালায় এমনভাবে সেজেছিল যে তা দেখলে সত্যই মোহিত হতে হয়। আমরা ঘুরতে ঘুরতে হোটেলে এসে পৌঁছালাম। অনেক বন্ধু বান্ধব দোকান থেকে কিনে কেটে ফিরেছেন দেখলাম। সকলেরই মুখে হাসি।

পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফাষ্ট খেয়েই হংকং দ্বীপে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। হংকং হারবার হোটেল থেকে বেশ কয়েক মিনিটের পথ। কতবার হংকং দ্বীপে ঘুরে এসেছি তাই এই দ্বীপটা আমাদের কাছে আর অজানা ছিল না। অন্যেরা কেউ এখনও দ্বীপটা দেখেন নি তাই দেখবার জন্যে তাঁদের একটা বেশ উৎসাহ রয়েছে দেখলাম। গাইড আমাদের সকলকে বাসে করে নিয়ে গিয়ে হারবারে গিয়ে তুললেন। তারপর ফেরি জাহাজটি ছাড়তে একে একে আমরা জাহাজে গিয়ে উঠলাম। এখানে পারাপারের এত ভীড় যে জাহাজ কয়েক মিনিট পর পর ছাড়ে। কয়েকটা জাহাজ এখানে সব সময় কাজ করে চলেছে। ভোর বেলা থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত লোক ও যানবাহন পারাপার করে থাকে। কাউলুন থেকে বেশীরভাগ লোক হংকং দ্বীপে কাজ করতে যান। সকলকেই টিকিট কাটিয়ে লাইন দিয়ে এক এক করে জাহাজে উঠতে হয়। জাহাজে ভর্তি লোক আর অসংখ্য মোটর গাড়ী নিয়ে আমাদের জাহাজটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিল। যতবড় সমুদ্রপোত এখানে অনেক বড়বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। এই ঈশ্বর দত্ত সমুদ্র পোতটা আয়তনে ১৭ বর্গমাইল। এখানে অন্যান্য দেশের জাহাজ আসে ও এখান থেকে অন্যান্য দেশে হংকং সরকারের জাহাজে যাতায়াত করে থাকে। নানা দেশের সঙ্গে এরা ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। পূর্ব্বে চীন দেশের সঙ্গে এদের বেশীর ভাগ বাণিজ্য হ'ত। কিন্তু আজকাল চীনদেশের সঙ্গে বেশী ব্যবসা বাণিজ্য হয় না। তাই এরা এখন ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা করছে। গাইড আমাকে বিশদ ভাবে সব জানালেন। জাহাজ থেকে হংকং এর বাড়ীগুলোকে ছোট ছোট বাক্সর মত দেখায় কিন্তু আমরা কাছে যেতে দেখতে পেলাম ওগুলো কোনটা বিশতলা আর কোনটা বাইশতলা উঁচু। জাহাজ এসে হারবারে ভিড়ল। হংকং এর রাজধানী ভিক্টোরিয়াতে আমারা এসে নামলাম। পূর্ব্বেই জানতাম যে কাউলুন হারবার থেকে ভিক্টোরিয়া হারবার এক মাইল লম্বা। আর যদি আমরা নৌকা বা জাহে করে হংকং দ্বীপে আসতাম তাহলে তারা আমাদের লেমান পাশ leimun pass) এ নামাত। তার দূরত্ব মাত্র আধমাইল।

সমুদ্রের পাশ দিয়ে একটা প্রশস্ত রাজপথ হংকং দ্বীপটাকে বেষ্টন করে রয়েছে। এই পথ দিয়ে বাস, ট্যাক্সি ও অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করে থাকে। সহরে ঢোকবার জন্যে আর একটা রাস্তা ওপরে চলে গেছে। রাস্তার দুধারে অগনিত বড় বড় অট্টালিকা রয়েছে। আর সেখানে রয়েছে অফিস আর বড় বড় আসবাবপত্রের ও অন্যান্য জিনিষের দোকান। এখানে একটা বিরাট গ্যারেজ তৈরী হয়েছে। গাড়ীগুলোকে ওপর তলায় ও নীচের তলায় রাখা হয়। বেশীর ভাগ দোকানগুলো সব চীনা ও ইয়োরোপীয়ানদের। এই সব দোকানে সব কিছুই জিনিষ পাওয়া যায়। একটু

দুধারেই রয়েছে বড় বাজার, লোকে লোকারণ্য। আমাদের বাসটা পাহাড়টাকে বেষ্টন করে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে পাহাড়ের মাথায় ভিক্টোরিয়া চূড়ায় উঠবে। এই পাহাড়ের চূড়াটা অন্যান্য পাহাড়গুলির চেয়ে সব চেয়ে উঁচু। এর উচ্চতা ১৮২৩ ফুট। আমরা প্রথমে এসে ওখানে ইলেকট্রিক কেবল ট্রাম-কারে করে উঠেছিলাম। এই ট্রামে করে বেশীর ভাগ লোক যাতায়াত করে থাকেন। এই পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য অট্টালিকা রয়েছে। আর এই ট্রাম যাতায়াতের পথে অনেকগুলি ষ্টেশন রয়েছে। প্রত্যেক ষ্টেশনে ট্রাম-কারটা থেমে যাত্রী ওঠা নামা করায়। ওপর থেকে তারের সাহায্যে ট্রামকারটিকে পাহাড়ের ওপর ও নীচে ওঠানো ও নামানো হয়। একটা ট্রাম নীচে নামে ও একটা ট্রাম ওপরে উঠে যায়।

পেনাং এ এই রকম ট্রামগাড়ী আছে। আমরা পেনাং-এর পাহাড়ে এই ট্রামে করে উঠতাম। পাহাড়ের চূড়া থেকে কাউলুন সহর আর হংকং দ্বীপটা বেশী ভাল করে দেখা যায়। আমাদের বাসটা পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল। প্রশস্ত পথটাতে বাস ও অন্যান্য যানবাহন বেশ ভালভাবে যাতায়াত করতে পারে। তবে মদের নেশায় অনেকে এ্যাকসিডেন্ট করেছেন।

ওপর থেকে নীচের আকাশচুম্বি বাড়ীগুলিকে দেখতে বেশ ভাল লাগে। নীচের জমির একপাশে রয়েছে মস্তবড় একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ। সেখান-কার রাস্তাটা ডিম্বাকৃতি আর দেখতে খুবই সুন্দর। আমরা ক্রমাগত ওপরে উঠতে লাগলাম। রাস্তার দুপাশে সুন্দর সুন্দর অসংখ্য অট্টালিকা রয়েছে। সবই ধনীর প্রাসাদ বলে মনে হল। আমরা কিছুক্ষণে মধ্যেই পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে পড়লাম। এখানে বেশ শীত, আমাদের সকলের বেশ শীত করতে লাগল। ওপরে দুটো দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে। সেখান থেকে লোকে দূরের বস্তুগুলি দেখেন। আমরাও দেখলাম। দূরে কাউলুন সহর আর তার বিমান বন্দর কাইটাকের (Kaitak) রানওয়েটা। দেখতে খুবই সুন্দর লাগল। রানওয়েটা যেন সমুদ্রের ওপর ভাসছে। হংকং দ্বীপের আর কাউলুনের অনেক জায়গা সমুদ্রের বুক থেকে মানুষ কেড়ে নিয়ে সহর তৈরী করেছে। ওপর থেকে এর সমুদ্রতীর দেখলাম। সমুদ্রতীরগুলো সমান নয়, সবই এবড়ো খেবড়ো হয়ে রয়েছে। গাইড জানা-লেন যে হংকং এর পাহাড়গুলো ৫০ পারসেন্ট গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী। টাইফুন আর সমুদ্রের ঢেউতে পাহাড়ের ধারগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আর তার ফলে প্রাকৃতিক সমুদ্রপোত প্রায় সব জায়গাতেই গড়ে উঠেছে। এই দ্বীপটা পাহাড়ে পাহাড়ে ভর্তি। এর আয়তন এত ছোট যে পাশের স্টোন কাটার দ্বীপটা নিয়ে এর আয়তন হবে বত্রিশ মাইল। ক্যানটন থেকে এর দূরত্ব ৭৭ মাইল।

গাইড হংকং সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জানালেন। "পূর্ব্বে হংকং দ্বীপে জেলে আর জলদস্যুর আবাস স্থল ছিল। এই দ্বীপটা তখন খাস চীনভূখণ্ডের মধ্যেই ছিল। তবে এই ছোট্ট দ্বীপটাকে মাঞ্চু রাজারা কোন মূল্যই দিত না। প্রকাণ্ডচীন দেশ নিয়েই তখন তাঁদের মাথা ব্যথা থাকত। চীন দেশের সঙ্গে বানিজ্য করতে তখন ইয়োরোপের অনেক দেশের লোক, ভারত ও অন্যান্য পূর্ব্ব দেশের লোকেরা চীন দেশে আসতেন। অনেকে এসে তাঁরা ব্যবসা বানিজ্য করে চলে যেতেন। আবার অনেকে সেখানে পাকা বন্দোবস্ত করবার জন্যে রয়ে যেতেন। এদের মধ্যে ছিলেন পর্তুগীজ, রাশিয়া, ডাচ ও ইংরাজেরা। এই সব দেশের লোকেরা নিজেদের সুখ সুবিধার জন্যে নিজেদের দেশ থেকে একজন করে রাজদূত চীন দেশে আনতেন। এই সব রাজদূতেরা তাঁদের নিজের নিজের লোকদের দেখাশুনা করতেন। ডাচ ও রুশ রাজদূতেরা চীন রাজার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে সম্মান দিতে পারতেন না। তাঁরা অসম্মান বোধ করতেন। এই সম্মান দেওয়াটা চীনদেশের একটা প্রথা ছিল। তাই তাঁদের দেশে ফিরতে হ'ল। ইংরাজ ছিল সুবিধাবাদী।

চীনা রাজার সম্মানে তারা ঐ প্রথাকে মেনে নিয়ে চীন দেশে রয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারা বাণিজ্য বিস্তার করতে করতে দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে স্থায়ী ভাবে রয়ে গেল।

১৮২১ সাল থেকে তারা হংকং হারবারে তাদের বাণিজ্য জাহাজগুলি, সবসময় নোঙর করে রাখত। তারপর দ্বীপটী তাদের থাকবার উপযুক্ত ভেবে তারা সেখানে ক্রমে ক্রমে বাসা বাঁধতে লাগল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ভারতের পূর্বদিকটা কব্জায় করে শাসন চালাচ্ছিল। সেই সময় ভারতে আফিমের চাষ হত। সেই আফিম চীনদেশে নিয়ে এসে তারা ব্যবসা করত। জাহাজ ভর্তি আফিম এই হংকং এ এসে আশ্রয় নিত। তারপর এখান থেকে চীন ভূখণ্ডের নানা জায়গায় চালান দেওয়া হত। চীনদেশের লোকের কাছে এই আফিমের বিনিময়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কোটি কোটি টাকার রৌপ্য আহরণ করে তাদের দেশে নিয়ে ফেলত। মাঞ্চুরাজা দেখালেন যে তাঁর প্রজারা এই আফিম খেয়ে কাজ করতে পারে না তারা সব সময়-ঝিমুতে থাকে। দেশের সর্বনাশ দেখে তিনি সারা চীনদেশে আফিম বিক্রি বন্ধ করে দিলেন।

ক্যাণ্টন থেকে তাঁর লোকেরা আফিম কেড়ে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে সব পুড়িয়ে দিল। ইংরাজেরা দেখল যে তাদের আফিমের ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এতে তাদের বেশ ক্ষতি হবে। তাই তারা চীনরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে দিল। এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৩৮ সালে। চুবছর যুদ্ধ করে চীনরাজ পরাজিত হয়ে ১৮৪২ সালে ওঁদের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদন করলেন। এরই নাম নানকিং চুক্তি। এই চুক্তির ফলে ইংরেজরা চীনদেশের পাঁচটী বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পেল আর হংকং দ্বীপটী তখন থেকে একেবারে নিজেদের কলোনীতে রূপান্তরিত করল। ইতিহাসের পাতায় এইযুদ্ধের নামই আফিম যুদ্ধ বলে খ্যাত। তবে এখন চীনদেশের যা অবস্থা হয়েছে তাতে করে মাওসেতুং ইচ্ছা করলে এক রাত্রিতেই হংকং চীন-দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না, এঁদের কাছ থেকে নানা রকম ভাবে চীনদেশ এখনও উপকৃত হচ্ছে। হংকংএ জলাভাব লেগেই আছে। ক্যাণ্টন থেকে এখনও প্রচুর জল রোজ এখানে এসে থাকে। এর জন্যে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা হংকং সরকারকে দিতে হয়। জলসরবরাহ বন্ধ করে দিলে হংকংএ জলের জন্যে আজ হাহাকার উঠবে।" মিঃ চুয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন" এই সুন্দর হংকং দেশটার উন্নতি করতে ইংরেজদের কত বছর লেগেছিল ?"

"বেশী দিন তাদের লাগেনি। এক শতাব্দীর মধ্যেই এদেশ তারা উন্নত করে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের একটা অসুবিধা ছিল। কারণ কাউলুন থেকে সব সময়েই একটা না একটা ঝামেলা তাদের আসত। কাউলুনেই ছিল বড় সমুদ্র পোত। সবসময়েই চীনা দস্যুরা লুকিয়ে লুকিয়ে এই দ্বীপটী আক্রমণ করতে লাগল। তখন হংকংএর রাজধানী ভিক্টোরিয়া বিপদে পড়ল। ১৮৬০ সালে পিকিং সম্মেলনে চীনাদের সঙ্গে এদের একটা চুক্তি হ'ল। এই চুক্তিতে কাউলুন পেনিনসুলা আর স্টোন কাটার দ্বীপ বৃটিশের এসে গেল। এর পর ১৮৯৮ সালে চীনদেশের সঙ্গে আর একটী চুক্তিতে তারা নিউ-টেরিটরিটী ৯৯ বছরের জন্যে চীন সরকারের কাছ থেকে লীজ নিল। এর সঙ্গে এ'ল মীর ও ডিপ উপসাগর চুটী। তারপর থেকেই বৃটিশের হংকং সাম্রাজ্যটী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে গিয়ে আজ এমনি স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।"

"হংকং এ এত লোকের সমাগম হত না যদি চীনদেশে একটুশান্তি থাকত।" কথাটা বলে ফেলেই আমি চুপ করে থাকি। চীনাদের কাছে চীন দেশের নিন্দা করা আমার উচিত হয়নি। গাইড ভদ্রলোকটি বললেন "আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার। চীন দেশে কোন কালেই শান্তি ছিলনা আর, আজও নেই। তা না হলে বিদুষী চীনাজনগনের আজ এমন অবস্থা হ'ত না। ১৯১১ সাল থেকেই এই অশান্তি প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ে দেশের মধ্যে রাজা প্রজাদের

মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। দেশের লোকেরা ভয় পেয়ে দলে দলে এখানে চলে এল। এর পরই চীনে প্রজাতন্ত্র সরকার গঠিত হয়েছিল।

তার পর ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ চীনের কতক অংশের জনগণ বৃটিশ পণ্য একেবারে বয়কট করেন। সেই সময় এঁদের পণ্য চীন দেশের রপ্তানী করার পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ও মালয়ে রপ্তানী করতে লাগলেন। তাতে চীনদেশের অনেক ক্ষতি হ'ল। অনেকে খেতে না পেয়ে এখানে চলে এ'ল। তার পর জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া দখল করে বসল তখন চীনাদের সঙ্গে ইংরেজের আবার বন্ধুত্ব হ'ল। ১৯৩৭ সালে জাপানের ভয়ে চীনাজনগণ হংকং এ এসে প্রাণ বাঁচায় সেই সময় ইংরাজেরা চীনাদের আশ্রয় দেবার জন্যে অনেক কিছু সুবন্দোবস্ত করেছিল। তার পর ১৯৪১ সালে ১৫ই আর ১৬ই ডিসেম্বরে জাপান হংকং আক্রমণ করল। ইংরেজরা যুদ্ধ করে সেই অভিযান ঠেকাল। কিন্তু ১৮ই ও ১৯ শে ডিসেম্বরের আক্রমণে বৃটিশকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তারা আর যুদ্ধ করে ওদের আক্রমণের বাধা দিতে পারল না।

জল সরবরাহের পাইপ লাইন জাপান এসে দখল করে ফেলল। অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করবার পর ১৯৪১ সালের খৃষ্টের জন্মদিনে হংকং জাপানের হাতে চলে গেল। আর চীনারা প্রাণভয়ে আবার চীন দেশে পালাতে সুরু করল। ৩০শে আগস্ট ১৯৪৫ সালে তিন-বছর পরে ইংরেজের হাতে আবার তাদের কলোনীটা ফিরে এল। যুদ্ধের সময় ঐ দ্বীপের কুখ্যাত স্ট্যানলি শিবিরে জাপানীরা বৃটিশ বন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল।'

"আপনাদের উপর কোন অত্যাচার করেন নি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জাপানীরা কাকেও বাদ দেয় নি। আমাদের মেয়েদের ওপর তারা খুবই অত্যাচার করেছিল তা এখানে না বলাই ভাল। চীনা যুবকেরা বনেজঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকত। বুড়োরাও তাদের হাতে রেহাই পায় নি। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আমরা দিনের বেলা বাবা আর ভাইদের লুকিয়ে লুকিয়ে খাইয়ে দিয়ে আসতাম। দিনের বেলায় তাঁদের কেউ বাইরে আসতে পারত না।"

আমি জাপানীদের অত্যাচের কথা মালয়ে গিয়ে সবই শুনেছিলাম। আমরা তখন মালয় অধিকার কর-বার জন্যে বোম্বাইয়ে কল্যান ট্র্যানজিট ক্যাম্পে অপেক্ষা করেছিলাম। আমেরিকা এটমবোমা ছোঁড়ার পর জাপানীরা সন্ধির প্রস্তাব আনে। পরে তারা সর্বত্র পরাজয় বরণ করে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে। আমরা তখন মালয়ে গিয়ে মালয় অধিকার করি। আমরা ১৫ই সেপ্টে-ম্বর ১৯৪৫ সালে মালয় দ্বীপের পোর্টে ডিকসনে অবতরণ করেছিলাম। আমার "মহাযুদ্ধের পর মালয়" নামক নামক পুস্তকে যথার্থ ভাবে বর্ণনা করেছি, আমি তখন একটা মেডিকেল ইউনিটে ক্যাপটেন ছিলাম।

আমাদের সঙ্গের একজন শিক্ষক তাঁকে স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার উত্তরে তিনি বললেন যে হংকংএ দুহাজারের ওপর স্কুল তৈরী হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ছেলেমেয়েরা পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতিবারেই জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাদের স্থান দিতে পারা যাচ্ছে না। ১৯৫২ সালের পূর্ব্বে যেখানে সেখানে স্কুলগুলো ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠত। শিক্ষার কোন বালাই ছিল না। শিক্ষার মান খুবই নিম্নস্তরের ছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের পর স্কুলবোর্ড গঠন হ'ল। স্কুল আর যাতা ভাবে গড়ে উঠল না।

যে সে আর শিক্ষকতা করতে পারল না। তারপর থেকেই শিক্ষার মান বেশ উন্নত হয়ে উঠছে। আর এখানের হংকং বিশ্ববিদ্যালয়টী ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টী আবাসিক, ১৮৮৭ সাল থেকে এখানে ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এখন তার খুব উন্নতি হয়েছে। এখান থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রী দেওয়া হয়। এখানে অনেক বিখ্যাত চীনা ডাক্তার রয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং আর্টস সবই এখন পড়ান হয়

বিত্তশালীর মত উন্নত ধরনের বলে গাইড আমাদের জানালেন।

পাহাড়ের মাথায় আইসক্রীম, চা ও কফির স্টল রয়েছে। অনেকে চা ও দুধছাড়া কফি খেলেন। আমরা আইসক্রীম খেলাম। মালয় দেশে থাকা কালীন চীনাদের প্রায়ই সকলকেই দুধছাড়া কফি বা চা খেতে দেখতুম। তাঁরা এাকে বলতেন কপিও' বা 'চেও'। 'ও' মানে দুধছাড়া। হংকং এর সমতল জায়গাগুলো খুব গরম। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় সূর্য্যের প্রখর তেজ থাকা সত্বেও বেশ ঠাণ্ডা বোধ করছিলাম। গাইডের মুখেই শুনলুম যে গ্রীষ্মকালে তাপ মাত্রা ৯০ ডিগ্রি ফারেন হাইটের ওপর পর্য্যন্ত উঠে যায় আর শীতকালে ৫৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নেমে আসে। আমরা গরম কালে এখানে এসেছিলাম বলেই এখানে খুব গরম বোধ করছিলাম। মালয় দেশে এত গরম আমরা কখনও পাইনি। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে আমাদের মালয় দেশকে খুবই ভাল লেগেছিল। ওখানে জন জীবনের মান খুব উন্নত ছিল। তাছাড়া তার প্রকৃতি, তার আবহাওয়া, তার সুন্দর দৃশ্য আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল।

এর পর আমরা বাসে করে অন্য পথ দিয়ে নামতে লাগলাম কিছুক্ষণ নামবার পর আমরা টাইগার বাম গার্ডেন (Tiger Balm Garden) বা হ'পার ভিলাতে' (Howper villa) এসে ঢুকলাম। 'হ'পার ভিলাটী মানব হিতৈষী কোটিপতি স্বর্গত অ বুন হ'র (Aw Boon How)। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা বাগান। সেই বাগানের মধ্যে নানা রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। আর রয়েছে সারি সারি কিম্ভূতকিমাকার চেহারার মূর্ত্তি। কোনটা চীনাদের শয়তান, কোনটা চীনাদের দেব দেবী। ইহজগতে পাপ করলে মৃত্যুর পর পাপীকে নরকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। তারই সব দৃশ্য। মূর্ত্তি তৈরী করে সব দেখান হয়েছে। আবার রয়েছে পুণ্যাত্মাদের মূর্ত্তি। তাঁরা মৃত্যুর পর কেমন ভাবে সুখ ভোগ করেন আর দেবতাদের আশীর্ব্বাদ পান তারই সব দৃশ্য।

সিঙ্গাপুরের পাসির পানজাং এতে (Pasir Panjang) হপার ভিলা কয়েক একর জমি নিয়ে তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে শত শত চীনা দেব দেবীর মূর্ত্তি শয়তানের মূর্ত্তি আর রয়েছে নানা জীব জন্তুর মূর্ত্তি। বাগানটীর মধ্যে ঘুরতে খুবই পরিশ্রম হয়ে থাকে। এই হপার ভিলার নির্ম্মাতা স্বর্গত অ' বুন হ (Aw Boon How) ছেলেবেলায় প্রায়ই আমাহারে দিন কাটাতেন। কোন এক চীনা ভদ্রলোকের কাছ থেকে মেনথল ও ভেসিলিন সহযোগে টাইগার বাম (Tiger Balm) বলম ঔষধটী তৈরী করে' চীন দেশে ও মালয়ে বিক্রি করে' ক্রমে ক্রমে তিনি কোটিপতি হন। ইনিই টো দৈনিক সংবাদ পত্রও বের করেছিলেন একটী ইংরাজীতে আর একটি চীনা ভাষায়। হংকং এর ইংরাজী পত্রিকাটী নাম হংকং স্টাণ্ডাড নিউস পেপার (Hong Standard Newspaper) এর অফিসটি ৬৩৫ নং কিংস রোড, হংকং। হংকং এর হ' পার ভিলার পাশেই রয়েছে এরই একটি বড় অট্টালিকা তার মধ্যে রয়েছে জেড পাথরের তৈরী অনেক দেখবার জিনিষ পত্র। এখানে ঢুকতে হলে উপরক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হয়।

জীবনে ইনি লক্ষ লক্ষ টাকা স্কুল কলেজেও দান করেছেন। বেশ কয়েক বছর পূর্ব্বে ইনি মারা গেছেন। এখন তাঁর ছেলেরাই সব দেখাশোনা করেন।

আমরা বাগানটি দেখে এ্যাবারডিনে (Aberdeen) এলাম। এবারডিন হংকং উপসাগরের ধারে অবস্থিত। এখানে শত শত জেলে পরিবার বাস পাহাড়ের ওপর প্রচুর ঘর বাড়ী রয়েছে কিন্তু তাতেও তাদের কুলোয় না। তাই কয়েক শত পরিবার উপসাগরের ওপর নৌকাতে বসবাস থাকে। তারা মাছ ধরে কেনা বেচা করেই সংসার প্রতিপালন করে থা ক। এদের জীবন যাপন প্রণালী দেখলেই বোঝা যায় যে এরা খুবই গরীব। জীবিকা নির্ব্বাহ করবার জন্যে এদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। রাস্তার একধারে এদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর আর বাজার অন্যধারে একটি কবরস্থান রয়েছে। এরা কেমন করে বাস করে তা দেখে

সত্যই অবাক হতে হয়। আমরা একটা সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীচে নেমে এলাম। বাস আসার এদিকে কোন পথ নেই। এখানেই আমাদের লাঞ্চ খাওয়াবে শুনলাম। সমুদ্র থেকে টাট্‌কা মাছ ধরে আমাদের খাওয়াবে তাও জানতে পারলাম কিন্তু এদিকে একটাও হোটেল দেখতে না পেয়ে গাইডকে হোটেল দেখাতে বল্লাম। গাইড দূরে সমুদ্রের ওপর অসংখ্য নৌকার মধ্যে একটি ছোট জাহাজ দেখিয়ে বল্লেন যে ঐ জাহাজে আমাদের লাঞ্চ খাওয়ানো হবে। আমাদের ওরা নৌকা করে ঐ জাহাজে নিয়ে যাবে। দেখলাম সামনেই একটা বাহারে নৌকা আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছে। আমরা একে একে সকলেই নৌকাতে উঠতেই নৌকাটী ছেড়ে দিল। অসংখ্য নৌকার মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের ইঞ্জিন-চালিত নৌকাটী কিছুক্ষণ পরে সেই জাহাজ রেষ্টুরেন্টে পৌঁছে গেল। আমরা এক এক করে রেষ্টুরেন্টে উঠে গেলাম। পাশেই আর একটা জাহাজ রেষ্টুরেন্টে রয়েছে। ওটির মালিক অন্ত একজন ভদ্রলোক। আমাদের জাহাজটি বেশ মাঝারি গোছের। এটী দোতলা করা রয়েছে। মস্ত বড় ডেকের ওপর আমাদের লাঞ্চের জন্তে মস্ত বড় টেবিল আর প্রায় কুড়িটা চেয়ার পাতা রয়েছে। আমাদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কারণ তারা এখনও রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত। মালিক আমাদের সকলকে ভালভাবে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি একধারে আমার স্ত্রীকে ও আরও কয়েকটি মহিলাদের নিয়ে গিয়ে একটি বড় পাহাড়ী চিংড়ি দেখালেন। চিংড়িটি জলের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছে। আমরা এরকম চিংড়ি স্বাবদেশের টোকাডোরো হোটেলে খেয়েছিলাম। এক একজনকে এক একটা চিংড়ি মাছ পরিবেশন করা হয়েছিল। খেতে সুস্বাদু। কিন্তু একটু বেশ শক্ত বলে বোধ হয়েছিল। এগুলো অষ্ট্রেলিয়ান লবষ্টার। সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের গর্ত্তে গর্ত্তে এরা বাস করে থাকে। আমাদের লাঞ্চ খাবার ডাক আসতে আমরা সকলে চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম।

রেষ্টুরেন্টের কর্মচারীরা বড় বড় থালায় করে সদ্যধরা চিংড়ি মাছ ও অন্যান্ত সামুদ্রিক মাছ ভাজা আর তার সঙ্গে থালায় করে" ফ্রায়েড রাইস আমাদের টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। সকলেই মহানন্দে আহারে মনোনিবেশ করলাম। এতদিন ঠাণ্ডা ঘরের মাছ খেয়ে খেয়ে আসল মাছের স্বাদটা পাচ্ছিলাম না। এখন তা বেশ পাচ্ছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাছের থালা আর ভাতের থালা শূন্ত হয়ে গেল। মালিক কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়ালেন। তিনি আবার ইশারা করাতে কর্মচারীরা আরও কয়েকটি থালা টেবিলে এনে রাখে। জাহাজটির ছাদটি কাঠের তৈরী, ডেকের চার পাশ খোলা। নীচের তলায় রান্নাঘর সেখানেই সব কিছু রান্না হয়। ডেকে বসে থাকাকালীন অনেক ব্যাপারীদের আমাদের চোখে পড়ল। অনেকে ছোট ছোট নৌকা করে জিনিষ বিক্রি করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ আমাদের ওখানে এসে জিনিষপত্র বিক্রি করবার জন্তে আমাদের ডাকাডাকি সুরু করে দেয়। ওখানকার তৈরী ও বিদেশী জিনিষ ওদের কাছে পাওয়া যায়। সেগুলোর বাজার থেকে দাম বেশ সস্তা। নৌকা করে কেউ কিছু খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করতে আসে। কেউ কেউ পয়সা ভিক্ষা চাইছে। মালিক ওদের ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন। তা না হলে ওদের দেখে আমরা খাবার মুখে তুলতে পারছিলাম না। আমাদের ভারতে বিয়ে বাড়ীতেও এ রকমের ভিক্ষুক অনেক সময় দেখেছি। খেতে বসে খাবার মুখে তুলছি প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকের দল মুখ বাড়ীয়ে হাঁ করে কাতর নয়নে আমাদের খাওয়া দেখছে। তখন আর খাবার মুখে তুলতে পারি নি। বাড়ীর মালিক ওদের দেখে তখন তাড়াতে আরম্ভ করেন। ওদের কথা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি, জীবনে ওরা ভাল ভাল খাবার কখনও খেতে পায় নি। লোকেদের খেতে দেখেছে কিন্তু ওরা তার ভাগ পায় নি। লোকেদের উপাচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য যে গুলো বাইরে ফেলে দেওয়া হয় সে গুলোই শুধু ওরা

চুহুরগুলোর সঙ্গে মারামারি করে সংগ্রহ করে থাকে। ওদের কি প্যাণ্ডেলের বাইরের এক কোণে খাওয়ানো যায় না। ওরাও ত আমাদেরই ছেলেমেয়েরা একথা আমরা কখন বুঝি না কেন? আমার একটি মেয়ের বিয়ের সময়ে সকলের খাওয়ার শেষে ওদের নিয়ে আমাদের পরিবারের লোকেরা এক টেবিলে বসে আহার করেছিলাম। সেদিনের কথা আজ আমার মনে আছে। সেদিন তারা কি আনন্দেই পেটভরে খেয়েছিল তাদের তখন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তারা তখন ভিক্ষুকের মত বসে বসে খায় নি। ঠিক যেন তারা এক একজন নিমন্ত্রিত অতিথি ছিল। তারা সেদিন তাদের মর্য্যাদা ও সম্মান ফিরে পেয়েছিল। তারা যে মানুষ সেদিন তারা তা বুঝতে পেরেছিল। ওদের আনন্দ মুখগুলো দেখে সেদিন আমার বিবাহের কাজ শুভ হয়েছিল বলে মনে করেছিলাম।

বন্ধুবান্ধবেরা মহা আনন্দে খেয়েই চলেছেন। মালিকও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার তারিফ করছিলেন। খাবার সময়ে বেশ কয়েকটি ফটো আমি তুলেছিলাম। বাড়ীতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখাব বলে জাহাজটির ভেতরকার ও পাশের কয়েকটি দৃশ্যও তুলেছিলাম। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কেউ ওখানেই বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগলেন, কেউ গল্প জুড়ে দিলেন, কেউ জাহাজের ডেকের ওপর এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। কর্মচারীরা টেবিলের ওপর থেকে উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি সব নিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে চলে গেল। ওদের দেখে এক একবার আমার মনে হতে লাগল ওরা কি এখানকার কোন খাদ্যের অংশ খেতে পায়? রোজইত এখানে অনেকে খেতে আসেন। আর রোজই এইভাবে লোকেদের সমানে খাবার পরিবেশন করে থাকে। মালিক ওদের কিছুই খেতে দেয় না? কৌতূহলী হয়ে সে কথা গাইডকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম। গাইড জানিয়ে ছিলেন যে এখানথেকে ওদের কিছুই দেওয়া হয় না। কোন সময়ে যদি লুকিয়ে খেয়ে ফেলে আর পরে ধরা পড়ে ওদের চাকরী চলে যায় সেই ভয়েই ওরা সর্বদাই লোভকে জয় করে চলে। ওরা এখানে অস্থায়ীভাবে চাকরী করে, প্রত্যেকদিনের উপার্জন প্রত্যহ নিয়ে চলে যায়। সকলেই বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে থাকে। সকলের সঙ্গে ঐ টাকায় শাকভাত ছাড়া তাদে কিছুই জোটে না। হংকং গরীবের দেশ বললেও চলে। এখানে ধনীর সংখ্যা গরীবের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। ওদের চাকরী চলে গেলে অনাহারে ওদের পড়ে থাকতে হয়। ওরা সব সময়েই সর্বহারা।

ওরা নিজেদের দেশেও খেতে পায় না, এখানেও খেতে পাচ্ছে না। গাইডের কথাগুলি সবই সত্য। চীনদেশের নেতারা যতই নিজেদের জয়ঢাক পেটান না কেন এইসব দৃশ্য দেখলে তাদের জয় হয়েছে বলে মনে হয় না। দরিদ্র সব দেশেই দরিদ্র। তাদের জন্যে কারো প্রাণ কখনোও কাঁদে না গরীবরা পূর্ব্ব জন্মের পাপ ভোগ করতে এসেছে তার জন্যে কারোই প্রাণ কাঁদা উচিত নয়। ঈশ্বরই তাদের শাস্তি দিচ্ছেন এই মনে করেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি যখন সৈন্যদলে নাম লেখাই তখনকার কথা আজও আমার বেশ মনে আছে। সব কিংস কমিশন (Kings commission) অফিসারদের নিজস্ব একটা করে ব্যাটম্যান বা চাকর থাকত। তখন দেশের বাড়ীতে আমরা কখনও ছুরি কাঁটা ব্যবহার করতুম না। তাই এই সব খাবার সময় আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কাটা ছুরী চামচের ব্যবহার শিক্ষা দিত। আমরা যখনই ভুল করে মাছের ফ্রাই কাটতে গিয়ে মাংসের ছুরিটা ধরতাম বা সুপ খাবার সময় সুপের চামচ না ধরে অন্য চামচ ধরতাম তখন তারা আমাদের ভুল শুধরে দিত। অন্যান্য বড় বড় অফিসাররা আমাদের দিকে আড় চোখে দেখে নিয়ে খেতেন। কয়েকদিন বাদেই আমরা শিখে গেলেও তারা খাবার সময় আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখত। খাওয়া হয়ে গেলে তারা আমার ঘরে চলে গিয়ে জুতো পরিষ্কার করত, বিছানা করে বসে থাকত। ঠিক করে রাখত, তারপর আমাদের

আমার প্রতীক্ষায় করে বসে থাকত। ভোরে বেড়াতে নিয়ে অন্যান্য কাজ করে সকাল এগারোটার সময় তারা একবার বাড়ী থেকে খেয়ে আসত আর রাত দশটার সময় তাদের ছুটি নিতে হত।

কামাই তাদের কোনদিনই চলত না। সকালে সেই খেয়ে এসে রাত দশটায় বাড়ী ফিরত। এই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তাদের খিদে পেত বলে আমি মনে করতাম। তাই তাকে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এর মধ্যে তার মোটেই খিদে পেত কিনা বা কোথায় কিছু সে কিনে খেত কিনা। তার উত্তরে সে আমায় বলেছিল যে ঐ সময়ের মধ্যেই তার খুবই খিদে পেত কিন্তু তার আর কোন উপায় ছিলনা। যা মাইনে পায় তা থেকে বাইরে কিনে খাওয়াটা তার চলেনা। আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমাদের খাবার পর রান্নাঘরে অনেক বাড়তি খাদ্যদ্রব্য থাকে তা কিছু কিছু তারা খেতে পারে। সে হাসতে হাসতে বলে যে রান্নাঘরের তদারকী সুবেদার মেজর ঐ সব খাবার আবার যত্ন করে তাদের নিজেদের জন্তে রেখে দেন। যদি কেউ খিদের জ্বালায় লোভ সংবরণ করতে না পেরে মুখে দেয়, ধরা পড়লে তার আর রক্ষে ছিল না। মারধোর ত হবেই। বেচারীর তখনই চাকরীও চলে যাবে। অনেক বেকার ছেলে বসে আছে তখনই তারা এসে কাজে যোগদান করবে। অনেক সময় খিদের জ্বালায় সে অস্থির হয়ে পড়ত কিন্তু তাকে মুখ বুজে কাজে যেতে হত।

ছুটী হলে তবে সে বাড়ী যেতে পারত। কোন কোন দিন আমার কাজ হয়ে গেলে তাকে ছুটী দিতাম কিন্তু সে যেতে পারত না।

সুবেদার মেজর তার যাতায়াতের সময় স্থির করে দিয়েছিল।

আমরা ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাসে ফিরে এলাম। আসার সময় বাসটিকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একটি পাহাড়ের দিকে হাত দেখিয়ে গাইড আমাদের দেখতে বললেন। আমরা দেখলাম যে ঐ পাহাড়ের মাথায় ভাঙা টিনের ছাদ দেওয়া অসংখ্য ছোট ছোট ঝুপড়ি। তাদের দেওয়ালগুলো গাছপাতা দিয়ে ঢাকা। ওখানেই কয়েক শত চীনা রিফুজি পরিবার এখনি অবস্থায় বাস করছে বলে উনি জানালেন। ওরা সবাই দিনমজুর। জাহাজে কাজ বা বাড়ী তৈরী করা, বা মাল বহার জন্তে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। চীনদেশ থেকে রিফুজী হিসাবে এসে ওই পাহাড়ের মাথায় বছর বছর ধরে বাস করছে, টাইফুন বা বর্ষার সময় ওদের তখন কি অবস্থা হয় তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। অতিবৃষ্টি ওদিকে হয় না তাই হংকংএ জলের ভয়ানক কষ্ট।

টাইফুন এলে প্রবল বাতাসে ওদের বাড়ীগুলো হাওয়ার বাপে নানা দিকে উড়ে চলে যায়। বাতাস থেমে গেলে আবার ওরা সেইগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে বাঁধে। হংকং এ জায়গা খুব কম তাই তাদের জন্তে কোন স্থায়ী বাড়ী করতে সরকার পারছেনা। অবশ্য অনেক জায়গায় সরকার এদের জন্যে বাড়ী তৈরী করে দিয়েছে। তবে প্রতি বছরেই চীন দেশে থেকে রিফুজী অসংখ্য লোক আসছে তাই হংকং সরকার তাদের সামলাতে পারছে না। চীনদেশে শান্তি ফিরে না এলে হংকংএর অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হয়ে উঠবে।

আমরা টুর নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। শুধু মনে হতে লাগল যে একদিকে হাজার হাজার আকাশছোঁয়া অট্টালিকার মধ্যে ধনীদের আনন্দ কলরব, আর একদিকে অসংখ্য ভাঙা টিনের ঝুপড়ি ঘরগুলোর মধ্যে দুঃখীদের ক্রন্দন দুটো জিনিষ কেমন করে একই জায়গায় থাকতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে কত বড় একটা পার্থক্য রয়ে গেছে তা নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। সবই কি পূর্বজন্মের কর্মফল? এ কথার কে উত্তর দেবে? পরদিন সকালে ক্যাথে প্যাসিফিকের একটা প্লেনে করে আমরা ব্যাঙ্ককে যাত্রা করলাম।

ছেলেমেয়েদের জন্তে লিচুর মত বড় বড় আলফল কিনে নিয়ে যেতে আমরা ভুলিনি।

ক্রমশ

কালাপাহাড়

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় অবিভক্ত বঙ্গ ও অখণ্ডিত ভারতের সর্বত্র একাধিকবার ভ্রমণ করেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাঁর এই ভারত পরিক্রমায়। অন্তরঙ্গ আশ্রমবাসিদের কাছে তিনি এইসব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন।

অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মূঢ়তায়, সামাজিক নির্যাতনে অথবা হিংসাদ্বেষপরায়ণ জাতিগোষ্ঠীর অত্যাচারে, পূর্ববঙ্গে হিন্দুগণ কীভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তার তিনটি করুণ কাহিনী আমার মনকে অভিভূত করে।

একদিন উত্তরায়ণের উদয়নে, একান্তে রবীন্দ্রনাথকে সে-কাহিনী তিনটি বলি। তিনি নীরবে একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করেন।

তাঁর মুখের উপর নানা ভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করি।

কখনো ক্রোধে এবং লজ্জায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। কখনো করুণায় নেত্রদ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন, সে এক আশ্চর্য দর্শনীয় ছবি। ১৯৩০-৩১ সালের কথা, আজও জীর্ণ মানসপটে সে-ছবি মিলিয়ে যায় নি।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর কণ্ঠে মাত্র একটি বাক্য উচ্চারিত হলো :

“তুই লেখ,—প্রকাশের ভার আমার।”

তারপর ঐ তিনটি কাহিনীর মধ্যে থেকে, বিশেষভাবে একটির উল্লেখ করে সেটি কীভাবে লিখতে হবে, তিনি তার বর্ণনা দিতে থাকেন।

আমি তখন লিখি—কিন্তু কখনো গল্প লিখিনি। সুতরাং তাঁকেই লেখার জন্য অনুরোধ করতে থাকি।

শেষে তিনি আমায় বলেন :—

“তুই লিখে দিয়ে যাস্, দেখি কি করতে পারি।”

তাঁর ঐ “বর্ণনা দিতে থাকা” বিশেষ কাহিনীটি একটি বাঁধানো খাতায় লিখে তাঁর কাছে দিয়ে আসি।

এর পর, ১৯৩২ সালে, রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে পূর্ববঙ্গে অনুন্নত সমাজের সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করি। খাতাটি তাঁর কাছেই থাকে।

প্রায় বছর দুই পরে একবার শান্তিনিকেতনে আসি। এসেই তাঁর কাছে যাই—তখন সেই খাতাটির খোঁজ করি।

কবির মন তো একজায়গায় পড়ে থাকতো না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিমগ্ন মহাকবির কলমে সে-গল্প আর লেখা হয় নি।

খাতাখানি তাঁর পার্শ্বচর শ্রীসুধীরচন্দ্র কর আমায় ফিরিয়ে দেন।

খাতা খুলে দেখি—তিনি একটি কবিতা তারমধ্যে কাটাকাটির একটি বিচিত্র চিত্র এঁকে রেখেছেন। কবিতাটি হলো :

“দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে” [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য়, পৃ-২৩৯-৪০, তারিখ—২৮ আষাঢ়, ১৩৪১ (১৯৩৪)] শেষ সপ্তক, সংযোজন, “দুঃখ যেন জাল।”

চিত্রসহ ঐ কবিতাটির (প্রথম সংস্করণের) প্রতিকৃতি আমি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশ করার চেষ্টা করছি।

এখানে যে কথা বলছিলাম :

রবীন্দ্রনাথের দেহান্তের পর, ১৯৪৮ সালে, ঐ তিনটির একটি কাহিনী (“হে মোর দুর্ভাগা দেশ”) ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশ করি (৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৫)।

যে বিশেষ কাহিনীটি কীভাবে লিখতে হবে বলে কবি “বর্ণনা দিতে থাকেন”, সেটি সেভাবে লেখার শক্তি আমার ছিল না—আজও নাই।

তবু কাহিনীটি আমার নিজের জীবনে দেখা হবে-

ছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে, পরিমার্জিত করে সসংকোচে, তা প্রকাশ করছি—।

আমার অক্ষম লেখনী সে-ঘটনার অন্তত একটা সাদামাঠা ছবি, সংস্কারমুক্ত সহৃদয় পাঠকের সামনে তুলে ধরবে।*

অমর মুখুজ্যে যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে পারেন—এ কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি—

ছেলেবেলা হতেই তিনি অত্যন্ত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির। আমরা বন্ধুরা তখন তাঁর উপর কত না উপদ্রব করেছি—কখনো চট্‌তে দেখিনি।

একটা ঘটনা বেশ মনে আছে।

তখন আমার বয়স দশ কি এগারো। গ্রামের 'মাইনর' (M. E.) স্কুলের থার্ড ক্লাসে পড়ি। অমরদা পড়েন সেকেণ্ড ক্লাসে। তিনে সেবার ক্লাসে প্রথম হয়ে পুরস্কার পান—একটা চমৎকার গল্পের বই। সুন্দর সিন্ধের বাঁধাই। স্কুলের সব ছাত্রেরই তার উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

সেই বইখানির মাঝের পাঁচসাতখানা পাতা ছিঁড়ে দুর্ফাঁক করে দিল আমাদের ক্লাসের ছিংসুটে গণেশ। দারুণ রাগে আমাদের সবারই হাত নিস্‌পিস্ করছিল। কিন্তু অবাক হলাম অমরদার ব্যবহারে।

তিনি কিনা হেসে বল্লেন:

"আহা ছেলেমানুষ। ওকে কিছু বোলো না।"

আমরা বেশ জানতাম, নীচের ক্লাশে পড়লেও গণেশ তাঁর চাইতে বয়সে ছোটো নয়।

এমন কত ঘটনাই ঘটেছে।

টিফিনের সময় তিনি এসেছেন তাঁর খাবার খেতে। এসে দেখেন টিফিনের পাত্র শূন্য। এমন একবার নয় কয়েক বার। কখোনো তিনি কাউকে কিছু বলেন নি।

এইভাবে কতরূপে তাঁকে আমরা জ্বালাতন করেছি—কখনো চট্‌তে দেখি নি।

তারপর বড় হয়ে এই শান্ত নিরীহ মানুষটি বহু লোকের বহু উপকার করেছেন। সে জন্যে ঘরে বাইরে নিগ্রহও সহ্য করতে হয়েছে অনেক। কিন্তু কিছুতেই তাঁর সেই সৌম্য মূর্তিটির কোনো পরিবর্তন দেখি নি।

বহুকাল আগের কথা। তখন আমরা প্রায় সবাই পড়া সাঙ্গ করেছি। কেউ কেউ বিবাহ করে সংসারে জড়িয়ে পড়েছি। কেউ চাকরী করি—কেউ বিষয় সম্পত্তি দেখি কেউ বা যাত্রার দলে নাচ, গান বা অভিনয় করি।

গ্রামে সতীশ চাটুজ্যের মেয়ের বিয়ে। আমরা প্রায় সকলেই সে বাড়ীতে উপস্থিত। হঠাৎ কী কারণে বরের বাবা গেলেন চটে। তখুনি আর কথা নাই—বর ও বরযাত্রীসহ তিনি বিবাহবাসর থেকে উঠে পড়লেন।

কত অনুনয়, বিনয় কান্নাকাটি পায় পড়াপড়ি। কিছুতেই বরকর্তার রাগ গেল না। তিনি সদলবলে চলে গেলেন।

সর্বনাশ। ব্রাহ্মণের জাত যায় যে। কাতর হয়ে তিনি কেবল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করেন। একে ধরেন—ওকে ধরেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একে নিতান্ত গরীব, তাতে কন্যাও তেমন সুশ্রী নয়। কে বিয়ে করবে?

হঠাৎ অমরদা বলে বসলেন—তিনিই বিয়ে করবেন। সবাই অবাক। এ বলে কি?

এম, এ, পাশ ছেলে। অবস্থাও বেশ ভালো। সুন্দরী মেয়ে, তার উপর ২।৪ হাজার টাকার অলংকারাদি বরপণ যে পেতে পারে সে কিনা—

---

*দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীটি আচার্য ক্ষিতিমোহন পড়েছিলেন। আশংকা ছিল, আমার লেখা তাঁর মনের মত হবে না। কিন্তু তাঁর প্রফুল্ল মুখ দেখে সে-আশংকা দূর হয়।

দুঃখের বিষয় বাকি দুটি কাহিনীর আর একটিরও প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

গুরু রবীন্দ্রনাথ, কোনোটিই ছাপার অক্ষরে দেখেন নি।

আজ দ্বিতীয়টি, এবং শেষ নিশ্বাস নেবার পূর্বে শেষ কাহিনীটি প্রকাশ করে যেতে পারলে একই সঙ্গে আমার পিতৃতর্পণ ও আত্মতর্পণ হবে।

সতীশ চাটুজ্যে তো বিশ্বাসই করতে চায় না। ভাবেন বুঝি পরিহাস। অমরদা ততক্ষণে বরের আসনে বসে পড়েছেন।

আর সন্দেহ রইল না। বিয়ে তো হয়ে গেল। কিন্তু এ বিয়ের জের চলেছিল বহুকাল।

অমরদার বাবা রেগে আগুন। ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। বৌ নিয়ে তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হলো।

জেলা শহরের একটা স্কুলমাষ্টারী জুটিয়ে, কষ্টেসৃষ্টে অমরদা তাঁর সংসার চালিয়ে এসেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অমরদা তাঁর পৈতৃকগৃহ ও বিষয়াদির অধিকার ফিরে পান।

এমনি তো ছিল অমরদার স্বভাব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ স্বভাব যেন অধিকতর উজ্জ্বল হতে লাগলো।

নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। গ্রামের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে—ভালবাসে।

ব্যতিক্রম তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিরা। তাঁর জেঠা ও কাকার ধুরন্ধর পুত্রগণ তাঁকে সর্বদা জ্বালাতন করতো। ক্রমাগত মামলা—মকদ্দমা করে তারা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। কী করে এই নিরীহ মানুষটিকে জব্দ করা যায়—সবসময় তারা তারই ফন্দি আঁটতো।

আমাদের গ্রামে বহু মুসলমানের বাস তারাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সকলেই প্রায় নিরক্ষর কৃষক এবং মৎস্যজীবী।

নিজেদের মধ্যে কোনো বাদবিসম্বাদ হ'লে অমরদাকেই তারা মীমাংসার জন্যে ডেকে নিয়ে যেতো। অমরদাও তাদের বিমুখ করতেন না।

এইভাবে অমরদার সঙ্গে তাদের বেশ একটা মধুর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

পালে পার্বণে, ক্রিয়াকর্মে—অমরদাকে তারা আমন্ত্রণ করতো। সেখানে উপস্থিত থেকে, গৃহকর্তার তার, তাঁকে কাজকর্মের তদারক করতে হতো।

সেদিনও তাঁর সেইরকম এক আমন্ত্রণ ছিল—এ বিয়েবাড়িতে।

সকাল থেকে সেই ক্রিয়াবাড়ীতে উপস্থিত থেকে, গৃহকর্তার তার সবকিছুর তদারক করে—রাত্রে বাড়ী ফিরবেন—এমন সময় সেই গৃহস্থ ও তাঁর প্রতিবেশী মুসলমানগণ অমরদাকে ধরে বসলো—কিছু জলযোগ করতে হবে। বিয়ে বাড়ীতে এসে, অভুক্ত থেকে তিনি বাড়ী যাবেন—এটা তাদের সকলেরই মনে বড়ো কষ্ট দিচ্ছিল।

কাছেই ছিল গোয়ালা বাড়ী। সেখানেই তাঁর জলযোগের ব্যবস্থা হলো। দই, চিঁড়ে, ছানা ও ক্ষীর গোয়ালার তৈরি—কাজেই অমরদার কোনো আপত্তি হবার কথা নয়।

খাওয়াদাওয়া সেরে অমরদা বাড়ী ফিরলেন রাত্রি প্রায় এগারোটায়।

সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন এমন সময় ডাক এলো তাঁর ভাইদের কাছ থেকে।

তাদের অভিযোগ শুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন।

মুসলমানের ঘরে খাবার খেয়েছেন তিনি—তাই তাঁকে জাতিচ্যুত করা হবে।

তিনি তাদের কত বোঝালেন—গোয়ালার ঘরে গোয়ালার তৈরি খাবার খেয়েছেন—তাও কেবল চিঁড়ে দই, ছানা ও ক্ষীর। কোনো ব্রাহ্মণেরই তাতে আপত্তি কারণ থাকতে পারে না।

সেকথা তারা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইলে না বলে—

"আমরা খুব বিশ্বস্ত সূত্রে সঠিক খবর পেয়েছি।"

সে রাতটো কোনো রকমে কেটে গেলো।

পরদিন সকালে বসলো মজলিস। আশপাশে চতুর্দিকের চতুষ্পাঠীর বহু পণ্ডিত জড় হলেন—অমরনাথেরই চণ্ডীমণ্ডপে। তাঁর বিচার হবে।

ভ্রাতারা ব্যাপারটি বেশ গুছিয়ে রেখেছিল। তা করেই প্রমাণ করে দিলো—অমর খুড়ো—মুসলমান বাড়ীতে—মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেয়েছেন।

অমরদা কত শপথ করলেন, গোয়ালাদের আনিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ালেন, কিছুতেই কিছু হলো না। বিপক্ষে আরো ঢের বেশি সাক্ষী পাওয়া গেল। অমর মুখুজ্যের সাক্ষীই জাল প্রমাণিত হলো।

কত কাতর মিনতি। সমস্তই ব্যর্থ। বিচারকেরা অচল অটল।

ধর্মের রক্ষক তাঁরা—ধর্মরক্ষা তো করতে হবে। দোষীকে জাতিচ্যুত করাই সাব্যস্ত হলো।

অমরনাথ আর কিছু বল্লেন না। ধীরে ধীরে মজলিস থেকে উঠে গেলেন। চলে গেলেন—অন্তঃপুরে।

স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন—"আমি মুসলমান হবো—এক্ষুনি। তুমি যদি আমার সঙ্গে আসতে চাও—চলে এসো। আর যদি আপত্তি থাকে থাকতে পার। আধঘন্টা সময় দিলাম—এরি মধ্যে সব ঠিক করে ফেল।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী বাক্যহারা। এমন ভয়ংকর মূর্তি তো তিনি তাঁর কখনো দেখেন নি।

কথাটার অর্থ খানিকক্ষণ তাঁর মাথায় ঢুকলনা।

মুসলমান হবেন—তাঁর স্বামী।

নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত কুলীন মুখুজ্যে-বংশে জন্ম। সেই তাঁর স্বামী কিনা—।

তখুনি তাঁর নিজের কথা মনে হলো। ব্রাহ্মণের কণ্যা তিনি। শিশুকাল হতে কত ব্রত, কত পুণ্য অনুষ্ঠান—কত আচার পালন করেছেন। কত দেবদেবীর পূজা করে আসছেন।

আজ থেকে তাতে আর তাঁর কোনো অধিকার থাকবে না। হিন্দুর সব দেবদেবীর দুয়ার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে—তাঁর কাছে, আজ হতে।

আশ্বিনমাস আসবে। মা আসবেন। তাঁর সঙ্গিনীরা সবাই তাঁকে বরণ করে নেবে। পূজা দেবে—পুষ্পাঞ্জলি দেবে। আর তিনি। কাছে গিয়ে একটু দেখতেও পাবেন না।

ওই তাঁর বাড়ীর বাসনমাজা ঝি—মোক্ষদা। যে আজ তাঁর রান্নাঘরের দাওয়াতেও বসতে পায় না—তারও বেশি অধিকার থাকবে মার পূজায়—তাঁর চেয়ে। ওই মোক্ষদাই তখন তাঁকে স্পর্শ করলে স্নান করে শুচি হবে।

হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠস্বরে—তাঁর চিন্তাজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

"আর সময় নাই—আসবে যদি চলে এসে।"

আর সময় নাই। এই মুহূর্তেই সব ঠিক করে ফেলতে হবে। একদিকে তাঁর স্বামী—আর একদিকে তাঁর ধর্ম। কাকে নেবে এই মুহূর্তে ঠিক করো।

স্বামীকে ছেড়ে, এই ধর্ম নিয়ে কি তাঁর শান্তি হবে? কে জানে।

স্বামী ছাড়া তাঁর বন্ধুই বা আর কে?

স্বামীর পরে তো তাঁর আপনার জন ওই দেওরেরা। ওদের মধ্যে বাস? সর্বনাশ। তার চেয়ে মুসলমান হয়ে মুসলমান স্বামীর সঙ্গে বাস—ঢের ভালো।

তৎক্ষণাৎ তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন স্বামীর পাশে। বল্লেন:

"তুমিই আমার একমাত্র আপনার জন। তোমার যে ধর্ম আমারও তাই।"

অমরদা শুধালেন—"ছেলেরা?"

"তারা কেউ বাড়ীতে নেই—ডাকতে পাঠিয়েছি।"

অমরনাথ বেরিয়ে এলেন। অদূরেই মুসলমানদের বসতি। হাঁক দিয়ে বল্লেন—ভাইজান। কে আছ শীঘ্র এসো। মৌলবী সাহেবকে ডাকো—আমি মুসলমান হবো।"

দেখতে দেখতে শত মুসলমান জমা হয়ে গেলো। আনন্দে অধীর তারা। অপমানিতকে সম্মান দিতে জানে তারা। অবজ্ঞাতদের, সমাজচ্যুতদের সমাজে তুলে নেওয়াই যে তাদের ধর্ম।

অমর মুখুজ্যে মুসলমান হবেন—এ যে তাদের কল্পনাতীত।

তখুনি মৌলবী এলেন। পার্শ্ববর্তী মসজিদে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হয়ে গেল। মহাসমারোহে অমর মুখুজ্যে সপরিবারে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

তারপরেই তিনি সমবেত জনতাকে বল্লেন :

"আজ রাত্রে আমার গৃহে তোমাদের সবার নিমন্ত্রণ। আমার চণ্ডীমণ্ডপে কোরবানি হবে—আমি টাকা দিচ্ছি, অবিলম্বে ব্যবস্থা করো।"

ক্ষণেকের জন্যে সকলে বিস্ময়ে বিমূখ। হতবাক।

এতটা কেউ ভাবতে পারে নি।

বিখ্যাত মুখুজ্যে বংশের চণ্ডীমণ্ডপে—কোরবানি—গোহত্যা—হবে।

পরমুহূর্তেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। জনতার মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ উঠলো। শতশত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো :

"আল্লা হো আকবর।"

সে-ধ্বনি হিন্দুর প্রাণে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। দেখতে দেখতে সহস্র মুসলমানে চণ্ডীমণ্ডপ ও তার চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

গরু তারা এনেছে। এবার কোরবানি হবে।

অমরনাথের জ্ঞাতি ভ্রাতারা স্তম্ভিত। সমস্ত হিন্দুসমাজ স্তম্ভিত। কিন্তু কারো শক্তি নাই এসে নিবারণ করে।

সে উন্মত্ত জনপ্রবাহের সামনে আসবে কে?

জ্ঞাতিরা সব ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাতে লাগলো। ধর্মরক্ষকেরাও ধর্মরক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে—আত্মরক্ষার সহজ উপায় খুঁজে নিলেন।

তুমুল "আল্লাহো" ধ্বনির মধ্যে মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গোহত্যা হয়ে গেল।

মুখুজ্যেবংশের সকল পরিচয় ডুবিয়ে দিল ওই বলির রক্ত।

অমরনাথ হলেন—ওমর আলি।

পবন-নন্দন বব্ বীমান

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে দীর্ঘ-লাফ বা লং জাম্প এমনই একটি ক্রীড়া যাহাতে গতিবেগ (speed), পায়ের ক্ষমতা (strength of leg), যথোচিত সময় জ্ঞান (Proper timing) এবং ভারসাম্য (Balance) রক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। কৃতিত্বপূর্ণ লাফ দেওয়ার জন্য একজন মানুষের উপরোক্ত প্রতিটি গুণেরই প্রয়োজন আছে।

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে বিশ্বখ্যাত ক্রীড়াবিদ J. C. Wanes ২৬ ফিট ৫॥০ ইঞ্চি অতিক্রম করে যখন একটি বিশ্ব রেকর্ড করেন তখন অনেকেই বলেছিলেন "এটাই তবে বিশ্বের সর্বকালের সর্বোত্তম কৃতিত্ব।" ইহার অধিক দূরত্ব অতিক্রম করা জাগতিক কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।" এই সময় ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞগণ বহু গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একজন ছয় ফিট উচ্চতার মানুষ বেগে ধাবমান হয়ে যদি তার যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক ভাবে কোন লাফ দিতে সক্ষম হন তবে তিনি তাঁর দৈর্ঘ্যের সওয়া চারগুণ পর্য্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন। ইহার অধিক অতিক্রম মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রবচন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ভুল হয়ে প্রমাণিত থাকার পর Ralph Boston অতঃপর ২৭ ফিট ৪ ৩/৪ ইঞ্চি অতিক্রম করে মানুষের পূর্বোক্ত ঐ ধারণা অমূলক বলে প্রমাণিত করেছিলেন।

কিন্তু আজও অঘটন ঘটে। ইহা অপেক্ষাও আরও অবিশ্বাস্য কিছু যে ঘটতে পারে, তাহারই অবতারণার জন্য আজকের এই প্রস্তাবনা।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক। অগণিত দর্শকসমাগমে ষ্টেডিয়াম তখন গম গম করছে। এই সময় অলিম্পিক লং জাম্পের চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফলের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তখন। প্রতিযোগিরা একের পর এক দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর দূরত্বের লাফ প্রদান করে দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করে চলেছেন তখন। এই প্রতিযোগিতায় সকলেই একটা তীব্র প্রতিযোগিতা আশা করেছিলেন সেদিন।

প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে একজন লম্বা ছিপছিপে চেহারার কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে লাফ দেওয়ার সীমানায় এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। মিশমিশে কালো তার রঙ। হাড় আর মাংস দ্বারা গঠিত দীর্ঘ চেহারায় চর্বির লেশ-মাত্র আভাস নেই। যুবকটি দেখতে কিন্তু সুপুরুষ। মাইকের ঘোষণায় যুবকের নাম জানা গেল বব্ বীম্যান (Bob Beman)।

প্রাক্ লম্ফন দৌড় শুরু করার পূর্বে বীম্যানকে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে দেখেছিলেন সেদিন ষ্টেডিয়াম সমাগত অগণিত দর্শকমণ্ডলী। এর পরই মনে হলো যেন কোন অলৌকিক শক্তিবলে বীম্যান একটি ভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। লম্বা ছিপছিপে দেহটি যেন তার কোন মন্ত্রবলে ইস্পাতের ন্যায় কঠিন হয়ে উঠেছে। চক্ষু দুটিতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল তখন এক সুদৃঢ় সঙ্কল্প। এর পরই দেখা গেল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটে এসে তিনি যথাসাধ্য শক্তিতে যথোপযুক্ত সময়ে বোর্ডে পদাঘাত করে তড়িৎগতিতে শূন্যে উঠে পড়লেন। এরপর শূন্যে বাতাসের ভিতর শরীরটিকে গুটিয়ে নিখুঁত সুন্দর একটি ডিম্বাকৃতি পথ রচনা করে অপরূপ ভঙ্গীতে শরীরটিকে সোজা করে এনে ধীরে ধীরে তিনি মাটি স্পর্শ করলেন। বীম্যান মাটি স্পর্শ করার পর দর্শকগণ উপলব্ধি করেছিলেন—দীর্ঘ লাফের বিভাগে তিনি তবে এক অবিশ্বাস্য কীর্তিকথার নায়ক হয়ে পড়েছেন। এই বিভাগে ২৯ ফুট ২॥০ ইঞ্চি লাফিয়ে

তিনি একটা বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেদিন। এই বিভাগের তৎকালীন বিশ্ব রেকর্ড ছিল ২৭ ফুট ৪ ৩/৪ ইঞ্চি।

এই সময় প্রদত্ত দৈর্ঘ্য লাফের দূরত্ব ঘোষণা মাত্রই বীম্যান অকস্মাৎ সশব্দে তালি দিয়ে হাত দুটি জোড়া করে নিমীলিত চক্ষে কি যেন চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিলেন তখন। এই সময় এক অসম্ভব স্বপ্নের সমাধিতে বোধহয় তিনি সমাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্নলোকের দ্বার উন্মোচিত হওয়ার জন্যই বোধহয় তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন তখন। এই রকম অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ধীরে ধীরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে ভূমি চুম্বন করে পুনরায় নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

এই রকম করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে বীম্যান সেদিন বলেছিলেন "ঊর্দ্ধলোকের সেই বিরাট মানুষটির কথাই চিন্তা করছিলাম আমি। তিনি আমাকে আমার এই প্রচেষ্টায় এতটা দূরত্বের ব্যবধানে এনে মাটি স্পর্শ করিয়েছেন।" খুবই আন্তরিকভাবে মৃদুহেসে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন সেদিন।

এই অবিশ্বাস্য লাফ দেখে অলিম্পিকে উপস্থিত দর্শকদের সকলেই সেদিন বলেছিলেন "বীম্যান নিশ্চয়ই কোন দৈবী শক্তি লাভ করেছেন। নতুবা কখনই কোন মানুষের দ্বারা এই প্রকার অচিন্তনীয় লাফ সম্ভবপর নয়।"

এই প্রতিযোগিতায় বীম্যান প্রায় দুই ফিটের ব্যবধানে বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে ইতিপূর্বে এই পৃথিবীতে কোন মানুষই কখনও ২৮ ফিটের বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হন নি কোনদিন। বিশ্বে বব্ বীম্যানই একমাত্র মানুষ যিনি ২৯ ফিট অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে অতি অল্প কয়েকজনই আছেন যারা ২৭ ফিট অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা সম্ভব হতে দেখা গেলেও বব্ বীম্যানের এই লাফের সঙ্গে কোন ঘটনারই তুলনা করা যেতে পারেনা। এটি এমনই একটি ঘটনা যাকে রোজার ব্যানিষ্টারের সর্বপ্রথম চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়ানর ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে।

বাইশ বৎসর বয়স্ক দীর্ঘকায় শীর্ণাঙ্গ জ্যামাইকাবাসী এই যুবকের লাফানোর মধ্যে কোনই সুষ্ঠু ভঙ্গিমা দেখা যাবে না। জ্যামাইকার Long Island-এর অধিবাসী এই যুবক Elpaso-এর Texas বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি সব সময় একই রকমভাবে যথোপযুক্ত মাপের লাফ দিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দিন বৃষ্টির মধ্যে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাঠে সমস্ত কিছুই যথোপযুক্ত সময়ে যথাযথভাবে প্রতিপালন করে তিনি অবিশ্বাস্য দৈর্ঘ্যের উপরোক্ত একটি লাফ দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে লোকে আজও চিন্তা করে যে মানুষ এই ক্রীড়ার প্রাথমিক পর্য্যায়ে বেশ কয়েকবার অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন সেই মানুষই আবার কেমন করে এইরূপ দৈর্ঘ্যের এমন একটি অবিস্মরণীয় লাফ দিয়ে জগৎকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন। এই অলিম্পিকে তিনি যে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন তাহা ম্লান করে দিতে মানুষের এখনও বহুযুগ লাগা সম্ভব হতে পারে।

এই অকল্পনীয় লাফের কথা স্মরণ করে মানুষ আজও চিন্তা করে কোন অনুপ্রেরণার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বীম্যান শতাব্দীর এই স্মরণীয় লাফ প্রদানে সমর্থ হয়েছিলেন। এটা তবে কি? পুরুষকার না দৈববল? ইচ্ছাশক্তি না মন্ত্রশক্তি?

দ্বিতীয় চাকরী

রঞ্জিত গোস্বামী

প্রমথেশ স্ট্র দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা কফি মুখে টেনে নিচ্ছিল। পরপর তা মুখে একটা স্বাদ এনে দিয়ে, গলায় ঠাণ্ডা স্পর্শ দিয়ে নেমে যাচ্ছিল দেহের ভিতরে। আর সেই আমেজে ডুবে সে একবার কফি হাউসটাকে নতুন করে দেখে নিল। আজ প্রায় অটটার পরে সে কফি হাউসে এসেছে একটা দুপুরের কতকটা সময় কাটিয়ে দেবার জন্য। তার টেবিলের একদিকে কেবল সে বসে আছে। বাকি তিন দিক খালি। আর এই থেকেই সে যেন অনুভব করতে পারছে প্রমথেশ নন্দীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কলেজ-জীবনের সেই হাস্যোজ্জ্বল উজ্জ্বলতা নেই। অলোকা সুমিত্রা কোথায় চলে গেছে। বাসবটাও আর দেখা করতে আসেনা। তাদের সেই হাসির কল্ কল্ শব্দ সময়কে ভর করে তরঙ্গের মত কেন্দ্র ছেড়ে চারদিকে কলরোল তুলে জড়িয়ে গেছে। একটা টেবিলে চারটে ছেলে— সিগারেটের ধোঁয়া। একটাতে চারজন মেয়ে। একটায় দুটো ছেলে দুটো মেয়ে—হাসির ফুলঝুরি। শব্দের ঢেউ। তারুণ্যের স্পন্দন। আর এরাই ছাত্র।

প্রমথেশের বুকের ভেতরটা শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারী হয়ে এলো। মাই বয়েজ—প্রথম যখন এই কথাটা সে উচ্চারণ করেছিল তখন নিজেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সামলে উঠেছিল। পরপর বহুবার ব্যবহার করেছে একই কথা। তার ভালোলাগে। খুব ভালো লাগে তার নিজের ছাত্রদের।

কোন ছেলে যখন তাকে স্যর বলে ডাকে তখন সে কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। কি দিয়ে যে তার অসুবিধা দূর করবে ভেবে পায় না। প্রিয় বন্ধু সুশান্ত তখন চিৎকার করে উঠেছিল, অ্যাবসার্ড—অ্যাবসার্ড — তুই মরবি প্রমথেশ। প্রফেসারী ছেড়ে অন্য কাজে ঢোক। কত কোম্পানী হাঁ করে আছে তোদের মত লোক পাবার জন্য। তখন তোকে কত করে বললাম আই-এ-এস কম্পিট কর, করলিনা। আমরা সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিসট্রেশানে তোর মত লোক পেলে অনেক কাজ করিয়ে নিতাম, হতভাগা হোপলেস।

প্রমথেশ এই সময় চুপকরে একদৃষ্টে ধ্যানস্থের মত চেয়ে থাকে। এক টুকরো হাসি শুধু ঠোটের কোনে লেগে থাকে। সে কেবল সুশান্তর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য। নিজের ভেতরে এক বিরাট অন্তহীন সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। কি দ্যাখে? কিছুইনা। কেবল চোখচেয়ে ডুবে থাকা। তার বলতে ইচ্ছে করে, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে, সুশান্ত বুঝবে না। প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলেও বুঝবেনা, সে অনেক কথা বলে যাবে। সুশান্ত একান দিয়ে শুনবে ওকান দিয়ে বার করবে, সিগারেটে টান দিতে দিতে, ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ চিৎকার করে উঠবে, হতভাগা। ড্যাম হতভাগা। তোর বুদ্ধি সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য।

তারপর হিসাব দেবে। ক্ষমতা, টাকা, যশ দেবেই প্রমথেশ তা জানে। তাই নিজের কথার ঢেউগুলোকে সে নিজের মনেই একটা একটা করে ভেঙে ফেলে।

অথচ কিভাবে সে প্রফেসারীতে এলো তা সে নিজেও জানে না, তার যে স্বভাব-চরিত্র ছিল তাতে পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানত শিক্ষকতার লাইন তার নয়। সে নিজেও আশ্চর্য্য হয়। কিন্তু এটাই সত্য। সে সত্যকে মেনে নিতে চেষ্টা করে।

প্রমথেশের মুখের এই হাসি সুশান্তর অসহ্য লাগে। সে আরেকবার চিৎকার করে ওঠে,—আমি বলছি তুই

মরবি। সত্যি আমি ইয়ার্কি করছিনা। এই জন্যই একবার মরেছিলি—

প্রমথেশ বেশ আশ্চার্য্য হবার ভাণ ক'রে বলল—মরেছিলাম?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ মনীষাকে বাড়ি থেকে বিয়ে দেয়নি। তুই গাধার দলে নাম লিখিয়েছিস শুনে শ্রীমতি এক ছোকরা আই, এ, এস এর সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

কথা শেষ হতে না হতেই প্রমথেশ হো হো করে হেসে উঠল। হাসির দমক আর থামতে চায়না। সুশান্ত পারলনা হাসিতে যোগ দিতে। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, হাসির ঢেউ যখন শান্ত হয়ে এলো তখন প্রমথেশ বলল—কেন তোকে মনীষা বলেছে?

সুশান্ত বাগত ভাবে বলল,—ওকথা বলার মুখ আছে ওর? আমি চেষ্টায় আছি। একদিন সুযোগ পেলেই আচ্ছা করে শুনে দেবো—

—আরে! তুই বলবিতো জানলি কি করে?

—কি করে আবার। ছোকরাই বলেছে আমাকে, ওতো জানেনা মনীষার কার সঙ্গে আগে প্রেম ছিল। আর এও জানেনা আমি তোদের লিঙ্কম্যান ছিলাম। তুই একটা ফুল।

প্রমথেশের মুখে সেইহাসি। এই হাসি সহ্য করার ধাত সুশান্তর নয়। সুশান্ত দপ করে জ্বলে উঠল, তোর এখনও হাসি পাচ্ছে হতভাগা? তোকে গালাগালি দিয়ে সুখ নেই। তুই কি মেটিরিয়ালসএ তৈরী বলতো?

পরীক্ষা করতে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান একটা রিসার্চম্যানকে পাঠিয়ে দিক।

—দেবো। আলবৎ দেবো।

সুশান্ত কথাটা বলতে বলতে প্রচণ্ডজোরে নিজের পায়ের ওপর একটা থাপ্পড় বসাল। প্রমথেশ প্রথমে হাসল।

তারপর নির্বিকারভাবে, বলল,—তুই এলায় একটু আসবি?

—আসবো! আসবো মানে? আমি বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি তোকে নিয়ে যাবো বলে। আর, তুই হতভাগা—

সুশান্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল।

প্রমথেশ মিনতির সুরে বলল,—কটা খাতা আছে দেখে নিতাম। পরে সময় নাও হ'তে পারে। কাল না হয়—

সুশান্ত বেশ গম্ভীরভাবে ডানহাতের আঙুল তুলে বলল,—সুশান্ত সান্যাল একবার কথা বলে। এবং যা বলে তা করে। তোমাকে আজ যেতেই হবে।

বলে চেয়ার থেকে উঠে প্রমথেশের দিকে এগিয়ে গেল। ওর হাত ধরে টান মারল। প্রমথেশ বিছানার ওপর বসেছিল। টানের চোটে নেমে পড়ল বলল,—দাঁড়া জামাটা গলিয়ে নিই।

—ও আমি নিয়ে যাচ্ছি।

বলে হ্যাঙার থেকে সাদা পাঞ্জাবীটা টেনে নিল। একহাতে পাঞ্জাবী আর একহাতে প্রমথেশের হাত ধরে সুশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। প্রমথেশ পাঞ্জাবীর পকেটথেকে চাবি বের করে ঘরে তালা দিল। প্রমথেশকে পাশের সিটে বসিয়ে সুশান্ত গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। আঁকাবাঁকা সরুরাস্তা দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। সুশান্ত শক্তহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে একটা ঠ্যালা গাড়িকে কয়েকবারের চেষ্টায় কাটিয়ে গেল,রাস্তার দুপাশে একবার দৃষ্টিবুলিয়ে সামনের দিকে দার্শনিকের মত চেয়ে থেকে ব্যঙ্গ করে বলল, একেবারে হস্তিনাপুরে এসে ডেরা বেঁধেছিস, তোর বেশ চয়েস আছে।

প্রমথেশ না হেসে পারল না।

কিন্তু মনটা খচ খচ করছে। খাতাগুলো দেখা খুব দরকার ছিল। বাড়ী ফিরলে টায়ার্ড হয়ে পড়বে, আর সেই সময় খাতা দেখা চলেনা। অন্তত সে নিজে দেখেনা। ওরাতো বুঝেবেনা একটা খাতা মানে একটা ছাত্র। আর একটা ছাত্র মানে? এখনও প্রমথেশ সেই প্রশ্নের উত্তর বার করতে পারেনি। সে যখন শৈশবের মধ্যে ডুবে থাকে তখন সে যেন নিজেই একটা ছাত্র হয়ে যায়। এই খাতাগুলো যেন তার বহুদিনের

প্রতিশ্রুতির জন্য উত্তর পত্র। আর তা যেন অন্য কোনো পরীক্ষকের কৃপাপ্রার্থী। প্রমথেশ বোঝে। সব বোঝে, তাই প্রয়োজন পড়লে একটা খাতা একবার-দুবার তিনবার পর্যন্ত ছাখে। এবং নাম পাল্টানো একজনের প্রতি নিজের সহানুভূতি উজাড় করে দিয়ে মনে মনে আনন্দ পায়।

বড় রাস্তায় পড়ে সুশান্ত গাড়ীর স্পীড আরও অনেক বাড়িয়ে দিল। গাড়ি ছুটে চলছে। দুজনে নিঃশব্দে সেই বেগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই নীরবতা থেকে সুশান্ত বলল,—তোকে প্রফেসারি ছাড়তে হবে।

প্রমথেশ যেমন সুশান্তর সব আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে পরস্পরের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে তোলে তেমনভাবে হাসলনা। একবার সুশান্তর দিকে তাকাল। রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,—খাবো কি?

সুশান্ত উত্তর দিল না। উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। গাড়ি বাঁক ঘুরিয়ে পার্কষ্ট্রীটে ঢুকলো। চার দিক যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে পার্কষ্ট্রীট তখন ক্রমে ক্রমে রাতের রানী হয়ে উঠছে। সুশান্ত একটা ছোট রেস্তোরাঁর সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল। দুজনে নামল, প্রমথেশের ইচ্ছা ছিলনা ভেতরে ঢোকার। কিন্তু সুশান্তর প্রতিবাদ করা তারপক্ষে সম্ভব হলো না। ওর সঙ্গে ভেতরে ঢুকল। একটা টেবিলের দুপাশে দুজনে বসল। বয় হুইস্কি দিয়ে গেল। সুশান্ত দুটো গ্লাসে ঢেলে একটা নিজে নিল আর একটা প্রমথেশের দিকে এগিয়ে দিল। প্রমথেশ দেখল ক্যাবারে এক তন্বীশ্যামা গানের সুরে সুরে রেশমী শাড়ীর বর্ণ সুষমার এক মধুর আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে কেমন মোহিত হয়ে গিয়েছিল, একটা অকারণ দীর্ঘশ্বাস সমগ্র বুকটাকে খালি করে বেরিয়ে এলো। সন্ধ্যার আবেশে ডুবে থাকা চার দিকের মানুষগুলোকে একবার দেখল। তারপর টেবিলের উপর রাখা হুইস্কির গ্লাসটার মধ্যে নিজের সত্তাকে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

সুশান্ত গেলাসে চুমুক দিতে দিতে প্রমথেশকে দেখছিল, বলল, চুপ করে বসে রইলি কেন? মনে হচ্ছে কোন দিন এসব ছুঁস নি। প্রফেসারী করতে হলে কি বৌদ্ধ ভীক্ষু হতে হয় যে মদ মাংস ছোঁব না?

প্রমথেশ তবু গেলাসটা ধরে বসে রইল।

সুশান্ত শান্তভাবে বলল,—নে নে। একটু খেলে কিছু হবে না।

প্রমথেশ অনিচ্ছাসত্বেও এক ঢোক গলাধঃকরণ করল। তারপর পুরোনো স্বাদ পেয়ে বেশ আমেজ করে বাকিটা শেষ করল।

একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিল চেনাশোনা কোন ছাত্র এসে বসে আছে কিনা। কারণ তার সন্দেহ সেও করেছে কিন্তু কারুকেই দেখলনা।

সুশান্ত বেশ ভালো করে লক্ষ্য করল প্রমথেশকে। চোখ, নাক, মুখ, শুধু তাই নয় শরীরের আড়ালে এক অশরীরী প্রমথেশকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু কোন দিশা খুঁজে পেলনা। বেশ গম্ভীরভাবে ডাকল,—প্রমথেশ

—বল

—আমি তোর বন্ধু।

—হ্যাঁ।

সুশান্ত একটু ইতস্তত করে বলল,—তোর জন্য একটা ভালো চাকরীর অফার আছে। হুইটল্যান্ড কোম্পানীতে একটা বিরাট পোষ্ট খালি আছে। আমার সঙ্গে মালিক-পক্ষের কথা হয়েছে। আমি তোর কথা বলেছি। বলেছি কাজ শিখবার সুযোগ দিতে হবে। এতে কোম্পানী অনেক লাভবান হবে। বলেছি আপনাদের কোম্পানী বহুদিনের জন্য এক বিশ্বস্ত বন্ধু পাবে।

এতোদূর বলে সুশান্ত থামল, প্রমথেশ এতক্ষণ দুই-হাতে মুখ ঢেকে সমস্ত চিন্তা স্রোতকে আটকাবার চেষ্টা করছিল। সুশান্তর কথা দুইকান দিয়ে ঢুকে বুকের ভেতর এক অদৃশ্য বস্তুতে যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় সে মুখ তুলে চাইল।

সুশান্ত বেশ গদগদভাবে বলল,—এবার আর ভুল

করিস না প্রমথেশ। আমি জানি প্রফেসরী ছাড়তে তোর বাধবে। কিন্তু ক্ষণিকের। একদিন দেখবি ওটা ভুল। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েদের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে ভাখ! কত বড় একটা মিথ্যে আবেশের মধ্যে তুই ডুবে আছিস।

প্রমথেশ বেশ একটু জোর দিয়েই বলল,—বুঝি বুঝি সুশান্ত সব বুঝি। কিন্তু—

—কিন্তু নয় প্রমথেশ। তুই জানিসনা কি জঘন্ত এই লাইন। কোন ফিউচার প্রসপেক্ট নেই। আছে অপরিসীম পরিশ্রম। বিনিময়ে অসম্মান। আমি স্বীকার করি প্রফেসারী ইজ দি বেষ্ট প্রফেসন। কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতিতে নয়। পৃথিবীতে কেউ তোর দাম বুঝবেনা। মনীষা বোঝেনি।

—সুশান্ত প্লিজ—

প্রমথেশ কাতরভাবে বলে উঠল। সুশান্ত কথার মাঝপথে থেমে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল,—সরী। প্রমথেশ এক্সট্রিমলি সরী।

মনীষা বোঝেনি। সত্যিই বোঝেনি। কেউই বোঝেনা। বুঝলে? বুঝলে এই জগৎ, এই দেশ, এই কলকাতা শহরটারই যেন চেহারা পালটে যেত। চাকরী না পেয়ে একদিন প্রফেসারী করতে এসেছিল। ভেবেছিল ভালো সুযোগ পেলে ছেড়ে দেবে, কিন্তু কেন যে ভালো সুযোগ পায়নি, আর চেষ্টাও করেনি।

বাবা মাষ্টার ছিল বলেই কি আজ সে রক্তের টানে শিক্ষকতার লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে? বাবা মারা গেছে বহুদিন। তার বেশ মনে আছে মৃত্যুর সময়কার বাবার দুরবস্থা। মাষ্টারী কি দিয়েছে বাবাকে?

দারিদ্র্য। সকাল সন্ধ্যা টুশানি করে সংসার খরচের টাকা তুলতে হয়েছে। বাবা অনেক দুঃখে বলেছিল, একটা যাই হোক চাকরী জোগাড় করে নিস বাবা। মাষ্টারী করতে যেন আসিসনা। এখানে শুধু দারিদ্র্য। মান সম্মান যশ কিছু নেইরে। বাবা, কিছু রেখে যেতে পারেনি তার জন্য। জলারশিপের টাকা আর টুশানির টাকাতে পড়া খাওয়া চালিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে যত-টুকু স্ফূর্তি করেছে তা ঐ থেকেই। আর সেই সে ঘুরতে ঘুরতে একই গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। কেন?

চিন্তার সরোবরে কিছুক্ষণ ডুবে থেকে সে উঠে এসে বলল,—প্রফেসারীতে আমি একটা আনন্দ পাই। কেমন একটা বিচিত্র অনুভূতি। প্রমথেশের কথাটা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিল। বলল,—বয়স কম তাই ও রকম লাগছে। তুই ভুলে যাচ্ছিস মানুষ সামনে যাই পায় তাই সত্য বলে ধরে বসে। এবং তারই মধ্যে নিজের ভেতরের অনুভূতিকে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু সেটা ভুল প্রমথেশ। নিজেও জীবনকে সুখী এবং সমৃদ্ধ করে তোলাই বোঝার কাজ। নিজের মধ্যে যে বিচিত্র বাসনা রয়েছে তাকে শুধু শুধু নষ্ট করবি কেন বল। নিজের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ে সুখকে জয় কর। সৎপথে থেকে জীবনে স্ফূর্তি কর—

কথাটা মিথ্যে নয়। প্রমথেশের কি ইচ্ছে করেনা এক একদিন আরব্য রজনীর মজলিশে নিজেকে হারিয়ে দেয়? পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মত সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। বাসনা তো হার মানবেনা। সে চিরকাল বিদ্রোহ করেই যাবে। আর সেই বিদ্রোহী বাসনাগুলোকে বুকে বেঁধে তাকেও হয়ত তার বাবার মত রিক্তনিঃস্ব পুত্রকে রেখে রোগশয্যায় শুয়ে তিলে তিলে মরতে হবে। না না সে হয়না। বেস্তোরাঁর সেই আরব্য রজনীর আবেশ ছাড়িয়ে তার মধ্যে একটা আতঙ্ক উদ্ধত আসামীর মত মাথা তুলে দাঁড়াল।

প্রমথেশ চশমাটা খুলে সামনের টেবিলের ওপর রাখল। দুই হাত মুঠো করে তাতে কপাল ঠেকিয়ে এই দুস্তর চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল। একটা তলহীন সংরাবরে নিজেকে নিয়ে ডোবাতে চাইল কিন্তু পারলনা। আতঙ্কে ভর করে শরীরের সমস্ত রক্ত-বিন্দু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে একটু অস্বস্তি বোধ করল।

সুশান্ত তাই দেখছিল। প্রমথেশকে বড় অসহায় মনে হলো। কিন্তু গ্রাহ্য করলনা। বরং বলল,—তুই পর্শু রাত্রির কথা ভুলে গেছিস প্রমথেশ এখন আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলি?

প্রমথেশ আবার মুখ তুলল। সুশান্তকে দেখল। ভুলে যাবে কেন সেই দুঃস্বপ্নের রাত্রি? এখনও তা চোখের সামনে আতঙ্ক হয়ে জেগে আছে। সুশান্তর কপালের ঐ কাটা দাগ এখনও শুকায় নি। সেই দুঃস্বপ্নের রাত্রি ওখানেই যেন লেপ্টে গেছে। একি ভোলা যায়?

সুশান্ত প্রমথেশের বাড়ি এসেছিল রাত দশটায়। এক একদিন যেমন দুজনে এখানে রাত কাটায় তেমন কাটাবে। অবশ্য অন্য কারণ ছিল। সুশান্ত অফিস থেকে গেছল ক্লাবে। ক্লাব থেকে বাড়ি। বাড়িতে রাতের খাবার খেতে গিয়ে ভাবে তার স্ত্রী ডালের বড়া বানিয়েছে। মনে মনে তার হাসি পেয়েছিল। আজ আর এখানে শোয়া হবে না। হতভাগা প্রমথেশ ব্যাটা খিদেও করবে না। নিজের খাওয়া হলে একটা টিফিন-ক্যারীয়ার বাটিতে বড়া ভরে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

প্রমথেশ ডালের বড়া পেয়ে খুশী হয়েছিল। রাতের খাওয়া তার হয়ে গিয়েছিল তা সত্বেও কিছু ডালের বড়া গলাধঃকরণ করে শোবার আয়োজন করছিল ঠিক সেই সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল খট্—খট্—খট্।

প্রমথেশ প্রথমে কোন সাড়া দেয়নি। সুশান্ত তার তার গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠেছিল,—কে

ওপাশে কোন আওয়াজ নেই।

প্রমথেশ আওয়াজ দিতে গেছল, সুশান্ত হাত নেড়ে মানা করল। নিজেই আবার হাঁকল,—কে দরজার কড়া নাড়ে?

এবার ও পাশ থেকে উত্তর এলো,—দরজা খুলুন। পাড়া থেকে আসছি। জরুরী দরকার আছে।

এতো রাত্রে কি দরকার থাকতে পারে। দুই বন্ধু পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। একটা আতঙ্ক সমস্ত ঘরের বাতাসকে ভারী করে তুলল। এতো রাত্রে এমনি কাজে কেউ আসবে না। দুজনের মনে একটা সন্দেহ প্যাকখেয়ে উঠল। সুশান্ত দরজা খুলতে গেল। প্রমথেশ মানা করল। কিন্তু শুনলনা।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ছেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সুশান্তকে বাধা দেবার সুযোগই ছিলনা। একজন প্রমথেশের দিকে তাকিয়েই বলল,—সেই শালা, ঠিক বাড়ি চিনে এসেছি।

প্রমথেশ কিছু বুঝে উঠতে পারলনা। বলল,—আমি —আমি প্রমথেশ। প্রফেসর প্রমথেশ নন্দী।

—চোপ শালা।

বলে একটা পেকেট খুলে একটা পৃষ্ঠা বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। প্রমথেশ দেখল পেকেটের পৃষ্ঠা।

—দেখেছো শালা।

বলে সুশান্তর-মতিগতি আঁচ করতে পেরে সুশান্তকে বলল,— খোটে এদিকে একদম এগোবেনা—

প্রমথেশ সহজ ভাবে বলল,—কিন্তু আমি ত কিছু জানিনা বাবা—

—না শালা জানোনা—

—না শালা জানোনা—

ব'লে একজন পকেট থেকে ছুরি বের করে তার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েছিল। সুশান্ত কত তার হাতটা ধরে ফেলল। আর তখনই যখন ছেলেটা হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গেল সুশান্তর কপালে ছুরিটা লেগে যায়। অন্য ছেলে দুজন এগিয়ে আসতে গিয়েছিল, কিন্তু এদের একজন হঠাৎ ব'লে উঠল—মানিক এ সেই প্রফেসরটা নয় রে।

অমনি আর দুজন একসঙ্গে বলল—কি বলিস!

—হ্যাঁ তার মাথায় কোঁকড়া চুল ছিল। গালে একটা আঁচিলও ছিল, কিন্তু বাতায় দেখে মনে হয়েছিল এই-ই।

বাকি দুজন থমকে গেল, তারপর এক মুহূর্তের মধ্যে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

শুধু দুই বন্ধুকে রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল, যেন কোন যাত্রিবাহি ট্রেন চলতে চলতে রাতের বেলা এক ফাঁকামাঠে তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। সুশান্তর কপাল যে সামান্য একটু কেটে গেছল তারথেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। প্রথমেশ সুশান্তকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

সেই দিন সেই রাত্রেই যখন ঘরের লাইট নিভিয়ে দুই বন্ধুতে শুয়ে পড়ল একটু বাদেই সুশান্ত ঘুমিয়ে পড়ল। প্রমথেশ জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। ঘুম এলোনা কিছুতেই। 'প্রফেসরী' এই একটা কথা যেন বারবার একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কতকিছু চিন্তা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে আনতে পারলনা। তার ছেলেবেলা থেকে হেঁটে আসা এই দীর্ঘ পথের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নেওয়া শিক্ষা, বিশ্বাস, দর্শন কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। সে কিছুতেই তাদের যথাস্থানে স্থাপন ক'রে মনে সামঞ্জস্য আনতে পারল না। একটা বিরাট মর্মবেদনায় শুধু এপাশ আর ওপাশ করতে লাগল।

প্রমথেশের সব মনে পড়েছে, আর সেই তোড়েই কপালের দুইপাশে দুটো শির ফুলে উঠে দপ্ দপ্ করতে লাগল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ল; সমগ্রবুকের ভেতর যেন খাণ্ডবদাহন চলতে লাগল, আগুন আগুন। আর সেই আগুন থেকে যেন এক মোঙ্গলীয় যোদ্ধা হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এলো পৃথিবীর যত শিক্ষকের শির শিকার করবার জন্য। এবং সেও যেন বন্দি হয়েছে সেই সব সৈন্যের হাতে, অবলুপ্তি যেন মাথার ওপর আকাশের মত সত্য হয়ে গেছে।

প্রমথেশ কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। রিজাইন লেটার দিয়েছিল, প্রিন্সিপাল তা বিাসিত করেছেন। একবার শুধু বলেছিলেন থেকে যেতে, প্রমথেশ রাজী হয়নি। এ সবই নীরবে হয়েগেছে, আশ্চর্য্য। আট বছর এক-নাগাড়ে প্রফেসারী করল, ছাত্রদের ভালোবাসল, প্রাণের সমস্ত দরদ উজাড় ক'রে দিয়ে পড়াল, এক মুহূর্তে কেমন সব মিথ্যে হ'য়ে গেল, মিথ্যে নয়তো কি? নইলে তার এই বিদায়ের দিনে কোন বিদায় সম্ভাষণ নেই, একটা ফুলের মালা বা তোড়া নেই, সে যেন কলেজটার জীবনে কালমাত্র এসেছে আজ চলে যাচ্ছে, অথচ সে দিনের পর দিন অনার্সে'র ছেলেদের নিয়ে এক্সট্রা ক্লাস করেছে, অথচ এর জন্য কিছুই অতিরিক্ত মূল্য সে দাবী করেনি, আশ্চর্য্য।

তার একবার সামনের গতিময় জীবনটার কথা মনে পড়ল, প্রাণে ভরপুর জীবন, হয়ত স্থায়ী সুখ এ জীবনেও নেই, কিন্তু গতি আছে, চমক্ আছে, একবার মণীষার কথা মনে পড়ল, অবাক্ হ'য়ে যাবে দেখে। হয়ত আবার লালপেড়ে শাড়ী পরে এলো চুল পিঠে ফেলে তার ঘরের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ষ্টীক ভরতে ভরতে তার দিকে চেয়ে হাসতে চাইবে, মনীষা তখন কত সস্তা হয়ে যাবে, আমারই দাম বাড়বে। কোম্পানী গাড়ি দিবে বলেছে, সে সেই গাড়ি চড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ মনীষার সঙ্গে দেখা। না, যা হবার হয়ে গেছে।

সে চিন্তায় বিভোর হয়ে কফি টেনে চলেছিল, হঠাৎ খেয়াল হলো গেলাসটা খালি হয়ে গেছে, অথচ কোল্ড কফির স্বাদটা বেশ আমেজ এনে দিয়েছে। প্রমথেশ বয়কে ডেকে আরেক গ্লাস কফির অর্ডার দিল।

মানভঞ্জন

—অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(জয়দেব গোস্বামীর অনুসরণে)

বল গো যদি একটি কথা
তব মুখের রুপালি হাসি
নাশে অমনি নিবিড় তমোঘোর ;
স্ফুরিতাধরা ! আনন-সুধা
চাঁদের মতো দূরিছে ক্ষুধা
পিয়াসী যবে মম আঁখি-চকোর ।
মানিনী প্রিয়া ! সুচারুশীলা !
মোছ গো আজি করুণ মান-লোর ;
বয়ান হেরি' প্রেম-অনলে দহিছে মন মোর—
মুখ-কমল-মধুপানে যে আঁখি-ভ্রমর ভোর ।
তুমি আমার জীবন, ধনি ।
তুমিই মম ভূষণ-মণি,—
তুমিই সখি ভব-সাগর-তরী—
বিরাজো তুমি আমার হৃদে
মিনতি এই সদাই করি
তোমার লাগি' চির-সাধন মোর ।
স্মরগরল নাশো গো আজি
মরমে বীণা উঠুক বাজি'
কোমল পদ-পরশে তব ।
জ্বলিছে হৃদে দারুণতর
মদনানল প্রখর-কর,
নিবাও-নাশা উপায় কর
অনুভবম মন্ত্রে নব ॥

চতুর্থ প্রহরে

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গ রাত্রির মত অফুরন্ত শিশিরাশ্রু ফেলে,
আমাকে কষ্ট দিলে, শোনা যায়,
তুমি নাকি নিরালায় কাঁদো ।
অথচ তোমার কাছে যা' পেয়েছি জন্মলগ্ন থেকে—
সে হ'ল বঞ্চনা-ঘৃণা, অবিমিশ্র বিদ্রূপ কৌতুক ;
যেহেতু ভালুক কিংবা বানরের ভূমিকায় নেমে
সংকেতমাত্রই নাচি ।
গলায় বকলস আঁটা ;
মজবুত শেকলটি থাকে
তোমার সে-বজ্র-মুঠিতেই ।
যেহেতু জন্মান্ধ আমি ;
ফুল-ফোটা ঋতুর সময়
নিজের হৃদপিণ্ড কেটে তাজা রক্ত
পেয়ালায় ভ'রে
তোমাকে দিতেই হয় অভিনব পাদেচ্ছাপূরণে ।
তুমি আর কী কী চাও ?
রক্তের চেয়েও কিছু দামী ?
কী সেই মহার্ঘ বস্তু নিতে চাও
চতুর্থ প্রহরে—
যখন দ্বিতীয় সত্তা পচা-গলা
আকাঙ্খার শেষ ?

"বাসুদেব সর্বমিদং"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

'পেৎসেমানি'র সেই মহানিশা। পেয়ালা ভরি'
বেদনার বিষে দাঁড়ালে সুমুখে পাত্র ধরি।
আমি ভয়াতুর কেঁদে বলেছিনু, 'দাও রেহাই।'
তুমি শুনিলে না। মন্দির মম শূন্য তাই।
আজ বলি, প্রভু, ভাণ্ডার তব হোলো কি খালি?
আমি প্রস্তুত। তুমি দাও মোর কণ্ঠে ঢালি'
যত বিষ আছে কুম্ভে তোমার। করুণা নয়!
শর-শয্যায় কাঁদে নর-নারী বিশ্বময়।
কার বোঝা ভারি, হাল্‌কা বা কার? পাবে না থেই।
কত রকমের দুঃখ সে আছে, সংখ্যা নেই।
'ক্রস্'-এর বন্দী বালক, বনিতা, বৃদ্ধ, যুব;
কেঁদে ও ককিয়ে লাভ আছে কোন? মৃত্যু ধ্রুব।
লুপ্ত হবে কি পাগলা-গারদ, হাঁসপাতাল?
মানুষের দেহে যৌবন রবে চিরটি কাল?
নিষ্ঠুর প্রেম-বহ্নি পোড়ায় কত জীবন।
কত 'ভ্রমর'-এর শুকায় সাজানো ফুলের বন।
কত ফুলের পাঁপড়ি অকালে খসিয়া পড়ে।
নয়নের জল, দীর্ঘশ্বাস সকল ঘরে।
লজ্জা-দুঃখ-পদস্খলন ব্যর্থ নয়।
মহাবেদনায় হল-মুখে যাক্ ভেঙে হৃদয়।
বন্ধ্যা মাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্যামাঙ্কুর।
কণ্ঠে ধ্বনিছে নূতন প্রাণের প্রভাতী সুর।
মৃত্যু হইতে বাহিরিয়া আসে নবজীবন।
বীজ ধান মরে মাটির গর্ভে: তবে শ্রাবণ
আড় ধান্যের সোনার হাসিতে ভরিয়া যায়।
জয়ী হ'তে চাও? প্রাণ দিতে হবে অবহেলায়।
স্বর্গোদ্যানে ফল-কুড়ানোর জীবন সেই।
আরাম রয়েছে; নব সৃষ্টির মহিমা নেই।
ইভ্‌ একাকিনী। এ্যাডামের কাঁধে কোথায় হল?
স্বর্গচ্যুত আদি-মানবের অশ্রুজল
ঘর্মে মিশিয়া করেছে তাহারে বিজয়ী বীর।
হাতে দিলো তার শিল্পীর তুলি, বাঁশী কবির।

জয় হ'তে তারে নিয়ে গেল জয়ে। সফলতার
চূড়ায় চূড়ায় উড়ালো বিজয়-কেতন তার।
মার জয় ক'রে জিনিল বোধিরে। সাধন বলে
আনন্দঘন চিরন্তনের চরণতলে
অবর্ণনীয় শান্তি পেয়েছে। তপস্যায়
দুখ-রজনীর পারে পোহালো নব-উষায়।
নূতন স্বর্গ, নূতন পৃথিবী মাটির কোলে
রচনা করিতে যন্ত্রের সুখেরে চরণে দ'লে
মানুষ হেঁটেছে দুর্গম পথে; দিয়েছে প্রাণ।
তবে সে করেছে আলোর তীর্থে মুক্তি-স্নান।
আমি দেখেছিনু তোমারে কেবল যেথানে তব
প্রসন্ন মুখ। ফুল ফোটে বনে নিত্য নব।
বিহঙ্গ-গীতে প্রভাত মুখর। শিশুর খেলা।
সোনালি ধান্যে আঙিনা হাসিছে। সাঁঝের বেলা
তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ; শঙ্খ বাজে!
শুধু মঙ্গলে দেখিনু তোমার চরণ রাজে।
শুধু সুন্দরে দেখেছিনু তুমি বংশীধর।
শুধু আনন্দে দেখিনু তোমারে হে নটবর।
আজ দেখি আছে মৃত্যুতে তব মায়ের ক্রোড়!
আঁধারেও তুমি; কে বলে তোমারে শুধু আলোর?
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় তুমি ভীষণ।
তোমার শঙ্খ-গরজনে কাঁপে রণাঙ্গন।
জলপ্লাবনে আর সাইক্লোনে তুমি করাল।
রুদ্রাণী, তব কণ্ঠের মালা নর-কপাল!
প্রলয়ঙ্কর নটরাজ তুমি নৃত্য করো;—
রক্তস্নানে হয় বসুমতী নূতনতরো।
জয় জীবনের! জয় মরণের। হে লীলাময়,
লজ্জা ও শোক, কামনার দাহ, পতাকা বয়
তোমারই। তুমিই সব রূপ ধ'রে রয়েছো জাগি!
নমো, নমো নমঃ। হে প্রভু তোমারই করুণা মাগি!
আঁখির পর্দা ছিন্ন করো হে। অন্ধ চোখ
দেখুক, তুমিই সব-কিছু, করো বিগত-শোক।
হে করুণাঘন দয়ার সিন্ধু, কল্পতরু।
কৃপা দিয়ে করো রূপান্তরিত জীবন-মরু।
বিশ্বাস আর শরণাগতির পরশমণি
ছোঁয়াও বন্ধু, প্রেম-সম্পদে কর গো ধনী।

বেদে সর্প ঐতিহ্য

অবনীভূষণ ঘোষ

সাধারণ সাপ এমন কিছু বলশালী প্রাণী নয়। তা সত্ত্বেও সরীসৃপটি সম্পর্কে মানুষ খুব সজাগ। এর কারণ, কোন কোন সাপের সামান্য স্পর্শে মানুষ মৃত্যুর কোলে পর্যন্ত ঢলে পড়ে। সাপ সম্পর্কে আজ মানুষ অনেক কিছু জেনেছে। তবুও তার কত ভয় জীবটির কথায় তা হলে প্রাচীন মানুষ—যাদের অনেকেই ছিল অরণ্যচারী—সরীসৃপটিকে কি চোখে দেখেছিল, তা আমরা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারি।

ভারতীয় চিন্তাধারার প্রাচীনতম গ্রন্থে সর্পের কথা আছে, কিন্তু সর্প বিবরণ নেই। কদাচিৎ কোন ঋকে সর্পের উল্লেখ দেখি। ঋক্-সংহিতায় সর্প বিবরণ না থাকাই অবশ্য প্রত্যাশিত। ভারত সর্প-সংকুল দেশ। কিন্তু ঋক্-রচকেরা তথা আর্যেরা এসেছিলেন শীত-প্রধান দেশ—সম্ভবতঃ রুশদেশের উরাল পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল থেকে। সর্পকুল তথাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা ছিলনা। ভারতে তাঁদের দফায় দফায় অনুপ্রবেশের অনেক পরে সাপ প্রাণীটি সম্পর্কে আর্যেরা ওয়াকিবহাল হতে বাধ্য হন।

সাপের কান নেই; বাতাসে ভেসে-আসা কোন শব্দই সাপ শুনতে পারেনা। কিন্তু পদক্ষেপজনিত সামান্য ভূকম্পনও সাপকে সজাগ করে তোলে। পল্লীবাসীর অনেকেরই এ অভিজ্ঞতা আছে। আজ থেকে অন্তত চার হাজার বছর আগের মানুষও সাপের এই ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিল: 'লুক্কায়িত সর্প পদশব্দের দ্বারা যেন আমাকে না জানতে পারে।' [৭, ৫০, ১] আর খোলস ত্যাগ সাপের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনেরা তারও প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন: 'সর্প যেমন আপনার পুরাতন চর্ম ত্যাগ করে...।' [৯, ৮৬, ৪৪] কোন কোন ক্ষেত্রে আর্যরা মত্ততাকারক সোমরস পানে অভিভূত হয়ে সর্প-দেহের উপর পতিত হতেন এবং তজ্জনিত তাঁদের ভবলীলা সাঙ্গ হত, এ ভেবে নেওয়া আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না। ঋক্-রচক তথা ঋষি একস্থানে বলছেন: 'যারা নিজের স্বার্থে আমার প্রতিবাদ করে...যারা শক্তিমত্তা বশতঃ আমার দোষ দেয়, সোম তাদের সর্পের উপর পাতিত করুন।' [৭, ১০৪, ৯]

সর্পসাধারণ ঋক্প্রণেতাদের রচনায় তেমন স্থান না পেলেও বিশালকায় অজগর তাঁদের মনে ত্রাস ও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। ঋক্-সংহিতায় 'অহি' শব্দের প্রয়োগ বহুস্থানে রয়েছে। অহি বর্তমানে সর্পার্থে ব্যবহৃত কিন্তু ঋগ্বেদে—বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋক্গুলিতে অহির অর্থ ঠিক সর্প নয়। কোন ভীষণকায় জীব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত। আর এই ভীতিপ্রদ জীবটি অবশ্য অজগর সাপ। বস্তুত অজগর যে একটি সাপ—সাপ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত জীব আদি আর্যরা তা বুঝতে পারেন নি; না পারা অস্বাভাবিক কিছু নয়; আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ সাপ ও অজগরের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ইন্দ্র ও বৃত্রের সংঘর্ষ এবং ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রের বধ ঋক্-সংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। সংগ্রামশীল আর্যদের প্রধানরূপে ইন্দ্র পরিকল্পিত। আর বৃত্র পরিকল্পিত বিরোধী অসুরদের (যারা প্রধানতঃ বর্তমান দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষ) প্রধানরূপে। প্রাচীন মানুষের চোখের সামনে ছিল পৃথিবী, আর মাথার উপর ছিল অন্তরীক্ষ। এক কথায় দ্যাবাপৃথিবী বলে উক্ত। পার্থিব অভিজ্ঞতা অন্তরীক্ষ অভিজ্ঞতার উপর আরোপ করার প্রবণতা প্রাচীন মানুষের ছিল। অন্তরীক্ষ ঘটনা পার্থিব ঘটনার আদলে বুঝবার সে প্রয়াস পেত। বিভিন্ন পুরাণকথায় এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অকস্মাৎ চতুর্দিক অন্ধকার করে মেঘের আবির্ভাবে

আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ-চমক বজ্র-নির্ঘোষ, তারপর বারিবর্ষণ—এই প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারতে আগত আর্যদের মনকে করেছিল উদ্বেলিত। আদিম মনোভাবসুলভ কল্পনায় তাঁরা এরই মধ্যে দেখেছিলেন দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বৃত্রের সংঘর্ষ। মেঘরূপী বিরাটকায় দানব বৃত্র জল বদ্ধ করে রেখেছে, ; শক্তিধর ইন্দ্র বজ্রাঘাতে বৃত্রকে বধ করে সেই অবরুদ্ধ জলের নির্গমনের পথ করে দিচ্ছেন। মেঘ পরিণত হচ্ছে বৃষ্টিধারায়। এই চিন্তা-ধারা সহজ ও সরল—অনায়াসে বোধগম্য, কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয় যখন এই মেঘরূপী বৃত্রকে অনেক স্থলে অহি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত জল-অবরোধক মেঘ অর্থেও অহি ব্যবহৃত হয়েছে। মেঘরূপী বৃত্রকে অহিরূপে কল্পনার মূলে আদি আর্যদের একটি অতি-বাস্তব অভিজ্ঞতা লুক্কায়িত আছে বলে মনে করে। অজগর পাহাড় অঞ্চলের সাপ, জলও খুব পছন্দ করে। কখনও কখনও এ সাপ জলাশয়ে দেহটা ডুবিয়ে মাথাটা উপরে রেখে দিনের পর দিন অবস্থান করে' অরণ্যা-বৃত প্রাচীন ভারতে জলের সন্ধানে কোন জলাশয়ে গিয়ে আর্যরা তাতে মগ্ন দানবাকার অজগরের সম্মুখে পড়তেন; তাঁদের আর জল নেওয়া হত না। অজগর যেন জল রুদ্ধ করে রাখত, পরন্ত প্রবল বারিবর্ষণে জলস্রোতে নদীতে শয়ান অজগর দূর-দূরান্তরে নীত হত অথবা নিহত হত। ইন্দ্র যেন অহিকে বধ করতেন। ঋক্-রচকের কথায় বলি: 'যে অহি নিজেকে বলবান মনে করে জল পরিবেষ্টন, করে অবস্থান করছিল, সেই অহিকে তুমি (ইন্দ্র) প্রবৃদ্ধ হয়ে বিনাশ করেছ।' [৪, ৩২, ২১] অন্যত্র: 'হে ধনবান ইন্দ্র, জলময় দেশ-সমূহকে লক্ষ্য করে যে অহি শয়ন করেছিল তুমি তাকে বজ্রাঘাতে ছিন্ন করেছ।' [৪, ১৭, ৭] আর একস্থানে: 'তুমি (ইন্দ্র) জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করেছ।' [৩, ৩৯, ২] অবশ্য আকাশে ভাসমান খণ্ড খণ্ড মেঘের সর্পিল গতি এবং দীর্ঘায়ত বিদ্যুতের সাদৃশ্য মেঘরূপী বৃত্রকে অহিরূপে কল্পনার ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। অন্তরীক্ষ থেকে বারিবর্ষণ হয় বলে ঋক্-প্রণেতার চিন্তায় আকাশ সাগররূপে কল্পিত হয়েছে। সুতরাং উপরে উক্ত সাদৃশ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

পূর্বেই বলেছি, অজগর পাহাড় অঞ্চলের সাপ। বিশাল দেহ সটান প্রসারিত করে পাহাড়ের বুকে অনেক সময় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। লোকের ভীতিরও উদ্রেক করে। পাহাড় থেকেই নদীনালার উৎপত্তি। অজগর নিজ শক্তিমত্তায় নদীনালার জল যেন আবদ্ধ করে রাখে। বর্ষাঋতুতে নদীর জলস্রোত প্রবল আকার ধারণ করে। সেই প্রবল জলস্রোত কখনও কখনও অজগরকে ভূতলে পাতিত করে তার দেহের উপর দিয়ে বয়ে যায়। ইন্দ্র যেন তার বাহুবলে অজগর তথা অহিকে পর্যুদস্ত করে নদীকে বেগবতী স্রোত-স্বতীতে পরিণত করেন: 'ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে নিধন করেছিলেন; ......তারপর গাভী যেমন সবেগে বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল তেমনি সবেগে সাগরের দিকে গিয়েছিল।' [২, ১৩, ১] অন্যত্র: 'তটকূলকে অতিক্রম করে নদ যেমন বয়ে যায়, মনোহর জল সেরকম পতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করে যাচ্ছে, বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা যে জলকে বদ্ধ করে রেখেছিল, অহি এখন সেই জলের নিচে শয়ন করল।' [১, ৩২, ৮] একস্থানে [৮, ৯৩, ১৪] অহিকে 'মৃগ-রূপী" বলা হয়েছে। বোধহয়, মৃগের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অহি বলতে কেন অজগর বুঝেছি, তা বোধহয় এখন পরিস্ফুট হয়েছে।

ইন্দ্র অর্বুদ দস্যুকেও নিধন করেছিলেন: 'হে ইন্দ্র, তুমি মহান অর্বুদকে পদ দ্বারা আক্রমণ করেছিলে; অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছ।' [১, ৫১, ৬] এই অর্বুদ দস্যুও অজগর সাপ বলে মনে হয়। অর্বুদ অর্থাৎ মাংসপিণ্ড। অজগরের পশ্চাৎ দেহে দুপাশে একটি করে দুটি নখরাকৃতি উন্নত দেহাংশ আছে। এই উন্নত অংশ সাপের পূর্বপুরুষের পিছন পায়ের নিদর্শন। এই উন্নত দেহাংশই অর্বুদ নামের মূলে রয়েছে বলে মনে করি। দশম মণ্ডলের চতুর্থবিংশতি

সূক্তের প্রথম ঋকে "কদ্রু-পুত্র অর্বুদ সর্প ঋষি"র উল্লেখ আমরা পাই।

ঋক্-সংহিতায় অহির্বুধ্ন্য নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। অহির্বুধ্ন্য ও অহির সাদৃশ্য আছে। উভয়েই জলরাশির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, উভয়েই ভীতিপ্রদ। তবে অহি দানব, আর অহির্বুধ্ন্য দেবতা। 'দেব অহির্বুধ্ন্য যেন আমাদের অনিষ্ট না করে শত্রুদের সংহার করেন।' [৫, ৪১, ১৬] অন্যত্র: 'আমাদের মন্ত্র দ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য ......যেন আমাদের বারিসহকারে অন্নদান করেন।' [৬, ৪৯, ১৪] এই অহির্বুধ্ন্য বৃহদাকার গোসাপ বলে মনে হয়। গোসাপ দেখতে ভীতিপ্রদ, কিন্তু বিষহীন ও নিরীহ প্রাণী। অহি অর্থাৎ অজগরের মত গ্রীবা, এই অর্থে অহির্বুধ্ন্য। বৃহদাকার গোসাপ লম্বা ঘাড় উঁচিয়ে যখন চারিদিকে তাকায়, তখন দূর থেকে অজগরের উত্থিত মুখ বলে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কালক্রমে সাদৃশ্যে অহির আরোপিত অর্থ যেমন মেঘ হয়েছে; অহির্বুধ্ন্যরও আরোপিত অর্থ তেমনি হয়েছে বিদ্যুৎ-ছটা। এখানে উল্লেখ্য, সাপের মত গোসাপের জিভও চেরা............নকুলকে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সংকলিত কয়েকটি ঋকে "গোধা" (অর্থাৎ গোসাপ) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় —এবং গোধাকে অহির্বুধ্ন্যর মত জলরাশির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে: 'যারা যজ্ঞের অন্ন দ্বারা দেহ পুষ্টি করে ,তাদের জন্যে গোধা অক্লেশে জল আহরণ করে দেয়।' [১০, ২৮, ১১]

আর্যেরা ভারতের পূর্বখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছেন, প্রাগার্য নিষাদ-দ্রাবিড়-কিরাত গোষ্ঠীভুক্ত জাতিবৃন্দ যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মূল ছিল এই পূর্বখণ্ডে। ঋক্-সংহিতার পরবর্তী কালে সংকলিত অথর্ব-সংহিতার অনেকাংশ জুড়ে এই প্রাগার্য সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। বস্তুত এই সংস্কৃতির রীতিনীতির বিবরণ অথর্ব-সংহিতায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সংস্কৃতির ধারক-দের কাছে স্বাভাবিকভাবেই সর্প-দংশন সমস্যা প্রবল ও ভয়াবহ আকারের ছিল। অথর্ব-সংহিতায় তাই সর্পকুলের বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ব-ঋষি সর্প-দংশন চিকিৎসারও কথা বলেছেন। স্বভাবতঃই সে চিকিৎসা আদিম মনোভাব মূলত ঐন্দ্রজালিক— মন্ত্রতন্ত্রের জয়গান।

অথর্ব-সংহিতায় বেশ কয়েকটি সাপের নাম পাওয়া যায়। এদের কয়েকটিকে সহজেই চেনা যায়, অপর কয়েকটির সঠিক পরিচয় লাভ করতে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমানে একই সাপকে অঞ্চলভেদে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, বেদেও তেমনি একই সাপের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। বৃহদাকার অজগর সাপ 'অজগর' নামেই অভিহিত হয়েছে। সুতরাং এ সাপের পরিচয় সুস্পষ্ট। গোখরো-কেউটে ভারতের সাধারণ সাপ। অথর্ব-সংহিতায় গোখরোকে বলা হয়েছে 'শ্বিত্র' (সাদা রঙের), আর কেউটেকে 'অসিত' (কাল রঙের)। 'কল্মাষগ্রীব' চক্রধর সাপ (গোখরো-কেউটে)। গোখরো ও কেউটের কোন কোনটার ঘাড়ের পর পেটের উপর দুই বা তিন সারি কাল আঁশ এড়োভাবে একত্রে সাজান থাকে। তাই কল্মাষগ্রীব বলতে গোখরো-কেউটেকে বুঝাই। 'স্বজ' সর্প চন্দ্রবোড়া—বাচ্চা দেয় এই অর্থে। স্বজের বিশেষণ রয়েছে 'বভ্রু'। চন্দ্রবোড়াও পিঙ্গল বর্ণের, 'উপতৃণ্য' ও চন্দ্রবোড়া, ঘাসে লুকিয়ে থাকে। 'পৃদাকু' চন্দ্রবোড়া বা চন্দ্রবোড়া-জাতীয় অন্য সাপ। 'দর্বি'ও বোধহয় চন্দ্রবোড়া। 'কৈরাত' বর্তমানে করেত (কালাচ) নামে প্রচলিত সাপ। 'তিরশ্চিরাজি' শাঁখামুটি (শাঁখিনী) —দেহে বলয়াকার রেখা বর্তমান। 'অশ্বাঘ' সর্প অশ্বের পক্ষে বিঘ্নজনক এই অর্থে—সম্ভবতঃ শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড় মারাত্মক বিষধর বৃহদাকার সাপ। পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণরত কোন কোন অশ্বারোহীর কাহিনীতে দাবি করা হয়েছে, শঙ্খচূড় সাপ তাঁদের অশ্বের পিছনে ধাওয়া করেছিল। পুরাণকথায় আমরা জানতে পারি, অঘাসুর অজগরের রূপপরিগ্রহ করেছিল। সেইভাবে অশ্বাঘ অজগরও হতে পারে।

অথর্ব-সংহিতায় সাপ ছিল্ক সরীসৃপ নয়, দেবরূপ

—দেবতার সামিল। সর্পকুলের কাছে নীত স্বীকার করে তাকে তুষ্ট করা যায়। যজুর্বেদেও সর্পজাতির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তা ক্ষীণ। সর্পজাতির...দেবযজনদের সঙ্গে কারবার ছিল যাতুধানদের। যাতুধান অর্থাৎ আভিচারিক। সর্বপ্রকার আভিচারিক কাজে তারা ছিল পারদর্শী। সর্প-দংশনের ব্যাপারে যাতুধানদের উপর সেদিনকার মানুষের খুবই আস্থা ছিল। যাতুধানদের রাজার একটি নাম ছিল 'সর্প'। বলা বাহুল্য, এই সর্প মনুষ্যবাচক, সরীসৃপবাচক নয়। যাতুধানরা সমাজে খুব উঁচু আসন অধিকার করে ছিলেন। এঁরা যে মূলে আর্য ছিলেন না, তা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে সর্পওঝা-সর্প বৈদ্য অভিহিত যে সব লোক দেখা যায়, তারা এই যাতুধানদেরই ধারা বহন করে আসছে। ইতিহাসের কালচক্রে জনজীবনের অনেক নিচু স্তরে তাদের স্থান হয়েছে।

সর্পওঝা-সর্প বৈদ্যদের চিকিৎসা প্রণালীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: মন্ত্র, প্রক্রিয়া ও দ্রব্যগুণ। যাতুধানরাও অনুরূপ চিকিৎসার মধ্যে অবশ্য কোন বাঁধাধরা প্রাচীর ছিল না। কখনও একটির সাহায্য নেওয়া হত কখনও বা দুটোর......কখনও বা তিনটির সাহায্য নেওয়া হত। তিনটির মধ্যে মন্ত্রই সকলের উচ্চে অধিষ্ঠিত ছিল। অথর্ব-ঋষি তথা যাতুধান বলছেন: 'দিব্যকবি বরুণ আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। ভয়ংকর মন্ত্রের সাহায্যে আমি তোমার বিষ হরণ করছি। যে বিষ খোঁড়া হয়েছে, যে বিষ খোঁড়া হয় নি এবং যা অন্তঃনিহিত, তা আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছি। মরুভূমিতে জলস্রোতের মত তোমার বিষ শুকিয়ে গেছে।' (৫, ১৩, ১) অন্যত্র: 'আমার চোখ দিয়ে আমি তোমার চোখ বিনষ্ট করছি। আমার বিষ দিয়েই তোমার বিষ বিনষ্ট করছি। হে সর্প মর, বেঁচে থেক না; তোমার বিষ তোমারই কাছে ফিরে যাক।' [৫, ১৩, ৪] অথর্বঋষির প্রার্থনা; 'দেবতাবৃন্দ, আমাদের সন্তানসন্ততি এবং আমাদের লোকজন সমেত আমাদের যেন সর্প হত্যা করতে না পারে। সাপের বন্ধ চোয়াল যেন না খোলে, খোলা চোয়াল যেন বন্ধ না হয়, দেবযজনদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাই।' [৬, ৫৬, ১] উইঢিপির কাদা প্রলেপ দিয়ে যাতুধান কখনও কখনও সর্প-দংশনের চিকিৎসা করতেন। উইঢিপ সাপের খাত ও আশ্রয়—দুয়েরই সংস্থান করে উইঢিপ ও সাপের সান্নিধ্য অনুষঙ্গে উইঢিপির কাদা সর্পাঘাত নিরাময় করতে পারে বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। ঋক্-সংহিতাতেও আমরা এখানে-ওখানে যাতুধানদের কথা পাই। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগে যাতুধানরা নিন্দিত: 'সেই দেব রাক্ষস ও যাতুধানদের নিরাকরণ করে প্রতিরাত্রি স্তুতিপ্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন।'] ১, ৩৫, ১০] যাতুধানরা শত্রু বলে গণ্য হলেও প্রাচীন আর্যদেরও চিন্তাধারা জাদুবিশ্বাসের খাতে প্রবাহিত হত। অল্প হলেও ঋক্-সংহিতাতেও সর্প-দংশন চিকিৎসার মন্ত্র দৃষ্ট হয়: 'রমণীগণ কুম্ভ করে যেভাবে জল নিয়ে যায়, হে দেহ একবিংশসংখ্যক ময়ূরী ও সপ্তনদী সেরূপ তোমার বিষ হরণ করুক।'] ১, ১৯১, ১৪] অন্যত্র: 'ক্ষুদ্র শকুন্তিকা পক্ষী তোমার বিষ খেয়ে ফেলেছিল, সে যেমন প্রাণ ত্যাগ করেনা, আমরাও প্রাণ ত্যাগ করব না। [১, ১৯১, ১১] শকুন্তিকা বোধহয় মুরগি। বিষহীন বিষধর—উভয়-প্রকার সর্পশিশুই কোন কোন মুরগি অনায়াসে গলাধঃকরণ করে। এখানে উল্লেখ্য, সর্পবিষ কোন জীবের পেটে গেলেই ক্ষতিকারক হয় না, ক্ষতিকারক হতে তা ঐ জীবের রক্তের সঙ্গে মেশা দরকার।

ঋক্-সংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ঋকগুলির রচনাকাল মোটের উপর সর্বপরবর্তী বলে গণ্য। সর্প-ঐতিহ্য বিচারের দৃষ্টিতেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। দশম মণ্ডলের ৭৬তম ও ১৮৯তম সূক্তের রচক যথাক্রমে "সর্প ঐরাবত জরৎকর্ণ" ও "সার্পরাজ্ঞী" ঋষি। বলা বাহুল্য, এরা কেউই ঋগ্বেদের যুগের ঋষি নন।]

সঙ্কলন

কে করিবে—কেমন করিয়া করিবে ?

পুরাতন কথা। সম্ভবতঃ বহুবার কথাটার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে ও হইবে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কেহ কেহ ইয়োরোপে ভ্রমণ কালে ভিয়েনা হইতে জুরিখ যাইতেছিলাম। গাড়ীটা ঠিক সময় রক্ষা করিয়া চলিতে ছিল না। বোধ হয় সে সময় উহা প্রায় আধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া চলিতেছিল। ট্রেনের "করিডরে" একজন মার্কিন দেশবাসী ব্যক্তি মহা অপ্রসন্নভাবে নৃত্য করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তীব্রভাবে ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, Have they sacked him; have they sacked him ? সেই ব্যক্তিকে কাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে কি ?" একজন টিকিট পরীক্ষককে ঐ প্রশ্ন করাতে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন " Sacked whom ?" (কাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে ?) মার্কিন ভদ্রলোক বলিলেন "Surely the fellow cousing this late running (যে ব্যক্তির জন্য গাড়ী বিলম্বিত হইতেছে তাহাকেই নিশ্চয়) তিনি আরও বলিলেন যে মার্কিন দেশে কাহারও দোষে যদি জনসাধারণের কোনও ক্ষতি, হয় তাহা হইলে তাহার আর চাকরী থাকে না। এক এক সময় তেমন কোনও ক্ষতিকর ঘটনা ঘটিলে শত শত লোক চাকুরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই যে গাড়ী বিলম্ব করিয়া চলিতেছে ইহাতে আমার মহা-অসুবিধা হইবে, জুরিখে একটা "মিটিং" আছে তাহাতে আমি পৌঁছাইতে পারিব না। গাড়ীটা বিলম্ব করিয়াই চলিতে লাগিল এবং মার্কিন ব্যক্তিও ছটফট করিতে থাকিলেন।

আমাদের দেশে তখন বৃটিশ রাজত্ব। কোনও ইংরেজের দোষে যদি একলক্ষ ভারতবাসীর প্রাণও যাইত তাহা হইলে সেই ইংরেজের পদোন্নতিই হইত। চাকুরীত যাইতই না, হয়ত বা তাহার একটা সি, আই, ই, বা অন্য কোনও খেতাবও জুটিয়া যাইত। এখন এদেশে আমাদের নিজেদের রাজত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়দলের নেতাদের ও আমলাদিগের প্রভুত্ব। খেতাবও নানা প্রকার আছে ও অনেকে পাইয়া থাকেন। কি কারণে কাহাকে খেতাবে বিভূষিত করা হয় তাহা বলা কঠিন অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু খেতাব যিনি পান তিনি যে দেশবাসীর কোন ভালো করিয়াছেন তাহা কোনও ভাবেই প্রমাণ হয় না। দেশবাসীর উপকার প্রায় কেহই করেন না। নিজ নাম, নিজ যশ, নিজ সুবিধাই সকলের লক্ষ্য।

যাঁহারা সাধারণতন্ত্রের রীতি অনুসারে নির্বাচনে দাঁড়াইয়া ভোট সন্ধানে ইতঃস্তত ঘুরিয়া জনসাধারণের নিকট ভোট চাহিতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা সকলের নিকট নিজেদের গভীর জনমঙ্গল আকাঙ্খা ব্যক্ত করিয়া নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। কিন্তু ভোটের ব্যাপার শেষ হইয়া যাইলেই সেই জনমঙ্গলাকাঙ্খাও নিবৃত্তি লাভ করে, দলের মালিকদিগের নির্দ্দেশই তখন প্রবল ও বিরাট আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া দাঁড়ায়। দেশবাসীর নানাপ্রকার অভাব অভিযোগ কে আর দেখিবে ? কোন কিছু করাইতে বা পাইতে হইলে দক্ষিণার কথা উঠে এবং অনেক সময় যথাযথ দক্ষিণা দিয়াও অনেকে প্রসাদলাভে সক্ষম হন না। যাঁহারা ভোটের আসরের মানুষ নহেন, রাজদরবারের ছোট বড় কর্ম্মচারী তাঁহারা আরই নিস্পৃহ ও জনসাধারণের সুখদুঃখবোধের ঊর্দ্ধে সকল আবেগ বর্জ্জিতভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহাদের প্রাণে কোনও

সারিদ্ধ্যের শিখা জালাইতে হইলে যে কৌশল ও পদ্ধতি জ্ঞান আহরণ করিতে হয় তাহা সকলের পক্ষে আহরণ করা সহজ বা সম্ভব হয় না। যাঁহারা এই ক্ষেত্রে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ তাঁহাদের কোন কিছুই অপ্রাপ্ত থাকিতে পারেনা, আবার যাঁহারা কাজ আদায়ের ক্ষেত্রের যন্ত্র পরিচালনায় অক্ষম, তাঁহাদের জন্ত না পাওয়ার দীর্ঘ তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘতর হইতে থাকে।

আমলাদিগের চাকুরী-জীবনের যে অমরত্ব, অর্থাৎ তাঁহাদের যে কোনও কিছুই করিলে বা না করিলে চাকুরী যাইতে পারে না, এই বিশ্বাস আজ দেশের মানুষের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।' Have they sacked him বলিয়া চিৎকারও কেহ করেনা এবং sackও আরই কেহ করিতে পারে না। খাদ্য হউক, বস্ত্র হউক, বাসস্থান জল সরবরাহ গ্যাস বিদ্যুৎ ঔষধ যাহাই হউক না কেন, মানুষ না পাইলে তাহার কোনও প্রতিকার সম্ভব হয় না। যেহেতু কাহারও কোন অক্ষমতা বা কর্ম্মে অবহেলার জন্ত চাকুরী যায় না। কেহ কেহ অকারণে মুরুব্বির "তাকতে" খেতাব বা উন্নততর পদমর্য্যাদাও লাভ করিয়া থাকেন। কর্ম্মীর কর্ম্ম বিচার না করিয়া যদি শুধু বৎসর গণনা করিয়াই উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়, সকল গাফিলি ও কর্ম্মকৌশলহীনতা যদি হিসেবের বাহিরে থাকিয়া যায় তাহা হইলে জনমঙ্গলসাধন কদাপি সম্ভব হইতে পারে না।

নাম পরিবর্ত্তন

বর্ত্তমান ভারতে সৃজন অপেক্ষা নাম- পরিবর্ত্তনই অধিক সহজসাধ্য বলিয়া রাষ্ট্রনেতা ও আমলামহলে রাস্তা ঘাট, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নাম পরিবর্ত্তনই বহুস্থলে করা হইয়া থাকে। নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ যে কত কঠিন কার্য্য তাহা যেসকল রাস্তা আছে সেইগুলির অবস্থা দেখিলেই অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। কোন শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা পুস্তকাগার শিল্পকলা সংগ্রহ কেন্দ্র নূতন করিয়া গড়িতে হইলে টাকার তাবার অনেক কাঠ খড় লাগিয়া থাকে। যাহা আছে তাহাকেই নূতন নামে অভিহিত করিলে নিঃখরচে কার্য্যসিদ্ধিও হইয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ পরিবর্ত্তন কার্য্যও অল্পবিস্তর জনপ্রিয় রূপও গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটকে যদি বিধান সরণী নামে আখ্যায়িত করা হয় তাহা হইলে বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরক্ষাও হয় এবং পুরাতন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাক্ষরও কিছুটা নিশ্চিহ্ন করা হইয়া যায়। বিধানচন্দ্র রায় বাংলার কৃতি সন্তান সুতরাং এই নাম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কেহ বড় একটা আপত্তি উত্থাপন করিবে না ধরা যাইতে পারে। উইলিংডন ব্রীজকে বিবেকানন্দ সেতু বলিলে ঐ একই ভাবে, সেই কার্য্য সহজগ্রাহ্য হইবে। হাওড়া ব্রীজকে রবীন্দ্র সেতু বলিলেও কথাটা লোকে মানিয়া লইবে বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মতলার ধর্ম্ম কাটিয়া তৎস্থলে লেনিনের নাম বসাইলে তাহা ততটা জনপ্রিয় না হইতে পারে। ধর্ম্মে বিশ্বাস সকল মানুষেরই অল্পবিস্তর থাকে, লেনিনের উপর আস্থা হয়ত অনেক মানুষেরই সমানভাবে নাই। ধর্ম্ম হইল সেই অন্তরের বাদবিচারের কথা যাহা সকলের মনেই থাকে। এমনকি কম্যুনিষ্টগণও যাহা অবলম্বন করিয়া চলেন তাহাকেও তাঁহাদের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মার্কসবাদ লেনিনবাদও ধর্ম্মার্থক বলিয়া চলিতে পারে। ইহা ব্যতীত আর একটা কথা হইল এই যে নামধামের বিষয়ে স্বাধীন দেশে বৈদেশিক নাম আমদানী না করাই বিধেয়। লেনিন যদি আমাদিগের ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কোন উপকার করিয়াও থাকেন তাহার জন্ত তাঁহার নাম বসাইয়া বহুপুরাতন একটা বড় রাস্তার সংজ্ঞা বিলোপ করার কোন সার্থকতা থাকে না।

ভগবতগীতার শ্রীকৃষ্ণ, রাবনবিজেতা শ্রীরামচন্দ্র, জৈন তীর্থঙ্কর মহাপুরুষগণ গৌতম বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মহামহারথীদিগের নাম উড়াইয়া দিয়া লেনিনকে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? যদি বিপ্লবের ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করা আবশুক হয় তাহা হইলে গারিবাল্ডি, মাৎসিনি জর্জ্জ ওয়াশিংটন অথবা অলিভার ক্রমওয়েল কি দোষ করিয়াছিলেন? ইহা ব্যতীত অন্ত কথা হইল

কলিকাতার রাস্তার নামকরণে বিদেশ ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা এত প্রকট হইয়া দেখা দেয় কেন?

এই ত গেল লেনিনের কথা। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চার্য্যকর নামকরণ হইল হো চি মিন সরণীর যাহা পূর্ব্বে ছিল হ্যারিংটন ষ্ট্রীট। হ্যারিংটন কে ছিলেন ও তিনি কি করিয়াছিলেন সে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হো চি মিন কে ছিলেন তাহা আমরা জানি। তিনি এশিয়ার এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মহানেতারূপে নাম করিয়াছিলেন। পাকিস্থান যখন কাশ্মীর দখল চেষ্টা করে হো চি মিন তখন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুকে একটা পত্রাঘাত করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি নেহেরুজীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে নেহেরুর বড়ই অন্যায় যে তিনি কাশ্মীর দখল চেষ্টা করিতেছেন। এ হেন হোচিমিনের নামে রাস্তা হইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। যদি বলা হয় যে এ দেশের আদর্শবাদ ক্ষেত্রের একটি সংখ্যালঘু সংঘের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন- তাহা হইলে সংখ্যালঘু আরও বহু সম্প্রদায় আছে, যথা মুসলমান সম্প্রদায়। তাঁহাদের মহাশ্রদ্ধেয় সেলিম চিস্তি অথবা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, তাঁদের নামেই রাস্তার বা নামকরণ হয় না কেন?

রাস্তার নাম বদল লইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া হইয়া থাকে। তাহাতে বহু অজানাই কলিকাতার মানচিত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছেন এবং হইতে থাকিবেন। দিল্লীর অনেক মহামানব যাঁহাদের এদেশে কোনও পরিচিতি ছিলনা তাঁহারা কলিকাতার দিল্লীভক্তদিগের দৌলতে বড় রাস্তার নামে স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছেন। দিল্লী আমাদের রাজধানী সুতরাং এই সকল নামকরণে আমাদের কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু যদি গড়ের মাঠের নাম বদলাইয়া মার্কসের মাঠ দেওয়া হয় কিম্বা কোনও একটা বিরাট রাষ্ট্রীয় ইমারতের নাম দেওয়া হয় মার্কিনী মহল, অথবা যদি প্রেসিডেন্সি কলেজকে বলা হয় কলম্বাস কলেজ বা ইরাসমাস শিক্ষাকেন্দ্র তাহা হইলেও অসংখ্য মানুষ তাহাতে মহা আপত্তি করিবে। হয়ত যদি ভারতীয়তার রক্ষণ হেতু নামটা পতঞ্জলি কি পানিনির সহিত সংযুক্ত করা হয় তাহা হইলেও আপত্তি হইতে পারে। কেননা প্রাচীনতা যদিও অনেকের নিকট কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়া মূল্যবান বিবেচিত হয় তাহা হইলেও তাহার একটা সীমা থাকে। যদি বহুলোকে কোন কিছুকে একটা কোনও বিশেষ নামে বহুকাল আখ্যায়িত করিয়া চলে তাহা হইলে সেই নাম হঠাৎ বদলাইয়া অপর কোনও নাম দিলে জনসাধারণের আপত্তির কারণ হইতে পারে। একটা কথাই শুধু সাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয় তাহা হইল বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের চেষ্টার কথা। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযোগ যেসকল নামের আছে বা ছিল সেই সকল নাম বদল করিলে কেহ কিছু বলে না। কিন্তু ধর্মতলা বা কালিঘাট বদলাইয়া অপর নাম দিলে মানুষে আপত্তি করিতেই পারে।

সাময়িকী

রেল ধর্মঘট

রেল ধর্মঘট নানা কারণে একটা বিশেষ আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রথম কারণ হইল ভারতীয় রেলওয়ের কর্মীসংখ্যা ও দ্বিতীয় হইল সেই রেলওয়েতে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ। ভারতবর্ষে অন্য কোন ব্যবসায় বা কারবার নাই যাহার কর্মীসংখ্যা বা মূলধন রেলওয়ে অপেক্ষা অধিক। শুনা যায় যে ভারতীয় রেলওয়েতে কুড়ি লক্ষ কর্মী নিযুক্ত ও তাঁহাদের পোষ্যদিগকে ধরিলে রেলওয়েতে কাজ করার উপরে প্রায় এক কোটি নরনারী শিশুর ভরণ-পোষণ নির্ভর করে। এই কারণে রেলকর্মীদিগের চাহিদা ও সেই চাহিদা সম্বন্ধে সকল আলোচনা ও বিশ্লেষণ বিশেষ মনযোগ দিয়া করা আবশ্যক। রেলওয়েতে সহস্র সহস্র কোটি টাকা পরিমাণ জাতীয় মূলধন লাগান হইয়াছে এবং রেলওয়ে একদিন বন্ধ থাকিলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বহু কোটি টাকা লোকসান হয়। রেল ধর্মঘট এইবার কুড়ি দিন চলিয়াছিল। রেলের ইতিহাসে ভারতবর্ষে ইহাই সর্ব্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী ধর্মঘট। ইহাতে যে লোকসান হইয়াছে তাহা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ হিসাবে চার পাঁচ শত কোটি টাকা হইতে পারে। জনসাধারণের রেল ধর্মঘটের ফলে যে ব্যাপক অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার মূল্য কেহ কষিয়া বাহির করিতে পারেন না, কিন্তু হিসাব করা সম্ভব হইলে তাহাতেও জাতীয় লোকসান কয়েক শত কোটি টাকা হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে। ১৯৭০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় রেলপথে চালিত গাড়ীতে প্রায় ২৫০ শত কোটি যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিলেন। মাল বহনের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ২৩ কোটি টন। রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০০০০ কিলোমিটার। রেলওয়ের বাৎসরিক আয় ১০০০ কোটি টাকার অধিক হয়। এই সকল রেলওয়ে সংক্রান্ত খবর হইতে বোঝা যায় যে রেলওয়ে জাতীয় জীবনের কত প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সুতরাং রেলওয়েতে ধর্মঘট করার পূর্ব্বে কর্মিদের বিশেষ চিন্তা করা উচিত ছিল যে এ ধর্মঘট করিলে জাতির জীবনের উপর কত কঠিন আঘাত লাগিতে পারে ও দেশের কত ক্ষতি হইতে পারে। কর্মীদিগের যাহা লাভ হওয়া সম্ভব ছিল এই ধর্মঘট করিয়া তাহারই বা পরিণাম কি হইতে পারিত সে কথাও ভাবিয়া দেখা উচিত হইত। কুড়ি লক্ষ লোকের লাভ যাহাই হউক না কেন কোটি কোটি মানুষের আর্থিক লোকসান ও কষ্টভোগের তুলনায় তাহার ওজন কমই হইত মনে হয়।

তেলের টাকা কোথায় যায়?

আরবদিগের তৈল বিক্রয়লব্ধ অর্থ কিভাবে কোথায় রাখা হইতেছে ইহা লইয়া বহু আলোচনা ও জল্পনা কল্পনা চলিয়া থাকে। এই টাকার অধিকাংশই আসিতেছে পাশ্চাত্যের ধনবান তৈল খরিদ্দার দেশগুলির নিকট হইতে। অর্থাৎ পাউণ্ড, মার্ক, ফ্রাঙ্ক, ডলার প্রভৃতি অর্থে। পাশ্চাত্যের সকল দেশের লোকেরই একটা কথাতে বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তাহা হইল এই যে আরবদিগের তৈল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ আরবগণ পুনর্ব্বার পাশ্চাত্যদেশেই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তিতে বিনিয়োজিত করিতেছেন। এই অর্থ বিনিয়োগের বিবরণ কোন কোন পাশ্চাত্যদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে ও তাহা হইতে বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যাইতেছে। যথা আবুধাবির তৈল বিক্রয়ের টাকায় ৪ কোটি পাউণ্ড কমার্শিয়াল ইউনিয়নের আকাশচুম্বি প্রাসাদের একটা বৃহৎ অংশ ক্রয়ে লাগান হইয়াছে। কুয়ায়েত জার্মানীর ক্রুপ কারখানার একচতুর্থাংশ ভাগ মূলধনের অংশ ক্রয় করিয়াছে ও অন্যান্য সম্পত্তিতেও দুই কোটি পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়াছে। সাউদি আরবগণ নিজেদের টাকা সর্ব্ব রাখার বিধান করে এবং তাহাদের তৈল বিক্রয়ে

টাকা তাহারা পাউণ্ডে ও ডলারেই জমা রাখে। কুয়ায়েৎ এই বৎসর ৩৭৫ কোটি পাউণ্ডের তৈল বিক্রয় করিবে এবং তাহাদের লণ্ডনের বিনিয়োগ দফতর হইতেই ঐ সকল টাকা কোথায় কিভাবে রাখা হইবে তাহা স্থির করা হইবে। আমেরিকার চেজ ম্যানহাটান এবং ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক এই সকল অর্থের অনেকাংশের বিলিব্যবস্থা করিয়া থাকে। জার্মানীর ডারেৎসে ব্যাঙ্ক ও ড্রেসডেনের ব্যাঙ্কও ঐ জাতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। সুইৎজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কগুলিও ঐ জাতীয় বিদেশী অর্থ লাভজনক ভাবে লগ্নি করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। ইরাণ কিন্তু নগদ টাকা লইয়া লেনদেন না করিয়া পাশ্চাত্যের কারখানার মূলধন ও সম্পত্তির অংশ ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল বিনিয়োগের ব্যাপার এখন মাত্র আরম্ভ হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহা বাড়িয়া বাড়িয়া এরূপ আকার ধারণ করিবে যাহা হইলে পরে ইরাণ ও আরবের অর্থ পাশ্চাত্যের বহু প্রতিষ্ঠানকেই অনেক পরিমাণে ক্রয় করিয়া লইবে।

ভানু তাপ

যতদূর মনে পড়ে ১৯১১ খৃঃঅব্দে এলাহাবাদে একটি প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীতেই আমরা ভারতবর্ষে প্রথম বাইপ্লেন ও মনোপ্লেন বিমান উড়িতে অথবা উড়িবার চেষ্টা করিতে দেখিতে পাই। এবং ঐ প্রদর্শনীতেই যোগি নামধেয় একজন আবিষ্কারক সূর্য্যরশ্মি ব্যবহারে একটি চুল্লি তৈয়ার করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি ভাত, ডাল রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতেছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগি তাঁহার সূর্য্যালোকলব্ধ উষ্ণতা ব্যবহারকারী চুল্লির নাম দিয়াছিলেন 'ভানু তাপ'। ৬৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে ইসরায়েলের লোকেরা আরবদিগের নিকট হইতে যাহাতে তেল ক্রয় করিতে না হয় সেই জন্য অন্য উপায়ে চুল্লি জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। তাঁহাদের মতে সূর্য্যরশ্মি ব্যবহার করিয়া জলগরম অথবা রন্ধন করা তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে করিতেছেন। ভানু তাপ যে ৬০ বৎসর পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে সেকথা তাঁহারা জানেন না। কিন্তু বিষয়টা তাঁহাদের যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। 'ভানু তাপ' আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত যোগি মহাশয় এলাহাবাদ প্রদর্শনীর পরে কি কারণে তাঁহার আবিষ্কারটি পূর্ণরূপে চালাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন না সেকথা আমরা যথাযথ বলিতে পারিনা। তবে একথা ঠিক যে শ্রীযুক্ত যোগি চাপ দিয়া নিজের আবিষ্কারটি পূর্ণরূপ চালাইয়া লইতে পারেন নাই। এখন আর তাঁহার পক্ষে প্রথম আবিষ্কর্ত্তা হওয়ার গৌরব আহরণ করা সম্ভব হইবে না। তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি ও বলিতে পারি যে ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগি ভানু তাপ আবিষ্কার করিয়া এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে তাহাতে রন্ধন করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। সেই সময়কার সংবাদপত্রে এই খবর নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল।
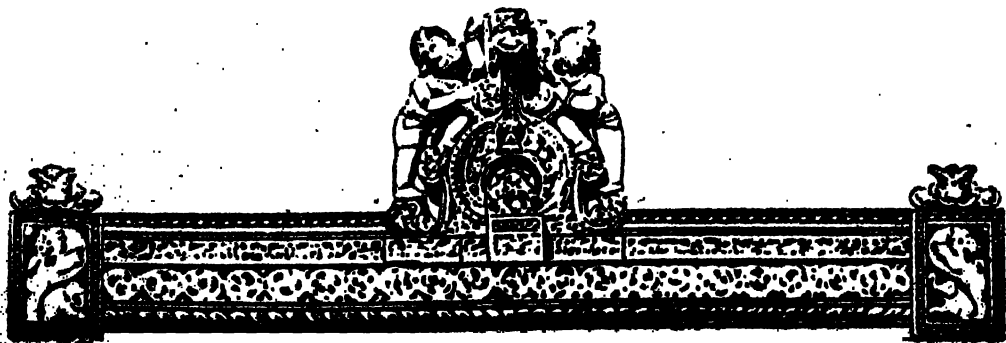
দেশ-বিদেশের কথা

প্রবাসে বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব

২৬শে জুন ১৯৭৪। মধ্য প্রদেশের সমস্ত হিন্দী ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি মাত্র নাম— কুমারী কমলা রায়। জব্বলপুর মহারাণী লক্ষ্মীবাই উচ্চ মাধ্যমিক বিত্তালয়ের ছাত্রী এই কুমারী কমলা রায়।

মধ্যপ্রদেশের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বৎসর (১৯৭৪) প্রায় দুই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সকল বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শ্রীকালুরাম বৈত স্বর্ণ পদকের অধিকারী হইয়াছে। কুমারী কমলা রায় বিজ্ঞান বিভাগ লইয়া পরীক্ষা দিয়া সমস্ত বিষয়েই লেটার পাইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। মোট নম্বর ৮০০ শ'র মধ্যে সে ৬৯২ নম্বর অর্জন করিয়াছে।

কমলা তাহার পিতার কর্মসূত্রে (পিতা শ্রীসুধাংশু বিকাশ রায় মধ্যপ্রদেশের ঘনসোর রেলওয়ে ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার) মধ্যপ্রদেশে আছে। সে তাহার মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া জব্বলপুরে থাকিয়া তথাকার প্রখ্যাত বিত্তালয় মহারাণী লক্ষ্মীবাই কন্যা উচ্চ মাধ্যমিক পাঠশালা হইতে পরীক্ষা দিয়াছিল। তথাকার শিক্ষিকামণ্ডলীর বিশেষ স্নেহের পাত্রী কমলা বাল্যকাল হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও অধ্যবসায় ও একাগ্রতার বলে এবং মাতার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নিষ্ঠার প্রভাবে কমলা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে মধ্যপ্রদেশের বাঙালী সমাজ বিশেষ গর্ব অনুভব করিয়া কমলা ও তাহার পিতা-মাতাকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাইতেছে।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কুমারী কমলা রায় পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। কমলার পিতাও দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় লেটারসহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। কমলার মাতামহ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। সদ্‌বংশজাত কমলা শান্ত, বিনীত। কমলারা দুই ভাই, এক বোন। কমলার দাদা দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারীং পড়ে, ছোট ভাই পড়ে জব্বলপুর স্কুলে।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি কমলার বিশেষ আকর্ষণ, শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা কমলার সবচেয়ে প্রিয়। হিন্দী সাহিত্যের প্রতিও তার অনুরাগ কম নয়, প্রেম চাঁদ, মৈথিলীশরণ, সুরদাস, তুলসীদাস তার প্রিয় লেখক। আমরা কমলার জীবনে উত্তরোত্তর অধিকতর সাফল্য, প্রতিভার বিকাশ ও কল্যাণ কামনা করি।

বৃটেন ও ভারতের অর্থনৈতিক লেনদেন

স্যার মাইকেল ওয়াকার বৃটেনের ভারতীয় হাই কমিশনার। তিনি বৃটেন ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ কার্য্যে বিশেষজ্ঞ। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ঐ বিষয় লইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে ভারত বৃটেনে ২৪২ কোটি টাকার দ্রব্যাদি গত বৎসরে রপ্তানি করিয়াছিল ও বৃটেন ভারতে পাঠাইয়াছিল ২৫০ কোটি টাকার মাল। বৃটেন ঐ বৎসরে ভারতকে বিনা সুদে ১৩৮·৫ কোটি টাকা কর্জ্জা দিয়াছিল। বৃটেন বরাবরই ভারতকে বহু টাকা ঋণ হিসাবে দিয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে যত টাকাই ভারতকে ঋণ হিসাবে বৃটেন দিতেছে তাহা সবই সুদ দেওয়া হইবে না এই শর্ত্তে দেওয়া হইতেছে। এই সকল ঋণ ২৫ বৎসরে শোধ দেওয়া হইবে এবং প্রথম সাত বৎসর অবধি শোধের কোন কিস্ত দিতে হইবে না। "এই সকল ঋণের টাকা কোন বৃটেনের রপ্তানি মাল ক্রয়ের সুবিধার জন্য বিশেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে না। বহু টাকাই ভারতের যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য পাইতে

দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে যে বৃটেন ইয়োরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর ব্যবসাবাণিজ্যে যোগদান করিয়াছে তাহাতে বৃটেন ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী জাতিগুলিকে জানাইয়াছে যে এমন ভাবেই এই ইয়োরোপীয় বাণিজ্য বৃটেনকে চালাইতে হইবে যাহাতে ভারত ও অন্যান্য "কমনওয়েলথ" দেশগুলির অর্থনৈতিক কোন ক্ষতি না হয়। ইয়োরোপীয় মিলিত বাণিজ্যিকগোষ্ঠীর জাতিগুলি ইহা মানিয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা এশিয়ার যে সকল দেশ "কমনওয়েলথ" অন্তর্গত সেই সকল দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ যথাসম্ভব সুগঠিত রাখিবার জন্য তৎপর থাকিবেন। ভারতের সহিত বাণিজ্য কিভাবে চলিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া একটি লিখিত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বৃটেন ইয়োরোপীয় বাণিজ্যগোষ্ঠীতে যোগদান করিবার পরে ভারতের সহিত বৃটেনের ব্যবসা শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে ভারতের ইয়োরোপীয় বাণিজ্যিকগোষ্ঠীতে রপ্তানির পরিমাণও ১৯৭০-৭১ এর ১০০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৭২-৭৩এ ২৩০ কোটি টাকা হইয়াছিল। সকল দিক হইতে দেখিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় যে বৃটেনের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ এখন উন্নতির দিকেই যাইতেছে এবং সেই উন্নতি যথাযথভাবে চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে সেই ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা এমনভাবে গঠিত হইয়া একটা স্থায়ীরূপ ধারণ করিবে যাহাতে বৃটেন, ভারত ও ইউরোপীয় জাতিগুলির অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির একটা প্রশস্ত পথ খুলিয়া যাইবে।

বৃটেন যে শুধু মাল আমদানি রপ্তানি ও টাকার লেনদেনের সাহায্যেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে। বৃটেন আরও সাহায্য করিতেছেন কারখানা গঠন ক্ষেত্রে। যথা চাষবাস যথাযথভাবে চালাইতে হইলে ভারতবর্ষের প্রচুর রাসায়নিক সার আবশ্যক হয়। বর্তমানে বৃটেন তিনটি রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতকে সাহায্য করিতেছেন। এই তিনটি কারখানা হইবে কান্দোলা, টিউটিকোরিন ও ম্যাঙ্গালোরে। ভারতে বহু কৃষিক্ষেত্রই বর্ষার জল না পাইলে চাষ না হইয়া পড়িয়া থাকে। জল সেচন কার্য্য ভারতের চাষের একটা অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। অর্থাৎ জল সেচন ব্যবস্থা না করিয়া খাদ্যবস্তু উৎপাদন এই দেশে বড়ই কঠিন। এই সেচন ব্যবস্থাক্ষেত্রেও বৃটেন নানাভাবে ভারতকে সাহায্য করিতেছেন।

"চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা"

প্রবাসীর একজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা বর্ত্তমান বৎসরে চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা নামে একটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষনা করিতেছি। এই প্রতিযোগিতাতে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গল্প ঃ

প্রথম পুরস্কার	১৫০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৫০ ,,

প্রবন্ধ ঃ

প্রথম পুরস্কার	১২৫ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৪০ ,,

কবিতা ঃ

প্রথম পুরস্কার	১০০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	৭৫ ,,
তৃতীয় ,,	৫০ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	২৫ ,,

পুরস্কার দিবার জন্য প্রবাসী-সম্পাদকের অভিমতই সকল সময় গ্রাহ্য হইবে। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইবার সময় এখন হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিল। পৌষের প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইবে। লেখকদিগকে নিজ নিজ লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে বাম কোণে "চারুশীলা দেবী প্রতিযোগিতা" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। লেখকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। অমনোনিত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

—প্রবাসী সম্পাদক

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭৪তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৮১

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি

যে সকল কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া কোন বিষয়ে একটা মীমাংসাতে উপনীত হওয়া যায় ও সেই মিমাংসার যাথার্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না ধার্য্য করিয়া নানা প্রকার রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক নিয়মকানুন গঠন ও কর্মপদ্ধতি সৃজন করা শুরু হয়, সেই ধারণাগুলি যদি হঠাৎ ভ্রান্ত প্রমাণ হইয়া যায় অথবা যদি সেই ধারণা হইতে উদ্ভূত যে সকল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া কর্মক্ষেত্রে নানাপ্রকার কার্যকলাপ আরম্ভ করা হয় তাহাও বিচারে অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত সকল কিছুই আর নির্ভরযোগ্য থাকে না। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি লইয়া পণ্ডিতমহলে যত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহাতে সকলেই এক-প্রকার মানিয়া লইয়াছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা অতি বড় কারণ। ব্যবসায়ের পরিমাণের তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং পণ্ডিতগণ নির্দেশ দিলেন মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করিলে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাইবে এবং ব্যাঙ্কগুলি যদি কাহাকেও আর পূর্বের মত অবাধে ও সহজে ঋণদান না করেন তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণ কম হইবে এবং মূল্য হ্রাস হওয়াও আরম্ভ হইবে। পণ্ডিতগণ আরও বলিলেন যে যদি কেহ অধিক বেতন পাইবে স্থির হয় তাহা হইলে বেতন যতটা বাড়িবে সেই বৃদ্ধির অংশটুকু তাহাকে নগদ না দিয়া ভবিষ্যতে সুদ সমেত সেই টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া একটা দলিল তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে। নানা ক্ষেত্রেই যাহাতে মুদ্রা বিনিময় অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে হয় সেই ব্যবস্থা

সকলকে করিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতগণ মুদ্রার পরিমাণ বলিতে কি বুঝেন তাহা পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। এক শতটি এক টাকার নোট ছাপা হইলে মুদ্রার পরিমাণ কি একশত টাকা পরিমাণ হয় না সেই পরিমাণ অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে? অর্থনীতিশাস্ত্রে বলে যে মুদ্রার সংখ্যা দিয়া তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। সংখ্যাকে যতবার মুদ্রা হাত বদলায় তাহার সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হয়। অর্থাৎ একশতটি এক টাকার নোট ছাপিয়া আসিলে দেখিতে হইবে যে সেই টাকা কতবার বেচা-কেনার কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। যদি এক বৎসরে ঐ টাকাগুলি মোটামুটি কুড়িবার করিয়া হাত বদলায় তাহা হইলে ধরিতে হইবে টাকার (ব্যবহারের) পরিমাণ দুই হাজার টাকার সমান। সুতরাং যদি টাকা বাজারে না ছাড়া হয় তাহা হইলে যে টাকা আছে তাহাই অধিক করিয়া ব্যবহৃত হইবে এবং টাকার সংখ্যা হ্রাস হইলেও তাহার (ব্যবহারের) পরিমাণ হ্রাস না হইতেও পারে। ব্যাঙ্ক যদি না টাকা ধার দেয় তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে যাহাদিগের নিকট টাকা আছে তাহাদের নিকট হইতে ব্যবসাদারগণ অধিক সুদ দিয়া টাকা লইবার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ যেখানে একব্যক্তি বৎসরে এক লক্ষ টাকা দুই তিনবার লাগ্নি করিতে পারিত সেই স্থলে সেই ব্যক্তির টাকা আর প্রায় কোন সময়েই পড়িয়া থাকিবে না ও তাহার লক্ষ টাকা চার পাঁচবার পর্য্যন্ত নানান ব্যবসাদারগণ ঋণ লইবে। টাকার পরিমাণ তাহা হইলে ব্যাঙ্কে হ্রাস হইলেও ব্যক্তিগত কারবারে বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রার ব্যবহারের গতিবেগ বা "ভেলসিটি অফ সার্কুলেশন" তাহা হইলে দমন করা পূর্ণরূপে সরকারী হস্তে থাকে না। এবং মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিলেও লেনদেন শীঘ্র শীঘ্র হইয়া মুদ্রার ব্যবহারিক পরিমাণ হ্রাস না হইতেও পারে। অনেক ব্যক্তি যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা দীর্ঘকালের মেয়াদে জমা রাখিতেন তাঁহারা ব্যবসাদারদিগের নিকট অধিক সুদ পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া অনেক টাকা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া ব্যবসাদারদিগকে সেই টাকা ধার দেওয়া শুরু করিতে পারেন। আর একটা কথা হইল বিক্রয়ের বস্তুর পরিমাণের উপর দ্রব্য মূল্যের নির্ভর-শীলতা। দ্রব্য সরবরাহ যদি কমিয়া যায় তাহা হইলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হয়। ব্যাঙ্ক প্রভৃতিকে যদি সরকারী নির্দেশে ধারকর্জ দিবার ক্ষেত্রে নূতন নিয়ম অনুসরণ করিতে বাধ্য করা হয়, এবং উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীগণ যদি টাকার অভাবে পূর্ণ পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম না হন, তাহা হইলে দ্রব্য সরবরাহে ঘাটতি পড়িতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বের মূল্যে দ্রব্য না পাওয়াতে ক্রেতাগণ অধিক মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবেন (ইহাতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস হইলেও মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।) তাহাতে দেখা যাইবে যে অর্থ-নীতিবিদ বিশেষজ্ঞদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া সকল সময় অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবে না হইতেও পারে। শুনা যায় যে নানান উপায় অবলম্বন করিয়া শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা কালো বাজারের কেনা বেচা খোলাবাজারে লইয়া আনিতে চেষ্টা করিবেন ও তাঁহারা সম্ভবতঃ ঐ কার্য্যে সক্ষমতার আশাও মনে পোষণ করিতেছেন। কালোবাজার বলিতে আমরা বুঝি একটা গোপনে কেনা-বেচার ব্যবস্থা তাহা কি করিয়া শাসকদিগের চেষ্টায় উন্মুক্ত আসরে আসিয়া পড়িবে তাহা বোঝা সহজ নহে। অবশ্য যদি সরকারী কর্মচারীরাই জানিয়া শুনিয়া কালোবাজার চালাইতে সাহায্য করিতেছিলেন ও এখন তাঁহারাই সেই সহায়তা বন্ধ করিয়া কালোকে সাদা করিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বিষয়টা ততটা অসম্ভবের ক্ষেত্রে না থাকিতেও পারে। ঠিক পরিস্থিতি কি তাহা অবশ্য আমরা বলিতে পারি না।

নাম বদল

বিভিন্ন পত্রিকায় হিন্দু স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া মাইকেল স্কুল করা লইয়া সপক্ষে বিপক্ষে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক পত্রিকাই নাম [illegible]

ঠিক হইতেছে না, উহা বদলাইয়া ডি, রোজিও স্কুল, রামমোহন স্কুল অথবা রাধাকান্ত স্কুল করিলেই ঠিক হয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে নামটা পালটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, যে নাম আছে সেই নামই রাখিয়া দেওয়া উচিত। কারণ উহা হিন্দু স্কুল হিসাবেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং বরাবরই ঐ নামেই চলিতেছে। এমন কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই যাহার জন্য নামটি পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। নাম পরিবর্তন আজ কাল একটা মানসিক ব্যাধির মতই জননেতাদিগের উপর ভর করিয়াছে এবং কোন অজুহাত পাইলেই সকলে মিলিত হইয়া দুই চারিটা রাজপথের উদ্যানের বা হাসপাতালের নাম বদলাইয়া ফেলেন। অনেক সময় একটা রাজপথকে চার টুকরো করিয়া চারজন মহারথীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে বড় বৃহৎ বৃহৎ সহরেই রাস্তার নাম বদলাইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে কাহারও পক্ষে কোন স্থান খুঁজিয়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধরা যাউক একটা দীর্ঘ রাজপথের উপরে এক হইতে এক হাজার সংখ্যক সহস্রটি গৃহ আছে। যতদিন রাস্তাটির নাম ছিল অমুক রোড ততদিন ৩৩০নং অমুক রোড বলিলে ঐ রাস্তার ৩৩০নং গৃহে যাওয়া সহজই ছিল। এখন নাম বদলাইয়া এক হইতে ৩১৩নং অবধি রাস্তার নাম হইয়া হজ রোড এবং তাহার পর হইতে রাস্তার নাম হইয়াছে বরল রোড ৩৩০নং অমুক রোড এখন হইয়াছে ১৭নং বরল সরণী। এই কারণে অমুক রোড অনুসন্ধান করিতে গিয়া যদি কেহ হজবরল সরণীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে তাহা হইলে দোষটা হয় নামকরণকারীদের। এই সকল ব্যক্তিদিগের নূতন নূতন রাজপথ, উদ্যান বা স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করিবার ক্ষমতার অভাব থাকাতে ইহারা পুরাতন রাস্তা-ঘাটের নূতন নামকরণ করিয়াই নিজেদের সৃষ্টি প্রেরণার অভিব্যক্তি পূর্ণ করেন। ইহার ফলেই এই নাম বদলের জনমনউন্মাদিনী বুদ্ধিভ্রংশকারী আন্দোলন সহরবাসীদিগের একটা অকারণ উদ্ভূত যন্ত্রণার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাস্তার নাম বদলাইলে জবাহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বোস, হো-চি মিন বা লেনিনের স্মৃতি সংবের লোকের মনে গভীর ভাবে উৎকীর্ণ হইয়া থাকে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ। রাস্তার নামকরণের দ্বারা স্মৃতি রক্ষা অত্যুত্তম পন্থা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচর বর্ণনা

কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে যেসকল গুপ্তচরের বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে এক এক দেশের নৃপতি বা শাসকগণ দুই আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেভাবে যেরূপ গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া যে জাতীয় মতলব হাসিল বা অভিপ্রায় সিদ্ধির চেষ্টা করিতেন, এখনও গুপ্তচর নিয়োক্তাগণ ঠিক সেইভাবেই সেইরূপ অভিসন্ধি সম্পাদন চেষ্টা করিয়া থাকেন। যেসকল গুপ্তচরগণ যেভাবে বিদেশী শত্রুদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগের অভিষ্ট সাধন হেতু অন্য দেশে থাকিয়া দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে তাহার বর্ণনা কৌটিল্য (চাণক্যের অপর নাম) যেরূপ করিয়া গিয়াছিলেন এখন আড়াই হাজার বৎসর পরেও ঠিক সেই ভাবে ঐ কার্য্য করা হইতেছে। যেসকল গুপ্তচরদিগের বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক বা জটাধারী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন গুরুদিগেরও তাহাদের উক্তরূপে মুণ্ডিত মস্তক বা জটাধারী শিষ্যবৃন্দের কথা কৌটিল্য বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গুরু শিষ্যদিগের সহিত যাহারা সংযোগ করিয়া নিজ দেশের শত্রুদিগের সাহায্যে শক্তি নিয়োগ করে তাহারা অনেকে ব্যবসায়ীর কার্য্য করিয়া থাকে। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের যে তর্জমা করেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে যে কে কি প্রকার ভেক ধরিয়া গোয়েন্দার কার্য্য করিত। "A Trader fallen from his profession, but possessed of foresight......is a merchant spy......

"A man with shaved head (munda) or braided hair (jatila)...is a spy under guise of an ascetic practising austerities, such a spy surrounded by a host of disciples with shaved head

or braided hair may take his abode in the suburbes of a city and pretend as a person living on a handful of vegetables......

বর্ত্তমানকালে দেখা যায় যে মুণ্ডিত মস্তক অথবা জটাধারী বহু ছদ্মবেশী গুপ্তচর আমাদের দেশে শিষ্য পরিবেষ্টিত ভাবে ঘোরাফেরা করিয়া থাকে যাহারা বিদেশীর অর্থে পুষ্ট ও ভারতের সামরিক গুপ্ত সমাচার সংগ্রহে অতিশয় পারগ। ইহাদের সহিত আমাদের ব্যবসাদার গোষ্ঠির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়। তাহারা এই সকল মুণ্ডিত মস্তক অথবা জটাধারী বিদেশীদিগের নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিদেশী অর্থ অথবা দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে বলিয়া জনরব এবং সেই কারণেই উহাদিগের সহিত ব্যবসাদারদিগের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কৌটিল্য অথবা চাণক্যের যুগে গুপ্তচর নিয়োগ ও তাহাদিগের কর্ম্মপদ্ধতি যে প্রকার ছিল, এখনও যে সেইপ্রকারই রহিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে পারি যে মনের গতি ও ধারা নিত্যনূতন পথে কদাপি চলিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের দিগবিচার চিরকালই নির্দিষ্টভাবে চলিয়া থাকে ও পুরাতন রীতি পদ্ধতি তাহারা কখনও পরিত্যাগ করিয়া নূতনের আকর্ষণে মজিয়া বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে কোনও আগ্রহ প্রদর্শন করে না। এই সকল কারণে আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক হওয়া আবশ্যক যাহাতে আমরা সকলে ধর্ম্মের মোহাবিষ্ট হইয়া পথ ভুলিয়া বিদেশী চরদিগের সমর্থন করিয়া না বসি। এই সকল ব্যক্তি নানাভাবে আমাদের সতর্কতার প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া যেখানে সকল গোপন কথা সহজে জানা যায় সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছাইতে চেষ্টা করে এবং স্ত্রীলোক ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মনে বিশ্বাস জাগ্রত করিয়া তাহারা বহুস্থলে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের শাসকগণ এই সকল ব্যক্তিকে দেখিয়াও দেখেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এই সকল মুণ্ডিত মস্তক ধর্ম্মধরদিগের আখড়াতে গিয়া মোক্ষলাভ চেষ্টা করিয়া থাকেন। মোক্ষলাভ হয় কিনা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু বেফাঁসভাবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া তাঁহারা আশা করি দেশ রক্ষক না হইয়া দেশ ভক্ষক হইয়া দাঁড়ান না।

একথা ঠিক যে বহু দেশের বাসিন্দারাই বিদেশীদিগের নিকট গোপনে টাকা লইয়া স্বদেশের নানান খবর বিদেশীদিগকে জানাইয়া থাকেন। এই সকল স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তিগণ ধরা পড়িলে কঠিন শাস্তিও পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের গোপন সংবাদ পাঠাইতে সর্ব্বদাই সুবিধা হয় এবং ইহারা সেই কারণে যেসকল বিদেশী এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বিদেশী গুপ্তচর, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কারণে যেসকল বিদেশী অকারণে অর্থাৎ কোন বিশেষ অর্থকর বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণ না থাকিলেও ভারতে আসেন ও ভারত হইতে বিদেশে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যেই কোন কোন ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন ও তাঁহাদের সাহায্যেই গোপন সংবাদ প্রেরণাদি কার্য্য সাধন করেন। পঞ্চাশ কি একশতাধিক ব্যক্তি যেখানে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মের অভিনয় করে সেখানে কোথায় কয়জন বিদেশী গুপ্তচর তাহা জানা সহজ কার্য্য নহে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের শাসকদিগের পক্ষে জানা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে যে সকল প্রতিষ্ঠানের ভারতে শাখা প্রশাখা গঠন করিয়া বিদেশীদিগের যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা সৃজন করা আবশ্যক হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অত্যন্ত কড়া নজর দেওয়া ভারত সরকারের বিশেষ কর্ত্তব্য। উপরন্তু যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে বিষয়টা আরও আপত্তিজনকরূপ পরিগ্রহণ করে। প্রথমতঃ গুরুর সন্ধানে বহু বিদেশী এদেশে আসিয়া যত্রতত্র ভ্রমণ করিয়া যাহার তাহার সহিত মেলামেশা করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর ও কে নহে তাহা কে বলিবে? দ্বিতীয়তঃ অনেকে আজকাল এদেশে আসিয়া এই দেশেরও ধর্ম্ম এই দেশে প্রচার করিবার আয়োজন

করিয়েছেন। ইহাদের প্রবর্তক ও পরিচালক এই দেশীয় কিন্তু শিষ্যমণ্ডলী নানা দেশীয়। ইহারা হইলেন এই দেশের নিরাপত্তা বিনাশের সম্ভাব্য পথ নির্ম্মাতা। এই গোষ্ঠীর ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এই দেশে আগমনের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহারা নিজ দেশে থাকিয়াই নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। কয়লার খাদে কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার মতই ভারতে ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচার একান্ত অনাবশ্যক ও অকারণ আগ্রহজাত। এক আধজন ভক্ত আসিলে ক্ষতি নাই কিন্তু বহু ভক্তের আবির্ভাব বিপদজনক।

রাসায়নিক উপকরণ ও ভেষজ উৎপাদন

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে সকল দ্রব্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ও যাহা না পাইলে জীবন বিপন্ন হয় সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি রাসায়নিক বস্তু ও ঔষধ ইত্যাদির একটা বিশেষ ও অত্যাবশ্যকীয় স্থান আছে। ইহা বর্তমান সভ্যতার পরিণতির জন্য হইয়াছে বলা যায় না। কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঔষধের কথা শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদিগের নাম থাকিতে দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রচয়িতা চরক ও সুশ্রুতের নাম সর্ব্বজন জ্ঞাত ও চরক সংহিতার নাম ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যাপনার চিরস্মরণীয় অঙ্গ। খাদ্য ব্যতীত মানুষ যেমন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; ঔষধ না পাইলে অসুস্থ মানুষ তেমনিই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে কোন দেশেই মানুষের রোগ ও অসুস্থতা সচরাচর হইতে পারে ধরিয়া লওয়া হয় এবং যে সকল দেশ মহা স্বাস্থ্যকর দেশ বলিয়া পরিচিত নহে সেই সকল দেশেই জনসংখ্যার শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ মানুষ সর্ব্বদাই রোগাক্রান্ত থাকে। ঔষধের মূল্য খাদ্য অপেক্ষা অধিক যদি ধরা যায় তাহা হইলে মানুষ খাদ্যের উপর যাহা ব্যয় করে ঔষধের উপর তাহার অন্ততঃ এক দশমাংশের অধিক অর্থই ব্যয় করে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পথ্যকে পৃথক করিয়া দেখিলে ঐ ব্যয় আরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই ঔষধের উপর যাহা ব্যয় হয় তাহা হাজার হাজার কোটিতে গিয়া দাঁড়াইতে পারে। ঔষধ জাতীয় বহু দ্রব্য, যাহার উৎপাদন এখন রাসায়নিক বস্তু উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থার অন্তর্গত, আজকাল রাসায়নিক কারখানায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যথা জল শোধনের জন্য ক্লোরিন, ফটকিরির নাম করা যাইতে পারে। অনেক জাতীয় এসিড বা দ্রাবক বস্তু নানা প্রকার কার্য্যে লাগে যাহার মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার কথাও উঠিয়া থাকে এবং এই সকল বস্তু উৎপাদনও আজকাল কারখানাতেই হইয়া থাকে। সকল রাসায়নিক বস্তু ও ঔষধ উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইলে তাহার কিছু অংশ বিদেশে পাঠাইয়া ব্যবসা করাও চলিতে পারে। এখনও অবশ্য সকল বস্তু ও ঔষধ প্রস্তুত ভারতবর্ষে সম্ভব হইতেছে না এবং ভারতীয় পরিকল্পনা কর্তৃত্বের মালিকদিগের সহকারে নানান চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে বিদেশীদিগের সাহায্য পাইয়া আরও অধিক করিয়া রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা গঠন করা শীঘ্র সম্ভব হয়। তাহা হইলে মনে হয় আরও ৮০০-৯০ শত কোটি টাকার ঔষধাদি প্রস্তুত সম্ভব হইবে ও ভারতও ঐ ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। যে সকল জাতি এই বিষয়ে ভারতকে স্বদেশে ঔষধ প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার মধ্যে অনেক জাতি ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতেই নিজ নিজ ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা ভারতে গঠিত করিয়া লইয়াছিলেন। কোন কোন কারখানা পূর্ণরূপেই বিদেশী ধনে গঠিত হয় এবং অপর কোন কারখানা মূলধনে ভারতীয়দিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দিয়াছিলেন। এখন যেসকল কারখানা হইতেছে তাহার মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুতের কারখানাগুলি পূর্ণরূপেই ভারতের জাতীয় কারখানারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়েছে। এখন রাশিয়ার সাহায্যে যে কারখানার আকার বৃদ্ধি ও নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন কার্য্য চলিতেছে তাহা জাতীয় ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সকল গঠন পরিকল্পনা বাস্তবরূপ

ধারণ করিলে পর ভারতকে আর বিদেশ হইতে ঔষধ ও রাসায়নিক উপকরণ আমদানি করিতে হইবে না। উপরন্তু অনেক উৎপন্ন বস্তু বিদেশে রপ্তানি করাও সম্ভব হইবে ও তাহাতে বিদেশী অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারিবে। একথা অবশ্য অর্থনীতি ক্ষেত্রের একটা অতিবড় সত্য যে কোনও জাতিই শুধু বিদেশে মাল পাঠাইয়া তাহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্য্য সুসাধিকত করিতে পারে না। বাণিজ্য চালাইতে হইলে মাল আনয়ন ও প্রেরণ দুই কার্য্যই সমানে পরিচালনা করা আবশ্যক হয়। সুতরাং যদি ভারত সকল ক্ষেত্রেই স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করে। অর্থাৎ যদি ভারত সামরিক দ্রব্য সম্ভার অস্ত্রশস্ত্র বিমান নৌবহর প্রভৃতি নিজে নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে সক্ষম হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, কলকব্জা ইত্যাদি সকল কিছুই নিজ দেশে উৎপাদন করিয়া লইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভারত অন্য দেশ হইতে কি কি দ্রব্য আনাইবে? কিছু না আনাইলে ভারতের রপ্তানি ব্যবসায় কিভাবে চলিবে? শুধু রপ্তানি চলিতে পারে না, কারণ ঐ প্রেরিত বস্তু বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া ভারতকে কিছু না কিছু ক্রয় করিতেই হইবে। বর্ত্তমানে বিদেশীয় ঋণ শোধ ও সেই ঋণের সুদ দিয়া অনেক টাকা খরচ হইতে পারে, কিন্তু সে অবস্থা অল্পকাল স্থায়ী হইবে। ঋণ শোধ শেষ হইবার পরে রপ্তানি ব্যবসায় হইতে পাওয়া টাকা কিভাবে ব্যয় করা হইবে?

গরু মহিষ আছে দুগ্ধ নাই

শুনা যায় যে পৃথিবীতে যত গরু মহিষ আছে তাহার মোট সংখ্যার এক চতুর্থাংশ আছে ভারতবর্ষে। ইহা হইতে স্বভাবতই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কথা তাহা হইল যে পৃথিবীর মানুষ যত দুগ্ধ খাদ্য হিসাবে খাইয়া থাকে তাহারও মোট পরিমানের কাছাকাছি এক চতুর্থাংশ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বস্তুত ভারতবর্ষের মানুষের ভাগ্যে অতটা দুগ্ধ প্রাপ্ত কখন হইয়া উঠে না। এক চতুর্থাংশের পরিবর্তে এক দশমাংশও ভারতীয়গণ পান বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ এই যে ভারতীয় গরু দুধ দেয় অত্যন্তই কম। মোটামুটি তাহারা দৈনিক আধ সের দুধও দেয় বলিয়া মনে হয় না। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে ইউরোপ আমেরিকার গরুর দুধ হয় মোট হিসাবে প্রায় দৈনিক দশ সের। ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম দুধ দেওয়ার কথা অপর কোনও দেশের গরুর সম্বন্ধে শুনা যায় না। ভারতবর্ষের গরু যদি সুপ্রজনন ও খাদ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া নিজেদের অল্পদুগ্ধ দানদোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এবং যদি তাহাদের দৈনিক দুগ্ধদানের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা আধ সের হইতে বাড়িয়া অন্তত: ⁄২৷৷০ সেরে দাঁড়ায় তাহা হইলে ভারতের মানুষের পুষ্টি আহরণের ক্ষেত্রে একটা মহা উন্নতি হইয়া যায়। এখন যদি মাথা পিছু দুগ্ধ জোটে দৈনিক এক ছটাক তাহা হইলে দুগ্ধদান বৃদ্ধি হইলে তাহা হয়ত দাঁড়াইবে এক বা দেড় পোয়ায়। এবং যে হেতু সকল মানুষ সমান পরিমানে দুগ্ধ পান করেন না এবং শিশুদিগকে সকলেই অধিক করিয়া দুগ্ধ দিয়া থাকেন সেই কারণে দুগ্ধের যদি উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে শিশুদিগের দুগ্ধপান এতটাও বৃদ্ধি হইতে পারে যাহাতে তাহাদের শরীর বিশেষ ভাবেই সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে। ইহাতে সমগ্র জাতির স্বাস্থ্য এখনকার তুলনায় উন্নত হইবে বলিয়া মনে হয়। খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞদিগের একটা প্রবল শিরঃপীড়া আছে সকলেই জানেন। জমিতে জল ও সার সরবরাহ করিয়া ফসল উৎপাদন বাড়ান যত ব্যয় ও কষ্টসাধ্য সেইমত খরচও পরিশ্রম করিলে অল্পদিনেই গরু মহিষের দুগ্ধদান বাড়িয়া সকল ব্যক্তিরই সুবিধা হইতে পারে মনে হয়। আধুনিক যুগের সকল দেশের মানুষেরই খাদ্যের তালিকায় দুগ্ধের স্থান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এই কারণে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি সর্ব্বত্রই খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে লাভজনক বলিয়া গ্রাহ্য হয়। আমাদের দেশে তিন টাকা সের দুগ্ধ বিক্রয় হয় বলিয়া কথাটা আরই আলোচ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এ দেশের ও বিদেশে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্য তুলনা করিয়া দেখিলে সম্ভবত অতি উজ্জ্বলরূপে বলিতে পারা যাইবে যে সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই

ভারতবর্ষ হইতে দুধের মূল্য অল্প এবং জনসংখ্যার অনুপাতে দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমানও অনেক অধিক।

বিভিন্ন কার্য্যে রোজগারের আধিক্য ও অল্পতা

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ সুতরাং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দ্রব্যমূল্য, বেতন, ভাড়া, খাজনা প্রভৃতি ঠিক এক রকম না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একই স্থানে, একই বস্তুর মূল্য অথবা একই কার্য্যের পারিশ্রমিক যদি বিভিন্ন প্রকার হয় এবং যদি সেই মূল্যের বা মজুরীর হারের পার্থক্য প্রকটভাবে কমবেশী হয় তাহা হইলে বিষয়। অস্বাভাবিক ধরণেই অর্থনীতি বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। যথা ধরা যাউক কোনও এক স্থলে একটি ইস্পাতের কারখানা আছে ও তাহার নিকটে আছে রেজিষ্ট্রী অফিস আদালত প্রভৃতি ও কাছাকাছি স্থলে আছে দুই তিনটি স্কুল ও একটি কলেজ। নিকটস্থ একটি রেল ষ্টেশনের পার্শ্বে আছে একটি বালটি নির্ম্মাণের ছোট কারখানা ও অদূরে আরম্ভ হইয়াছে ধানের ক্ষেত্র। এই সকল বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে একই ধরণের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে নানা প্রকার শ্রমিকগণ। লেখাপড়ার দিক দিয়া সমান স্তরের ব্যক্তিগণ কেহ আদালতে, কেহ কলেজে, কেহ বা কারখানায় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন ও তাঁহারা বেতনাদি নানা প্রকার পাইয়া থাকেন। অতি অশিক্ষিত কর্ম্ম কৌশল-বিহীন শ্রমিক চাষের ক্ষেতে, আদালতের ঝাড়ুদার হিসাবে, ছোট বালটির কারখানায় অথবা বৃহৎ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করে। গ্রামে সে কাজ করিলে তাহার মজুরী হয় দৈনিক এক টাকা আট আনা। বালটির নির্ম্মাণ কার্য্যে কাজ লাগাইলে সে পায় সাড়ে তিন টাকা কিম্বা চার টাকা। ঝাড়ু দিলে আদালত তাহাকে দেয় মাসিক সত্তর টাকা এবং যদি সে ইস্পাতের কারখানায় ঢুকিতে পারে তাহা হইলে সে দৈনিক পাঁচ ছয় টাকা বেতন পাঁচ ছয় টাকা উৎপাদন বোনাস ও তদুপরি প্রভিডেন্ট ফণ্ড, গ্রাচুইটি, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ ইত্যাদি অনেক কিছুই পাইতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ ইস্পাতের কারখানায় কাজ পাইলে সে মাসিক রোজগার করিবে ৪০০।৪৫০ টাকা। উপরন্তু পাইবে রোজগারের শতকরা ১০ টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটির টাকা, বিনা ভাড়ায় থাকিবার গৃহ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা ঔষধ প্রভৃতি। অর্থাৎ মোটের উপর প্রায় ৬৫০।৭৫০ টাকা। বালটির কারখানায় যে মিস্ত্রি ঢোকে সে আয় করে মাসে দুই শত টাকা। ইস্পাতের কারখানায় সেই ব্যক্তি কাজ পায় যদি তাহা হইলে তাহার রোজগার হইবে সম্ভবতঃ ১৫০০ শত টাকা। ঐ কারখানায় হটহাও ও টাইপ রাইটিং করিলে যদি কেহ ১০০০।১২০০ টাকা পায় সেই একই ব্যক্তি আদালতে পাইবে ৩৫০।৪৫০ টাকা। গাড়ী চালাইলে ইস্পাত কারখানা দিবে ৪৫০।৭৫০ টাকা এবং আদালতের গাড়ীর চালক পাইবে মাসিক ২০০।২৫০ টাকা। ডবল এম, এ, পাকা অধ্যাপক কলেজে পাইবেন ৩৫০ টাকা মাসিক এবং তিনি আই এ, এস হইলে পাইবেন ৬০০-৯০০ টাকা। ইস্পাতের কারখানায় যদি তাঁহাকে রাখে তাহা হইলে তাঁহার বেতন ও বোনাস ইত্যাদি লইয়া রোজগার দাঁড়াইবে মাসিক ২০০০।৩০০০ টাকা। অর্থাৎ যদিও সকলে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে ন্যায়ত এক সময় এক অঞ্চলে যদি কেহ একই কাজ করে তাহা হইলে ঐভাবে নিযুক্ত সকল ব্যক্তির একই রোজগার হওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায় যে ব্যক্তিগত কাজ কারবারে একজন মানুষ যাহা উপার্জ্জন করেন তিনি সেই রকম কাজ করিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানে পান তাহা হইতে অনেক অধিক টাকা এবং যদি কপালগুণে তিনি কোন বৃহৎ কারখানায় ঢুকিয়া পড়িতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার উপার্জ্জন হইবে ন্যূনতম মজুরীর হারের দশগুণ। এই যে অবিচার ইহার মূলে রহিয়াছে মজুরী অথবা বেতন দিবার ক্ষমতার কথা। ক্ষেতের জন মজুরকে ক্ষেতের মালিক যাহা দিতে পারেন ও সেই ব্যক্তি শ্রম করিয়া ক্ষেতে যে মূল্যের বস্তু উৎপাদন করিতে পারেন তিনি সেই শ্রমই বৃহৎ কারখানায় করিলে তাঁহার দ্বারা উৎপাদিত বস্তুর মূল্য হয় বহুগুণ অধিক এবং বৃহৎ কারখানার শ্রমিক গোষ্ঠী দর কষাকষি করিয়া সেই কার্য্যের জন্য যে মজুরী আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হ'ন, অন্য স্থলে

শ্রমিকগণ সেইরূপ মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হ'ন না। অর্থাৎ শ্রমমূল্য উৎপাদিত বস্তুর মূল্যের সহিত গভীর ভাবে জড়িত থাকে এবং তাহার কারণ হইল উৎপাদিত বস্তুর মূল্যের সাহিত মজুরীদিবার ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে স্থলে মজুরী অধিক দিবার ক্ষমতা জন্মায়, শ্রমজাত বস্তুর মূল্যের আধিক্য হইতে, সেইখানে শ্রমিকগণও অধিক মজুরী আদায় করিতে সফল ভাবে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং ন্যায় বা সুনীতির সূত্র অবলম্বন করিয়া মজুরী স্থির করা হয় না, স্থির করা হয় মজুরী বৃদ্ধি হ্রাস করিবার ক্ষমতার ওজন দেখিয়া ও দর কষাকষি করিয়া।

চাষের ফসল বৃদ্ধির সীমা

প্রাচীনকালের মানুষ যখন প্রথম চাষ করিতে আরম্ভ করে তখন সে জঙ্গল কাটিয়া বৃক্ষ ডাল পালা জ্বালাইয়া দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিত। কিছুদিন চাষ করিয়া যখন সে দেখিত যে জমির উর্বরতা আর তেমন থাকিতেছে না তখন সে পুরাতন ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া পুনরায় আর একটা চাষের ক্ষেত্র বানাইয়া লইত। পুরাতন ক্ষেত্র বহুকাল অব্যবহৃত থাকিলে হয়ত আবার তাহার হারান উর্বরতা ফিরাইয়া পাইত এবং সেখানে তখন পুনরায় চাষ হইতে পারিত। যখন লোক সংখ্যা অল্প ছিল এবং জঙ্গল ছিল অফুরন্ত তখন এই জঙ্গল কাটা ও জ্বালানর রীতি অনুসরণ সম্ভব ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এই রীতি অবলম্বনে চাষবাস করা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া আসিল। জমি ফেলিয়া রাখিয়া ও তাহাতে সার দিয়া অথবা গরু ভেড়া চরাইয়া তাহাদিগের বিষ্ঠা হইতে প্রাপ্ত উর্বরতা বৃদ্ধিকর বস্তু সকল মৃত্তিকাকে সতেজ করিয়া তুলিলে পরে পুনরায় চাষ করার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। ইহাতেও সকল জমি চাষ করা সম্ভব হইত না। অনেক স্থলেই জলাভাব থাকায় চাষ করা চলিত না। মানুষ পরে পুষ্করিনী ও কূপ খনন এবং বাঁধ বাঁধিয়া নদী নালার জল রোধ করিয়া সেই সকল উপায়লব্ধ জলে চাষ করা আরম্ভ করে। এখনও পৃথিবীর বহু স্থলে বহু জমি চাষ হয় না যেহেতু সেই সকল জমির জল সেচন ব্যবস্থা নাই। ভারতবর্ষের শতকরা ২০।২৫ ভাগ চাষের উপযুক্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে এবং এই ব্যবস্থা আরও ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হইলে খাদ্য উৎপাদন অনেক বাড়িতে পারে, কিন্তু সে ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। অনেক জমিতে বালি, কাঁকর, পাথর ইত্যাদি অধিক থাকায় চাষ হয় না। সেগুলি বাছাই করিয়া ঠিক করা যাইতে পারে। তৎপরে আছে সারের কথা। এই সার জীব জন্তু উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে অথবা রাসায়নিক উপায়েও সার প্রস্তুত হইতে পারে। আজকাল রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া এক জমিতে বৎসরে দুই তিন বার চাষ করা হইয়া থাকে। রাসায়নিক সারের আর একটা সুবিধা এই যে অনেক জমির [illegible] কার উর্বরতার সহিত সংযুক্ত গুণের অভাব থাকে। যে সকল অভাব রাসায়নিক বস্তু জমিতে ঢালিয়া দিলে সহজেই দূর করা যাইতে পারে। আজকাল জমিতে জল সেচন, রাসায়নিক ও স্বাভাবিক উপায়লব্ধ সার সংযোগ ও ফসল অদল বদল করিয়া বা জমি ফেলিয়া রাখিয়া জমির উর্বরতা নিয়ন্ত্রন একটা বিশেষ বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া এখন বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদনত সহজ হইয়াছেই, আরও হইয়াছে ফসলের পরিমান বৃদ্ধি। যাহাকে "সবুজ বিপ্লব" বলা হয় তাহা এখন সকল দেশেই অল্পাধিক আবির্ভূত হইয়াছে বলা যায়। ভারতবর্ষে এখনও বহু জমি সেচের অভাবে এবং কাকর ইত্যাদি বাছাই না হওয়ার জন্য চাষ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম প্রয়োজন হইল জলের এবং জলের ব্যবস্থা হইলে পরে বাছাই ও রাসায়নিক সার সংযোগ করিয়া ফসল উৎপাদন হইতে পারে। আমাদিগের সেচেরও অভাব সারেরও অভাব। সেচের জন্য বিদেশ হইতে কিছুই প্রায় ক্রয় করিতে হয় না সুতরাং সেচের ব্যবস্থা বিদেশী অর্থ সংগ্রহ না করিয়া হইতে পারে। বাছাই করাও হাতের কাজ এবং তাহার জন্যও কোন সাহায্য বিদেশ হইতে পাওয়া প্রয়োজন হয় না। ইহাও অনায়াসে লোকের শ্রম ব্যবহারেই হইতে পারে। হয় না কেন তাহার উত্তর আমরা দিতে পারি না। শেষে আসে রাসায়নিক সার উৎপাদন ও ব্যবহারের কথা। সর্বত্র মৃত্তিকার গুণাগুণ বিশ্লেষন করিয়া ইহার আয়োজন আরম্ভ করা আবশ্যক। ইহাতে কাজটা আগাইয়া থাকে।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও গৌরমোহন আঢ্য

শৈলেনকুমার দত্ত

আজকের শিক্ষা বিপর্যয় এবং ছাত্র অসন্তোষের এই চরম দুর্দিনে একজন আদর্শবান শিক্ষকের নাম স্মরণ করলে বোধ করি আমাদের পুণ্যই হবে। তিনি হলেন গৌরমোহন আঢ্য। ইংরেজি শিক্ষার সেই জন্মলগ্নে একজন দরিদ্র বাঙালি নিজের চেষ্টায় কেমন করে একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তা ভাবলে আজও বিস্ময় লাগে। তাঁর সেই অমর প্রতিষ্ঠানের নাম হল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি। এই প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশে কয়েকজন কালজয়ী প্রতিভাধর উপহার দিয়েছে। তাঁরা হলেন—জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গভশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী কৈলাসচন্দ্র বসু, চিন্তাবিদ চন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল, নাট্যকার অমৃতলাল বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও অল্প কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন।

গৌরমোহন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী কলকাতায় এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সতেরো বছর বয়সে জীবিকার উপযোগী কোন কাজকর্মের সন্ধান না পেয়ে নিজেই একটি স্কুল খুলে বসেন একদিন—সে ঐতিহাসিক দিনটি হল ১লা মার্চ, ১৮২৯। তাঁর সময়ে কলকাতার বিখ্যাত বিদ্যালয় বলতে ছিল—[illegible], ডাফ সাহেবের জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং স্কুল সোসাইটির স্কুল বা হেয়ার স্কুল। কিন্তু অবিচল নিষ্ঠা, ত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের গুণে গৌরমোহন তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিকেও খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে বসাতে সমর্থ হন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপন করার কৃতিত্বও একজন বাঙালির—তিনি হলেন রামজয় দত্ত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যানিকেতনের বিখ্যাত ছাত্র হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ বাংলাগদ্যের অমর শিল্পী রামকমল সেন। সেদিক থেকে গৌরমোহন ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি।

বিদ্যালয় শুরু করেই গৌরমোহন নজর দেন ছাত্র সংগ্রহে। নিজের চেষ্টায় দুই শতাধিক ছাত্র সংগ্রহ করার পর তিনি টার্নবুল নামে একজন সাহেবকে অংশীদার করেন। তারপর টার্নবুল মারা গেলে তিনিই আবার স্বত্বাধিকারী হন। এরপর সৌভাগ্যক্রমে গৌরমোহন হার্মান জিওফ্রে নামে একজন দুঃস্থ অথচ প্রতিভাশালী ব্যারিস্টারের সাক্ষাৎ পান। এই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর থেকেই গৌরমোহনের স্কুলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। পরে জিওফ্রে সাহেবই হন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গৌরমোহন নিজেও নিচের ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতেন।

মত্তপ বলে জিওফ্রের কুখ্যাতি থাকলেও জ্ঞান বিদ্যা ও শিক্ষকতায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। জিওফ্রে অনেকগুলি বিদেশী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এই জ্ঞানতপস্বীর হাতেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এবং কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তৃতা, বিচার এবং তর্ক করবার শক্তি অর্জিত হয়।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করার আরও একটি কারণ হল—গৌরমোহন শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে আস্থা এবং শ্রদ্ধাশীল করে তুলতেন। বিপরীত দিকে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্রদের অবাধ স্বাধীনতার ফলে দেশীয় সংস্কৃতি নির্মমভাবে পদদলিত হচ্ছিল আর তাদের স্কুলে স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা যেভাবে কমে যাচ্ছিল, তাতে প্রত্যেক অভিভাবকেরই আশঙ্কা হওয়ার কথা। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও। গৌরমোহনের জনপ্রিয়তাও তাই দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

এ প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'সেকালের লোক' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন—"ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্রগণ ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াও স্বধর্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কার রূপে পরিণত করিয়াছিল।"

ওরিয়েন্টাল সেমিনারির এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে একটি পত্র প্রকাশ করেন নির্ভীক সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার—১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ সংখ্যায়। 'কস্যচিৎ পত্র প্রেরকস্য' এই কবিতাটির কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য—

ওরিয়েন্টেল সেমিনেরি নামে বিদ্যালয়।
গরাণহাটার মধ্যে গরাণহাটায়॥
স্থাপক তাহার হন আঢ্য মহাশয়।
নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায়॥

... ...

অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালকে শিখাইতে বাঞ্ছা যার হয়॥
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান॥

আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়।
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয়॥

গৌরমোহন ছাত্রদের পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। ক্লাসে কোন ছাত্র অনুপস্থিত হলে তিনি নিজে তার বাড়ি গিয়ে খবর আনতেন। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের মাইনেও তিনি নিতেন না। ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহার দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা তথ্যের সন্ধান দেওয়া হত ছাত্রদের। অল্পবয়স্ক পাঠার্থীদের চরিত্র গঠনের দিকেও তিনি ছিলেন একজন সজাগ প্রহরী।

ছাত্ররা যাতে নির্ভুল ইংরেজি বলতে লিখতে শেখে, সেজন্যে গৌরমোহনের আগ্রহ এবং উদ্যমের অন্ত ছিলনা। তিনি নানা জায়গা থেকে স্বল্প বেতনে দুঃস্থ অথচ আদর্শ শিক্ষক সংগ্রহ করে আনতেন। এমনি শিক্ষক সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁকে শেষ পর্যন্ত জীবন বিসর্জন দিতে হয়। সেদিনটি ছিল ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী—গৌরমোহন একজন গ্রশিক্ষকের সন্ধান পেয়ে শ্রীরামপুর গিয়েছিলেন। নৌকাযোগে ফেরার পথে গঙ্গার নৌকাডুবি হয়। গৌরমোহন সাঁতার জানতেন না, তাই তাঁর গৌরবময় জীবনেরও ঐসঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটে।

গৌরমোহন ছাত্রদের শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য সত্যি সত্যিই জীবনদান করেছেন। রাজনারায়ণ অমৃতলাল বসুর ভাষায় যথার্থভাবে বলতে গেলে—"শিক্ষা প্রচার করিতে গিয়া যদি কোনও বাঙালীর martyrdom হইয়া থাকে তাহা গৌরমোহন আঢ্যের।"

ব্যক্তিজীবনে গৌরমোহন সাধু ও ধর্মভীরু প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এমন সরল ছিলেন যে, তাঁর বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে গিয়ে বলতেন—আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি, তোমাদের তাই পড়াতে পারি না।

সেকালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল পাঁচ টাকা। আর ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ছিল

তিন টাকা। সেকালের পক্ষে এ বেতন যথেষ্ট বেশিই ছিল; কিন্তু তবুও হিন্দু কলেজের মত—গৌরমোহনের বিদ্যালয়েও ছাত্র উপচে পড়তে থাকে। গৌরমোহনের মৃত্যুকালে সেমিনারির মূল কেন্দ্রে ছাত্রসংখ্যা ছিল আট শ' আর তিনটি শাখা মিলে ছিল দু'হাজারের মত। দূরবর্তী ছাত্রদের কথা চিন্তা করে মূল প্রতিষ্ঠান ছাড়া ভবানীপুর ও বেলঘরিয়ায় দুটি শাখাও খোলা হয়।

গৌরমোহনের মৃত্যু এ হেন প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রাক্তন ছাত্র কৈলাসচন্দ্র বসু সেমিনারির প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন প্রতিষ্ঠানটির হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করা হয়—সদস্য নির্বাচিত হন 'বেঙ্গলী'—সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তাঁর মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, মতিলাল শীল, কৈলাসচন্দ্র বসু, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁদের পক্ষেও হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কারণ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি একটি প্রতিষ্ঠান ছিল না,—গৌরমোহন নিজেই প্রতিষ্ঠান ছিলেন।

সান্নিধ্য

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯১২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। কেওড়াতলায় শহীদ যতীন দাসের স্মৃতিসভায় ভূপতি মজুমদার এসেছিলেন সভাপতি হয়ে। সভা শেষ হয়ে গেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে-গাড়ীতে তিনি যাবেন, সে গাড়ী তখনও এসে পৌঁছায়নি।

ভূপতি দা দাঁড়িয়েই গল্প করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী আসতে দেরী হচ্ছে দেখে আমি বললাম—আপনি এসে বসুন। দাঁড়িয়ে কষ্ট হচ্ছে ত' আপনার?

ভূপতি দা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু দাঁড়িয়েছি বলে কষ্ট হচ্ছে? অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছো যে, বয়েস হয়েছে, এই ত'? বলো, কত বয়েস এখন আমার।

হঠাৎ বলে ফেলা শক্ত। তবু আন্দাজ করে বললাম—আমার মনে হচ্ছে আপনার এখন আটাত্তর চলছে।

কপটক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, তোমরা আমায় শুধু ছোটই করতে চাও। আমি এখন ৮২ কমপ্লিট করতে চলেছি। তাই বলে কি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। কক্ষনো না। আমি দাঁড়িয়েই থাকবো।

চিরযুবা ও চিরবিপ্লবী এই ভূপতি মজুমদার—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি সক্রিয় ছিলেন। রাজনীতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে অকুণ্ঠায় মনুষ্যকে দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রথম-জীবন কেটেছে সশস্ত্র বিপ্লবের পথেপথে, শেষজীবনে মন্ত্রীদের মসনদে বসেও অত্যন্ত সাধারণ নীরব-জীবনই বরণ করেছিলেন। রাজনীতির শেয়ার মার্কেট থেকে লভ্যাংশ তুলবার কোন আগ্রহ তাঁর কোনদিনই হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে বিগত শতাব্দীর একটি অনন্যযুগের অবসান ঘটেছে। বিংশশতাব্দীর বাঙালী সবদিক থেকেই তাঁর বিপরীত।

১৯৪১ সালে 'সৈনিক' সাপ্তাহিক পত্রিকার লেখক হিসেবে আমি প্রথম ১নং হেমন্ত দাস লেনে ভূপতি মজুমদারের বাড়ীতে এলাম। তখন তিনি বিধান মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়। এবং তারপরে তিনি হন শ্রমমন্ত্রী।

সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকাটি ভূপতিদার সৃষ্টি। তাঁর অনুজ ও ব্যক্তিগত সেক্রেটারি শ্রীশৈলেশ মজুমদার পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। 'সৈনিক' এর আড্ডা সে সময় জমজমাট। এই আড্ডায় নিয়মিত আসতেন কবি ও সাংবাদিক জগদানন্দ বাজপেয়ী, ৺নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, এবং আরও অনেকে। শেষের দিকে সৈনিকের সম্পাদকরূপে যোগ দেন কথা সাহিত্যিক গৌতম সেন। সময় পেলেই ভূপতিবাবু আড্ডায় এসে বসতেন। এবং তিনি এলেই আড্ডার মেজাজ বদলে যেতো। কারণ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেজাজে ছিলেন অত্যন্ত রসিক। তিনি কবিতার ভক্ত ছিলেন। তিনি এলেই জগদানন্দ বাবুকে কবিতা আবৃত্তি করতে হতো। ভূপতিবাবু বলতেন—কবি, এইজন্যেই ত' তোমাকে এত পছন্দ করি।

একদিন ভূপতিবাবু এসে বললেন—মোহনবাগান মাঠে ছেলেদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে দৌড়োতে। ওরা মনে করেছিল আমি বুড়ো হ'তে চলেছি। কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছি ওদের—বুড়ো বয়সেও পৌছয়ে নেই।

একদিন বললেন আমায়—বাঙালী ছেলেরা শুধু কবিতা লিখবে আর মিনমিনে হ'য়ে থাকবে, এ আমি সহ্য করতে পারিনা। তোমার মত ছেলেদের উচিত আর্মিতে-যোগ দেওয়া।

বলা যেতে পারে, আমাকে একদিন তিনি গোখেল রোডের রিক্রুটিং ক্যাম্পে নিয়েও গেলেন। আমার দুর্ভাগ্য ক্ষীণদৃষ্টির জন্য সেদিন এয়ার কোর্সে প্রবেশ করা আমার হয়ে ওঠেনি।

এখানেই কথায় কথায় একদিন যতীন মুখার্জীর কথা তুললাম। জগদানন্দবাবু আমার পরিচয় দিলেন—সন্তোষের মাসী হ'ল মৃণাল দেবী। আপনার মনে আছে ত?

—মৃণাল দেবীকে মনে নেই? একসময় ত' আমার আগুন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন একেবারেই ছাই হ'য়ে গিয়েছেন। বলেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কোথায় এখন? কাশীতে নিশ্চয়ই না।

বললাম—জঙ্গীপুরে থাকেন। আপনি জানেন, যতীন মুখার্জী ওঁর দেওর ছিলেন?

ভূপতিবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। যতীন মুখার্জীর নামের উল্লেখে তিনি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। আমি সেই সুযোগে আবার বললাম—বাঘা যতীন একটা পকেট ছুরি দিয়ে বাঘ মেরেছিলেন, এটা আপনি বিশ্বাস করেন?

গম্ভীরস্বরে এবার তিনি বললেন—যতীনদার জীবনে অবিশ্বাস্য কিছু নেই।

ভূপতি মজুমদারকে যতীন মুখার্জীই যে হাতে ধরে বিপ্লবের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, এ তথ্য সেদিন আমার জানা ছিলনা; যতীন মুখার্জী তাঁর ওপরে কতটা নির্ভর করতেন, তা জানা যায় যখন শুনি, জার্মান জাহাজে অস্ত্র আনার পরিকল্পনার ব্যাপারে জার্মানকনসাল হেলফেরিক এর সঙ্গে আলোচনার জন্য যতীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে (এম, এন, রায়) পাঠান এবং কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ভূপতি মজুমদারকেও পাঠান।*

ভূপতিমজুমদার সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হন। সিঙ্গাপুর জেলে বিপ্লবী অবনী মুখার্জীর সঙ্গে একই সঙ্গে তিনি ছিলেন।

'সৈনিক' পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয়জীবনে বলিষ্ঠ মানবতার প্রেরণা সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল; প্রতিদিনে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছি, আমরা স্বদেশপ্রেম থেকে সরে যাচ্ছি, আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি—এই দুঃখ তাঁকে গভীরভাবে পীড়া

---

* নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ (১৩৬১ সংস্করণ) পৃঃ ১৫১

মিত্র। সৌমিকের আজ্ঞায় ভূপতিদার প্রেরণায় এবং শৈলেশদার (মজুমদার) সহায়তায় আমরা একটি আদর্শ সংঘপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিই। শৈলেশদার মতে সংঘের নামকরণ করা হয় বেটার বেঙ্গল সোসাইটি (Better-Bengal Society) কর্মপরিচালনার ভার পড়ে আমার ও শ্রীমতী মায়া রায়ের* ওপরে। আমরা বাংলায় উপযুক্ত নাম খুঁজে না পাওয়ায় ইংরাজী নাম ব্যবহার করেছি। কিন্তু ৺রাজশেখর বসু আমাকে একটি চিঠিতে* লেখেন —ইংরাজী নাম বদলে বাংলা রাখুন। তিনি নিজেই একটি নামকরণ করেছিলেন—প্রগামী বাঙালী সংঘ।

ভূপতিদা যে শুধু আদর্শবাদী বিপ্লবী ছিলেন তাই নয়, তিনি সুরসিক ও সাহিত্যের অনুরাগীপাঠক* ছিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'আমি কোন সাহিত্য পত্রিকা হাতে পেলে আগে তার কবিতাগুলি পড়ে দেখি। কবিতার মান দেখে পত্রিকাটির মান নির্ধারণ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ কবি। এবং রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা উঠলে তিনি সবকিছু ভুলে সে আলোচনাতে ডুবে যেতেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে—(তখন তিনি ১৮ ডোভার লেনে থাকেন) একদিন গেলাম দেখা করতে। বাইরে ঘরেই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন— কে কবি ? এসো। আজকে ভাবছিলাম শুধু এক মহাকবির কথা। সারাদিন ত' তাঁরই কথা মনে হ'চ্ছে।

বসলাম। ভূপতিদা বললেন—রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি ছিলেন। সারাজীবন সাধনা করেছেন আনন্দ রূপের। বলেছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"

আনন্দের অনুভবে সমস্তটা জীবন যিনি তন্ময় হ'য়ে রইলেন, মৃত্যুর আগে তাঁর একি পরিবর্তন। কবি হঠাৎ বলে উঠলেন—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।

তাঁর সমস্ত জীবনের বোধ একমুহূর্তেই বদলে গেল। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে তিনি এক নতুন অনুভব পেলেন। লিখলেন—

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে,

এবার দুঃখের সাধনাতেই জীবনকে জানতে চান কবি। তাই হাতে দুঃখের অর্ঘ্যকেই বয়ে এনেছেন।

১৯৬৬ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর ডোভার লেনের বাসায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললাম,— আপনার বিপ্লবী জীবনের সুরু কি ভাবে হ'ল জানতে চাই।

ভূপতি বাবু একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন —তাঁর বাবা ছিলেন বাঁকুড়া জেলাস্কুলের শিক্ষক। বাঁকুড়া থেকে তিনি কৃষ্ণনগরে যান। সেখানে ৺বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ললিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সকলের যোগাযোগ ঘটে। এই চাটুজ্যে পরিবারের সূত্রেই যতীন মুখার্জী তাঁদের কাছে পরিচিত। তখন যতীন রাজনীতির পথে আসেন নি। কিন্তু তাঁর নির্ভয় চরিত্র ও শক্তিদীপ্ত পৌরুষ সকলকেই মুগ্ধ করতো। যতীন মুখার্জীর সঙ্গে ভূপতিবাবুর যোগাযোগ হ'লো ১৯০৬ সালে। তখন তাঁর বয়েস ষোলো।

ভূপতিবাবু যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এর লেখা জীবনের বিপ্লবী স্মৃতি বইটা আমার হাতে দিয়ে

*১ হিমাদ্রি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইনি ৺কালীপদ গুহরায় মহাশয়ের শিষ্যা।

*২ চিঠিটি ৺সুধীরচন্দ্র সরকারের-পুত্র শ্রীসুব্রত সরকার আমার কাছ থেকে নেন। তারপর আর ফেরত পাইনি।

*৩ একদিন গল্প করতে করতে বললেন- যে 'বিজলী' পত্রিকায় অবনীনাথ রায়'এর ছদ্মনামে 'চাঁটুকা' নামে একটি ব্যঙ্গরচনা লেখেন।

বললেন—এই বইটা পোড়ো। এতে অনেক কিছু জানতে পারবে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। অক্টোবর মাসের এক রবিবারে তাঁর বাসায় গেলাম। এদিন আবার তাঁর অন্যরূপ। চিন্তামগ্ন এক সাধকের ছবি। বললেন—তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে। তোমার সঙ্গে কাব্য আলোচনা করতে পারি। আজকে মনটা অন্য কিছু চাইছেনা। ভগবান তোমায় এনে দিয়েছেন।

ভগবানের নাম উচ্চারণ করেই ভূপতিদা হাসলেন। বললেন—বুদ্ধ বলেছিলেন, মানুষকে সম্যকদৃষ্টি, সম্যক-জ্ঞান ও সম্যকচরিত্র লাভ করতে হবে। কিন্তু মানুষ ভগবান ভগবান করে অস্থির। আসলে কিন্তু ভয় থেকে মানুষ ভগবানকে সৃষ্টি করেছে। তাই ভগবানের প্রথম অক্ষরই 'ভ'। তারপরে ভয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোভ। কবি যতীন্দ্রনাথ তাইত ভগবানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—

ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন
গরু মেরে জুতো দান অপেক্ষা
নহে কভু বেশী পুণ্য।

যতীন সেনগুপ্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই ভগবদ্‌মোহ থেকে মুক্ত হ'তে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর—

কে গাবে নূতন গীতা,
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস
গেরুয়ার বিলাসিতা?

*

১৯১২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। আমার লেখা 'শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন' বইটা তাঁকে দিলাম। ভূপতিদা বললেন—যতীনদাকে শহীদ বললে ঠিক বলা হয় না। বিপ্লবী ত' তিনি ছিলেনই! কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি আর সাধারণ মানুষ ছিলেন না। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তিনি সাধক হ'য়ে গেছেন। সাধক না হ'লে কেউ মৃত্যুকে হাতে নিয়ে এমন ভাবে খেলতে পারেনা।

ভূপতিদার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

---

*ভূপতি মজুমদার—জন্ম ১লা জানুয়ারী ১৮৯১, মৃত্যু—১৯৭৩

সুতপা

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

ওরা দু'জনে কথায় মশগুল হয়ে যায়, চোখের ওপর জেগে ওঠে সুদূরের ধাঁধা অতীত, ছাত্র-জীবনের ফেলে আসা খুঁটিনাটি। কথায় কথায় কথার মোড় ফিরে গভীর আলোচনা কোন বিশেষ বিষয়-বস্তুর কাছে ধরা না দিয়ে কেবল ঘুরে ফিরে বেড়ায়, ওরা যেন নেশায় মেতে ওঠে।

শেষে আনন্দবাবু হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন :

'এবার ত আপনাকে ছাড়তে হয়, নিচে গিয়ে বসার ত সময় হয়ে এল।'

সুনন্দা ঘরে ঢোকে।

'হ্যাঁরে আজ সন্ধ্যায় বেরোবি না বললি? কোথায় কি কিনতে যাবি বলছিলি?'

'নাঃ, আজ আর বেরোব না। আনন্দবাবু এসেছেন, একটু গল্প করি।'

'কেন? বেরোবেন ত চলুন না, আমার হাতে তেমন কিছু কাজ নেই। বেরোবেন মনে করে আমার জন্যে আটকে পড়বেন কেন?'

সুনন্দা ওদের জল-খাবারের আয়োজন করে আর সুতপা তৈরী হবার জন্যে চলে যায়।

সন্ধ্যার আলোয় চৌরঙ্গীর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দু'জনে মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তিগত চিন্তায়, যেখানে এসে ভিড় করেছিল অনেককিছু, কিন্তু কেউ কারও কাছে তা' প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করছিল না।

'সন্ধ্যা বেলায় আপনার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আপনার ক্ষতি করলুম বোধহয়, রুগী এসে ফিরে যাবে।'

'ঠিক উল্টো বললেন, নিজেরই দরকারে বেরোনর কথা, আপনি আসাতে তা' আর হচ্ছিল না। যাই হোক আপনার আসার ফলে একা একা বেরোতে হ'ল না এই যা।'

'কিন্তু আমি না থাকাতে ত এতদিন একা একাই বেরিয়েছেন।' দু'জনেই হেসে ওঠে।

'ওখানে আপনারা বোধহয় দল বেঁধে বেরোতেন?'

'ঠিক তা' না হলেও প্রায় তাই। ওখানে আমাদের গ্রুপ ছাড়া আর যাবই বা কোথায়? হয়ত বলবেন নতুন দেশের নতুন মানুষ দেখে বেড়াব, কিন্তু পড়াশুনো আর কাজকর্মের চাপে তা' আর হয়ে উঠত না। আর যে সব এখান থেকে দেখে গিয়েছি, তা' ভাবতেও দেরী হয় নি।'

'ওখানের শুনেছি বেশ একটা মোহ আছে। সচ্ছল কর্ম-মুখর জীবনে একটা নাকি প্রাণের সাড়া আছে যা এখানে নেই।'

'আছে ঠিকই, আর তার মোহে যে কেউ ডুবে নেই তাও বলি না, তবে কি জানেন; জীবনটাকে যারা শুধু একটা সীমার মধ্যেই পেতে চায় তাদের কাছেই সেটা স্বর্গ। অবশ্য গবেষণা নিয়ে অনেকে রয়েছে, তাদের কথা আলাদা। আমি ত কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, আমাদের দেশের অবস্থা সচ্ছল হ'লে আমরা ঠিক ওই ধরণের জীবনই চাইব কি না।'

'মানে ওদের জীবন-যাত্রার ধরণ আপনার মনঃপূত নয়।'

'কি জানেন. জীবন-যাত্রার ধরণ বললে বলাটা ঠিক হ'ল না, বরং জীবন-দর্শন বললেই যেন কিছুটা ধরা যায়। ওদের জীবন-দর্শনটাই আমার কাছে কেমন গোলমেলে বলে মনে হ'ল। ওরা বাঁচতে জানে, কিন্তু বাঁচার অর্থ বোঝে না।'

'আর আমাদের দেশে?'

'আমরা বাঁচতে এখনও ভাল করে শিখি নি বোধহয়, কিন্তু বাঁচার অর্থটা খুঁজি।'

হেসে ওঠে সুতপা। আনন্দও হেসে ফেলে।

'তবু ভাল আনন্দবাবু যে আপনি বললেন কি, আমরা বাঁচার অর্থ খুঁজতে গিয়ে বাঁচতেই ভুলে গেছি।'

'তা' নয়, এ যা দেখছি, বাঁচতে জানি, কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে···ব্যাপারটা ঠিক···।'

'কিন্তু জীবনের চেয়ে জীবনের অর্থকে বড় করে না দেখে ওরা কি ভুল করেছে? ভাবুন ত' কত সুখে আছে ওরা···।'

'এ ধারণা পাল্টান। কত দুঃখে যে তারা নেই, সেটা ভাল করেই বুঝে এসেছি, সুখের অভিনয়···।'

'না না আমরা যদি জীবনের চেয়ে তার অর্থ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ে থাকি, তবে কি আমরা অন্যায় কাজ করেছি বলেন?'

আনন্দবাবু কি যেন ভাবেন, বলেন, 'আসলে কি জানেন? ও দু'টোই দরকার, জীবনের প্রকাশ আর তার সার্থকতা বা অর্থ যাই বলেন।'

হেসে ওঠে সুতপা, 'এই সব গালভরা কথায় আপনি নিজেই এক সময়ে বিরক্ত হতেন, আজ আবার ওই সব বলছেন কেন?'

'বলছি আপনি খুশী হবেন বলে, আপনি ত এই সবই ভাল বাসেন।'

'নাঃ আর ভাল লাগে না। জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্র-জীবনে যে মাথা ঘামিয়েছিলুম, দেখছি তা' সবই যেন ফাঁকা, আসলে আমরা চলছি যেন খুশী মতই।'

ওরা কথা বলতে বলতে রাস্তার ধারেই মাটির ওপর একটু বসল, হাতে সময় আছে।

'আপনার তা' হলে সে সব ধারণা চলে গেছে?' আনন্দবাবুর প্রশ্ন।

'মনে হয় তাই।'

'কিন্তু তা' হলে আছেন কি নিয়ে? শুধু পেশেন্ট আর প্রেসক্রিপশন্ নিয়ে দিন কাটাবার সময় ত এখনও আসে নি।'

'বাঃ, তাই বলে যা মানতে পারব না তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকব? কিন্তু তা' নয়, আসলে আমি দেখছি আপনার পরিবর্তন। আপনি আগে কিন্তু কোন মীমাংসাই মানতে পারতেন না, সেটা কি ওদেশ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকার জন্যে?'

'মনে হয় যেন তাই। সত্যিই তাই। সেটা আগে বললে হয়ত মানতে পারতুম না, কিন্তু এখন মনে হয় যেন তাই। মানুষের মনের মধ্যে সুপ্ত কৌতূহলটা থাকে, সেটাই বোধহয় চট্ করে তাকে মীমাংসায় আসতে দেয় না; অন্ততঃ আমার পক্ষে বোধহয় একথাটা খাটে।'

সুতপা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বুঝতে পারে আনন্দর মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে আর তারই ফলে এখন তার হয়েছে আমূল পরিবর্তন। এতক্ষণ বোঝা যায় নি, এইবার বোঝা গেল তার সুতপার বিশ্লেষণের নির্ভুলতার স্বীকৃতিতে। নিজেকে কখনও যে ধরা দিতে চায়নি, নিজের মনের কোন দুর্বলতাকে যে কখনও প্রকাশ হতে দেয়নি, সুতপাকে শ্রদ্ধা, সম্মান দিলেও যে তার ধারণাকে কখনও নির্ভুল বলে মেনে নেয় নি, সে আজ কেমন সহজ ভাবেই অপরের কাছে নিজের সমালোচনাকে সত্য বলে মেনে নিল? ব্যাপারটা এমনিতে অতি তুচ্ছ বলে মনে হলেও সুতপা বেশ বুঝতে পারে আনন্দর মনোজগতে কোন নাটকের যবনিকা-পাত ঘটেছে। কিংবা হয়ত এটা সুতপারই মনের ভুল। বয়স, পরিবেশ এসবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তন কি অসম্ভব?

'আচ্ছা আনন্দবাবু, আপনি ওদেশে যাওয়ার কিছু-দিনের মধ্যেই ওদেশের রুচির সঙ্গে এদেশের রুচির তুলনা করে কোন অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন নি?'

'ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার আর সময় কোথায়? কেবল কাজ আর পড়া নিয়ে ওসব ভাবার সময় কতটুকু? তবে যা জানতে চাইছেন তা' ঠিকই, অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়া আর তাকে মানিয়ে নেওয়া এক আছেই।'

'আপনার বাড়ীর জন্যে মন কেমন করত?' হাসে. সুতপা।

'হ্যাঁ তা' বইকি। বাড়ীর জন্যেও বটে, আর কি·

জানেন? পরিচিত পরিবেশের যে মাধুর্য্যটা এখানে বোঝা যায় না, সেটা অন্য পরিবেশে গেলেই বেশ বোঝা যায়।'

'আপনার চিঠি যে ক'টা মাঝে মাঝে দিতেন, তাতে কিন্তু আমি ওদেশের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আশা করতুম।'

'বলছেন বটে, কিন্তু ফেনিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে বেয়াড়ারকম কিছু যদি লিখে ফেলি সে ভয় ছিল, কারণ —জানি এ-চিঠি সেন্সরড্ হবেই।' দু'জনেই হাসে কিন্তু নিজের নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দু'জনেই সচেতন হয়ে সংযত হয়ে যায়।

'কিন্তু আপনার চিঠি ও সেন্সরড্ হবার ভয় ছিলনা…'

সুতপা দাঁড়িয়ে পড়ে, হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়েই বলে, 'চলুন, দোকানের দিকে চলতে চলতেই গল্প করা যাক্, দোকানে দোকানে ঘুরতে ঘুরতে হয়ত বেশী দেরী হয়ে যাবে।'

ওরা চলতে শুরু করে দেয়।

আনন্দবাবু এখন প্রায়ই আসেন। সুতপা বাড়ী না থাকলে অনুপমবাবু জমিয়ে রাখেন। বেশ ভালই লাগে ছেলেটিকে, তবে বেশী কিছু আশা করেন না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন পাশ্চাত্যের যে জীবনধারা একদিন, আর একদিন কেন, আজও আমাদের আদর্শ, তার মধ্যে সুখশান্তি আছে ত?'

হাসে আনন্দ, 'তা' যা বলেছেন। আমাদের আদর্শই বটে, যেভাবে আমরা অনুকরণ করি…'

'কিন্তু উপায় কি? ভারতীয় জীবনধারার নজির ত' দেখি শুধু টানাটানির সংসারেই।

'অবশ্য দেখুন, আধুনিকতা বলতে আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণই বুঝি, কিন্তু আধুনিকতার প্রয়োজনকে ত অস্বীকার করতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই। আধুনিকতাকে অস্বীকার করা ত মৃত্যু। নতুন আবিষ্কারকে, নতুন চিন্তাধারাকে, নতুন পদ্ধতিকে সময়মত নিতেই হবে, সব কিছুই ত'প্রায় রোজই পাল্টাচ্ছে যে বাবা, এ আমরা মানতে না চাইলেও কিছুদিন বাদেই বুঝতে পারি।'

'হাঁ, আর সেইজন্যেই দেখুন তাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে আমাদের আধুনিক হতে হয়।'

'কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের যে আধুনিকতা এর ভিত্তিটা কি? ভাল লাগছে বলে? না দরকার আছে বলে?'

'তা' বটে।'

দু'জনেই হাসে।

অনুবাবু একটু গম্ভীর হয়ে যান—'বলতে পার আনন্দ, আধুনিকতা প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত না রুচিভিত্তিক?'

আনন্দ মনোযোগ দিয়ে অনুপমবাবুর কথাগুলো শুনতে থাকে। বলে, 'আপনি কিন্তু বেশ একটা ভাল পয়েন্টের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন।'

'জান, একদিন আমি আধুনিকতার ওপর চটা ছিলুম। সেদিক দিয়ে আমি ঠাকুমার আমলের মতটাকেই যেন বেশী পছন্দ করতুম। তারপর আমার সাংসারিক-জীবনে এমন একটা অঘটন ঘটল যে আমার চিন্তা, রুচি, আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকেই যেন একেবারে গুঁড়িয়ে দিল।'

'সে কি? তারপর?' আনন্দ স্তম্ভিত হয়ে শোনে, বোঝার চেষ্টা করে কোন্ ব্যাপারের ইঙ্গিত উনি দিচ্ছেন, কিন্তু ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না।

'তারপর আমি যেন হয়ে উঠতে লাগলুম অতি-আধুনিক, অবশ্য মনে মনে, মানে মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ জেগে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বুঝতে পারলুম আমি চিরন্তন গোঁড়ামিকে আশ্রয় করতে গিয়ে একটা সাজা পেয়েছি। ভাগ্যবান্ আমি, এমন সাজার পুরস্কার কম লোকের ভাগ্যেই হয়।'

আনন্দ চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে নামিয়ে রেখে বলে 'ব্যাপারটা বেজায় ধোঁয়াটে লাগছে কাকাবাবু, একটু যদি খুলে বলেন। এমন সুন্দর একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেছে আপনার জীবনে এ যেন ভাবাই যায় না।'

'বললে ঠিক বুঝবে না, আমার অনুভূতি ও আমার মধ্যেই আছে, তাকে প্রকাশ করলে তোমার কাছে নিছক সামান্য ব্যাপার বলে মনে হবে।' অনুপমবাবু একটু স্বাভাবিক হন, 'আসলে কি জান বাপু, যুগের দিকে নজর রেখে নিজের প্রয়োজন ঠিক করতে হয়। চিরাচরিত পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে একদিন দেখবে ঠকেছ। আবার যদি সময় থাকতে দায়-পড়ে কোন নতুন পথ ধরে চলতে হয় ত সেখানে আছে বিপুল সম্ভাবনা।'

'কিন্তু এসব বোঝায় কে? সবাই ত দেখি সেই পুরোণ পথ ধরেই চলেছে।'

'আসলে হয়েছে তাই। আমরা নতুনকে নিতে ভয় পাই, স্বাধীন চিন্তা আমাদের কাছে যেন একটা পাগলামী।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যতক্ষণ আমাদের আগের চিন্তায় বাধা না পড়ছে। এই হয়েছে ব্যাপার। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সেই পুরোণ পথের পথিক, কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবেই আমরা শুধু প্রগতির কথা বলি। আসল কথা কি জানেন কাকাবাবু, আমাদের জাতটার ভেতর এমন একটা চিরন্তণের ধারণা রয়ে গেছে যেটা ......'

'আহাহা, ভুল ক'রোনা, ওটা কোনদিনই পাল্টাবে না; যদি পাল্টায়, জানবে তখন সকলে দরকার ছেড়ে কাঁচর পেছনে ছুটবে। এখন তবু একটা পিছুটান আছে, তখন একেবারেই থাকবে না।'

'এই চিরন্তনের ধারণাটাই আমার কাছে কেমন খট্‌কা লাগে কাকাবাবু। যাই বলুন, ওদেশের তবু একটা সুবিধে বিজ্ঞানকেই ওরা সত্য বলে জেনে নিয়ে যা করার তাই করছে। আর আমাদের হয়েছে কি, যা করার তাই করছি বটে, কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের সঙ্গে গোঁজার সংস্কারকে জড়িয়ে ফেলে সব গুলিয়ে মরছি।' আনন্দ জোরে হেসে ওঠে, তাই দেখে অনুপমবাবু স্মিত হাসি নিয়েই কি যেন ভাবতে থাকেন।

রবিবারের বেলা গড়িয়ে যায়। সুতপার আজ থাকার কথা, কারেই কে ডেকে নিয়ে গেছে বলে এখনও আনন্দর সঙ্গে দেখা হয় নি। অনুপমবাবু বেরোবেন একটু বন্ধুদের আড্ডায়, আনন্দও উঠি উঠি করছে দেখে সুনন্দা আসে, বসিয়ে রাখে। বলে, 'বোসনা বাবা আর একটু, ও এক্ষুণি আসবে, এলে আর দেখা করে যাবে না?'

'তবে আর একটু চা দিন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা' দিচ্ছি। উনি রান্নাঘরে চলে যান, ওদিকে সদর দরজার কাছ থেকে অনুপমবাবুর গলা—'ওগো শুনছ? শোন একবার'...সুনন্দা রান্নাঘরে চলে গেছে, এইবার ওঁর গলা চড়বে বুঝে আনন্দই যেন অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে বলে, 'আজ্ঞে ডেকে দেবে নাকি?'

'ও হোহো; তুমিই এসেছ, যাক্‌গে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও ত বাবা, এদিকে আবার কেউ থাকে না, কে কখন ঢুকে পড়বে।' উনি পাঞ্জাবিটা চাড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে সুনন্দা ওকে খুঁজছে দেখে বললে, 'দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েছিলুম, কাকাবাবু বেরিয়ে গেলেন।'

সুনন্দা অপ্রস্তুত হয়, 'দেখছ, আমাকে ডাকবে তা' কি না তোমায় বললে...'

হোহো করে হেসে ওঠে আনন্দ, 'উনি আপনাকেই ডাকছিলেন, কিন্তু ভাবলুম দেখি এই দুরূহ কাজটা আমিই পারি কি না।'

'আসলে হয়েছে, কি' একটু লজ্জা পায় সুনন্দা, 'রাম আর লক্ষ্মণ দু'টোর কেউ নেই, এমন মুশকিল হয়েছে, একটা গেছে দেশে, আর একটা কাঁদনের ছুটি নিয়ে কার বাড়ী গেছে।'

আনন্দ তাকের ওপরের বইগুলো একে একে দেখতে থাকে, আর সুনন্দা বলে চলে চাকর না থাকার নানা অসুবিধার নানা কথা, তার বড় বোনের কথা, তার ভায়ের কথা, আর নানা আত্মীয়ের সুখদুঃখের কথা। আনন্দ কিছু শোনে, কিছুটা অন্যমনস্ক হয়; আর বই-গুলো দেখতে দেখতে অনেক কথাই ওর মনে পড়ে।

এক সময়ে সেও ছিল বইয়ের পোকা, সেটা ডাক্তারিতে ঢোকার আগে। স্কুল-জীবনের শেষ দিকটায় সে বই-ছাড়া আর কিছু জানত না। তার ফলে সেই সময়েই তার এমন কতকগুলো বিষয় পড়া হয়ে গিয়েছিল যা ও দেখেছে পরবর্তী-জীবনের সম-বয়সীদের হয় নি, আর বোধহয়—হবেও না। জীবনে একটা সময় প্রায় সবায়েরই আসে যখন কৌতূহলী মন কেমন যেন জ্ঞান-পিপাসু হয়ে পড়ে। সেই সময়টার সদ্ব্যবহার করতে পারলে কিন্তু লাভ আছে।

সুনন্দা যে কখন 'আসছি' বলে রান্নাঘরে চলে গেছে ওর খেয়াল ছিল না, চমক ভাঙল দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দে। ও গুটি গুটি দরজাটা খুলতে গেল। সুতপাকে একটু অবাক্ করে দেওয়ার কৌতুক মনের মধ্যে বোধহয় অনুভব করছিল। কিন্তু দরজা খুলেই দেখে এক ভদ্রলোক, বেশ ফিট্‌ফাট্ চেহারা, পরনে দামী স্যুট, চোখে দামী ফ্রেমের চশমা, চেহারার মধ্যে সম্ভ্রান্ত-ভাবটা সব দিক দিয়েই বেশ পরিস্ফুট বলে বয়সটা আন্দাজ করা গেল না। দরজার গোড়ায় ছোট্ট ফিয়াট্ গাড়িটি দাঁড়িয়ে, নিজেই চালিয়ে এনেছেন তা' আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সুতপার বদলে অচেনা মুখ দেখে একটু নিরাশ হ'ল আনন্দ, কিন্তু ভদ্রলোকটি একগাল হেসে ওঁকে দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন। আনন্দ বিস্ময়ের ভাবটা চেপে ওকে প্রতি-নমস্কার করে বলল—'আসুন'।

'মানে এই আপনার কাছে একটা দরকারে এসে-ছিলুম। বম্বে থেকে বোধহয় চিঠিতে সব খবরই পেয়েছেন।' ভদ্রলোকটি বেশ লাজুক প্রকৃতির, কথা বার্তার ভেতর কেমন একটা অপ্রতিভতার ছায়া।

'আনন্দ জানে বম্বে মানেই সুতপার বড়মাসীর জায়গা, বহুবার সুতপার মুখে শুনেছে। সুতরাং ও ধরেই নিল এ বম্বেবাসীটি নিশ্চয়ই সুতপার মেসোমশাই, আর ভদ্রলোকটিও ধরে নিলেন এই বোধহয় গৃহস্বামী। তাই ভদ্রলোকটি যখন বলেন —অনেক ভেবেচিন্তে কলকাতায় এসে আপনার সঙ্গে দেখা করাই ঠিক করলুম, তাই……

তখন আনন্দ বলে—'আমার সঙ্গে দেখা করে কি করবেন?' একটু অবাক্ হয়েই বলে।

'ওই আপনি থাকলেই সব হয়ে যাবে' ভদ্রলোক বলেন।

আনন্দ বলে— আমি বাড়ীর কেউ নয়, আর তা' ছাড়া আমি পারিবারিক ব্যাপারে মাথা ঘামাই না, সে আমার নিজেরই হোক আর পরেরই হোক।'

'আরে সে কি কথা? আপনি বাড়ীর কেউ নয় বললে কি লোকে শুনবে? আর বিশেষ করে এসব ব্যাপারে আপনাকে না হলে চলবেই বা কি করে বলুন?' ওরা কথা বলতে বলতে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল সুনন্দা ওদের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে ওদের কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসা দেখছে। আনন্দ কি বলার জন্যে সুনন্দার দিকে তাকাল, কিন্তু তার ফ্যাল্‌ফেলে অবাক্ চাউনি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাইল, ভদ্রলোকটি আনন্দর মুখে একটা বিস্ময়ের রেখা দেখে চাইল সুনন্দার দিকে। সুনন্দা ভদ্রলোকটিকে দেখে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল, এর আগে কোথাও এঁকে দেখেছে কি না। একটি বিস্ময়ের আবহাওয়া বারান্দাটাকে এমন ছেয়ে ফেলল যে কে কি করবে বুঝতে না পেরে সবাই যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে রইল কিছুক্ষণ। আনন্দ সুনন্দাকে কি একটা বলতে গিয়ে পাশে তাকিয়ে দেখে, কখন সুতপা এসে ওদের এই বিমূঢ়ভাব দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভদ্রলোকটি বেজায় রকম নার্ভাস্ হয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, মানে, মানে, আমি মিস্টার রায়ের সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলুম, বরদা রায়-চৌধুরী আমায় পাঠিয়েছেন।'

'ও হোহো, আমি ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি এর মেসোমশাই, ও সুতপাকে দেখায়।

'আমি ভেবেছিলুম আপনি বুঝি মিস্টার রায়।'

মা আর মেয়ে দু'জনে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকে পড়ে, আর ওরা দু'জনে পরস্পরের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করে, দরজা খোলাই থাকে।

'মানে, মানে, ব্যাপার কি জানেন ? আমার আগেই উচিত ছিল আপনি মিস্টার রায় কিনা জিজ্ঞেস করা।'

আনন্দ অনেক কষ্টে বিরক্তি চেপে মুখে হাসি এনে বলে—'আপনি বম্বের কথা তুলতেই এদের মেসো-মশায়ের কথা ভেবে নিয়েছিলুম!'

সুতপা এসে ওদের কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মুখ দেখে বোঝা যায় হাসিচাপার একটা কষ্টকর পরিশ্রম সে সেরে এসেছে।

'আপনি কি মেসোমশাই-এর কাছ থেকে আসছেন ?' জিজ্ঞেস করে সুতপা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভদ্রলোক যেন একটু কৃতার্থ হন।

'বাবার সঙ্গে কি কোন দরকারী কথা আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে একটা বিশেষ জরুরী কথা বলতে পারেন আর আজই সেরে ফেলতে হবে, কেননা আমি আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে আবার বাইরে যাব, সেখান থেকেই বম্বে ফিরব।'

'বেশ ত, একটু বসুন, বাবা বোধহয় এক্ষুণি ফিরবেন। আসুন আমার সঙ্গে।' বলে লোকটিকে সোজা নিজের ডিস্পেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে বসাল।

ফিরে আসতেই আনন্দবাবু বলেন, 'এ্যাঃ কি কেলেঙ্কারী বলুন ত ?'

'কেলেঙ্কারী ত' আপনিই করলেন ?'

ও একটু খিঁচিয়ে ওঠার অভিনয় করে। 'আর আমি কি করব ? আপনাদের বাড়ীতে লোক এল, হয়ত আত্মীয়, কুটুম, গাড়ী হাঁকিয়ে হাজির, আর আমি কোথাকার কে তাকে জিজ্ঞেস করব, কে মশাই আপনি ? কোত্থেকে আসছেন ? জানেন একবার আমাদের বাড়ীতে কি হয়েছিল ? আমার এক বন্ধু জোচ্চোর ভেবে পিসীমার জামাইকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় নি ? আর তাই নিয়ে আবার আমাদের ক্ষমা চেয়ে আসা ! ওর মধ্যে আমি নেই।

'বাঃ, তাই বলে একটা অচেনা লোককে সোজাসুজি আমার মেশোমশাই বলেই ধরে নিলেন ?' হেসে ফেলে সুতপা।

চায়ের কাপ হাতে সুনন্দা এসে দাঁড়াল, আর এক হাত দিয়ে তখনও মুখে কাপড় চাপা দেওয়া।

আনন্দ চায়ের কাপটা হাত থেকে নিতে নিতে বলে —'আপনিও হাসছেন, কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে…'

ওর কথা শেষ হয় না, আসেন অনুপমবাবু। সুতপাকে জিজ্ঞেস করেন 'হ্যাঁরে, বাইরে গাড়ী দেখছিলুম কেউ এসেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে খুঁজছেন, ডিস্পেন্সারিতে বসিয়েছি।'

'তাড়াতাড়ি চলে যান অনুপমবাবু,' আনন্দও চায়ের কাপ শেষ করে বিদায় নেয়।

একটু পরেই সুতপার ডাক পড়ে ওর বাবার কাছে। ও গিয়ে দাঁড়াতেই অনুপমবাবু আলাপ করিয়ে দেন— 'এই আমার মেয়ে সুতপা, ডাক্তারি পাস করে এখানেই প্র্যাকটিস করছে, তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ কর সুতপা, ইনি গুণী লোক, তোমার মেশোমশায়ের বিশেষ পরিচিত। ইনি এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে লণ্ডনে পড়াশুনা করেছেন, তার ওপর হোল-ওয়ার্লড প্রায় ঘুরেছেন। তোমরা কথা বল, আমি আসছি, দেখি একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি।'

অনুপমবাবু ভেতরে এসে দেখেন, সুনন্দা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পরস্পরের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়ের পর, গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি। সুনন্দা জিজ্ঞাসুভাবে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বামীর মুখোমুখি বসে পড়ে, কিন্তু চট্ করে কেউ মুখ খোলার প্রয়োজন বোধ করে না।

'তা' হলে দিদি যা বলেছিল করেছে।'

'হ্যাঁ তা' বটে, তোমার দিদির কথার দাম আছে আমি আগেও বলেছি, কিন্তু…'

'আবার কিন্তু কেন ?'

'আমি খুব একটা ভরসা রাখি না, আর ইয়েটাও…'

'থাম ত তুমি। যাই, আমি একটু চা জলখাবারের ব্যবস্থা করি।'

চমকে ওঠেন অনুপমবাবু—'ওহোহো, দেখেছ

একেবারে ভুলে গেছি, ও বোধহয় বেশীক্ষণ বসবে না। তাড়াতাড়ি কর।'

একা একা বসে বসে অনেক কথাই ভাবেন অনুপমবাবু। ছেলেটি প্রতিষ্ঠিত নিঃসন্দেহে, আর পরিচিত মহল থেকেই পাঠিয়েছে। কিন্তু···এই কিন্তুটা যেন কিছুতেই যেতে চায় না। হাজার হলেও আদরের মেয়ে, মনে আঘাত দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই। ও ব্যাপারটা তাঁর জগতে অজানা হলেও, আনন্দর এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসা-যাওয়াটা একেবারে উড়িয়ে দিতে যেন তাঁর সাহস হয় না। সুনন্দার কাছে কথাটা বলি বলি করেও যেন বলতে পারছেন না, অথচ সুনন্দাও খোলাখুলি-ভাবে তার সম্বন্ধে ত কই কিছু বলেও না।······

দু'টো মিষ্টি প্লেটে করে আর এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে সুনন্দা ওঘরের দিকে যাচ্ছে দেখে অনুপমবাবু পিছু পিছু চলে আসেন এঘরে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান, ভীষণ কিন্তু কিন্তু হয়ে পড়েন। হাসতে হাসতে সুতপা বলে, 'জান মা, ভবেন বাবু রাশিয়া, আমেরিকা থেকে শুরু করে সমস্ত ইউরোপ ঘুরেছেন, আবার এখন জাপান যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন।'

'বাঃ, তা' এ কি আপনাদের অফিস থেকেই যেতে হয় ?' সুনন্দা জিজ্ঞেস করে।

ভবেনবাবু বলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের ফার্মের ম্যানেজমেন্টেই যেতে হয়।'

'প্রচুর খরচ করে ত আপনাদের ফার্ম,' অনুপমবাবু বলেন, 'একেবারে ওয়ার্লড্ ক্যাপচার করার মত···'

'তা যা বলেছেন,' হাসেন ভবেনবাবু, 'এদের এস্টাবলিশমেন্ট বিরাট, তাই এসব খরচা মানে এদের কাছে নমিন্যাল।'

'বরদাবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কি চাকুরির-সূত্রেই ?' অনুপমবাবু জিজ্ঞেস করেন।

'আজ্ঞে, উনি আমার বাবার বিশেষ বন্ধু, অবশ্য বন্ধুত্বটা ওঁদের কাজকর্মের ব্যাপারেই। বরদাবাবুর অফিসের সঙ্গে ব্যবসায়ের খাতিরে বাবার সঙ্গে ওঁর পরিচয়। সেই সূত্রে এর ওর বাড়ীতে যাতায়াত অনেক দিন থেকেই। মাসীমা আমাদের বাড়ীতে অনেকবার এসেছেন। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়েই ভবেনবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন—'আচ্ছা তা'হলে আজকের মত আসি।'

'আচ্ছা; কিন্তু কলকাতায় এলেটেলে এখানে আসবেন,' অনুপমবাবু বলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' বইকি, তা' বইকি।' উনি দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান, পেছনে পেছনে ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে ওঁকে এগিয়ে দিতে যায়। সুতপা ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে খাটে গা-এলিয়ে দেয়। মনের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে নতুন চিন্তার প্লাবন।

মানুষ যখন পথ চলতে চলতে দেখতে পায়, তার চলার পথ বিভিন্নমুখী হয়ে বিভিন্নদিকে চলে গেছে, তখন সে থমকে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু নিজের বাঞ্ছিত-পথকে খুঁজে নিতে গিয়ে কি পরিত্যাজ্য অন্য পথগুলোর ওপর তার করুণা জাগে ? বোধহয় জাগে, বোধহয় জাগে না। যে স্বপ্ন, যে ধারণা আজ তার মনে গেঁথে রয়েছে, সুতপা ভাবে, তার ওপর কি যবনিকা পড়ছে ? না তার ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছে ? কল্পলোকের দিকে মনের রাশ আলগা হ'তে চাইছে, কিন্তু তাকে জোর করে টেনে রেখে দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করতে লাগল। এবার নিয়তি তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে ভাবতে গিয়ে যেন ভাবতে পারল না। ভদ্রলোকটিকে এখানে পাঠানর আসল উদ্দেশ্যটা কি বড়মাসীর, সেটা ওর কাছে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু বাবা-মার মতিগতিই যেন ওর কাছে অস্পষ্ট বলে মনে হল। কিন্তু যখন ও তলিয়ে ভাবতে চাইল যে ওর নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি, দেখল সেখানেও স্পষ্ট কোন কিছুর প্রকাশ ও ওর অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরতে পারে নি। সেখানেও একটা জিজ্ঞাসাই যেন ও বহন করে বেড়াচ্ছে। এইবার বোধহয় জিজ্ঞাসার শেষ করতে হবে।

কিন্তু কি ক'রে হবে ? তার অবচেতন মনের বাসনা-কেই যে বিধাতা পুরুষ, তার জীবনে ফুটিয়ে তুলবেন

এ কথা ভাবার সাহস ও হারিয়ে ফেলল নাকি? নিজেকে আর সামলাতে না পেরে নিঃশব্দে বসে রইল। চোখের জল আজ কেন কে জানে যেন বাধা মানতে চাইছে না। কিসের দুঃখ? কিসের ব্যথা? ও নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না, কেবল মনে হচ্ছে একটা বেদনা যেন ভেতর থেকে মুচড়ে মুচড়ে উঠে চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর চোখের জল থামলে, কলঘরে গিয়ে মুখ-চোখ ধুয়ে স্থির হয়ে চেয়ারে বসতেই চোখের সামনে আবার ফুটে উঠল সেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার রাত আর সেই ছবির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নতুন-রূপের সুতপা। আস্তে আস্তে মনের দ্বন্দ্ব কেটে গিয়ে নিজের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেল তার পথ কোথায়।

মা'র গলার আওয়াজে ওর চমক ভাঙ্গল। নীচে থেকে খেতে ডাকছে।

আনন্দবাবুর সরকারী হাসপাতালে মোটা-মাইনের চাকরি পাওয়ার খবরটা উনি শুধু হাতে কেন দিতে এসেছিলেন, সেই তাঁর তীব্র সমালোচনা করছিল সুতপা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ময়দানে বেড়াতে বেড়াতে।

'দেখুন, ও সামান্য মিষ্টি হাতে নিয়ে গিয়ে মানুষকে আনন্দ দেওয়াটা আমার মনঃপূত নয়।'

'তা'হলে অসামান্য কিছু আস্তমিষ্টি নিয়ে গেলেই পারতেন, তাতে আমার অন্ততঃ কোন আপত্তি ছিল না, এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি কিন্তু আপনার, অবশ্য জানি না ইচ্ছাকৃত কি-না।'

'বেশ, তবে এক কাজ করুন, একদিন আপনারা ফ্যামিলিসুদ্ধ চলুন আমার সঙ্গে, একটা ভাল রেস্তরাঁয় ঢুকে আশা মিটিয়ে খাওয়া যাক্। আমার কিন্তু এটাই সমীচীন বলে মনে হয়।'

ভাবনায় পড়ে সুতপা। 'ওরা কি রাজী হবে? মা আবার হোটেলে মোটেলে যেতে চাইবে কি না, কিংবা গেলেও কিছু খাবে কি না······'

'আরে সে আমি ঠিক নিয়ে যাব, আমার ওসবে অভিজ্ঞতা আছে। ঠাকুমাকে যদি মালা জপাতে জপাতে গ্রাণ্ড হোটেলে নিয়ে যেতে পেরে থাকি ত—অবশ্য শুধু দেখাতে।'

'আজ আপনাকে কিন্তু আর একটু সকাল সকাল আশা করেছিলুম,' সুতপা বলে।

'অন্যায় কিছু করেন নি, আসলে একটা ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।'

'কার ঠিকানা?'

'লণ্ডনের একজনের। তাকে আমার চাকরির খবরটা দিলুম।'

'যাক্, শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবে। ভালই করেছেন।'

কেমন যেন মুখটা কঠিন হয়ে পড়ে আনন্দর, সেটা চাপার চেষ্টাও যেন করে না।

'নাঃ যারা খুশী হবে তাদের আগেই দিয়েছি। আজকে যাকে দিলুম সে হবে না, আর সেই জন্যেই দিলুম।'

'মানে?' সুতপা একটু অবাক্ হয়। আনন্দর এই মুখ এর আগে একবার দেখে কি যেন একটা সন্দেহ করেছিল।

'একটা ডায়োগ্‌নোসিস্-এর ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছিলুম, নইলে লোকটা বেঘোরে মারা যেত। জানেন, একটা ইংরেজ-মেয়ে যে এমন স্টুপিড হয় আমার ধারণা ছিল না।'

'তা' ঝগড়া করলেন কেন? বয়স কত তার?' সুতপার ম্লানমুখেও একটু মুচ্‌কে হাসি খেলে।

শুকনো হাসি হাসে আনন্দ—'আপনি যা অনুমান করছেন তা' একেবারে মিথ্যে নয়, আমরা সত্যিই একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলুম। ও ছিল আমাদের সিনিয়র প্রফেসরের মেয়ে, এই আমাদেরই বয়সী। কিন্তু এই ব্যাপারে ওর ওই হামবড়াভাব দেখে আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি। শেষে করল কি জানেন? আমি যাতে ওখানে ভাল চান্স না পেতে পারি তার চেষ্টা করত তলে তলে। ভেবেছিল বুঝি, আমি থাকব বলেই গেছি।'

কি যেন ভাবে সুতপা, মনটা যেন কি বলি বলি

করে, শেষে বলেই ফেলে 'যত হাম্বড়াইই করুক, তার ওপর আপনার কোন দুর্ব্বলতা ছিল না ?'

আনন্দ যেন একটু অবাক্ হয়—'দুর্ব্বলতা ? আমার ?' তারপর হো হো করে হেসে ওঠে, 'কি জানি, তা,' ত বলতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই ছিল' সুতপার কথায় যেন একটা প্রত্যয়ের ভাব ফুটে ওঠে।

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন মনে হচ্ছে, আমার কোন গোপন চিঠি আপনার হাতে এসেছে আর তাতে আমার মনের কথাটা এইমাত্র পড়ে ফেললেন।'

হেসে ফেলে সুতপা, 'ব্যাপারটা কিন্তু তাই দাঁড়িয়ে গেল। আপনি যে তাকে আঘাত দেবার জন্যে পরিশ্রম করে ঠিকানা খুঁজে চিঠি লিখলেন এটা কিন্তু আপনার দুর্ব্বলতারই লক্ষণ।'

মুহূর্ত্ত-মাত্র স্তম্ভিত হয়েই সে-ভাব কাটিয়ে বলে আনন্দ —'আপনার কথা যদি সত্যি হয় ত বলব তার সঙ্গে প্রথম দিকে যে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এটা তারই প্রতিক্রিয়া।'

'তা' হলেও জানবেন,' একটু উদাসী স্বর যেন বেরিয়েছে সুতপার গলা থেকে, 'প্রথম জীবনের প্রথম ঘনিষ্ঠতা বড্ড বেশী গভীরে গিয়ে দাগ কাটে।'

'কি আর করা যাবে। একটা আধটা ওরকম দাগ না থাকলে পরেরগুলোকে ঠিক ম্যানেজ করা যায় না। আর তা'ছাড়া ওটাকে প্রথম বলেই বা……'

দু'জনেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় চৌরঙ্গীর ফুটপাথ দিয়ে। সন্ধ্যা এখনও হয়নি তবে রোদের আভাটা বড় বাড়ীগুলোর ওপর থেকে মিলিয়ে গেছে। ওরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। ফুরফুরে হাওয়ায় মনের ভেতরটা কেমন যেন হাল্কা হয়ে যায় সুতপার, অনেক কথা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় মনের ভেতর থেকে। ইচ্ছে করে অনর্গল কথা বলে যায় আনন্দর সঙ্গে, তার কোন মানে থাকুক না থাকুক, আনন্দ শুনুক বা না শুনুক। ভেতর থেকে যেন ওর চঞ্চল কিশোরী-জীবনটা কেন কে জানে একটু একটু করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একটা বেঞ্চিতে ওরা বসল। সুতপা চাইল আনন্দর দিকে, কিন্তু আনন্দ তখন এ্যাংলো-স্যাক্সন রক্তের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওর মতামত ব্যক্ত করছে, সুতপার সেই মুহূর্ত্তের চাউনি ও ধরতে পারল না। না পারুক, তাতে ওর কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তবুও মনে হয়, মাঝে মাঝে পুরুষের খেলোয়াড়ী মনোভাবের কথা, যে মনোভাব পায় নতুন নতুন খেলায় নতুন নতুন আনন্দ। ইনি আবার খেলায় মেতেছেন কি না কে জানে। তবু সুতপা ভাবে, আজ সে ত আর ছেলেমানুষটি নয়, তাই ধরা সে দিয়েছে সত্যিই, কিন্তু সে শুধু ধরা দেওয়ার আনন্দেই, তার বেশী কিছু নয়। খেলায় মাততে চায় মাতুক, খেলার শেষে তাকে নিছক খেলা বলে ভুলে যেতে সুতপার কষ্ট হবে না। সামনে সুদূর-প্রসারী মাঠ আর পেছনে যেখানে কলকোলাহল, এরই মাঝে যেমন আজ তারা বসেছে নিমেষের জন্যে, এসব যদি নিছক মিথ্যাও হয়ে যায়, যেন তার জন্যে সুতপার কোন দুর্ভাবনা নেই। এমন মাদক এক নেশা ওকে পেয়ে বসেছে।

জানি জানি সব জানি তোমার কুহকিনীরূপ, তোমার মন-ভোলান মায়া, আর তোমার ঘর-ছাড়ান আহ্বান, ও যেন কার উদ্দেশে ভাবে, পরক্ষণে ভাবতে চায় কে সে, তার স্বরূপ কি ? মনে হয় বোধহয় ওরই নাম প্রেম।

'আপনি কাল কি আসবেন ?' এক সময়ে জিজ্ঞেস করে সুতপা।

'কেন, কাল কোন কাজ আছে নাকি ?'

'কাল যদি আসেন ত বাড়ীতে বসেই গল্প করব, কাল এই সময়ে একজনের আসার কথা আছে।'

'তবে কাল যাব না।'

'না না আসবেন, যদি সে না আসে ত' আমার বোরোন হবে না।'

'আর যদি আসে ত আমায় বের করে দেবেন।'

হেসে ফেলে সুতপা,—'যান আপনার সঙ্গে কথা বলব না, যদি সে আসে ত' আপনি মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'সে হয় না, সারাটা বিকেল বাড়ীর মধ্যে আমার কাটবে না। চলুন ওঠা যাক।'

ওরা উঠে পড়ে। সুতপা কি যেন ভাবতে থাকে। আনন্দ বলে—'জানেন বিকেল বেলাটা আমার ছেলেবেলা থেকে বেশ প্রিয়-সময়, তাই এখনও কাজের শেষে এখান ওখান করে সন্ধ্যে উৎরে তবে বাড়ী ফিরি।'

'ও হরি, তবে রোজ আসেন না কেন?'

'সর্ব্বনাশ' মাঝে মাঝে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে হাজিরা না দিলে……এঃ, আপনি দেখছি এখনও জগৎটাকে চেনেন নি।'

'আর আমার চেনার বাসনাও নেই, আপনি প্রাণ ভরে চিনুন।'

'উহুঃ, আপনাকেও চিনতে হবে; যে জগতে বসে বাকী জীবনটা কাটাবেন তাকে যত আগে আর যত বেশী করে চিনবেন ততই ভাল।'

'কথাটা ভালই বলেছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় বেশী চিনলে বেশী কষ্ট।'

'কি জানি।' বলে আনন্দ।

একটা খালি ট্যাক্সিকে হাতছানি দিতে এসে দাঁড়াল, ওরা উঠে বসে।

'চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বাড়ীর দরজার কাছে এসে ওরা ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসে ওরা।

আনন্দ বলে—'আমাদের সেই অমল চৌধুরীকে মনে আছে আপনার?'

'বা রে মনে না থাকার কি আছে? তা'ছাড়া দেখাও ত' হয়েছিল,' একটু ভাবে সুতপা, 'প্রায় মাস-খানেক আগে। কেন, তার কথা হঠাৎ।'

'মানে, আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। ওর ত' বিয়ে লেগে গেল, খুব শীগ্‌গির।'

'তাই নাকি? তা' আপনাকেও বলে নি আমার কথা বললে না?'

'নাঃ তো আর বললে কই?' আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার অভিনয় করে।

সুতপা হেসে ওঠে—'তা' বাড়ীর লোক আপনার দুঃখ বুঝবে না? বলেন কি?'

'নাঃ, আমার বাড়ীর লোক আমার বিয়ে নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছে না।'

'সে কি? তবে কার বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?' একটু জিজ্ঞাসু হবার ভান করে সুতপা।

'আর বলেন কেন, ওরা মাথা ঘামাচ্ছে আপনার সেবারের বিয়েটা ভেঙ্গে গিয়েছিল কেন তাই নিয়ে।'

সুতপা চট্ করে বাড়ীর ভেতর চলে আসে। আনন্দ পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে। ক্রমশঃ

ওঁরা পাঁচজন

সুশীতল দত্ত

পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই সহরটা—এক কল্লোলিনী নদী একপাশ দিয়ে চলে গেছে—অপর পাড়ে সবুজ মাঠের মৌরসীপাট্টা দূর-দিগন্ত পর্যান্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। উত্তরে দক্ষিণে চলে গেছে একটা খাল—কে জানে, কী কারণে তার নাম হয়েছে নটী, খাল, সহরের প্রয়োজনে সেটা আজও বইছে শান্তমনে সহরটার বুক চিরে। সহরের পূর্বদিকেই পাহাড় আর সেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে স্তরে স্তরে পত্তন হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের চাবাগানগুলি। এই সহরের এক বাসিন্দা নৃসিংহ সেনগুপ্ত সরকারী দপ্তরে চাকুরী করে বিত্ত করেছেন প্রচুর। সহরের লোকেরা এঁর বাড়ীকে বলে পাঞ্জাঞ্জী বাড়ী।

এই বাড়ীর একটি শ্যামাতন্বী মেয়ে নাম গীতা—অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে—ওকে একবার দেখলে মুখ ফিরিয়ে আবার দেখতে ইচ্ছা করে। তাকে নিয়ে নানা আলোচনা হয় যুবকদের মধ্যে, ঈর্ষা করে কুমারী মেয়েদেরদল মুখে মুখে। ওর এক দাদা সুভোজিত আমার কলেজের সহপাঠী। জেলার সদরে দুজনেই কলেজে সিট না পেয়ে চলে গিয়েছিলাম অন্য এক জেলা সদরে—বাস করতাম একই হোষ্টেলের একই কামরায়।

একবার পূজার ছুটিতে আমি গিয়েছিলাম সুভোজিতদের বাড়ীতে—বিরাট বাড়ী কাকা কাকীমা ভাই বোনদের মিলে বিরাট এক পরিবার। এক মহোৎসব সকাল সন্ধ্যা লেগেই আছে সবাই মিলে মিশে আনন্দের মধ্যে বাস করছেন। সেই আনন্দ আরামের মধ্যে সকলের স্নেহপ্রীতি ভালবাসার মধ্যে আমার পূজার দিনগুলি ভালই গেল একেবারে নির্বিবাদে ও নিরুদ্বেগে কেটে গেলেই ভাল ছিল, কিন্তু কাটলো না—যখন হোষ্টেলে ফিরে এলাম তখন মনে হলো কী যেন ফেলে এসেছি—যতই জিনিষটাকে খুঁজি সেটাকে আর বের করতে পারছি না। হারানো জিনিষটি পেতে মন যেন আরো উতলা হয়ে ওঠে। আমার ভাবগতিক দেখে সুভোজিত জিজ্ঞেস করলো—কী হলো রে? আমি সঠিক উত্তর দিতে পারিনি সেদিন।

দিনকয়েক বাদে অচেনা হস্তরেখার একখানা খাম এলো আমার নামে। খামটা তাড়াতাড়ি ছিড়ে ফেললাম এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছোট একখানা চিরকুট তাতে শুধু লেখা "আপনার একটা জিনিষ এখানে ফেলে গেছেন হয়তো বা ভুলে, কখনও এখানে এলে ফেরৎ দিব, নাতো আসছে বারে দাদার হাতে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সে জিনিষটা কি তা সেও লেখেনি আমার মনেও এখন আসছে না—অথচ চিঠিটা পেয়েই আমার মনে হলো হারিয়ে যাওয়া জিনিষটা যেন আমি পেয়ে গেছি। সুভোজিত জিজ্ঞেস করলো জিনিসটা পেয়েছি কিনা—বল্লুম পেয়েছি—কিন্তু কি পেয়েছি, তা গোপন রাখলাম। সুভোজিত বুদ্ধিমান সেও আর পীড়াপিড়ী করলো না তা জানতে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে—সুভোজিৎকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে গিয়েছি—সেখানে তার খুব ভাল লাগে নি। কারণ বাড়ীতে একা মা আর সবেধন নীলমণি আমি—ত্রিভুবনে আর কেহ নেই ভাগ বসাতে আমার বিত্তে আর আনন্দ ও আরামে, ইচ্ছাকেও লাগাম টানিতে হয় না আর বাকী সকলের প্রয়োজনে। এতদিন ছিলাম ভাল কিন্তু এবারে সুভোজিত এসে ধাক্কা দিল এমন জোরে এতদিনের ধ্যানধারণার মূল যেন উপড়ে পড়তে চাইছে। সুভোজিত বললে "শুধু একা খাবার জন্যে আর স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার জন্যে মানুষ হয়ে জন্মাবার কোন প্রয়োজন ছিল না—হিংসা পশুবৃত্তি, হিংসা আর ঈর্ষাকে পরিহার

করেই মানুষ হয়েছে—সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ভাগ করে খাওয়াটাই সমাজের ইচ্ছা, বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সুষ্ঠু সমন্বয় প্রতিষ্ঠার শিক্ষাই শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা, এ পথই মঙ্গলের পথ—কল্যাণের পথ, প্রকৃতির ইহাই ইচ্ছা—এ ইচ্ছায়ই তাঁর সৃষ্টিতে প্রকটমান। সবাই এক মানব-জাতি। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিভেদ—যে ফারাক তা কৃত্রিম, মানুষের সৃষ্টি, কারণ ধর্ম নিজ অন্তরের বিশ্বাস। একই ভাষা উভয়ের মুখে, একই সুখ দুঃখের সমভোগী মন সকলের—তবু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক এদের মধ্যে এনেছে বিভাগ, ইন্ধন জুগিয়েছে কলহের, এর নাম আত্মকলহ যার পরিণাম আত্মধ্বংস। আর আজ যে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান দেখছ তাও গড়েছে মানুষ—নিজেদের কুবুদ্ধির তাড়নায় এদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য—নিজেদের আরামের জন্য শোষণ করছে দুর্বল মানুষদের, ধর্মের নামে ওরা কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দেয়—কিন্তু দান করে—দুর্বল মানুষকে আরো দুর্বল করার জন্য। এরাই গড়ে তুলেছে ভিক্ষুকের দল ভিক্ষা দিয়ে দিয়ে ধর্মের নামে স্বার্থপূরণের উলঙ্গ ইচ্ছায়। নিজেদের গড়া ন্যায় বিচারের আছিলায় এরা সমাজকে করছে শোষণ —এরা সমাজের শত্রু। সমাজের এই মিথ্যা ব্যবধান, এই স্বার্থান্ধ মানসিকতার অবসান না হলে দেশে বিপর্যয় ঘটবে—তোমার আমার সকলের বিত্ত এরা একদিন কেড়ে নেবে সকল অধিকার। কবিগুরুর "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" এর কথা দেশের শিক্ষিত লোক পড়েছেন —বাহবা দিয়েছেন কিন্তু হৃদয় দিয়ে তাকে নিজ কর্মের মধ্যে প্রকাশিত করবার চেষ্টা করেন নি। এই অপমানিত শোষিত জনগণ একদিন স্বাধীকারের উদগ্র চেতনায় জেগে উঠবে—তখন আর কিছু থাকবে না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর নিপীড়িত জনসাধারণের চিত্ত মাতানো রাজনীতির আগ্রাবী কথামালায় বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফাঁকা আশ্বাসে এদের চিরদিন ভুলিয়ে রাখা যাবে না— এরা জাগবেই—দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন আর মানুষরূপী শকুন গৃধিনী শ্রেষ্ঠীদের লোভের আগুনে পুড়ে ওরা খাঁটি মানুষরূপে একদিন শক্তিমান হয়ে দাঁড়াবে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আর এদের রুদ্র রোষের অনলে পুড়ে ছাই হবে সকল অন্যায়, অবিচার। আজকেরদিনের এই রাজনৈতিক গণিকাবৃত্তির কারবার আর বেশীদিন চলবে না।" ওর কথা শুনে এর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মাল—প্রীতি ভালবাসার স্থান দখল করল শ্রদ্ধা— কিন্তু যুগযুগান্তের কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারলাম না তবু এইটুকু আজ বুঝলাম যে সুভোজিতদের মত উদার মনের মানুষরাই পারে সংস্কারমুক্ত হয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করতে।

বাড়ী থেকে আমরা চলে গেলাম শিলং শহরে সুভোজিতের মাসীমার বাড়ী—যেমন প্রকৃতির অঢেল সৌন্দর্য্যভরা এই শহর তেমনি স্নেহ মমতার ভরা মায়ার এক প্রতিমূর্তি হলেন সুভোজিতের মাসীমা—যেখানে থাকবার কথা ছিল এক সপ্তাহ, রয়ে গেলাম প্রায় এক-মাস। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে যেতাম আমি, সুভোজিত ও তার মাসতুতো বোন দীপ্তি—সেই মনোরম শিলং শহরের ইউকালিপটাসের গন্ধভরা শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যাবেলায়।

একদিন অপরাহ্নে বাড়ীতে দীপ্তির এক বান্ধবীসহ আমরা চারজন বসে কি যেন একটা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। শ্রীমতী দীপ্তি বসেছিল আমার দিকে মুখটা আড়াল করে—সেই ছিল সেদিনের মুখ্য বক্তা। মুগ্ধচিত্তে বক্তৃতা শুনতে শুনতে একবার বলে উঠলাম, "বক্তার মুখ না দেখলে বক্তব্য সঠিক বুঝা যায় না।" এর উত্তরে দীপ্তি বলে উঠল "বক্তব্য বুঝতে বক্তার মুখ দেখতে হয় না—তাকে বুঝতে হয় আপন অনুভূতি দিয়ে অন্তরের সম্পদ দিয়ে। ওর এই রুচিশীল তিরস্কারের ভাষাটা ছিল স্নিগ্ধ, আমি একটু লজ্জা অনুভব করলাম— দীপ্তির এই দীপ্ত আত্মজ্ঞানের সচেতনতার জন্য ওকে সম্মান না দেখিয়ে থাকতে পারলাম না। এর পর আর যে দুই তিন দিন ছিলাম ওর সঙ্গে সাধারন কথাবার্তা হলেও

আসর জমিয়ে আর কথাবার্তা হলো না। সেখানের তল্পী বেঁধে আমি আর সুভোজিত চলে এলাম কলকাতায়।

বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় একদিন দুজনে বসে আছি নিজেদের বিছানায়। আমরা কথা বলছি—বাইরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুভোজিত বলে উঠল "তুই নাজমাবেগমকে দেখেছিস ওর কথা কি তোর কাছে বলেছি ?" আমি এই প্রথম শুনলাম নাজমাবেগমের কথা অবাক হয়ে আমি বললাম না তো হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বললে "আচ্ছা দীপ্তিকে তোর কেমন লাগলো" আমি বললাম "সুন্দর" সে একটু হেসে বলল "আর রীতাকে ?" আমি বললাম। "খুব ভাল"। ও জিজ্ঞেস করল "দুজনের মধ্যে কে ভালো—আমি একথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা ওকে নাজমাবেগমের কথা জিজ্ঞেস করতেই সে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। আমাদের আলোচনাটাও হঠাৎ মাঝপথে সেখানেই বন্ধ হল।

এর পরদিনই একখানা চিঠি পেলাম বহু স্ট্যাম্প তার গায়ে আঁকা—ঠিকানা বদল হয়ে হয়ে চিঠির গা হয়েছে বিশ্রী—লেখার অধিকারিনী ও সঠিক ধরতে পারছি না-- অধীর আগ্রহে খুলে ফেললাম খামটা, লিখেছেন শ্রীমতী দীপ্তি দাশগুপ্তা, সুভোজিতের মাসতুতো বোন শিলং থেকে। লিখেছেন "চিঠিটা লিখব কিনা ভাবছি বেশ কয়েকদিন ধরে—সঠিক উত্তর পাবো কিনা জানি না তবু লিখছি কিছু জানবো বলে ' এই চিঠির উত্তর পেলেই লিখব—কারণ সঠিক ঠিকানাটা এখনও জানি না।"

চিঠির উত্তর দিই দিচ্ছি করে দিন সাতেক কেটে গেল। কিন্তু এরমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, সুভোজিত ভারত সরকারের একটা বড় চাকুরী পেয়ে সিমলা চলে গেছে। আমি এখানে একা তাই দীপ্তির এই চিঠিটার স্পর্শ আমাকে একটু সতেজ করে তুলল। সেদিনই সন্ধ্যায় উত্তর দিলাম। লিখলাম--"আপনার চিঠির জন্ত ধন্তবাদ। আমি আপনার কথা শুনতে উদগ্রীব হয়ে বসে আছি। সুভোজিত চলে গেছে সিমলায়, সে সেখানেই থাকবে।" ইতি—শোভন।

দিনকয়েক বাদে আমারও একটা চাকুরী হয়ে গেল বিদেশী এক ফার্মে—ফ্রি বাড়ী ও গাড়ীসহ। আমি আগের আস্তানা ছেড়ে চলে এসেছি প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটের এক রম্য বাড়ীতে। ইতিমধ্যে দীপ্তির চিঠির উত্তরটা পুরোনো বাসার ঠিকানায় ঘুরে নূতন এই বাড়ীতে এসে পৌঁচেছে আজই সন্ধ্যায়। দীপ্তি লিখেছে—"বার বারই মনে হচ্ছে না লেখাই ভাল কিন্তু মনের ভিতর কে যেন তাড়া দিচ্ছে লিখতে। সেদিন আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল—আপনার দৃষ্টি মেয়েদের বাইরের দিকেই, অন্তর জানবার প্রয়োজন বোধটুকু আপনার নেই—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—না, বোধহয় বড় অন্যায় করে ফেলেছি আপনার উপর। কারণ যাকে জানি না তার সবটুকুই জেনে ফেলেছি মনে করা পাপ। যাক্ তবু আমাদের মেয়েলি-মনের ঔৎসুক্যটুকুর তাড়নায় এই পত্র লিখছি। আশা করছি এর উত্তর পাবো। তারপর আমি আমার বক্তব্য বলবার চেষ্টা করবো।" ইতি—দীপ্তি।

এই চিঠির কি উত্তর দেব ভাবছি, সে যেটুকু জানতে চায় তার সবটুকুই আস্তে আস্তে বের করে নেবে, কারণ এ ব্যাপারে মেয়েদের উদ্দামপ্রবণতা খুবই প্রবল। ওরা হার মানবার ভাব দেখাবে কিন্তু হার মানবে না কিছুতেই অথচ পুরুষদের অন্তরের এ দৌহিক প্রেরণার দিকটার সঠিক সন্ধান ওরা ঠিকই ধরে ফেলবে। যখনই কলম হাতে ধরছি তখনই আবার দেখি যে আমার অবচেতন মনের মধ্যে রীতা এসে উঁকি মারছে—তাই কলমটা তার সরল গতি হারিয়ে ফেলে সর্পিল গতিতে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে। তাই দীপ্তিকে তার চিঠির উত্তরে লিখলাম "আপনার চিঠিখানা পেয়েছি, তাকে বুঝবার চেষ্টা করছি কিন্তু কি লিখলে আপনার চিঠির উত্তর হবে তা ঠিক ধরতে পারছি না। যাক্ আমরা এখানে ভাল আছি। সুভোজিতও ভাল আছে বলে জানিয়েছে। রীতার চিঠির উত্তর দিয়েছি। প্রীতি রইল। ইতি শোভন।

অফিসের কাজ কর্মে খুবই ব্যস্ত আছি, বাড়ী ফিরে অলস সময়ে একা একা বসে বই পড়ি, মাঝে মাঝে ক্লাবে যাই চাকুরীর স্বার্থে এমনি করে দিনগুলি অ না বিরহের মৃদু দহনের মধ্যে চলে যাচ্ছে আর যাতনার হেতু জানিনা বলে বেদনাটুকু মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। দেশের বাড়ী থেকে মায়ের চিঠি এসেছে কলকাতায় বাড়ী করতে আর নিজে দেখেশুনে বিয়ে করতে। তিনি যাবার আগে দেখে যেতে চান আমার সুখের সংসার—এতেই মায়েদের পরম তৃপ্তি এই ভবলীলায়।

মাকে তাঁর চিঠির উত্তর দিইনি এখনও, আজ আবার এসেছে সুভোজিতের চিঠি— সে আসছে কলকাতায় বদলী হয়ে। এইদিনই আবার চিঠি এল, লিখছে দীপ্তি। খামখানা খুলেই রেখে দিলাম বালিশের নিচে—রাত্রে শোবার সময় পড়ব বলে। রাত্রে সেই পত্র খুলে দেখলাম সে লিখছে—"আপনার চিঠি পেয়ে মনে হল, খেয়ালটা যেন অন্ধকারেই পর্য্যবসিত হল। আমি যা জানতে চাইতাম তা আর পরিপূর্ণ করা গেল না আপনার চিঠি পেয়ে তা মনের মধ্যেই আবার লুকিয়ে গেল, আপাততঃ লুকিয়েই থাক সেখানে তা হলে আবার কোনদিন হয়তো স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে পারবে সঠিক মুহূর্তে। যাক আমি ও আমার বান্ধবী নাজমা অক্সফোর্ডে পড়তে যাচ্ছি আসছে সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষী। সুভোজিতদা এর মধ্যে কলকাতা আসছেন দেখা হবে। আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন; আচ্ছা আপনার মা কেমন আছেন। রীতাদের বাড়ীতে হারিয়ে যাওয়া জিনিষটা সঙ্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো।"

আমি ভাবছি রীতাদের বাড়ীতে হারিয়ে যাওয়া জিনিষটার কথা দীপ্তি জানলো কি করে। কে তাকে বললো বা কী সে জিনিস, আর নাজমার সঙ্গে সুভোজিতের কি সে সম্পর্ক, তবে কি এরা বিলেত যাচ্ছে বলেই সুভোজিত আসছে কলকাতায়? দীপ্তি পরিচয় দিয়েছে তার বান্ধবী বলে, এর বেশী কিছু বলেনি কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে সম্পর্কটা আরো নৈকট্যের বাইরের অন্তরের। যাক মাকেই বা কি লিখবো তাই ভাবছি, ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরে উঠেই কর্মব্যস্ততা অফিসে যেতে হবে—অফিসে গিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে যাই। সকলকে ভুলে যাই এমনকি মার কথা পর্য্যন্ত। অথচ মাকে অনেক কথা বলার আছে—অনেক কথা আছে মাকে জানাবার। পাপ পুণ্য সব কথা শুধুমাত্র মায়ের কাছেই বলা যায়—আর আজ পর্য্যন্ত আমার সকল কথা মাকে বলেছি ও সকল পাপ পুণ্য কাজের কথা তাঁকে জানিয়েছি। কারণ মায়েরা অন্তর্যামিনী। সন্তানের মনের কথা মায়েরা জানেন ভাল করে। সন্তানের মনের গভীরে মায়ের সতর্ক সস্নেহ দৃষ্টি আনাগোনা করছে নিরন্তর স্নেহের ঝরণা বইছে তার শরীরের উপর।—ছিঃ ছিঃ কী নক্কারজনক আমার চাকুরী জীবন। আজ নিজের উপরও ঘৃণা ধরে গেছে। তাই অফিসে বসেই মাকে চিঠি লিখলাম।

"মা, তোমার চিঠি পেয়েছি—তোমার ইচ্ছা হলে আমি কলকাতায় বাড়ী করতে পারি তবে আমি অন্যের তৈরী করা বাড়ী কিনতে চাই না আমি তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে বাড়ী বানাতে চাই আমার পছন্দমত। আর সাজাতে চাই আমার মনের মত করে আমার ঘর। বিয়ের কথা লিখেছ আমি নিজে একা পছন্দ করতে পারব না। এই বৃহৎ সমাজের মাঝে, আধুনিক মেকি সৌন্দর্য্য আর প্রাণহীন সমাজের মাঝে। এবার গিয়ে একটি মেয়ের কথা তোমাকে বলব। প্রণাম গ্রহণ করো ও আশীর্ব্বাদ করো যেন জীবন সফল ও সার্থক হয়।" ইতি—তোমার স্নেহের শোভন।

অফিস থেকে বাড়ী এসে পেলাম মাসীমার পত্র অর্থাৎ সুভোজিতের মায়ের পত্র, তিনি লিখেছেন,

"শ্রীমতী রীতার একটা বিয়ের প্রস্তাব প্রায় পাকা হয়ে আছে এখন শুধু সুভোজিতের মতের অপেক্ষা রীতা সানন্দে সম্মতি দিচ্ছে না, তাই সুভোজিতের আসার অপেক্ষায় সব মুলতবী হয়ে আছে। ওর সঙ্গে

তুমি এলে খুবই খুসী হব। আগষ্টের শেষাশেষী সুভোজিত আসবে, কারণ দীপ্তি ও নাজমা সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে বিলেত যাচ্ছে।"

দেখতে দেখতে আগষ্ট মাসও শেষ হতে চলল, সুভোজিতও এসে গেছে, বাড়ী নিয়েছে লাভলক ষ্ট্রীটের মিঃ জাষ্টিস মুখার্জির বাড়ীর সামনের বাড়ীর পাশের বাড়ীটা। দিন সাতেক পর দীপ্তি নাজমাকে নিয়ে কলকাতায় এল। পনরদিন বাদে ওদের বিদেশ যাত্রার টিকিট কেনা হয়ে গেছে। ওরা খুবই ব্যস্ত কেনাকাটা নিয়ে। বিদেশে নিয়ে যাবে স্বদেশের কিছু প্রিয় সামগ্রী। এরই মধ্যে সুভোজিতের বাড়ীতে একটা নৈশ ভোজের আয়োজন করছেন শ্রীমতী নাজমাবেগম। সেই ভোজসভায় কথাবার্তায় আমার ধারণা হল যে সুভোজিত আর নাজমার এই পরিচয়টা ঘন মধুর সম্পর্কে আচরেই পর্য্যবসিত হবে—কিন্তু সংশয় আর ঘৃণা আমার মনকে তখনকার মত ঘিরে ধরেছে আমারই যুগযুগান্তের সংস্কার বোধে। নৈশভোজের পরও কিছু হাসি ঠাট্টা শেষে বাড়ীতে ফিরে এলাম। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে দীপ্তি কোন কথাই বলেনি সেদিন, শুধু আসার সময় একটু স্মিত হাসি হেসে বলেছিল "আবার দেখা হবে"

তার পাঁচ দিন পরে দীপ্তি চলে গেল লণ্ডনে আর শ্রীমতী নাজমা রয়ে গেলেন এখানেই। একাজটায় আমার সন্দেহ বা ধারণা আরো ঘনীভূত হল এদের দুজনের সম্পর্কে কিন্তু বাস্তবে কিছু দেখছি না বলে মুখ বুজে রয়েছি। সুভোজিত বল্লে তার সঙ্গে শিলং যেতে হবে কারণ রীতার বিয়ের কথাটা এবার পাকা করতে হবে যাতে ওর বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ছুটি পেলে যাব বলে আমি চলে এলাম কিন্তু নিউইয়রএ ছুটির দরখাস্ত পাঠাব কি না ভাবছি—কারণ আমি শিলং যেতে চাইছি না। আর রীতার বিয়েটা কোন অজানা ভদ্রলোকের সঙ্গে হয়ে যায় সেটাও যেন আমার মন চাইছে না। অথচ রীতা যে আমার মন কেড়ে নিয়েছে তেমনও নয়—তবু আজ মনে হচ্ছে হারানো জিনিষটা যেন আরো বেশী করে হারিয়ে ফেলার সময় এসেছে। আমার যাওয়া হল না, সুভোজিত চলে গেল শিলং। দিন সাতেক পর চিঠি পেলাম রীতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সকলের অনুরোধ সত্বেও রীতার বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি কেন জানি না যাবার ইচ্ছাটাও প্রবল ছিল না অথচ রীতার বিয়ে হচ্ছে, আমারই পিসীমার দেবরের ছেলের সঙ্গে। ওকে আমি চিনি ছোটবেলা থেকেই। বিয়ের পরই রীতা আমাকে চিঠি দিয়েছে ওর বিয়েতে যাইনি বলে অনুযোগ করেছে আর লিখেছে "আপনার আরটুইন বাদামী রঙএর স্বর্ণা কলমটা আমি সেদিন দুষ্টুমি করে লুকিয়ে নিয়ে রেখেছিলাম। আপনি যাওয়ার সময় খেয়াল করে চাননি আর আমিও সেদিন ইচ্ছা করেই আপনাকে ফেরৎ দিইনি ফলে কাজটা প্রায় চুরির মতই হলো—আজ ভাবছি কী অন্যায়ই না সেদিন করেছি। আজ তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আশীর্ব্বাদ করুন, শোভনদা আমরা যেন সুখী হতে পারি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি—রীতা।

রীতার চিঠি পেয়ে আমার হারানো স্বর্ণা কলমটার কথা মনে পড়ল কীই বা তার দাম তবু সে ছিল আমার আদরের, সে ছিল আমার কাজের। ওদিয়ে আমি কত আজে বাজে লিখেছি, তাই মনটা কিছু খারাপ হলো, রীতার প্রতি কিছু রাগও কিন্তু তার ঐ স্বীকারোক্তির জন্য মনে খুবই আনন্দ হলো পরক্ষণেই মনটাকে তাজা করে রীতাকে লিখলাম,—

কল্যাণীয়াসু ;—

আদরের বোন রীতা—,

তোমার পত্র পেয়ে অন্তরে বাইরে খুসী হয়েছি। তোমরা সুখী হও সংসার সুন্দর হউক তোমারই অন্তরের সৌরভে। "তোমরা চিরসুন্দর হয়ে থাক মধুর জীবন মাঝে।" ইতি—শোভনদা।

চিঠিখানাকে ডাকে ফেলতে কিরণের হাতে দিয়ে একটা প্রশান্ত আনন্দ আজ অনুভব করলাম এমন শান্ত স্নিগ্ধ অনুভূতি বহুদিন উপলব্ধি করিনি।

সুভোজিত ফিরে এসেছে কলকাতায়। ওর সঙ্গে এক

সন্ধ্যায় দেখা করতে গেছি, প্রকাণ্ড বাড়ীতে সে একা। রীতার বিয়ের কথা উঠল, কথা প্রসঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করলো "হারে অনিমেশ তোর আত্মীয় একথা কোনদিন বলিস নি কেন?" তাহলে তুই আমার কুটুম্ব হলি দেখছি তোর সঙ্গে এখন একত্রে পাত পাতা যায় কিনা হয় আমাকে উদ্দেশ্য করে নয়তো তোকে উপলক্ষ করে। —কী বলিস" আমি ভাবছি তার কথার ইঙ্গিতে আমার ভাবনা দেখে সে একটু মুচকি হাসি হাসল, আর বলল এতে কোন হেঁয়ালী নেই, সরল কথা অর্থাৎ আমি আর নজমা শীঘ্রই পরিণয়সূত্রে একে অপরকে বাঁধছি। বাবা মা কাকা এরা সবাই আসছেন এখানে, এলেই বিয়ের দিন ঠিক হবে।" আমার চোখে মুখে একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল, সুভোজিত সেটাকে লক্ষ্য করে বলল "এটা তোমার জন্মজন্মান্তরের সংস্কার, তাই তোমার মনে জাগছে, পুরাতন চিন্তাধারাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মনকেও করে নিতে হয় বিজ্ঞানভিত্তিক করে নূতন চোখে দেখতে হবে জগৎকে। ভাবতে হবে নূতন করে কারণ যুগ পরিবর্তনে মানুষ বদলায় বদলায় মন তার রুচি নূতন রূপ নেয় সমাজ জীবন কারণ সে গতিশীল। পরমা প্রকৃতির ইচ্ছায় সে বিবর্তনশীল। আদি থেকে সে চলছে সামনের দিকে—সেদিকেই জয়যাত্রা বা সার্থক গতিপথ।" আর ধর্ম? ও তো নিজ অন্তরের অনুভূতির কথা—সে হল মনের মধ্যে মঙ্গলের সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করার অসীম আনন্দানুভূতি আর যিনি মঙ্গল তিনি অখণ্ড তিনি সুন্দর তিনি সত্য আর তিনি শিব—তিনি সকল তর্কের অতীত তিনি প্রেমময় তিনিই রসময়। বাইরের কারু সঙ্গে ওর বিরোধ নেই।" আমি হতবাক হয়ে সুভোজিতের কথা শুনছি আর ভাবছি এই বিদ্রোহীর অন্তর দৃষ্টির কথা। কতক্ষণ এমনভাবে কেটেছিল জানিনা রাত হয়েছে বাড়ী ফিরে এসেছি। বাড়ী এসে দেখছি দীপ্তির একখানা পত্র পড়ে আছে আমার টেবিলের উপর। লিখছে "বিদেশে এসে স্বদেশকে ভালবাসতে শিখলাম আজ। আজ মনে পড়ছে নূতন জীবন সন্ধানের তাগিদে বাইরে এসে যেন অন্তরের সব জিনিষকেই হারিয়ে ফেলেছি, তাই নিজেকে আজ একান্তভাবেই একা মনে হচ্ছে। এখানের কোর্স শেষ করেই দেশে ফিরে যাব। আচ্ছা আপনি কি আমার সান্নিধ্য কামনা করেন। পত্রের উত্তরে জানতে ইচ্ছা করছি—তারপর বেছে নেব জীবনের গতিপথ। ভাল আছি একথা বলতে পারছি না, কি সে খারাপ তাও ঠিক জানাতে পারছি না, আজ এখানেই শেষ করছি।"—দীপ্তি।

কি লিখব এর উত্তর ঠিক মনে আসছে না অথচ উত্তর দেওয়ার তাগিদটা আমাকে বেত মারছে লেখার জন্য। তাই লিখলাম, কোর্সটা শেষ করে চলে এস। আচ্ছা, নাজমার সঙ্গে মনে হয় সুভোজিতের বিয়ে হচ্ছে তোমার কি ধারণা তা জানতে ইচ্ছে করে, মাঝে মাঝে চিঠি দিও, আজ এখানেই ইতি।—

চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়েই ভাবলাম কই দীপ্তির কথার জবাব তো দিলাম না অথচ যা লিখতে চাইছি তা আর এযাত্রা লেখা হল না।

দিনকয়েক বাদে সুভোজিতের বিয়ে হয়ে গেছে নাজমার সঙ্গে। বহু গণ্যমান্য ও সমাজপতিদের উপ-স্থিতিতে। আমিও সেখানে দেখলাম রীতাকেও অনিমেশকে। বাসরঘরে কোন এক মুহূর্তে শুধু আমি নাজমা ও সুভোজিত বসে কথা বলছি। মেয়েদের দল তখনও এঘরে এসে আসন পাতেন নি—সেই সুযোগে আমি জিজ্ঞেস করলাম "বিয়েটা হল কোন শাস্ত্রমতে?" সুভোজিত হাসল, উত্তর দিল নাজমাবো মানবিক শাস্ত্রমতে। আমি আর অগ্রসর হলাম না বুঝলাম ওরা দুজন সত্যই মানব-তারধর্মে বিশ্বাসী। আর এদের পরবর্তীরাই হবেন খাঁটি ভারতীয়। আনন্দ ও আহ্লাদ সেরে আমি এদের কল্যাণ কামনা করে আর শুভেচ্ছা জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরেই দেখি দীপ্তির চিঠি "কই আমার চিঠির জবাব তো নেই তোমার চিঠিতে—উত্তর এড়িয়ে এড়িয়ে কয়দিন চলবে বলতো? আচ্ছা, সুভোজিতদার বিয়ে আশা করি নাজমার সঙ্গে হয়ে গেছে—বা কি মজা, খুবই ভাল হয়েছে দুজনের এই মিলন। কি বল?

—আমার আগের চিঠির উত্তর চাই—সঙ্গে এইটার অবশ্য দুটারই একসঙ্গে হলেও চলবে। আজ খুবই তাড়াতাড়িতে লিখছি, পরীক্ষা এসে গেছে, খুব পড়তে হচ্ছে, শীতেও কষ্ট হচ্ছে—শিলংএর শীতের এখানের শীতের সঙ্গে তুলনা হয় না—এখানের শীত যেন নেউলের কামড় আর শিলংএর শীত যেন বীতার সেই পোষা বিড়ালের আদুরে আঁচড় কাটা। এখানেই শেষ করছি—ইতি দীপ্তি।

দীপ্তির চিঠি পেয়ে ভাবছি তাকে উত্তরে কি লিখি, কারণ এবার এড়াতে পারব না অথচ সহজ সরল কথাটাও কলমে আসছে না। কি যেন অজানা লোকের কাছে লজ্জার ভয় এসে সহজ গতি পথের যাত্রাকে গলা টিপে ধরেছে—তাকে বিপথগামী করে দিচ্ছে এই হৃদয়হীন সমাজের ভয়। সব ভয় ভাবনা লজ্জা ঝেড়ে ফেলে চিঠির উত্তর লিখতে গিয়ে ঠিক লেখা হল না এই মিথ্যা মেকী সমাজের ভয়ে— লিখলাম "তোমার চিঠি পেয়েছি ওদের বিয়ে হয়ে গেছে খুবই আনন্দের কথা, বিশেষ করে কাজটা যখন হয়েছে বিপ্লবিক। গতানুগতিক ব্যবস্থার বাইরে বিচরণ করাই বিপ্লবের কাজ আর রুচিশীল অগ্রগমণই হল আধুনিকতা। একাজে গরীবেরা বাহবা দেয় সানন্দে তাকে গ্রহণ করে আর গেল গেল বলে প্রাচীনেরা ভ্রু কুঁচকিয়ে রব তুলে। অথচ মজা এই যে কিছুই ফেলা যায় না এই বিরাট সমাজে, সময়ের গর্ভে শুধু বিলীন হয়ে যায় পুরাতন-নূতনকে স্থান করে দেবার জন্য জগৎ সমাজ সংসার সবই থাকছে প্রাচীনকে ঘিরে আর নবীনকে। সাদরে গ্রহণ করে এ দুয়ের সমন্বয়েই সমাজ এগিয়ে চলে সামনের দিকে সে দৃষ্টিই তার সত্য দৃষ্টি। যাক পরীক্ষার পরই তুমি আসছ শুনে খুসী হয়েছি। আজ এখানেই শেষ করছি; প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। ইতি—শোভনদা।

চিঠিখানা ডাকে ছেড়ে দিয়ে ভাবছি—কি করবো এখন—মায়ের শরীর ভাল নয়, মাকে দেখতে যেতে হবে গ্রামের বাড়ীতে অথচ দীপ্তি চলে আসছে এরই মধ্যে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে কিছুই ঠিক করতে পারছি না, এদিকে লজ্জায় সুভোজিতের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারছি না। এই দুটানার মধ্যে পড়ে অগত্যা মাকে দেখতে গেলাম। মা আমার মৃত্যুপথযাত্রী আমাকে দেখে প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন "এসেছ বাবা শোভন!" মায়ের এমন মিষ্টিমধুর হাসি দেখিনি বহুদিন—আজ মনে হচ্ছে মায়ের এই হাসির মধ্যে যেন অজস্র স্নেহ ঝরে পড়ছে আমার মাথার উপর—আর সেই স্নেহ-করুণার সাগরের মধ্যে আমি এক চিরশিশু হয়ে বসে আছি মায়ের কোলের উপর, আমাকে ঘিরে রেখেছে মায়ের স্নেহ।

কতক্ষণ কেটে গেছে এমনি করে খেয়াল ছিল না—মা আস্তে আস্তে বললেন আমার যাওয়ার সময় এসেছে আমাকে বিদায় দাও তোমরা সবকিছু বুঝে নাও যা এতদিন তোমারই জন্যে আগলে রেখেছি। আমার জীবনের সব সুখ আহ্লাদ সবই পূরণ হয়েছে শোভন—কিন্তু আমার সব সাধের সেরা সাধ...মায়ের কথা আর শেষ হল না আমার মা যাত্রা করলেন আনন্দলোকে। আমার কোন কথা আর মাকে বলা হল না—একটা বুক ফেঁড়া কান্নায় আমি ভেঙে পড়লাম মায়ের চরণতলে—কি করবো, কি হবে এরপর এমনি ভাবনায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। হঠাৎ মনে হল আমার পিঠের উপর কে যেন হাত রেখেছে, মুখ তুলে দেখি আমার পাশে সজল নয়নে দাঁড়িয়ে আছে সুভোজিত আর তারই পাশে মুখে আঁচল দিয়ে সিক্ত চোখে চেয়ে আছে নাজমাবৌ। এই শোকে আমি মুহ্যমান—এদের এখানে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম এরা এল কি করে—আমি এদের মুখের দিকে চাইতেই সুভোজিত বলে উঠল, কথা পরে হবে চল এবার সৎকারের ব্যবস্থা করে আসি।

• • • • •

শ্রাদ্ধশান্তি সেরে বাড়ীর সবকিছু গুছিয়ে রেখে আমি সুভোজিতের সঙ্গে কলকাতা চলে এসেছি। ওরা কয়েক দিন থেকে আমাকে একটু শান্ত করে চলে এসেছে ওদের বাড়ীতে। একটা নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘিরে ধরেছে—মা আর নেই একথা ভাবতেও পারছি না—এত স্নেহ, এত মমতা এত করুণা সবই কি ঠুনকো—সবই কি ফাঁকি—মিথ্যা তবু নির্মম সত্য মা আর নেই। অফিসের কাজ-

কর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চাই—এত লোকের ভীড়েও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—একটা শূন্যতা আমার সাথী হয়ে গেছে।

নাজমাবৌ এসে এরমধ্যে একদিন বলে গেল দীপ্তি ফিরে এসেছে ও শিক্ষাবিভাগে চাকুরী নিয়ে মফঃস্বলের এক মহিলা কলেজে চলে গেছে। কথাটা শুনে রাগ হলো বা অভিমান হলো সেটা দীপ্তির উপর না নিজের উপর তা আজ আর বলতে পারছি না। তবু একটু হাসির মধ্যে আমার মনের আনন্দটা প্রকাশ করেছিলাম নাজমা বৌয়ের কাছে।

দিনগুলি চলে যাচ্ছে। এমনিভাবে যদি চলে যেত তবেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন দীপ্তির একখানা চিঠি পেলাম ভাষা অভিমানে ভরা অথচ নেই কোন অভিযোগ আছে শুধু মৃদু তিরস্কার। বুঝলাম বাঙালী নারীর হৃদয়ে বিদেশে ঘুরেও হয়নি প্রীতিরস হারা। দীপ্তির এই চিঠির উত্তর আমি দিইনি। এর উত্তর না দেওয়াটাই সৃষ্টি করলো একটা বিরাট ফাঁক দুজনের মধ্যে প্রায় বিচ্ছেদের কাছাকাছি।

বিদেশে যেতে হল, একবৎসর সেখানে কাটিয়ে এসেছি নিজের কোম্পানীর কাজে। এসেই নিজেকে খুবই ব্যস্ত করে তুলেছি কাজ কর্ম দেখবার জন্য অবসর কম—সারাদিন গাড়ী নিয়ে ঘুরাঘুরি করে এক সন্ধ্যায় আরেকটা গাড়ীর সামনে এসে পড়েছি, কষে ব্রেক টেনেছি কিন্তু গাড়ীকে থামাতে থামাতে একটা কলিশন হয়ে গেল—এর পর কি হলো আর বলতে পারি না।

চোখ মেলে দেখছি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমার বাড়ীতে নয়—একটা নার্সিং-হোমের কেবিনে। আমার সামনে ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে বসে আছে দীপ্তি। সবে মাত্র তখন রাত্রি ভোর হয়েছে। আমাকে চোখ মেলে কিছু বলতে দেখেই ইঙ্গিতে আমাকে কথা বলতে মানা করলো—সে শুধু বলল "ভয় নেই বিপদ কেটে গেছে। আমি চিত্রাপিতের মত বসে রইলাম বিছানার উপর। ডাক্তার এলেন ও একটা ইন্‌জেকশন দিতে দিতে বললেন ভাগ্যিস উনি ছিলেন তাই এযাত্রা বেঁচে গেলেন,—যে গাড়ীটার সঙ্গে আপনার গাড়ীর কলিশন হয়েছিল তার পিছনের গাড়ীতেই উনি যাচ্ছিলেন—মনে রাখবেন, ওঁর ভিতর দিয়েই ভগবান এবার আপনাকে রক্ষা করলেন—উনিই আপনার জীবন-রক্ষিকা। আজ বিকালেই আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব, আপনি বিপদ-মুক্ত হয়ে গেছেন, তবে দুর্ব্বলতা যেতে কয়েকদিন লাগবে, যত্নের মধ্যে থাকবেন। ডাক্তারবাবু চলে গেলে দীপ্তি গতকালের একসিডেন্টের কথা আমাকে বলল আর বলল কি ভাবে সে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় এই নার্সিং-হোমে এনেছিল। একটু কি ভেবে আমাকে বলল "চল বাড়ী যাই আমি তোমার কাছেই থাকবো যতদিন না তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছো। ভয় নেই আমি এরপরই চলে আসব। হয়ত বা লোকে বলবে এ হলো আমাদের পত্র-বিলাস আর আমি হয়ে থাকবো তোমার কাছে লেখিকা বান্ধবী।—এই বলে দীপ্তি একটু মুচকি হাসি হাসলো। আমি ভাবছি দীপ্তির মহানুভবতার কথা, ভাবছি তার আত্মপ্রত্যয়ের কথা। দীপ্তির স্নেহময়ী মাতৃ-হৃদয়ের কথা—বুঝেছি তার করুণাময়ী নারী-মনের কথা। আজ স্পষ্ট মনে হচ্ছে এমন নারীকেই যেন খুঁজেছি বহুদিন ধরে।—ওকে কিছু বলতে যাচ্ছি এমন সময় নাজমাবৌ আর সুভোজিত এসে দাঁড়িয়েছে কেবিনের মধ্যে। নাজমার হাতে একগুচ্ছ চাঁপাফুল আর সুভো-জিতের হাতে বেলফুলের মালা, দুজনের মুখেই হাসি, চোখগুলি প্রীতিরসভরা মুখে এদের ভাষা। নাজমা একগাল হেসে বলে উঠল আজই বিয়েটা হয়ে যাক্ দুজনের মধ্যে—দুজনেই খুঁজেছেন প্রচুর একে অন্যকে। শুধু বলেন নি কেউ কারু কাছে, কিন্তু দুজনের চোখেই ছিল ভাষা—অন্তরের ইশারা। আমি আমতা আমতা করে বললাম এখনই কি করে হবে—আত্মীয় কুটুম্ব পরিজন ছাড়া। নাজমা উত্তর দিল বহুদিন আগে হয়ে গেছে বিয়ে পাবন শৈব মতে। আমরা দুজন তার সাক্ষী কী হবে আপনার এই কপট সমাজের মিথ্যা সমারোহে।

স্বভাব

ভাগবতদাস বরাট

যে যা চায়, তা পায় না। যা পায়, তা তার চাওয়ার তুলনায় বুঝি অনেক কম। মানুষের আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি নেই। অনন্ত আশা মনের গহ্বরে সুপ্ত থাকে বীজমধ্যস্থ গাছের মত। সেই সুপ্ত আশাই মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে। অহরহ মানুষ তাই নানা আশা পোষণ করে। কিম্বা, একথাও বলা চলে যে কুহকিনী আশার পিছনে মানব-মন অহরহ ছুটে চলে। মানুষের, এ হল একটি বিশিষ্ট নেশা।

সুশান্ত এসব বুঝে। মনে মনে এসব নানা কথা প্রায়ই সে চিন্তা করে। ছেলেদের নামতা পড়ার মত বারংবার ঐ একঘেয়ে উক্তিই আলোচনা করে। কিন্তু কেন যে মানুষ আশায় নেশায় মত্ত, তা সে ভেবে পায় না। আশ্চর্য্য হয় মানুষের অফুরন্ত আকাঙ্খার দৃষ্টান্ত দেখে।

যার ধনসম্পদ মোটেই নেই সে যেমন চাতকের মত ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় উদ্‌গ্রীব, তেমনি অগাধ ধনের অধিকারীও ধন-লাভের বাসনায় ছুটোছুটি করে। কিন্তু কেন? —এইপ্রশ্নের জবাব সুশান্ত আজও ভেবে পায় না। অনেক ভেবেচিন্তে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আশা যেমন মানুষের উন্নতির সোপান, তেমনি তার মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী। তাই সে নিস্পৃহ। কোন আশাই মনে পোষণ করে না।

স্বামীর উদাসীন ভাব দেখে তেতে উঠে উমাশশী। ওর অভিযোগ সুশান্ত নিষ্কর্মা। চোখের সামনে কত জনকেই না সে গজিয়ে উঠতে দেখল। গজিয়ে গুছিয়ে কতজনই না ধন-দৌলতের অধিকারী হল। যারা ছিল ফকির, তারা ফিকিরে কোন কাকে ফস্ করে রাতারাতি বেড়ে উঠে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়ে উন্নত পর্য্যায়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওরা যে পর্য্যায়ের মানুষ সেই পর্য্যায়েই রয়ে গেল। বরং কিছুটা যেন নেমে বসেছে। জলের স্রোত স্বভাবতঃই যেমন নিম্নগামী তেমনি ওদের অবস্থাও স্রোতের মত নীচের দিকে নেমে চলেছে।

উমাশশী ভাবে। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে নির্জ্জন দুপুরে নিরালা ঘরে এই সব আবোলতাবোল নানা কথা চিন্তা করে। আর তা ভেবে স্বামীর উপর চটে উঠে।

ঘরে তো কিছুই নেই। এই দুর্দ্দিনের বাজারে চাল, তেল, আটা, কেরোসিন ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একান্ত অভাব। তেমন টাকাপয়সার জোর নেই যে পাশের বাড়ীর যোগান ঘোষের মত জিনিষ থাকতেও জিনিষ জুটিয়ে জড়ো করবে। বিকাশ রায়ের মত ওর স্বামী সেরকম চোকস নয় যে কালো বাজারে কাবিল হবে। ওর সেরকম বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। নিতান্ত বোকা। ভীরু। কাপুরুষ। মুখে কতকগুলো ধর্ম্মের বুলি আওড়িয়ে নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকা দিতে সচেষ্ট সর্ব্বদা। এই তো মুরোদ। একটু যা পড়া শিখা শিখেছিল তাই রক্ষে, তা নাহলে খাওয়া পরার পয়সা জুটত না।

উমাশশী যতই ভাবে ততই নানা কথা মনে জাগে। বিস্মৃতপ্রায় কথা-কাহিনী একে একে মনের দরজায় ভীড় জমায়। স্বামীর অক্ষমতার দিকটাই ওর কাছে বসন্তের গুটীর মত প্রকট হয়ে উঠে। স্বামীকে খুবই বোকা মনে হয়। ওর বোকামীর জন্যেই ওদের দুরবস্থা।

ঘরে তেমন কোন দামী বা ভারী আসবাবপত্র নেই। দামী শাড়ী ব্লাউজ আজ প্রায় ছ' সাত বছর হল ওর অঙ্গে চড়ে নি। মাসের শেষে যা আসে তাতে টেনেটুনে শুধু সংসার খরচাই চলে। তাও কোনরকমে। জোড়া-তালির প্রলেপ দিয়ে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচা মেটাতে জলের মত সব পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। সুশান্তও একথা বলে। উমাশশীর অনুযোগের উত্তরে

ওর এক ঘেয়ে পুরনো উক্তিই বারবার আবৃত্তি করে। বলে, পয়সা কি করে থাকবে বল, ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষায় তো সব পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্ত্রী সক্রোধে উত্তর দেয়,—ছেলে মেয়েদের তা হলে মূর্খ করে রেখে দাও কেমন? মোটে তো দুটো ছেলে মেয়ে। পাঁচ-দশটা হলে কি করতে? একটু হেসে আবার বলে—কেন, তোমার মত তো কত জনই চাকরী করছে! দশটা পাঁচটা ডিউটিতো অনেকের। কিন্তু টিউশ্যান করেও দু'পয়সা রোজগার করে। তুমি পার না?

সুশান্ত বরাবরই শান্ত প্রকৃতির। কথার পর কথা বাড়িয়ে ঝগড়া করতে সে নারাজ। বিশেষ করে এই ক্ষণে স্ত্রীর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখে বলির পাঁঠার মত নিস্পৃহ হয়ে পড়ে নিরুত্তরে সরে পড়ল।

সন্ধ্যা ছ'টা। আপিস থেকে বাড়ী ফিরল সুশান্ত। শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ। মাস কয়েক হল শরীরটাও কেমন যেন দুর্ব্বল দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। একটু কাজ করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভাবে কোন চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠে না। সময়ের অভাব এবং পয়সা-টাকারও টানাটানি।

স্বামীকে দেখে উমাশশীর মুখখানা আরো গম্ভীর হয়ে উঠে। যেন শ্রাবণের থমথমে মেঘ। স্ত্রীর মুখ দেখে সুশান্ত শঙ্কিত হয়। যেন এইমাত্র পিয়ন এসে ওর হাতে খামে মোড়া টেলিগ্রামটা গুঁজে দিল। আমতা আমতা করে বলে; কি হল উমু। শরীর খারাপ নাকি?

—যাও যাও এত সোহাগ দেখাতে হবে না। ঝঙ্কার দিয়ে উঠে উমাশশী। পিঠে রাখা স্বামীর হাতখানা একঝটকায় পিঠ থেকে সজোরে নামিয়ে দেয়। বলে সংসারের দিকে কি তোমার মন আছে? যা কিছু অভাব অনটন তা নিয়ে আমাকেই নাজেহাল হতে হচ্ছে। তুমি কিছু দেখছ কি? আর কোন চেষ্টাও তো করছ না।

নিরুপায় হয়ে সুশান্ত বলে,-কি আর করব বল? ভেবে চিন্তে কিছুই তো করা যাবে না। এযে মানুষের সৃষ্ট অভাব। চাল নেই চিনি নেই, আটা নেই। আবার কখনো কেরোসিন নাই। কয়লারও অভাব। নাই বলেই ব্যবসাদার খালাস। তোমার পয়সার জোর থাকে তো বেশী দামে কিনে নাও। তখন দেখবে সবই আছে। চোরাকারবারীদের ঐ তো কেরামতি। চড়া দরে মাল বেচে চড়চড়িয়ে বেড়ে উঠছে।

—তাই তো বলছি, অপিসের ছুটির পর বাকী সময়ে তুমিও তো এই রকম একটা কোন কাজ কারবার করে দু'পয়সা রোজগার করতে পার।

এঅনুযোগ আজকার নয়। বহুবার উচ্চারিত উমাশশীর চিরাচরিত উক্তি। সুশান্ত চেষ্টাও করেছে বার বার। কিন্তু কোন কাজ জুটাতে পারে নি। পরিচিত এক বন্ধুর চায়ের কারবারে পার্টনার হয়ে বারবার টাকা ইনভেষ্ট করেছে। আদাজল খেয়ে জল-কাদায় হাঁটাহাঁটির পরিশ্রমও করেছে। চায়ের পোটলা-পুঁটলি বেঁধে পকেটে ভরে পরের দোকানে যাওয়া আসাও করেছে বারংবার। কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারে নি। শেষে দেখা গেল লাল বাতি জ্বলে উঠল ওদের ব্যবসায়। আর সেই সঙ্গে ইনভেষ্ট করা টাকাটাও খোয়া গেল। এ সংবাদ যেমন গোপন ছিল তেমনি গোপন আছে আজও। উমাশশীর কানে পৌছোনি। বরং প্রকাশ হলে প্রশাসনে মন খারাপ হবে। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে উমাশশী বলে, তুমি একটি জবুদ্গব। স্রেফ সুশান্তও নিজেকে এই রকম একটা কিছু ভাবে যখন, সে দেখে যে ওর বাড়ীর সামনের ফাঁকাজায়গায় একটা বিরাট দু'তালা বাড়ী কেঁদে বসল সুব্রত সান্যাল।

এই সুব্রতকে বেশ ভাল ভাবেই জানে চিনে সুশান্ত। এক সঙ্গেই ওরা স্কুলে পড়ত। যেমন মোটাসোটা দেহ তেমনি বুদ্ধিও মোটা। মোটেই সে চালাক চতুর নয় অথচ বছর কয়েকের মধ্যে চোরা কারবারের দৌলতে কেমন ভাবে যে সে ফেঁপেফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল তা ভেবে আশ্চর্য্য বোধ করে সুশান্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বীয় সজীবতা যাচাই করে দেখল বোধহয়। তারপর বলল—নিজের অবস্থাটা পাল্টে নিতে অনেক

রকম চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভাগ্যের দোষ। কিছুই করে উঠতে পারলাম না।

উমাশশী সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—যারা অকর্মণ্য, তারাই ভাগ্যের দোহাই দেয়। কর্মক্ষম ব্যক্তি নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে তুলে।

সুশান্ত নিশ্চুপ। নিজেকে নিজের কাছে এইক্ষণে অতি অসহায় ও দুর্বল মনে হয়। স্ত্রীর বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে নিজেকে খুবই অকেজো ভাবে। শুধু একদিন বলে নয়, প্রায়ই ওকে স্ত্রীর কাছে এই রকম নানা কথা শুনতে হয়। অথচ এই সব কথা বলার ওর কোন অধিকারই নেই।

সুশান্ত নিজেই সংসারের কাণ্ডারী। সে যা রোজগার করে তাতেই তো ওর সংসার চালু। স্বচ্ছলতার মধ্যে না হলেও উপোস কেউ তো দেয় না. যেমন করেই হোক ওর রোজগারে সংসারের প্রতিজনেরই অভাব মিটছে। সে ছাড়া আর তো কেউ রোজগার করে না। বসে বসে সবাই খাচ্ছে। অথচ স্ত্রীর বিচারে সে অকর্মা। হায়রে সংসার। স্বার্থপরজগৎ।

পরদিন সকালেই তাগাদায় এল অনিল মিত্র। এসেই বলে—দাদা টাকাটা দিন। আজই টাকা পাঠাতে হবে। সুশান্ত বলে, মাস কাবার না হলে পারছিনা তা দিতে। একথা তোমাকে টিকিট কেনার আগেই বলেছিলাম। আর তুমি তাতে রাজি হয়েছিলে বলেই কিনেছিলাম।

—কিন্তু, দিলে ভাল হত। অনিল তাগাদার উপর তাগাদা দেয়।

—পারব না অনিল পারব না। লটারির টিকিট নিয়েছি ধনী হবার আশায়। কিন্তু ধন লাভের আগেই তোমার তাগদার ঠেলায় অস্থির হচ্ছি। এখন বুঝছি মানুষের কিছু চাওয়াটাই অন্যায়। কোন কিছু-চাওয়া বা লোভ করা বোকামী।

অনিল বলে, সবার মুখেই শুনছি পরে টাকা দেব। তা হলে চলে কি করে বলুন, আর অতজনের টাকা আমি জুটাবো কোত্থেকে?

সুশান্ত বলে,—সত্যি—অন্যায় আবদার। যাদের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের দেওয়া উচিত। আর তুমিই বা ওসব আজেবাজে লোকদের টিকিট বেচ কেন? একটু থেমে আবার বলে—যাক্ তুমি ওবেলা একবার এসো। দেখি কারো কাছে ধারটার যদি পাই। তবে কথা দিতে পারছি না ভাই।

অনিল নিরুত্তরে চলে গেল।

মেদিনীপুর কালেকটারের অধীনে লোয়ার ডিভিসন কেরানীর চাকরী করে সুশান্ত রায়। চাকরির মেয়াদ পনের বছর হতে চলল, কিন্তু তখনও অস্থায়ী। সরকারের আশ্বাস যে চাকরী ওর সহসা যাবে না। মাসে সবসুদ্ধ তিনশ টাকা পায়। উপরি রোজগার মোটেই নেই। আর তার প্রত্যাশীও সে নয়। এমন কি যদি কেউ কোন দিন ওকে কিছু দিতেও আসে তা হলে সে তা প্রত্যাখান করে। সবার সামনে বুক ফুলিয়ে ওর বলার সাহস আছে যে এক পয়সা কারো কাছে নিই না। আর তা সে বলেও। কিন্তু এখন দেখছে ও কথার কোন দাম নেই। লোকে ওকেই বোকা বলে। আগে দাম ছিল। লোকে সমীহ করতো কিন্তু এখন না-নেওয়াটাই বোকামি যেন। আবহাওয়া পাল্টে গেছে। পরিবর্তনশীল জগতের এই নিয়ম। সুশান্ত এই সবই বুঝে। কিন্তু সে যে ওর স্বভাবের দাস। স্বভাব পাল্টাতে পারবে কি? ঘুষের পয়সা হাতে পড়লেই হাত কেপে উঠে। মনে হয় যে ঘুষ দিল, তাকেই ঘুষি মারি। ঘুষ নেওয়া মানেই তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। অথচ প্রতিদিনই জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বহুপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারকে সে নির্বিবাদে সহ্য করছে। যদিও সে বুঝেছে যে সমাজ-জীবনে চোরা কারবার ধ্বংশের বীজ স্বরূপ এবং তাকে যে প্রশ্রয় দিয়েছে সেও ধ্বংশাত্মক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। সেও অন্যায় করেছে। কিন্তু বুঝেসুজেও কিছু করতে পারছে না। নিজেও প্রয়োজনের তাগিদে চোরাবাজারে জিনিস কিনছে। তা না কিনলে যে সংসার অচল। এতে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে

না? —এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে যথাসময়ে হন্তদন্ত হয়ে সুশান্ত আপিসে প্রবেশ করে। এবং সিটে বসেই দেখে একজন দন্তবিহীন লোক ওর অপেক্ষায় ওরই সামনে বসে আছে।

লোকটি একটি দরখাস্ত ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, —আমাকে কুড়ি বোতল কেরোসিন তেলের পারমিট ইস্যু করিয়ে দিতে হবে।

তখন কেরোসিনের ক্রাইসিস। সুতরাং কুড়ি বোতল কথাটা শুনেই সুশান্ত আশ্চর্য হয়ে ক্ষণিক লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে—কুড়ি বোতল তো পারব না, পাবেন মাত্র পাঁচ বোতল।

—দেখুন যদি দয়া করে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তা হলে আপনাকেও সন্তুষ্ট করব। কথার শেষে লোকটি একটি পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে দেয়।

সুশান্তর হাত কাঁপে মুখ শুকিয়ে যায়। একটা কেমন যেন অনাস্বাদিত অনুভূতিতে সে তখনই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। ভাবে, এই লোকটির কুড়ি বোতল কেরোসিন তেলের পারমিট ইস্যু করাও চোরা-কারবারকে প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু সে না দিলেও লোকটি অন্য ভাবেও কেরোসিন জোগাড় করবে সুতরাং সে নিশ্চেষ্ট হলেও চোরা কারবার চালু থাকবে। এদিকে অনিলের এত টাকার তাগিদ। তা ছাড়াও নানাদিক থেকে পাওনা-দারদের আক্রমণ। সুশান্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করে। কি করবে তাই তখন সমস্যা। উচিত অনুচিত এই দুইটি কথার উপর নানা যুক্তি তর্ক ওর মনের দরজায় ভীড় করে অবশেষে এই স্থির হয় যে পাঁচটা টাকা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

কুড়ি বোতলের পারমিট ইস্যু করে দেয় সুশান্ত। তারপর সেই পারমিট এস-ডি-ওকে সই করিয়ে লোকটির হাতে গুঁজে দেয়।

সমস্ত দিনটা সুশান্তর মনটা কেমন যেন এক অব্যক্ত ব্যথায় ম্রিয়মান ছিল। অন্তরের পুলক খর্ব হয়ে শুকিয়ে পড়েছিল। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে ওর মনের মধ্যে—একটা দারুন ঝড় বইছে।

পাঁচটাকার নোটটা ওর কাছে ধন সম্পদ নয়, মনে হচ্ছে পায়ের নীচে যেন কাঁটা ফুটেছে। দারুন অস্বস্তি।

অফিস ছুটি হল পাঁচটার পর। সুশান্ত বাড়ী ফিরে। মনে তখনও ওর প্রশান্তি নেই। খুবই যেন দুষ্কর্ম করে ফেলেছে এই রকম মনের ভাব। মনে হচ্ছে রাস্তার লোকজন যেন। ওকেই দেখছে। আর অলক্ষ্যে বিধাতাও হাসছেন। ওর বিবেক বলছে সুশান্ত ঘুষখোর চোর।

একটা ভিখারী এসে সামনে দাঁড়ায়। হাত পেতে বলে, —কিছু দিন, আজ চারদিন কিছু খাই নি।

সুশান্ত এই সুযোগে ওর পকেটের ভারী বোঝাটা ভিখারির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। মনে হল এতক্ষণ ভুল পথে সে হাটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন সঠিক পথের হদিস পেয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ভিখারি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—লোকটা পাগল কিম্বা বোকা। উমাশশী কাছে থাকলে সেও ঐ রকমই কিছু ভাবত। কিন্তু স্বভাবের দাস সুশান্ত। স্বভাবটা পাল্টাতে না পেরে বিবেকের কাছে এইক্ষণে যা শুনে তা প্রশংসারই কথা।

ক্রীড়া-জগৎ এবং স্ত্রীজাতি

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

ইতিহাসে মেয়েদের খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে আরম্ভ হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান লোক-চক্ষে তেমন প্রীতিপ্রদ ছিল না। মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য অতীতে এবিষয়ে শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতা প্রভৃতি বহু প্রশ্নেরই অবতারণা হয়েছে। এমন একদিন ছিল যখন মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান অশিষ্টতার নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের এই অতীত চিন্তাধারা বর্তমানে কিন্তু অচল বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এখনও কিন্তু অনেকে স্ত্রীজাতি দুর্বল, স্ত্রী-দেহোর্কাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুপযোগী এবং ব্যায়াম প্রশিক্ষণ নারীত্ব-বর্জিত প্রচেষ্টা জ্ঞানে ইহা অনুমোদনে বিরত থাকেন। কেহ কেহ আবার ক্রীড়া-প্রচেষ্টা-জনিত শারীরিক নিপীড়ন স্ত্রীলোকদিগের শরীরের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করে বলে মনে করেন।

বর্তমান যুগে মানুষের সামাজিক ও মানসিক উন্নতির সাথে সাথে মেয়েরাও অতীত দিনের বহু নিষেধের বাধা তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রগতির পথে অগ্রগামী হয়েছেন। মেয়েদের উপর খেলাধূলার অশুভ প্রভাব সম্বন্ধীয় অহেতুক ভয় বর্তমানের দিনে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোন কোন বিশেষ দৈহিক বিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শারীরিক বিষয়েই পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। স্ত্রী-জাতির নির্দিষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধ-ধর্মী নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে খেলাধূলায় অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাত দশক পূর্বে ওলিম্পিকে মেয়েদের জন্য প্রথম ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তখন মনে হয়েছিল শুধুমাত্র নাম রক্ষার জন্যই হয়ত মেয়েরা ইহাতে যোগ-দান করেন। কিন্তু বর্তমানে রেকর্ড ভাঙ্গার পাল্লাতেও মেয়েরা বোধহয় পুরুষদের অপেক্ষা অনেক এগিয়ে আছেন।

ইংলণ্ডের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ এ এইচ চার্লস "Women and the Sport" বিষয়ে তাঁর লিখিত এক প্রবন্ধে বলেছেন "প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ইউরোপীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত তাঁদের এই শারীরিক উন্নতি অব্যাহত আছে। এখনকার দিনে Ante-Natal Clinicএ আগত মেয়েদের স্বাস্থ্য বিগত দিনের নারীদের তুলনায় অনেক উন্নত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় হতে আগত স্কুলের বালিকাদের মধ্যেও আজ উন্নতি দেখা গিয়েছে। এই সকল মেয়েদের স্কুলে দলগত ক্রীড়া অভ্যাস করান হয়।"

এই বিষয়ে প্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় প্রতীচ্যের দেশগুলিই অধিক অগ্রগামী বলে মনে হয়। ইহার এক-

মাত্র কারণ বোধহয়, প্রাচ্যের মেয়েরা মাত্র কিছুদিন পূর্বে পর্দার অবরোধ ঘুচিয়ে বিশ্বের আলোকের সন্ধান পেয়েছেন।

১৯৫২ সালের ওলিম্পিক প্রসঙ্গে জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন এই ওলিম্পিকে যোগদানকারী মোট ৬৯টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪১টি দেশই কেবল এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে নারী প্রতিযোগীও প্রেরণ করেছিলেন। মেয়ে বিভাগে যোগদানকারী এই সকল দেশের অধিকাংশই প্রতীচ্যের দেশ বলে জানা গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ভারতবর্ষ প্রেরণ করেছিল মাত্র সাতজন প্রতিযোগিনী এবং ইজরায়েল থেকে প্রেরিত হয়েছিল মাত্র চারজন। মধ্য প্রাচ্যের আর কোন দেশ থেকে কোন মহিলা প্রতিনিধি প্রেরিত হয়নি তখন।

বিশ্ব ক্রীড়ায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করাটাই বড় কথা নয়। দেশের অধিক সংখ্যক বর্দ্ধিষ্ণু বালিকার ক্রীড়ানুরক্তিই দেশ ও জাতির উন্নতির সহায়ক। কোনও ক্রীড়ায় রেকর্ড ভঙ্গ করাটা উল্লেখযোগ্য হলেও প্রতি সপ্তাহে অধিক সংখ্যক বালিকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করাটাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীও সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে সমর্থ হন।

সন্তান প্রজননের প্রাথমিক পর্য্যায়ে মেয়েদের ব্যায়াম ক্রীড়া অনুশীলন বিষয়ে অনুসন্ধানের দ্বারা ইতিপূর্বে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গিয়েছে। এই সমীক্ষার মধ্যে অনেকেই ছিলেন তৎকালীন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ্। এঁদের মধ্যে কেহ বা ছাত্রী অবস্থায় এবং তাহার পরবর্তী কালেও ক্রীড়ার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কেহবা আবার বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে ক্রীড়াজগতের সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময় কিছু স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে প্রশ্ন করে জানা যায় যে তাহাদের কোন সময়েই কোন ক্রীড়ার প্রতি আসক্তি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যথেষ্ট অনুসন্ধানের দ্বারা জানা যায় ইহাদের মধ্যে অনেকেই অতীত জীবনে সাইক্লিং অথবা সাঁতারের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

আমরা জানি ক্রীড়ানুরক্তা বালিকার দেহের গঠন-ভঙ্গিমা সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা সুনিশ্চিত ভাবে উত্তম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে "কোমরের ব্যথা" (Waist Pain) সাধারণ মেয়েদের নিকট একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু খেলাধূলায় আসক্ত বালিকাদের যথোচিত দেহগঠন-ভঙ্গিমার জন্য উক্ত উপসর্গের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বিরল বলেই মনে হয়। খেলাধূলার মাধ্যমে সঠিক শারীরিক গঠন-ভঙ্গিমা গঠিত হওয়ার জন্য ইহাদের শরীরের পেশীগুলি যথেষ্ট বলশালী হয় এবং ইহারা অত্যধিক শারীরিক Lordosis নিবারণ করে। এই জন্যই দেহের Sacro Iliac অস্থি সন্ধি-স্থলের উপর মোচড় জনিত চাপ সৃষ্টি কম হওয়ার জন্যই কোমরের ব্যথার সম্ভাবনা থাকে না।

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও চারিত্রিক সামঞ্জস্য গঠন করতে সাহায্য করে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা মানুষের মনে স্ত্রীজাতি তত্ত্বের রহস্যময়তা অপনোদনেও সহায়তা করে।

বর্তমানে মেয়েরা পুরুষের ন্যায় সকল বিভাগেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। মেয়েদের পক্ষে দেহ সংস্পর্শক ক্রীড়া অথবা যে ক্রীড়ায় শরীরে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে তাহা না করাই ভাল। কারণ ইহার দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব হানির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই মেয়েদের মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ফুটবল প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় যোগদান না করাই ভাল। ফোলা নাক, কান অথবা চোখের নিকট কালশিরা পড়াটা বিশেষ ক্ষতিকারক না হলেও উহা কিন্তু স্ত্রীজনসুলভ নয়। স্বল্পপেশী সমন্বিত হাল্কা ধরণের স্ত্রী দেহ কাঠামো অতি সহজেই অল্প আঘাতের দ্বারা পেশী অথবা অস্থি-বন্ধনী-সমূহের মচকানি জনিত বহু প্রকার উপসর্গের সম্মুখীন হয়। American Athletic Unionএর রিপোর্টে

দ্বারা ইহার সত্যতা নির্দ্ধারিত হয়েছে। পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও ক্রমপর্যায়ের প্রশিক্ষণের একান্ত প্রয়োজন আছে।

স্ত্রী-ক্রীড়াবিদের সাধারণ ডাক্তারী পরীক্ষা

ক্রীড়া-জীবন আরম্ভের পূর্বে প্রতিটি মেয়ে ক্রীড়াবিদের নিয়মিত শরীর পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। কোন অসুখের পরও চিকিৎসক দ্বারা শরীর পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

ক্রীড়া-সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারাই এই সকল ক্রীড়াবিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। স্বাস্থ্য পরীক্ষা এমন চিকিৎসালয়ে করানো প্রয়োজন যেখানে শরীর বিষয়ক সকল প্রকার পরীক্ষাই সম্ভব হতে পারে। এই সকল চিকিৎসালয়ে নাড়ী, স্পন্দন, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষা এবং ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফী পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকা প্রয়োজন। Gunner Malerstorm কোন এক জায়গায় বলেছেন বহু ক্রীড়াবিদ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা সম্বন্ধীয় মানসিক দুর্বলতায় ভোগেন। কিন্তু দেখা যায় সম্ভবতঃ তাঁরা হৃৎপিণ্ডের কোন অসুখেই আক্রান্ত ন'ন। অধিকাংশ ক্রীড়াবিদের মধ্যে Extra Systole এবং Pericardial Pain (বক্ষ বেদনা) এর ঘটনাই পাওয়া যায়। মানসিক এবং শারীরিক নিপীড়নই এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ইহা সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃত হৃৎপিণ্ডজনিত রোগ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। এ বিষয়ে সঠিক রোগ নির্ণয়ে যেন কোন অবহেলা না হয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি জনিত উপসর্গে ক্রীড়াবিদের শারীরিক নিপীড়ন মূলক ক্রীড়ায় যোগদান না করাই শ্রেয়।

স্ত্রীরোগ জনিত উপসর্গাদির জন্য ক্রীড়াবিদের বস্তিদেশ পরীক্ষার (Pelvic Examination) প্রয়োজন আছে। সন্তানবতী নারীকে ক্রীড়া মরশুমের পূর্বাহ্ণেই পরীক্ষা করানো ভাল। কারণ ইহাদের যদি Genital Prolapseএর লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে তাদের লৌহ বল নিক্ষেপ, ডিস্কাস নিক্ষেপ, লম্ফন প্রভৃতি ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করা অনুচিত। অল্পবয়স্কা নারীদের মধ্যে Ovarian Cyst খুব একটা বিরল ঘটনা নয়। এই রোগের উপসর্গগুলিও সব সময় যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নাও হতে পারে। এই জন্যই অনেক সময় প্রথম সন্তান হবার সময় যথারীতি বস্তিদেশ পরীক্ষার সময় হয়ত ইহা হঠাৎ নির্ণীত হতে পারে। বস্তিদেশে যদি Derenoid Cyst স্থিরীকৃত হয় তবে প্রতিযোগিতায় যোগদানের পূর্বে উক্ত Cystটিকে শল্য চিকিৎসার দ্বারা অপসারণ করার একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রী ক্রীড়াবিদ্‌দের অপর নানা প্রকার উপসর্গে প্রায়ই ভুগতে দেখা যায়। ইহারা যদি গুরুতর আকার ধারণ করে তবে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে ইহাদের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে সকল ব্যাধিকেই উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা সত্বর আরোগ্য করা যায়।

১৯৫২ সালে British Medical Journalএ প্রকাশিত The Physical Education for Girls কমিটির রিপোর্টে মেয়েদের জন্য ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই রিপোর্টে সাঁতার, নৌকা বাইচ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় হৃদপিণ্ড নিপীড়িত (Heart Strain) হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। ঐ কমিটির কিছু সদস্য বলেছেন "ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য শারীরিক নিপীড়ন ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের কার্যাবলীতেও কিছু ব্যাঘাত জন্মায়...।" এই উদ্ধৃতিটির উল্লেখ করে Charles পুনরায় তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন 'হৃৎপিণ্ডের নিপীড়ন' (Heart Strain) একটি অস্পষ্ট অভিব্যক্তি (vague term), অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যায় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হৃৎপিণ্ডের উপর কোন অশুভ প্রভাব বিস্তার করে না, যদি না ইহা রোগদুষ্ট হয়। পুরুষেরা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার কঠিন প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও যদি তাদের শিক্ষানুশীলনে সক্ষম হন তবে মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ একই উক্তি সমান ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। কেহ কেহ বৈকালের কঠিন

প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও সন্ধ্যাকালের পাঠ্যসূচী উত্তমরূপে অধ্যয়নে সক্ষম হন আবার কেহ বা উক্ত ক্রীড়ানুশীলনের পর কোন রকমেই পাঠে মনোযোগ দিতে পারেন না। বিষয়টি খানিকটা ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভরশীল।

ক্রীড়া-কৃতিত্বের কথা বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব মেয়েরা ক্রমশঃই এ বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের বোধহয় আরও অধিক দূর অগ্রসর হতে হবে। সেই জন্যই বোধহয় তাঁদের কৃতিত্ব আরও বিস্ময়জনক।

বর্তমান কালে ক্রীড়ার সাজসরঞ্জাম, ট্র্যাক, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের উন্নতি সাধিত হয়েছে। এই কারণেই বর্তমান ক্রীড়া-কৃতিত্বের সহিত অতীতের ক্রীড়া-কৃতিত্বের কোন তুলনামূলক বিচার চলে না। আমরা জানি সর্বশ্রেষ্ঠা নারীর কৃতিত্ব কখনই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের কৃতিত্বের সমতুল্য হতে পারে না। কিন্তু একথা আজ প্রমাণ হয়েছে যে মহিলাদের রেকর্ড এই শতাব্দীর শুরুতে সৃষ্ট পুরুষদের রেকর্ডের প্রায় সমান হয়ে গেছে। একথাও আজ নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বর্তমান কালের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী ক্রীড়াবিদ্ যে কোন সমবয়স্ক সাধারণ যুবক অপেক্ষা উন্নততর ক্রীড়ামান প্রদর্শনে সক্ষম।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় আকারে ছোট, মোট দেহ-ওজনের অনুপাতে মাংসপেশী কম। একই পরিমাণ অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেও তাঁদের হৃৎপিণ্ড স্পন্দনে দ্রুততর। ইহা ব্যতীত নারী পুরুষের দেহ-কাঠামোগত পার্থক্যের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। মেয়েদের পায়ের দৈর্ঘ্যের তুলনায় ধড়ের অংশ দীর্ঘতর এবং শরীরের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত নীচে।

অতএব পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও তাদের সামর্থ্য সীমার মধ্যে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতা অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের শুধু লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে কঠোর ব্যায়াম প্রজনন শক্তির উপর কোন-অশুভ প্রভাব বিস্তার করে কি না।

ঋতু সংক্রান্ত কথা

প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ক্রমবর্দ্ধমান যোগদানের ফলে স্বভাবতই মানুষের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। কঠোর ক্রীড়া-প্রশিক্ষণ ঋতুর উপর কি প্রভাব বিস্তার করে? ইহা কি ক্রীড়া-কৃতিত্ব প্রদর্শনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়?

পূর্বে মেয়েদের এই সময় যে কোন ব্যায়াম চর্চাই নিষিদ্ধ ছিল। প্রতি মাসেই ৪।৫ দিনে একজন মেয়ের শরীর থেকে জরায়ুর কিছু অংশ নিঃসৃত হয়ে যায়।' স্বভাবতই ইহাতে এই ক্ষয়জনিত শঙ্কায় মানুষের মন বিচলিত হয়ে উঠে।

এক বিখ্যাত মেয়ে-স্কুল থেকে পাশ করা কোন এক মহিলা চিকিৎসককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন—"আমার স্কুলে অধিকাংশ বালিকাগণই ঐসময় নিজেদের ক্রীড়ার মধ্যে আবদ্ধ রাখতেন। শুধুমাত্র যারা খেলাধূলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না তাঁরাই কেবল এই অজুহাতে নিজেদের ক্রীড়া প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতেন।"

এই সম্বন্ধে একদল নারী ক্রীড়াবিদের মধ্যে অনুসন্ধান করে প্রাগে (Prague) Kral এবং Markalans তাঁদের একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্টে (1930—Track and field championship for women) বলেছেন শতকরা ২৯জন প্রতিযোগী ঋতুকালেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। শতকরা ৬৩জন প্রতিযোগী এবিষয়ে কোনও প্রভেদ উপলব্ধি করেন নি। এই অনুসন্ধান রিপোর্টের শতকরা ৮জন প্রতিযোগী কেবল ঋতুকালীন অবস্থায় তাঁদের ক্রীড়া-কৃতিত্বের হানির কথা বলেছেন।

ডোরিং—(১৯৬৩) ঋতুকালীন বিভিন্ন অবস্থায় ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া প্রচেষ্টার বিষয় গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ঐ সময়ে ক্রীড়া পারদর্শিতা হ্রাস পায়। ইহা শেষ হওয়ার পরবর্তী দিনগুলিতেই ক্রীড়া পারদর্শিতা উন্নত হয়।

১৯৬৪ সালের টোকিও ওলিম্পিকে যোগদানকারী মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় Zaharive দেখেছেন শতকরা ৬৮·১ জন মহিলা প্রতিযোগীর মধ্যে ঋতু হেতু কোন পরিবর্তন হয়নি। শতকরা ২১·৭ জনের সামান্য পরিবর্তন ও শতকরা ১৭ জনের নিকৃষ্ট ফলাফল হয়েছিল। ইহাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ফলাফল হয়েছিল সাঁতারুদের মধ্যে।

পিয়ারসন ও লকহার্ট (১৯৮৯) এ বিষয়ে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পান নি। এঁদের দুজনেরই মত হল ঋতুকালে এবং পূর্বে দক্ষতা হ্রাস পায়। ইহার এক মাত্র কারণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যই সম্ভবত ক্রীড়ার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ প্রদর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়।

Wearing এবং তাঁহার সহযোগীগণ ওয়েস্টার্ণ অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মহিলা ক্রীড়াবিদকে নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে ঐ সময়ে মহিলা ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া কৃতিত্বের হ্রাস হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে ক্রীড়োৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে Ore Ingman একদল উচ্চ ক্রীড়াকুশলী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ক্রীড়াবিদকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণায় ক্রীড়াবিদদের বিভিন্ন ক্রীড়ায় কঠোর পরিশ্রম করানো হয়েছিল। এই সমীক্ষায় মোট ১০৭ জন ক্রীড়াবিদের মধ্যে সাঁতারু ছিলেন ৯ জন, ১৩ জন জিমন্যাস্ট, ২৮ জন বাস্কেটবল খেলোয়াড়, ১৪ জন স্কী ও স্কেটিং ক্রীড়াবিদ এবং ৪৩ জন এ্যাথলেট। ইঁহাদের গড় পড়তা বয়স ছিল ২৩·১ বৎসর। ইঁহাদের ঋতু প্রারম্ভকাল ছিল গড়ে প্রায় ১৪·৬ বৎসরে।

যৌবনের প্রারম্ভেই এই সকল ক্রীড়াবিদ কঠোর প্রশিক্ষণ মূলক ক্রীড়ায় আপনাদের নিয়োজিত করেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩১ জন ক্রীড়াবিদের ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের পর ঋতুচক্রে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৪ জন খেলোয়াড়ের ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের পর ঋতুকালীন উদর যন্ত্রণা জনিত উপসর্গের উপশম হয়। ২৮ জন ক্রীড়াবিদের ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণকালীন সময়ে ঋতুর গোলযোগ দেখা যায়।

গবেষণায় ১০৭ জন ক্রীড়াবিদের মধ্যে ১০৪ জন প্রতিযোগীই ঋতুকালীন সময়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৭৭ জনের মধ্যে কোনই অশুভ ফল দেখা যায় নাই। কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা কালীন সময়ে ঋতুচক্রের পরিবর্তন দেখা গেলেও ইহাতে কোন স্থায়ী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। সাঁতার এবং পেন্টাথলেন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়-অংশ ক্রীড়াবিদের ভিতর ঋতু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। Ingman-এর মতে আপনাদের পরিবর্তন এবং বহুক্ষণব্যাপী ক্রীড়া প্রচেষ্টা জনিত শারীরিক নিপীড়নের কারণেই সম্ভবতঃ এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমরা জানি মেলবোর্ণ ওলিম্পিকের ৬ জন ক্রীড়াবিদ ঋতুকালীন সময়েই স্বর্ণপদক জয়লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

দুঃশ্চিন্তা এবং মানসিক উৎকণ্ঠা অনেক সময় ঋতু-বন্ধের কারণ হলেও প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়ায় এই ঘটনা বিরল বললেই হয়। এই সকল ক্রীড়াবিদ নিজেদের শক্ত সমর্থ করে গড়ে তোলার সাথে সাথে আপনাদের মানসিক অবস্থাকেও পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করে তুলতে সমর্থ হন।

কোন নারী ক্রীড়াবিদ যেন মনে না করেন যে ক্রীড়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ হেতুই ঋতুর গোলযোগের সৃষ্টি হয়। তবে গোলযোগের মাত্রাধিক্য ঘটলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আমরা জানি মেয়ে পুরুষ সকল ক্রীড়াবিদই একটু স্বাস্থ্য সচেতন হন। শারীরিক বিপর্যয়ের ভয়ে তাঁহারা সদা সর্বদাই একটু উৎকণ্ঠিত থাকেন। ত্রিশোর্ধ্ব বয়স্কা এমন বহু ক্রীড়াবিদ ছিলেন বা আছেন যাঁরা সন্তানসন্ততি সহ বিবাহিত জীবন যাপন করেন। এই সকল ক্রীড়াবিদের অনেকেই নানাবিধ উপসর্গে ভুগতে পারেন। ইঁহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়

অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় ক্রীড়াজনিত দৌড়ঝাঁপের জন্য নাও হতে পারে। ইহা কখনও বা হয়ত জরায়ুতে fibromyoma নামক টিউমারের জন্যও হতে পারে। সাধারণতঃ নিগ্রোজাতির মেয়েদের মধ্যেই fibromyomaর আধিক্য দেখা যায়। জঠর মধ্যস্থ অঙ্গ সকল যদি যথাযথ থাকে তবে সামান্য ঋতুর গোলযোগ ক্রীড়া সাধনার পথে অন্তরায় হয় না।

কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানের পূর্বে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা স্বাভাবিক ঋতু ইচ্ছাকৃত রুদ্ধীকরণ একটি অসঙ্গত পদ্ধতি। ঋতু মেয়েদের ক্রীড়াকৃতিত্বের কতটুকু ক্ষতি করে এই প্রবন্ধে তাহা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং "হরমোন" (Hormone) সহযোগে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। ইহার ফলে স্বাভাবিক কোন নারী হয়ত অনেক সময় দীর্ঘদিনের অনিয়মিত ঋতু জনিত উপসর্গে ভুগতে পারেন।

মহিলা-জগতের ক্রীড়ামহলে কোনও ক্রীড়াবিদ্ কখনও বা হয়ত মহিলা না হওয়ার দরুণ ক্রীড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। আমরা জানি অধিকাংশ রমণীকেই দেখে বলে চিনতে খুব অসুবিধা হয় না। কিন্তু সময় সময় আমরা এমন রমণীর সাক্ষাৎ পাই যাদের বাহ্যত পুরুষ বলে ভ্রম হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা কিন্তু স্ত্রীলোক। অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু সংখ্যক পুরুষের সংস্পর্শে আসি বাহ্যতঃ স্ত্রীলোক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কিন্তু পুরুষ।

বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে এরূপ ঘটনা খুব একটা বিরল নয়। ১৯৩৪ সালে একজন বিশ্ব রেকর্ডধারী পোলিশ মহিলা ক্রীড়াবিদ উত্তরকালে পুরুষ বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের Osloতে ইউরোপীয় ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে দুইজন ফরাসী মহিলা ক্রীড়াবিদও অনুরূপভাবে পুরুষ ক্রীড়াবিদ্ রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

ক্রীড়া প্রাঙ্গণের এই জটিলতা অপনোদনের জন্য ক্রীড়াবিদ্‌দের বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসা জগতের ইতিহাসে এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা বহু তথ্য অবগত হতে সমর্থ হয়েছি। ১৯৩৬ সালের ওলিম্পিক হাই জাম্প বিজয়িনী জর্মান তরুণী Dora Ratjenকে ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ শহরে Herman নাম নিয়ে বসবাস করতে দেখা গিয়েছে। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে তিনি একজন পুরুষ। ৪০০ এবং ৫০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডধারী একজন উত্তর কোরিয়ার মহিলা ক্রীড়াবিদ্ পরবর্তীকালে পুরুষরূপে পরিচিত হয়েছেন।

১৯৬০ সালের ওলিম্পিক হাইজাম্প বিজয়িনী রুমানিয়ার মেয়ে ক্রীড়াবিদ্ Jolanda Balas এক সন্তান সহ বিবাহিত জীবন যাপন করা সত্বেও তিনি স্ত্রীলোক কি না এই সম্বন্ধে চিকিৎসা জগতে সন্দেহ আছে। ১৯৬৪ সালেও উক্ত Jolanda Balas হাইজাম্পে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

ক্রীড়া-জগতের এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য গত মিউনিক ওলিম্পিকে একটি নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে পূর্বানুরূপ মেয়েদের শরীর পরীক্ষার পর ক্রীড়াবিদ্‌দের স্ত্রী-পুরুষত্ব স্থিরীকরণের জন্য তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত লালা (Buccal Smear) পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনী সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে তাঁকে বিশেষ কয়েক প্রকার শারীরিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা এবং ক্রীড়াপ্রচেষ্টা

যে কোন ক্রীড়াবিদ্ই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়েও নিজেকে ক্রীড়া সাধনায় নিয়োজিত রাখতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমরা জানি মেলবোর্ণ ওলিম্পিকের তিনজন ক্রীড়াবিদ্ এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভ্রূণ বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকার দরুণ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের লাফানো অথবা পতনের সম্ভাবনা আছে এমন কোন ক্রীড়ায় যোগদান করা অনুচিত। প্রসবের দিন যতই এগিয়ে আসে স্ত্রীলোকের নড়াচড়া করাটাও ততই শ্রমসাধ্য হয়ে ওঠে। খেলাধূলায় প্রীতিও তখন তাঁর অনিচ্ছা।

জন্মায়। এই অবস্থার শেষ পর্যায়ে ক্রীড়াবিদের শ্রমসাধ্য ক্রীড়ার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত না করাই ভাল। অনেক সময় ইহার জন্য রক্তচাপ বর্দ্ধিত হতে পারে। এই সময় অতিরিক্ত বোঝা বহন ছাড়াও দেহকে অন্য বিষয়েও অনেক বেশী কাজ করতে হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় ক্রীড়াবিদেরা এই সময় মানসিক দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে একটু বেশী রকম মুক্ত থাকেন। সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা তাঁহারা Antenatal Exercise ভালভাবে রপ্ত করেন এবং উপভোগও করেন। ক্রীড়াবিদেরা তাঁহাদের পেশী-সমূহকে অনায়াসেই আপনাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সমর্থ হন এবং ইহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ বিষয় সম্বন্ধেও সবিশেষ সচেতন থাকেন। সাধারণের ধারণা মহিলা ক্রীড়াবিদদের বস্তীদেশ (Pelvis) ছোট হয়। ইহা ভুল ধারণা। ক্রীড়াবিদ মেয়েরা স্বভাবতই সাধারণ মেয়েদের তুলনায় অধিক স্বাস্থ্যবতী এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হন। সুতরাং বৃহদাকৃতি রমণীর ক্ষুদ্র বস্তীদেশ হওয়াটা অস্বাভাবিক। ব্যায়াম ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার জন্য ক্রীড়াবিদের নিতম্ব দেশের অতিরিক্ত মেদ ঝরে যাওয়ায় উঁহাদের বস্তীদেশ অপেক্ষাকৃত ছোট দেখায়। ধাত্রীবিদ্যায় বস্তীদেশের বহিরাকৃতি অপেক্ষা বস্তী আধারের ধারণ ক্ষমতাটাই (Pelvic Capacity) প্রধান বিবেচ্য বিষয়। Kolesi Niemivera ফিনিসীয় বেস্‌বল খেলোয়াড় ও সাঁতারুদের সন্তানোৎপাদন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার গবেষণায় ৫০ জন বেস্‌বল খেলোয়াড় এবং ৪৩ জন নারী ক্রীড়াবিদ্‌কে মনোনীত করা হয়েছিল।

সাধারণ নারীদের ন্যায় ইঁহাদের বিবাহের গড়পড়তা বয়স ছিল ২৪ বৎসর। ইহাদের প্রথম সন্তানোৎপাদনের বয়স ছিল গড়ে প্রায় ২৬ বৎসর। ইহার দ্বারা এই সকল রমণীর সন্তান ধারণ সক্ষমতাই প্রকাশ পায়।

ফিনল্যাণ্ডে ছোট বস্তীদেশ সম্পন্ন (Narrow Pelvis) রমণীর সাক্ষাৎ প্রায়ই পাওয়া যায়। Niemivera ক্রীড়াবিদ্‌দের বস্তীদেশের বহিরাকৃতির পরিমাপ (External Pelvic Dimension) নির্দ্ধারণ করে প্রমাণ করেছেন ইহাদের বস্তীদেশের পরিমাপ সাধারণ রমণী অপেক্ষা বৃহত্তর। এই সকল রমণীর প্রসবকালীন যন্ত্রণাও সাধারণ রমণী অপেক্ষা অল্প হয়।

এই সকল রমণীর প্রসবকালীন সময়ও (Duration of Labour) সাধারণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়। বেস্‌বল খেলোয়াড় এবং সাঁতারুদের প্রসবকালীন সময়ের দ্বিতীয় পর্য্যায়টিও (2nd Stage of Labour) গড়ে যথাক্রমে প্রায় ৫৫ মিনিট ও ৪৪ মিনিট।

এই সকল রমণীর ক্ষেত্রে প্রসবকালীন সময়ের তৃতীয় পর্যায়টিও স্বাভাবিক ছিল। ভূমিষ্ঠ সন্তানগুলিও যথাযথ ওজন ও দৈর্ঘ্যের হয়েছিল। ইহাদের মধ্যে চারিটি শিশুই কেবল উপযুক্ত সময়ের পূর্বে জন্মেছিল। মহিলা ক্রীড়াবিদের ছোট বস্তীদেশ এবং জনন ক্ষেত্র (Rigid Perinama) সম্বন্ধীয় পূর্ববর্তী ধারণা এই রিপোর্টের দ্বারা অমূলক বলেই প্রমাণিত হয়। সাধারণত একজন ক্রীড়াবিদ সমভাবাপন্ন মন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণক্ষম হন। তাঁহার পেটের পেশী শক্তিশালী হয়। তিনি বস্তীদেশের (Pelvic floor) বিপরীতধর্মী পেশী-গুলিকেও সহজেই শিথিল করে দিতে সক্ষম হন। এই সকল কারণেই মহিলা ক্রীড়াবিদ সহজ সবল এবং নিরুদ্বেগ সন্তান প্রসবে সমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এখনও পর্য্যন্ত এমন লোকও আছেন যাদের ধারণা ক্রীড়া সাধনা মেয়েদের সন্তান ধারণের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।

সন্তানবতী মেয়েরা তাঁদের গৃহস্থালীর কথা ও সন্তান সন্ততির বিষয় চিন্তা করে হয়ত বা মনে করতে পারেন — এই পর্যায়েই তাঁর ক্রীড়া জীবনের শেষ। আমরা জানি দুই সন্তানের জননী Fanny Blankers Coen ১৯৪৮ সালের লণ্ডন ওলিম্পিকে চারিটি স্বর্ণ পদক অর্জন করে মানুষের এই ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করেছেন।

যারা সন্তান প্রসবের পরও স্বীয় ক্রীড়াজীবন অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁদের উচিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনমাস বিশ্রাম গ্রহণ। এই সময়ের পর ক্রীড়াবিদ্‌ তাঁর

কঠোর প্রশিক্ষণ আরম্ভ করতে পারেন। প্রসবান্তে কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর Postnatal ব্যায়াম শুরু করবেন।

প্রসবান্তে অনেক ক্রীড়াবিদই ক্রীড়া প্রশিক্ষণে প্রত্যাবর্তনের জন্য অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। তাঁরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন কখন তাঁরা সাঁতার কাটতে পারেন অথবা কখন তাঁরা আবার টেনিস খেলতে পারবেন ইত্যাদি। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁদের কমপক্ষে তিনমাস পর্য্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে। ইহার পর বস্তীদেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করানোর পর পুনরায় তাঁদের কঠোর প্রশিক্ষণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

সকল ক্রীড়াবিদই যে সন্তানপ্রজননকালীন কোন জটিলতায় ভুগবেন না—এমন কোন কথা নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ Severe Toximiaর জন্য প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করায় বিরত থাকতে বাধ্য হন। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পরে প্রসবান্তিক জটিলতা উদ্ভূত উপসর্গাদির চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশেষে ইহা বলা যায় উপযুক্ত নির্বাচন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত ক্রীড়া নির্দ্ধারণের দ্বারা মেয়েরা ভবিষ্যতে ক্রীড়াজগৎ এবং ব্যবহারিক জীবনে বহুল পরিমাণে উন্নতি প্রদর্শনে সক্ষম হতে পারেন।

তথ্য পঞ্জী :—

1) এ, এইচ, চার্লস, এফ, আর, সি, এ, এফ, আর, সি, ও, জি প্রণীত—"Woman in Sport" নামক প্রবন্ধ।

2) এ, জে, রেয়ান এম, ডি, ; এফ, এ, সি এস প্রণীত "Medical Problems of Athletes" নামক পুস্তক।

3 ড.: এন রায়চৌধুরী এফ, আর, সি, এস, এফ, আর সি ও জি প্রণীত—"Woman in Sport" নামক প্রবন্ধ (Journal of Indian Medical Association, Vol—61 No. 3)

ভারতের বাইরে প্রবাস
মালয় থেকে জাপানে কয়েক দিন

ডাঃ গৌরমোহন দাস

আমরা হংকং থেকে ক্যাথে প্যাসিফিক প্লেনে করে ব্যাঙ্ককের ডন্ মুয়াঙ্ (Don Muang) বিমান বন্দরে এসে নামলাম। এই নিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার এখানে নেমেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এটি একটা মস্তবড় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। এখন কোয়ালালামপুরে একটা বড় বিমান বন্দর তৈরী হয়েছে। এই ব্যাঙ্ককের বিমান বন্দরে সারা পৃথিবীর বিমান আসা যাওয়া করে। প্রতি আধঘণ্টায় একটা করে জেট ও অন্যান্য বিমান ওঠানামা করছে। এখান থেকে ব্যাঙ্কক সহরের দূরত্ব ১৮ মাইল। লিমোসিনে (limousine) করে সহরে গেলে প্রত্যেকের ২০ টিকল বা ভাট (bhat) লাগে; ট্যাক্সি করে গেলে ৫০ ভাট পড়ে আর বাসে করে গেলে ৫০ সাটাঙ্ (Satang পড়ে। একটা বৃটিশ পাউণ্ড ভাঙালে ৫২টা ভাট ও একটা আমেরিকান ডলার ভাঙালে ২০·৯০ ভাট পাওয়া যায়। একটা ভাট ভাঙালে ১০০টা সাটাঙ্ (Satang) পাওয়া যায়। একটা ভাট রূপোর টাকা, স্বর্ণবর্ণের ৫০ সাটাঙ্ মুদ্রা পাওয়া যায়। ১০০ ভাটের নোট লাল রঙের, ২০ ভাটের নোট সবুজ রঙের, ১০ ভাটের নোট চকোলেট রঙের আর ৫ ভাটের নোটের রঙ ফিকে লাল রঙের। ব্যাঙ্ক বা সরকার অনুমোদিত দোকানে বিদেশী টাকা ভাঙিয়ে এদের দেশের টাকা নেওয়া যায়। কিন্তু ভারতের মুদ্রা সকল দেশেই অচল। এদেশে ব্যাঙ্ক খোলা থাকে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। শনি ও রবিবার বন্ধ থাকে। বড় পোষ্ট অফিস (G. P. O) সহরের নিউ রোডে অবস্থিত। রবিবার ছুটি, শনিবার সকাল ৮টা থেকে বারোটা, অন্যান্য দিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিমান বন্দরে লোকজনের খুব ভীড়। পাসপোর্ট আর হেল্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে আমরা বিমান বন্দরের লাউঞ্জে এসে বসলাম। যারা ব্যাঙ্ককের ভিসা না নিয়ে ব্যাঙ্ককে যাবেন তাঁরা ২৪ ঘণ্টা সেখানে থাকতে পারবেন। ভিসা নিয়ে গেলে ৬০ দিন থাকতে পারা যায়। হোটেলের খোঁজ করতে হলে বিমান বন্দরে Tourist Organization of Bangkokএর (T O T) অফিস রয়েছে। অফিসের লোকেরাই থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দেন।

আমাদের ট্রাভেল কোম্পানীর লোক তাঁদের বাস এনে আমাদের সহরে নিয়ে চললেন। পাঁচ নম্বর প্রশস্ত রাজপথ (High way 5) দিয়ে আমাদের বাসটা চলেছে। রাস্তার দুধারে জলেভরা সরু খাল-ডুটির পাশে পাশে গরীবদের ছোট ছোট কাঠের বাড়ী আর দোকান সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় যেন ভারতের এক দরিদ্র পল্লীর মধ্যে দিয়ে বাসটা ছুটে চলেছে। থাইরা আমাদের মতনই কতকটা দেখতে

তবে তাঁদের নাকগুলো ঈষৎ একটু চাপা। এঁদের মধ্যে অনেক চীনা পরিবারও রয়েছেন দেখলাম। এঁরা সকলেই গরীব গৃহস্থ। ধনী চীনারা সকলেই সহরের উপকণ্ঠে বড় বড় অট্টালিকায় বাস করে থাকেন। থাইল্যাণ্ড, মালয় আর সিঙ্গাপুরে চীনারাই সবচেয়ে বেশী অর্থবান্ আর পরিশ্রমী। ঐ সব দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চীনারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। মালয়ী বা থাইরা বেশ গরীব। ওঁদের নিজেদের দেশে ওরাই অর্থহীন। মালয়ে থাকাকালীন একবার মালয় সরকার চীনাদের ব্যবসা-বাণিজ্য মালয়ীদের হাতে কিছুটা তুলে দিতে চেয়ে বিল উত্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এর ফলে মালয়ের সমস্ত চীনারা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। তার ফলে মালয়ের সমস্ত জায়গায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এর পর মালয় সরকার আর বিল উত্থাপন করতে সাহসী হন নি। তবে এই সব দেশের চীনারা কম্যুনিষ্ট পন্থী নন এঁরা, চিয়াংকাইশেক পন্থী। চীনদেশের সঙ্গে এঁরা কোন সংস্রব রাখেন না। এঁরা চীনদেশে কোনদিনই যান নি বা এখন যেতেও চান না। মাঝে একবার হুজুকে পড়ে চীনা কম্যুনিষ্টের প্রচার কার্য্যে অভিভূত হয়ে বেশ কয়েকজন ভাল ভাল চীনা ছেলে কম্যুনিষ্ট চীনে চলে গিয়েছিল। তারা আর সেদেশে ফিরতে পারে নি। শ্যামদেশের (থাইল্যাণ্ড) চীনারা শ্যামদেশের সমস্ত ব্যবসা নিজেদের করকবলিত করে বসে আছে। এদেশে তিরিশ মিলিয়ন লোকসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯৮ ভাগ থাই, চার লক্ষ চীনা। আর বিশ হাজার বিদেশী লোক অন্যান্য দেশ থেকে এসে এখানে বাস করছেন। যদিও থাইরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ তবুও ব্যবসাক্ষেত্রে চীনাদের অনেক পেছনে পড়ে রয়েছেন। এদেশের বেশীর ভাগ থাইরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ব্যাঙ্ককের পশ্চিমে তিরিশ মাইল দূরে অবস্থিত Nakhon Pathom সব চেয়ে পুরাতন সহর। এই সহরেই প্রথম বৌদ্ধধর্মের আগমন হয়েছিল। এইখানে একটা পুরাণো বৌদ্ধ প্যাগোডা রয়েছে। এই প্যাগোডাটি (chedi) ১৫০ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল। শ্যামদেশের দক্ষিণে অনেক মুসলমান ধর্মী থাই রয়েছেন। মনে হয় এঁরা প্রতিবেশী মালয়ীদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ মালয়ীরা সকলেই ইসলামধর্মী; এখানকার চীনারা কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তবে বেশীর ভাগ লোক কনফুশিয়ান, তারপর রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ লোক ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের। এদেশের অধিবাসীদের জাতীয় ভাষা থাইভাষা, তবে এঁরা ইংরেজীকে তার পরেই স্থান দিয়েছেন।

আমরা পাঁচ নম্বর হাইওয়ে দিয়ে চলেছি। বেশ খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা রাস্তার চৌমাথায় এসে পড়লাম। চৌমাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। যুদ্ধে যারা মারা গেছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্যেই এই স্মৃতিস্তম্ভটী তৈরী হয়েছে। এটা খুব উঁচু ও এর চারদিকে অনেকগুলি সশস্ত্র সৈনিকের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রয়েছে। এর উপরিভাগটী মিনারের মত সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। আমরা এটার পাশ কাটিয়ে Phya Thai রাজপথে পড়ে সোজা এগুতে লাগলাম। আকাশে মেঘ করেছিল, এখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ীর কাচগুলো সব উঠানো ছিল। যে দু'একটা খোলা ছিল সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। এ সময়টা ঠিক বর্ষাকাল নয় তবে জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এই রকম ছিরঝিরে বাদলা হয়ে থাকে। এদের বর্ষাকাল মে মাস থেকে সুরু হয়। এই সময় প্রচণ্ড বর্ষণ হয়ে থাকে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা থেকে তিন দিন পর্য্যন্ত এই বৃষ্টি স্থায়ী হয়। এই সময় রাস্তাঘাট বেশ কাদা কাদায় হয়ে যায়। জুন মাসে ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাত কমে আসে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরেও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয় তবে এখানে বেড়াবার সময় হচ্ছে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস। এই সময় বৃষ্টিবাদল থাকে না, আর দিনের তাপমাত্রা খুব বেশী হয় না। দিনগুলি রৌদ্রময় থাকে আর রাত্রিটা বেশ আরামদায়ক। সারা বছর প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি বারিপাত হয়ে থাকে। এই বৃষ্টি আর প্রচুর খালের (Klong) আধ

Menam Chao Phraya নদীর জন্যে এদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান হয়ে থাকে। আর তার জন্যেই এদেশ চাউল রপ্তানীর জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে। নানা রকমের যানবাহন এই পথ দিয়ে চলেছে তবে সহরের তুলনায় লোকের ভীড় এদিকে খুবই কম। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর আমাদের বাঁদিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর ঘেরা বেশ বড় একটা অট্টালিকার সারি দেখতে পেলাম, অট্টালিকার সামনে ও পেছনে প্রকাণ্ড চত্বর। এইটাই হচ্ছে Churalongkorn বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ব্বে এর মধ্যে প্রবেশ করে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টা ভালভাবে দেখে এসেছিলাম। এর প্রফেসর ও ছাত্রদের সঙ্গেও কথাবার্ত্তা বলেছিলাম। এখানে সব বিদ্যাই পঠিত হয়ে থাকে। তবে বেশীরভাগ ছাত্র কলাবিদ্যার জন্যে এখানে এসে থাকে। এখানে বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা পঠিত হলেও কলাবিদ্যার ছাত্রের তুলনায় বিজ্ঞান ছাত্র খুবই নগণ্য। তবে এখনকার কথা আমি বলতে পারব না। এটা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে। ব্যাঙ্ককে আরও একটা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেটাতে অন্যান্য বিষয় পঠিত হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে আমরা খাস সহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটা জনাকীর্ণ, মোটর গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিকশা, ঠেলা গাড়ী আর সাইকেলে ভর্ত্তি। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের যাতায়াত করাই এখানে দায় হয়ে উঠেছে বলে মনে হল।

এরপর চতুর্থ রাম। রাজপথের ওপর দিয়ে আমাদের বাসটা চলতে সুরু করল। এখানের রাস্তার নাম দেখে আমাদের এক সঙ্গী চীনাশিক্ষক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "শুনলাম আপনি এখানে অনেকবার এসেছেন। এর ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। কারণ জাপানে থাকবার সময় জাপানের ইতিহাস আপনার পড়া রয়েছে দেখলাম।"

"হ্যাঁ, কিছু কিছু জানি। যে দেশে যাই সে দেশের ইতিহাস যতটা সম্ভব পড়ে তবে সেখানে যাই। আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন তা না বললে ত আমি বলতে পারব না।"

"আমি বলছিলাম যে, যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটার নাম চতুর্থ রামা রাজপথ। এই নামটা কি রামায়ণের রামার নাম থেকে নেওয়া হয়েছে না অন্য কোন বিখ্যাত লোকের নাম?"

আমি তাঁর উত্তরে জানালাম "এই রামা সম্বন্ধে বলতে গেলে থাইল্যাণ্ডের একটা ছোটখাটো ইতিহাস আপনাকে শোনাতে হয়। সেই ইতিহাসটা আমি গত বছর এখানে ঘোরার সময়ে এখানকার গাইডের মুখে শুনেছিলাম।"

তিনি আমার কথা শুনে বল্লেন, "এখনও হোটেলে পৌছাতে আমাদের অনেক দেরী রয়েছে। আপনি এর ইতিহাসটা আমায় সংক্ষেপে বলে যান আমি শুনব, অবশ্য যদি আপনার বলতে কোন বাধা না থাকে।"

আমি তাঁকে এর ইতিহাসটা বলতে সুরু করলাম। আমার স্ত্রীটা মুখটিপে হেসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললেন। তাঁকে দেখে আমার মনে হল যে তিনি যেন আমায় জানাতে চান যে শিক্ষকের ওপর এবার শিক্ষকতা করতে যাচ্ছ সাবধান হয়ো। উপায় নেই, তাই বলতেই হ'ল।

থাইল্যাণ্ডের আদি অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটোরা। এখন তারা এদেশ থেকে সরে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে বসবাস করছে। দু'হাজার বছর পূর্ব্বে তারা Khmer জাতির দ্বারা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তখন কাম্বোডিয়া শ্যামদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। Khmerরা এক হাজার বছরের ওপর এদেশে রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ Angkor তাঁদের রাজধানী ছিল। তা ছাড়াও তাঁদের ২টি প্রধান সহর ছিল। তন্মধ্যে একটি লোপবুরি (Lopburi) আর অন্যটা পিমাই (Pimai)। লোপবুরি ব্যাঙ্ককের উত্তরে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। আর পিমাই লোপবুরি থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে হবে। এই সময়ে থাইরা তাঁদের একটা নিজস্ব স্বাধীন রাজধানী গঠন করেছিলেন। এই থাইরা চীনদেশেরই অধিবাসী ছিলেন। এঁরা চীন

দেশের Yantze নদীর উপত্যকা থেকে শ্যামদেশের দক্ষিণে Chao Phraya নদীর ধারে এসে বসবাস করেছিলেন। যেখানে তাঁরা রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সেই জায়গাটি ছিল দক্ষিণ চীনের Nauchaoতে। এখনও সেখানে অনেক থাই বসবাস করেন। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে থাইল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন কুবলাই খানের মোঙ্গল সৈন্যদল Nauchao অধিকার করতে এল তখন থাইরা ভয়ে ভয়ে ও দলে দলে Naucho ছেড়ে থাইল্যাণ্ডে এসে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে Khmerদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ও তাঁদের পরাজিত করে তাঁদের উত্তর ও মধ্য থাইল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারপর ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা Khmer সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে তাঁদের ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁরা তখন Angkor ত্যাগ করে যে যেদিকে পারলেন সেদিকে পালিয়ে গেলেন। Angkor-এর রাজধানীতে আর কেউ রইলেন না। রাজধানীটি পরে জঙ্গলে পরিণত হ'ল। এই Angkorএর জঙ্গলের মধ্যেই হিন্দুদের নির্মিত মস্তবড় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। এই বিরাট মন্দিরটিই হচ্ছে Angkor Wat। থাইরা Angkor জয়ের পর সেখানে রাজধানী পত্তন না করে Sukhothai নামক উত্তর থাইল্যাণ্ডের একটি জায়গাতে রাজধানী পত্তন করলেন। Sukhothai থাই ভাষার অর্থ "সুখের প্রভাব"। এই রাজ্যের তৃতীয় শাসনকর্তা Rama Kamhaeng খুব শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশ, লাওস ও কাম্বোডিয়ার কতক অংশ তাঁর রাজত্বের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তিনিই থাইল্যাণ্ডে (শ্যামদেশে) প্রথম চীনা কুম্ভকারের একটি দলকে চীনদেশ থেকে তাঁর রাজত্বে আনিয়ে ছিলেন। তারা এসে এখানকার বিখ্যাত Sukhothai ও Sawn-kalok নামক মৃৎপাত্রাদি তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল। তিনিই প্রথমে থাই আইন তাঁর রাজত্বে প্রণয়ন করেছিলেন ও তিনিই থাই বর্ণমালার উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই সময় বৌদ্ধধর্ম দেশের মধ্যে ভালভাবেই নিজের স্থান করে নিয়েছিল। আর এই ধর্মের প্রভাবে দেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। সত্যই এই সময়টা থাই-শিল্পের সুবর্ণযুগ বলা চলে। এই সুবর্ণযুগ এরপর একশত বৎসর পর্য্যন্ত চলেছিল। ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যটা Ayutthayaর অধীনে গেল। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে পুরা রাজধানীটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। Ayutthaya সহরটা ব্যাঙ্ককের উত্তরে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটা চার শতাব্দী ধরে ব্রহ্মদেশের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হতে হতে ১৭৬৭ সালে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের হাতে পরাজয় বরণ করেছিল। Sukhothai সহরটির মত Ayutthaya বিখ্যাত হতে পারেনি। কিন্তু এর শাসনকর্তারা এখানে বড় বড় প্রাসাদ ও বড় বড় মন্দির তৈরী করেছিলেন। এখনও সেই সব প্রাসাদ আর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে সেখানে এই সব ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ দর্শন করতে যান।

ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের হাতে যখন Ayutthayaর পতন হ'ল তখন একজন থাই জেনারেল Phraya Tak Sin তাঁর পাঁচশত অনুচর সমভিব্যাহারে থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এক বছরের ভেতর Ayutthaya থেকে ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করলেন। কিন্তু তিনি ওখানে আর নতুন করে রাজধানী তৈরী করলেন না। তিনি সেখান থেকে Chao Phraya নদীর পশ্চিম তীরে Thonburiতে রাজধানী স্থাপন করলেন। এ জায়গাটা Ayutthaya থেকে ৪৫ মাইল দক্ষিণে ও শ্যাম উপসাগর থেকে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কিন্তু এখানে রাজধানী তৈরী করেও তিনি শান্তি পেলেন না। সবসময়েই তিনি ব্রহ্মদেশীয় আক্রমণকারীদের ভয় করতে লাগলেন। কারণ থনবুরির জায়গাটা খুব নিরাপদ ছিল না। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে Tak Sinএর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী Chao Phraya Chakri (ইনি পরে প্রথম রামা উপাধি নিয়েছিলেন)

নদীটার পূর্ব্বতীরে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এর নাম তিনি থাই ভাষায় রাখলেন ব্যাঙ্কক। এর অর্থ "দেবদূতের সহর।" প্রথম রামার পর তাঁর বংশধরেরা এখনও রাজত্ব করে যাচ্ছেন। এই রাজপথটা চতুর্থ রামার নাম অনুসারে নামকরণ হয়েছে। আর ব্যাঙ্ককে সবচেয়ে পুরাতন রাস্তা হল নিউ রোড; এটা ১৬ই মার্চ্চ ১৮৬৪ সালে তৈরী হয়েছে। এটা এখন আধুনিকভাবে গঠিত হয়েছে। জনসাধারণের অফিসে যাতায়াতের সময়ে এই রাস্তাটীতে এত ভীড় হয়ে থাকে যে সকল প্রকার যানবাহনের গতি হ্রাস পায়। এর ওপর দিয়ে ট্রামগাড়ী যাতায়াত করে থাকে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ী ছিল। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এটা বিদ্যুৎচালিত হয়। ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে ইতিহাস শুনে খুব খুশী হয়ে আমায় ধন্যবাদ জানালেন।

একটু পরে আমাদের বাসটি Surasakdi রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড একটি আধুনিক নতুন তৈরী রামা হোটেলের কাছে এসে থেমে গেল। কলকাতায় ফেরবার পথে এই হোটেলে আরও একবার একরাত্রি বাস করেছিলাম। শুনেছিলাম হোটেলটি একটি থাই বিধবা মহিলার সম্পত্তি। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এই হোটেলটি তিনি তৈরী করেছেন। এই হোটেলের মধ্যে ১৭৪টি ঘর আছে। একজনের থাকার জন্যে ২৪০ থেকে ৩২০ ভাট পড়ে আর দু'জনে থাকতে গেলে ডবলরুমের ভাড়া পড়ে ৩০০ থেকে ৩৭০ ভাট। এগুলি সবই প্রথম শ্রেণীর হোটেল। আমরা আরও কয়েকবার Suriwongse রোডের Trocadero হোটেলে থেকে এসেছি। এগুলি প্রথম শ্রেণীর নীচের তলার হোটেল। এদের এখানে খাওয়া দাওয়া খুবই উচ্চ ধরণের। আমাদের বিমান কোম্পানী আর টুরিষ্ট কোম্পানী খাওয়া থাকার খরচ দিয়েছিল। তা না হলে ঘর ভাড়ার সঙ্গে খাওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। যারা ঘর ভাড়া নেবেন তাঁদের বাইরে খেয়ে আসতে হবে। আর তা না হলে এখানকার খাওয়ার খরচ তাঁদের পকেট থেকে বের করতে হবে।

হোটেলের কাঁচের দরজার সামনে পা দিতেই দরজাটি আপনা হতেই খুলে গেল। আমরা অবাক্ হলাম না কিন্তু অন্যান্য বন্ধুর দল অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন কি ওঁদের মধ্যে একজন আবার বাইরে এসে ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। হোটেলের সামনের দিকের প্রায় সবটা মোটা কাঁচ লাগানো। বাইরে থেকে ভেতরে কি হচ্ছে দেখা যায়। ভেতরে ঢুকেই অফিস কাউন্টার। সেখানেই আমাদের ঘরের নম্বর দিতে আমরা সকলেই যে যার ঘরে বিশ্রাম করতে চলে এলাম। লিফ্‌টেও তাই, সেখানে কোন লিফট্‌ম্যান নেই। সামনে পা দিতেই লিফ্‌টের দরজা খুলে যায় ও ভেতরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমার বন্ধুদের একজন দোরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা কয়েকজন তার মধ্যে ঢোকবার পর তবে তিনি লিফ্‌টে ঢুকলেন। তারপর বোতাম টেপা, তারপর লিফ্‌টে করে উপরে ওঠা। ঘরগুলি সব দামী দামী আসবাবে ভর্ত্তি। একদিকে মস্তবড় পুরু রবারের গদি পাতা খাট- তারপর অন্যদিকে সুন্দর আলমারি ও সোফাসেট। মেঝেতে লালরঙের পুরু গালিচে পাতা, বাথরুম ঘরের মধ্যেই রয়েছে। স্নান সেরে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। গিন্নীর ইচ্ছা হল দু'কাপ চা ঘরের মধ্যেই খাবেন। ডাইনিং টেবিলে যেতে চাইলেন না। বোতাম টিপে দু'কাপ শুধু চা অর্ডার দেওয়া হ'ল। চায়ের শিকার নেই, শুধু জলো চা দুধ আর চিনি দিয়ে গলায় ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিল এ'ল এগারো টাকা। দু'কাপ চায়ের দাম এগারো টাকা? চোখ কপালে উঠে গেল। বোধহয় কোথাও ভুল হয়েছে। তাই ঘর থেকেই নীচের অফিসে ফোন করলাম। বিল ঠিকই আছে, রুম সার্ভিসের জন্যেই এত দাম। পকেটে টাকা ছিল, দিয়ে দিলাম। আবার সঙ্গে টিপস্ দিতে হল। বেয়ারা সেলাম বাজিয়ে চলে গেল। ও চলে যেতে আমি গিন্নীর মুখের দিকে তাকাই, গিন্নীও আমার মুখের দিকে তাকান। বিবাহের সময়ের মত আমাদের যেন আর একবার ছাদনাতলার শুভ-দৃষ্টি হয়ে গেল। এখানে টুরিষ্ট কোম্পানী আমাদের দু'দিন রেখে ডিনার, লাঞ্চ আর ব্রেকফাষ্ট দেবেন ও

কয়েকটি দর্শনীয় স্থান তাঁরা দেখাবেন। কিন্তু ভাসমান বাজার (floating market) দেখতে হলে আমাদের নিজের খরচায় দেখতে যেতে হবে। আমরা বেশ কয়েকবার এদেশে এসেছি কিন্তু ভাসমান বাজার আমাদের কখনও দেখবার সুযোগ হয় নি। বাজার দেখতে গেলে ভোর বেলায় বেরুতে হয়। সকাল দশটায় প্লেন থাকত তাই আর আমাদের দেখা হয়ে ওঠে নি। একবার অবশ্য এখানে প্লেনের অভাবে দিনকয়েক আটকা পড়েছিলাম, তখন হাতে বেশী পয়সা ছিল না। বাবা মা ও আমার সেজ মেয়ে মঞ্জু সঙ্গে ছিল। একলা ত আর যেতে পারি না। এবারও আমাদের দেখা হবে কি না তাই ভাবছি। জাপান থেকে ফেরবার পথে হাতের টাকাকড়ি সব খরচ করে বসে আছি। যে কটি টাকা আছে তাতে ওখানে যাওয়া চলবে বলে মনে হয় না। আবার যে গাইড আমাদের সঙ্গে যাবেন তাঁরও খরচ আমাদের যোগাতে হবে। প্রত্যেকের প্রায় একশত ভাট যেতে আসতে খরচ পড়বে। মালয় থেকেও এখানে টাকা আনানো যায় না। কারণ মালয় থেকে বৃটিশ কমনওয়েল্থের মধ্যের সব দেশে টাকা পাঠান যায়, অন্যান্য দেশে পাঠানো যায় না। সকলের সঙ্গে সলাপরামর্শ করলাম। অনেকের হাতই ফাঁকা তবে দু'চার জনের কাছে কয়েকশত ডলার এখনও উদ্বৃত্ত রয়েছে। পরামর্শ করা হ'ল যে সেই টাকা থেকেই আমাদের খরচ করা হোক আর বাড়ীতে ফিরে তাঁদের টাকা শোধ করলেই হবে। সকলেই রাজী হয়ে গেল। আসছে কাল ভোরেই আমার ভাসমান বাজার দেখব বলে গাইডকে জানিয়ে দিলাম।

সকলেই আজ রাত্রিবেলা আমাকে গাইড করে ঘুরতে চান। যদিও আমরা স্বামী-স্ত্রীতে অনেক মন্দির দর্শনও অনেক কেনাকাটা এখানে করেছি তবুও বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে। মন্দিরে এখন যাওয়া যাবে না। মন্দিরগুলো বিকাল পাঁচটার পর সব বন্ধ হয়ে যায়। তবে জিনিষপত্তর কেনাকাটা বা থিয়েটার সিনেমা দেখা যায়। কিন্তু তাতেও অর্থের দরকার তাঁদের জানালাম। অনেকেই জানালেন যে তাঁদের কাছে যা আছে তাতে করে থাই নাচ বা থিয়েটার দেখতে পারা যাবে। সিনেমা ত বাড়ীতে গিয়েই দেখা যেতে পারে।

থাই নাচ দেখতে যাওয়াই স্থির হ'ল। কারণ থাই নাচ শুনেছিলাম খুবই বিখ্যাত, আমার তখন দেখার সুযোগ হয়নি। অনেকবার আমি ঐ নাচ দেখতে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সব সময়েই 'হাউস ফুল' থাকত। আর না-হয় সেই সময়ে নাচ একেবারেই হত না। সকলকেই সাবধান করে দিয়ে বললাম যে তাঁরা যেন সকলে কোট আর টাই এঁটে প্রস্তুত হয়ে থাকেন তা না হলে নাচঘরের দরোয়ান হয়ত ক্ষুজিয়া হোটেলের মত আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। তাঁরা সকলেই সহাস্যে মত দিলেন যে ভদ্র ভাবে তাঁরা কোট আর টাই পরেই নাচ দেখতে যাবেন। মিঃ চেং এতক্ষণ ধরে আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন "ওখানে যুবতী থাই সুন্দরীদের নাচ হবে, না জাপানের থিয়েটারের মত পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচবে? তা যদি হয় আমি যাব না। ভদ্রলোকের সে কথা এখনও মনে আছে দেখছি সেখানে পুরুষদের যুবতী নারী ভেবে যা কীর্ত্তি করেছিলেন তা এখনও আমার মনে আছে। দর্শকটা যখন পুরুষ বলে তাঁর ভুল ভাঙালেন তখন তাঁর কি আপশোষ! মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস তিনি সেদিন ফেলেছিলেন। ওঁর কথা শুনে আমি তাঁকে জানালাম যে তাঁরা একটিও পুরুষ নয়, আর বয়সে তাঁরা পূর্ণ যুবতী। শুনেছি নাচঘরের ম্যানেজার যুবতী সুন্দরী মেয়েদের বেছে বেছে তবে নাচে নামবার অনুমতি দেন। তাঁকে একটু মিথ্যা করে বানিয়ে বললাম। মিঃ চেং শুনে খুব খুশী হলেন ও টিকিটের কত দাম আমাকে তা জিজ্ঞাসা করলেন।

হোটেলের অফিসে গিয়ে খোঁজ করে জানতে পারলাম যে সবচেয়ে কমদামী আসনের মূল্য ত্রিশ ভাট; তবে আজ আমরা টিকিট পাব কি না সেটা

সন্দেহজনক। কারণ, কয়েকদিন আগে থেকেই এই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। মিঃ চেং-এর মুখটা খুব মলিন হয়ে গেল। তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম যে তাঁর হতাশ হবার কোন কারণ নেই। যদি ওখানকার সুন্দরীদের দর্শন না মেলে তা'হলে আমার জানাশোনা অনেক স্থান আছে সেখান থেকে তাঁকে ঘুরিয়ে আনা হবে। আমার কথা শুনে মিঃ চেং-এর মুখে হাসি দেখা গেল। তার-পর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষকে নিয়ে ঘরে সাজগোজ করতে চলে গেলেন। সকলেই আমার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি যে কখনও ঐ সব জায়গায় ঘোরাফেরা করিনি তা সকলেই জানেন। আমি তাঁদের হাসতে দেখে বললাম যে ওখানে নাচ না দেখাতে পারলেও আমি তাঁদের পার্কে নিয়ে গিয়ে নাচ দেখাব। পার্কে আমেরিকান সৈন্যদের জন্যে বেশী ভীড় হয়ে থাকে। আমরা যে সময়ে ওখানে গিয়েছিলাম তখন সারা থাইল্যাণ্ড আমেরিকান সৈন্যে ভর্তি ছিল। তার-পর কয়েক বছর পরে তারা স্বদেশে ফিরে যায়।

ক্রমশঃ

মধ্যযুগের সন্ত কবি

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন এখানে সভ্য জাতির বসবাস ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে ছিল শবর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি বর্বর জাতি। এ সকলকে যে একই ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা গিয়াছিল তার কারণ আর্যদের পরিকল্পনায় মানুষের অন্তিম আশ্রয় সর্বার্থসাধক স্বর্গলোক ছিল, এমন এক দেবসমাজ ছিল যে দেবতারা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক হয়েও সামান্য মানুষের ব্যাপারে জড়িত থাকতেন, আর সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, দেবতারা ছিলেন মন্ত্রের বশ, বলি-নির্ভর, মানুষ যজ্ঞ না করলে আহার্যের অভাবে তাঁদের জীবন ধারণ অসম্ভব হ'ত। সুতরাং নিরাপত্তাকামী মানুষের পক্ষে এই ধর্মে টেনে আনা শক্ত হ'ল না। কারণ এই প্রক্রিয়ার বৃহদংশই তার নিজের আয়ত্তে, আর দেবতা নির্বাচনে কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না।

কিন্তু এই উদারতার ফলে ধর্মের আদিম আর্যরূপ অনেকখানি বদলে গেল। যারা দলে মিশলেন তাঁরা আর্যদের বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের সাফল্য স্বীকার করে নিয়ে এলেন নিজেদের দেবতা-উপদেবতা, পূজা-পদ্ধতি সংস্কার-আড়ম্বর। এই মিশ্রণের ফলে ধর্মের একীভাব নষ্ট হ'ল বটে কিন্তু তার পরিধি গেল বেড়ে, এবং এই নবোদ্ভূত হিন্দুধর্মের ছত্রতলায় শক, পহ্লব, হূণ, সকলেই নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে এর সামিল হ'ল। ভারত-প্রবাসী গ্রীকরাও যে হিন্দুধর্মে অনুরাগী ছিল ইতিহাসে তার নজির মেলে।

যারা মিশে গেলেন তাঁদের আদি ধর্ম ছিল অসংবদ্ধ, বিশ্বাস ছিল আলগা, ধর্মের পাকে সমাজ গ্রন্থিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে তাঁরা আশ্রয় নিলেন তাতে মানুষের ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক,—ব্যাপক জীবনের সব পর্দাগুলি "ধর্ম" আখ্যার বিস্তৃত পরিসরে ক্রমশঃ অনড় ভাবে বাঁধা হতে লাগল। এই হিন্দুধর্মকে একদিন ইস্‌লামের সুপ্রথিত জগজ্জিগীষু ধর্মের সঙ্গে

মোকাবিলা করতে হ'ল খ্রীঃ শতেক ত্রয়োদশ। একেশ্বরবাদী জাতি-বিভাজন-রহিত, সাম্যবাদী, ধর্ম গ্রহণের আহ্বানে প্রসারিত-বাহু, পরমত-অসহিষ্ণু প্রবল ইস্‌লাম ধর্ম যখন দুর্ধর্ষ সৈন্যের পশ্চাতে প্লাবনের মত দেশে বয়ে গেল তখন হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রীরা প্রমাদ গুনলেন। একদল নিশ্চয় করলেন হিন্দুধর্মকে আরও দৃঢ় করে শতপাকে বাঁধবার, উদ্ভব হ'ল মেধাতিথি, বিজ্ঞানেশ্বর, হেমাদ্রি, স্মার্ত রঘুনন্দনের, যাঁরা বিধি-নিষেধ, ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিচারের সাবধানী চিকিৎসায় মুহ্যমান হিন্দুধর্মের প্রাণ রক্ষার সংকল্প করলেন; সেকালের কবিরাজ যেমন অনশন এমনকি নির্জলা অবস্থাকেই রোগ মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করতেন। এই রক্ষণশীল চরমপন্থীরা হিন্দুসমাজের অন্ততঃ উচ্চ ও মধ্য স্তরের লোকদের ধর্মান্তর গ্রহণ থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন।

দেশগ্রাসী সর্বনাশী প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করতে স্মার্ত পণ্ডিতেরা বাড়ীর দরদালান ত্যাগ করে চিলে-কোঠায় উঠলেন, একতলার লোকের কি হ'ল তার দিকে নজর দেবার উদারতা ও নিঃস্বার্থতা তাঁদের ছিল না। কোঠাবাড়ীর বুনিয়াদ মজবুত ছিল তাই ভেঙ্গে পড়ল না, কিন্তু দেওয়ালে ফাটল ধরল; উপরতলার লোক কোনমতে টিকে রইলেন। গৃহস্থালির কাজ তাঁরা সেই উঁচুতে থেকেই চালালেন, কেনা-বেচা করলেন সেইখান থেকেই, দড়ি দিয়ে ঝুড়ি নামিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে। কিন্তু যাঁরা নিচের তলার লোকদের বাঁচাবার উপায় ভেবেছিলেন তাঁরা মনস্থ করলেন যে, এই বন্যার জল যে কতটা উঠবে, কতদিন থাকবে তার স্থিরতা নেই, অতএব নৌকাই প্রকৃষ্ট আশ্রয়, জল যতদূরই উঠুক না কেন, নৌকা তার উপরই থাকবে। অতএব তাঁরা গৃহত্যাগ করলেন।

এদের মধ্যে একদল ভক্তিবাদী। ঘর ছাড়বার সময়ে এঁরা শাস্ত্রগ্রন্থ, গৃহদেবতা, উপকরণসম্ভার সঙ্গে নিলেন এবং যেখানে একটু উঁচু দ্বীপ পেলেন সেখানে আশ্রয় নিলেন। শুষ্ক জ্ঞানকর্ম পরিত্যাগ করে এঁরা প্রেম-ভক্তির রসময় আশ্রয় নিলেন, যে আচার শুধু পালনীয় কর্তব্যের জপমালা হ'য়ে উঠেছিল তা'তে আনলেন নিষ্ঠা, কুলদেবতা হ'লেন ভক্তের ভগবান্‌, অন্তর্যামী। এঁদের ছিল পৌরাণিক অবতারের সাকার উপাসনা, প্রেমের বন্ধনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে এঁরা সংসার-বিপাক আর মনের অবস্থা থেকে অব্যাহতি চাইলেন। মায়াকে ভগবানের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপিত করে এঁরা তাকে গ্রহণ করলেন লীলা বলে, মায়ার প্রতি এঁদের ভ্রূকুটি বৈরাগ্য নেই। ভক্তিধর্মের এই নূতন সংস্করণের সূত্রপাত হয় দক্ষিণ দেশে, ক্রমশঃ তা উত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হয়। বৈষ্ণবরা একতলার লোকদের অল্প-বিস্তর সঙ্গে নিলেন, জাতিভেদ, পংক্তিদোষ বর্জনের চেষ্টা কার্যকর না হ'লেও মুখে এঁরা স্বীকার করেছিলেন। যে দ্বীপে আশ্রয় নিলেন সেখানেই মনোরম কুঞ্জবন রচনা ক'রে পারিপার্শ্বিকের সৌম্য সুষমায় মুগ্ধ হ'য়ে লীলা স্মরণ কীর্তনে ডুবে রইলেন।

আর একদল লোক—যাঁরা অধিকাংশই একতলার লোক—তাঁরা নৌকাযাত্রা করলেন বটে কিন্তু উঁচু ডাঙায় ভিড়লেন না, খুঁটী গাড়লেন না, পাছে কোন গণ্ডীতে আটকে পড়েন। আত্মবিশ্বাসের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা হারিয়ে আজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট পদ্ধতির বাধ্যতার বেড়াজালে ধরা পড়েন এই তাঁদের ছিল পরম ভয়, তাই তাঁরা কূলে নৌকা লাগালেন না। ঘর ছাড়বার সময়ে এঁরা পুতুল খেলার ভগবানকে সঙ্গে নিয়ে যান নি, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি যার সঠিক পাঠোদ্ধার দুষ্কর তাকে পরিহার করলেন, শুধু অনাবশ্যক নয়, অহিতকর বোধে, এবং যাঁরা শাস্ত্র ও বিগ্রহ আঁকড়ে ছিলেন তাঁদের করলেন নিন্দা। অথৈ জলে নিসর্গ ডুবে গেছে তার শ্যাম মনোহর নিত্য পট-পরিবর্তনকারী ঋতুরূপ তাঁরা দেখতে পাননি, তরী ভাসিয়েছেন সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে, নাবিক ছিলেন মনের মধ্যে এবং তাঁকেই একাগ্র উপাসনার অর্ঘ্য দিয়েছেন—কখনও বা দেহতাত্ত্বিক রহস্য ভেদ করে দেহীকে জানবার বাসনায়, কখনও বা অন্তর্যামীর কাছে প্রেমস্বরূপ ভাব-সমাধির পূর্ণ আত্মদানে এঁরা বেদ পুরাণ সমীক্ষণ করেছেন কিন্তু অভ্রান্ত ব'লে

মানেন নি। অন্তঃকরণ যথেষ্ট দায়ক বলে এঁরা বহির্বিশ্বকে তেমন আমল দেন নি; মায়াকে দেখেছেন বিভ্রান্তির মূল কারণ রূপে। একতলার লোক এঁরা, কাজেই একতলার লোককে কাছে টানতে রক্তের টানই যথেষ্ট ছিল, দার্শনিক যুক্তির আবশ্যকতা ছিল না। এঁরা যুক্তি তত্ত্বের মাষ্টারি করেন নি, অনুভূ বচন ছড়িয়ে গেছেন, যারা শুনেছে তারা শুনেছে। এই যাত্রা শুরু হয় উত্তর ভারতে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে, পরে প্রসারিত হয় দক্ষিণে। উত্তর ও মধ্য-ভারতে এঁরা সন্ত নামে পরিচিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে "অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" (২।৬), কেউ যদি ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন ইহা জানেন তাঁকে সন্ত মনে করা হয়।

বাসিন্দাদের বাকি অনেকে নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করলেন, কেউ বা তলিয়ে গেলেন। এ সবের মধ্যে আপন মর্মবাণী কাব্য-সঙ্গীতে গভীর ভাবে অঙ্কিত রেখে গেছেন মুখ্যতঃ এই ভক্ত এবং সন্তরা। সে যুগের অধ্যাত্ম-রস-সাহিত্যের আলোচনায় তাই এঁদের প্রধান স্থান। রক্ষ্যমাণ বিষয় সন্ত-কবি।

সন্তদের জীবনী ও জীবৎকাল সবক্ষেত্রে বিদিত নয়, অনেকের বেলায় কিংবদন্তী ও অনুমানের ওপর নির্ভর। যতদূর জানা যায়, কবীর ও রৈদাস কাশীর লোক, খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। দাদূ ছিলেন খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে, রাজস্থানে। রজ্জব, গরীব দাস ও সুন্দর দাস দাদূর শিষ্য, রাজস্থানে বসবাস, বিদ্যমান ছিলেন খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মলুক দাসও ঐ সময়ের লোক, বাস এলাহাবাদে। চরণদাস দিল্লী অঞ্চলের লোক, খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর। শিবদয়াল ও পলটু দাস জীবিত ছিলেন খ্রীঃ উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, প্রথম জন আগ্রায়, দ্বিতীয় জন অযোধ্যায়। তুলসী সাহেব পুণার লোক পেশোয়া-বংশজ এবং পেশোয়া পদের উত্তরাধিকারী ছিলেন কিন্তু সে দাবী ছেড়ে দিয়ে সামান্য সাধুর ন্যায় উত্তর প্রদেশের হাথরসে বসবাস করেন খ্রীঃ উনিশ শতাব্দীতে।

সন্তদের রচনা থেকে কিছু উদ্ধারণ নীচে দেওয়া হ'ল। হিন্দী আর বাংলার উচ্চারণ-ভেদের কারণে হিন্দী বানান সর্বত্র রক্ষা করা হয়নি, বানান কিছুটা বদলাতে হয়েছে যাতে উচ্চারণ যথাসম্ভব হিন্দী অনুগামী হয়। "হৈ"-এর বাংলা উচ্চারণ হই, কিন্তু হিন্দীতে কতকটা হয় এর অনুরূপ, তাই হিন্দীতে হৈ থাকলে বাংলায় হয়েছে হয়। সেইরকম "মৈ"-এর স্থলে ময়। "ক্যা" না লিখে লেখা হয়েছে ক্যায়া, কহা না লিখে লেখা হয়েছে কহ্য়া। বাংলায় অন্তস্থ ব-এর উচ্চারণ নেই তাই বাংলায় য় বা ওয় ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন "পিবৈ"-এর স্থলে পিওয়ৈ, "ফিরাবে"-এর স্থলে ফিরাওয়ে, "পিব" বা "পীব"-এর স্থলে পিয়, "জ্যুঁ" অর্থে যেমন, তাই এখানে লেখা হয়েছে যুঁ। সন্তদের রচনায় তৎসম ও তদ্ভব শব্দে শ-ষ-স, জ-য, ন-ণ-এর ব্যবহার যথেচ্ছ; উচিত অক্ষর ব্যবহারের চেষ্টা এখানে করা হয়েছে। হিন্দীর "য"এর স্থলে য় ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চারণ রক্ষার্থে।

হিন্দীর ছন্দ মাত্রাবৃত্ত, স্বরের লঘু গুরু ভেদ আছে কিন্তু মাত্রা বজায় রাখতে বানানের ব্যতিক্রম হয়েছে, হ্রস্ব ই-কার উ-কার-এর স্থলে দীর্ঘ ঈ-কার ঊ-কার এবং তদ্বিপরীতের বহু ব্যবহার আছে। এতে ছন্দের মাত্রা রাখতে গিয়ে ভাষা-বিভ্রাট ঘটেছে। ব্রজবুলিতে কিন্তু ই-কার উ-কারের বৈষম্য না ঘটিয়ে প্রচলিত বানান বজায় রেখে পড়বার সময়ে মাত্রানুগ করে পড়ার রীতি আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই নিয়মে বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে।

চরণের স্বল্প-পরিসর হেতু ভনিতায় অনেক সময়ে শুধুই পদকর্তার নাম থাকে, কোনও ক্রিয়াপদ থাকে না, পদকর্তা বলেছেন, না পদকর্তাকে সম্বোধন ক'রে বলা হচ্ছে সেটা বোঝা কঠিন। কোথাও বা সর্বনাম থেকে বোঝা যায়, "নিন্দক বপুরা পর উপগারী, দাদূ নিন্দা করে হমারি"—এখানে অবশ্যই অর্থ করতে হবে "দাদূ বলে আমার নিন্দা করে।" কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই নামটি কর্তা না কর্ম পদ সেটা অনির্ণেয়। উত্তরপ্রদেশের অভিজ্ঞ আলোচকরা ভনিতার কবি নামকে সম্বোধন মনে করেন, সম্বোধিত নয়।

(২)

সন্তদের অনেকেই অন্ত্যজ হয়েও নিপীড়ন সত্বেও ধর্মত্যাগ করেন নি, ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা না করে ধর্মের যা-কিছু ঈশ্বর-উপলব্ধির উপযোগী তাকেই গ্রহণ করে বাকি বহিরংশটা বর্জন করেছেন, এর মধ্যে ধর্ম প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু ছিল নিজের উপলব্ধির তীব্রতাকে ব্যক্তমানসে পরিগ্রহ করা এবং অনুভূতির চরম মুহূর্ত-গুলিকে বাচনিক রূপ দিয়ে সঞ্জীবিত করে রাখা। লোকসমাইকে এঁরা ডাক দেন নি, একত্রিত করেন নি, যদি কোন জিজ্ঞাসু এঁদের কথায় কান দেয়, এঁদের ভাষা তার-ই জন্য। সম্প্রদায় স্থাপনের চেষ্টা এঁরা করেন নি কিন্তু ভক্ত আপনি এসে জুটেছে এবং গোষ্ঠী বন্ধনের স্বাভাবিক প্রবণতায় সম্প্রদায় স্থাপন করেছে, সন্তদের জীবন-কাহিনী নানা অলৌকিকত্বে রঞ্জিত করে প্রচার করেছে, নইলে মান থাকে না যে। ভক্ত নির্বাচনে সন্তরা জাতিকুল বিচার করেন নি, অযোগ্য ব্যক্তিকেও স্বভাব-গুণে উত্তরণ করতে পারবেন এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস।

"কবীর খাই কোট কি, পানি পিওয়ে ন কোই
যাই মিলে যব গঙ্গ মে, তব সব গঙ্গোদক হোই।"

কবীর বলে, গড়খাইয়ের জল কেউ পান করে না, কিন্তু সেই জল যখন গঙ্গায় গিয়ে পড়ে তখন গঙ্গোদক হয়ে যায়।

"গঁ্যু জল আওর মলিন মহা অতি
গঙ্গ মিলয়ো হুই যাত হী গঙ্গা।" (সুন্দর দাস)

এই সব রচয়িতাদের সামগ্রিক ভাবে বলা হয় মধ্যযুগের সন্ত কবি। হিন্দী সাহিত্যের কেতাবে এঁদের নির্গুণবাদী কবিও বলা হয়। অনেকেই ছিলেন অল্প-শিক্ষিত, কেউ কেউ নিরক্ষর, বহুলোক ছিলেন অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর—কবীর ছিলেন জোলা, দাদূ ধুনিয়া (ধুনারী), রৈদাস চর্মকার।

প্ল্যানচেটের প্ল্যানিং

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

মিডিয়ামের আসরে মহর্ষি ভরদ্বাজ এসে হাজির হলেন। মাথায় জটা, পরনে বল্কল। এক মুখ পাকা দাড়ি-গোঁফ, পাটের মত শুভ্র।

মহর্ষিকে প্রণাম করতেই তিনি খুশী হয়ে আশীর্বাদ করলেন, শুভম্ অস্তু, শুভম্ অস্তু। তারপর আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কস্যম্ কিম্ তে পরিচয়ঃম্?

ওরে বাবা, এ যে সংস্কৃত। আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। মনে আছে, ইস্কুলে প্রতি বছর অধিকাংশ ছাত্রের সঙ্গে আমিও সংস্কৃত পরীক্ষায় ফেল করতাম এবং প্রতিবারই পনের-কুড়ি নম্বর করে গ্রেস দিয়ে আমাদের পণ্ডিতমশায়কে তাঁর চাকরি বজায় রাখতে হ'ত। সেই সংস্কৃত ভাষাতেই কি আজ মহর্ষির সঙ্গে কথা বলতে হবে?

সবিনয়ে নিবেদন করলাম, গুরুদেব, স্বাধীন ভারতবর্ষ তার পিতৃপিতামহের সংস্কৃত ভাষাটাকে "ডেড্ ল্যাংগোয়েজ্" অর্থাৎ মৃত ভাষা বলে ঘোষণা করেছে; এবং এদেশে আজ সংস্কৃতের চর্চা হয় না বললেই চলে। তাই সংস্কৃত শেখবার সুযোগ আমার হয়নি। আপনি যদি বাংলায় কথা বলে এই অধমকে বাধিত করেন। আপনি সর্বজ্ঞ, বাংলা ভাষাটা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

—তথাস্তু। মহর্ষি বললেন, আমায় ডেকেছ কেন? কি চাও আমার কাছে?

করজোড়ে বললাম, মহর্ষি, আপনি মহা পণ্ডিত। আপনার "গোলধ্যায়" বইখানি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু মানুষের বাসনার অন্ত নেই। আমার ইচ্ছা আপনার কাছে আদিম পৃথিবীর গল্প শুনব। মানুষের সৃষ্টি হলো কেমন করে? তারও আগে কেমন করে জেগে উঠেছিল পৃথিবীর বুকে প্রাণের সাড়া? কোথায় কবে, কি ভাবে এর প্রথম সূত্রপাত?

বুঝেছি। মহর্ষি বললেন, তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি বৎস। কিন্তু এ বড় কঠিন প্রশ্ন।

—আপনার কাছে তো কিছুই কঠিন নয়, গুরুদেব?

মহর্ষি একটু হাসলেন, বললেন, এস আমার সঙ্গে।

দ্বিরুক্তি না করে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ঘর ছেড়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়েছি, অশ্রু এসে আমার আমার হাত ধরল, বললে: আমি যাব তোমার সঙ্গে।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি?

হ্যাঁ। অশ্রু অবিচলিত ভাবে বললে, আমাকে ফেলে রেখে তুমি কোথাও যেতে পাবে না।

—কিন্তু?—

—কোনো 'কিন্তু' শুনব না। অশ্রু নাছোড়, আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি কখন থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি, তা জানো?

বাস্তবিক সাজগোজ করেই এসেছে অশ্রু। মহর্ষির সঙ্গে আমার কথাবার্তা বোধহয় দরজার আড়াল থেকে শুনেই যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। বেনারসী শাড়ী আর গয়নায় ঝলমল করছে অশ্রু।

অগত্যা অশ্রুকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষিকে অনুসরণ করলাম। অচেনা পথ। কোথাও বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও গভীর জঙ্গল, আবার কোথাও বা আকাশ-ছোঁয়া পর্বতশ্রেণী। সব অতিক্রম করে চলতে লাগলাম

আমরা। মাথার উপর শুধু অনন্ত আকাশ। তারাগুলো নিষ্প্রভ হয়ে আছে মরা মানুষের চোখের মতো।

কত যে পথ হাঁটলাম তার ইয়ত্তা নেই। চলতে চলতে মহর্ষি হঠাৎ এক জায়গায় থামলেন। বললেন, দেখতে পাচ্ছ?

বললাম, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, শুধু অন্ধকার। এত অন্ধকার কখনো দেখিনি।

—এ হচ্ছে প্রেতলোক। ভরদ্বাজ বললেন, এখানেই তোমরা দেখতে পাবে পূর্বপুরুষদের।

—এই অন্ধকারে?

—একটা মশাল জ্বালছি। তাহলে আর দেখতে অসুবিধা হবে না।

মশাল জ্বালতেই দেখতে পেলাম, একটা গাছের তলায় বসে আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, কারো দেশী পোশাক, কারো বিলেতী। মহর্ষি তাঁদের পরিচয় দিলেন, এঁরা সকলেই প্রাণী-তত্ত্ববিদ—লর্ড কেলভিন, ফিশার, ডারউইন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

আমি আর অভ্র তাঁদের কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই তাঁরা আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। শুধু ইশারায় দেখিয়ে দিলেন একটা পথ। সেই পথ ধরেই আমরা চলতে লাগলাম। মহর্ষি ভরদ্বাজ আগে আগে চলেছেন, আমরা তাঁর পেছনে। পথ যেমন দুর্গম, তেমনি সঙ্কীর্ণ ও পিচ্ছিল।

অভ্র টাল সামলাতে পারছিল না, বারবার পিছলে যাচ্ছিল। ওর একটা হাত ধরে বললাম, একটু সাবধানে চল। এই রাস্তায় একবার পা হড়কালে কোমর ভাঙাটা বিচিত্র নয়।

অভ্র বললে, মাগো, কি বিশ্রী রাস্তা! আগে ভাবতাম ভারতবর্ষের মত নোংরা দেশ আর নেই। এখন দেখছি—

—এখন দেখছ, আছে।

অভ্র বললে, কিন্তু নোংরা রাস্তার জন্যে ভারতবর্ষের সরকারকে গালাগালি দিয়ে তবু যাহোক আনন্দ পাওয়া যায়। আর এখানে?

—এখানে গালাগালি শোনাবার মত কোনো সরকার নেই, এটাই আমাদের দুঃখ।

অভ্র আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়েই ফিক্ করে হেসে ফেলল, দুঃখটা আমার বেশী, না তোমার?

—খুব আমারই। বললাম, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা এখানে নিশ্চিন্ত। ভারতবর্ষের মতো রাজনৈতিক দলাদলি আর গুণ্ডার উপদ্রব এখানে নেই।

—কিন্তু এটা যে প্রেতলোক! অভ্র ভয়ে ভয়ে বললে।

বললাম, ভূতের ভয়টা প্রেতলোকের চেয়ে পৃথিবীতেই বেশী, অভ্র। আর সেই সব ভূতের কীর্তি-কাহিনী ঢেকে রাখবার জন্যে ভারতের সরকার, শুধু ভারতের কেন পৃথিবীর সব দেশেরই সরকার প্রকৃত ইতিহাসকে লুকিয়ে রেখে একটা মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে জনসাধারণকে ধাপ্পা দেন। এখানে কিন্তু ততটা প্রতারিত হবার ভয় নেই; কারণ আমাদের পূর্বপুরুষদের মাথায় শয়তানি বুদ্ধি আজকের দুনিয়ার মতো এমন উগ্রভাবে কখনো দেখা দেয়নি। তাই ইতিহাস এখানে যেটুকু পাওয়া যাবে, তা জল-মেশানো দুধের মত নিশ্চয়ই অকেজো হবে না।

মহর্ষি ভরদ্বাজ হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, তিষ্ঠ। দাঁড়াও এখানে।

তাঁর কথায় খেয়াল হলো আমাদের। তাই তো, কোথায় এসেছি আমরা?

মশালের আলোয় দেখলাম পাহাড়ের গুহায় একটা উলঙ্গ মানুষ বসে আছে। মাথায় জট পাকানো বড় বড় চুল। বলিষ্ঠ দেহ, লম্বায় প্রায় ছ' ফুট। লোকটা কাঁচা মাংস খাচ্ছে চিবিয়ে চিবিয়ে।

ভরদ্বাজ বললেন, এর গোষ্ঠীর নাম নিয়েণ্ডারথাল্, আজ থেকে প্রায় আশী হাজার বছর আগে পৃথিবীতে ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, এদের কোন জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, গুরুদেব?

—হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। ভরদ্বাজ বললেন, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালিতে এদের কিছু ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই অনুমান করা হয় যে, এরা ইউরোপ মহাদেশে বাস করত।

অশ্রু আরেক দিকে আঙুল দেখিয়ে আমার কানে কানে বললে, দেখ, কি অসভ্য ওই লোক দুটো। এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে।

তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হয়েছে ওদের।

অশ্রু মুখ টিপে একটু হেসে বলল, ইস্, জংলীদের এত সাহস! আসুক না আমার কাছে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।

অশ্রুকে সদুপদেশ দিয়ে বললাম, জংলী হলেও ওরা আমাদের পূর্বপুরুষ। ওদের সম্বন্ধে একটু সম্মান করে কথা বলবে না?

অশ্রু গলার জোর দিয়ে বললে, না।

অশ্রুর শেষ কথাটা ভরদ্বাজের কানে গেল। বললেন কি হয়েছে মা-জননী।

লজ্জায় মুখ নীচু করল অশ্রু।

আমি বললাম, আপনার মা-জননী ওই ন্যাংটা লোকদুটোকে দেখে ক্ষেপে উঠেছে।

ভরদ্বাজ এক নজরে লোকদুটোকে দেখে বললেন, ওরা প্রায় সমসাময়িক যুগের মানুষ। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বছর আগে ওরা পৃথিবীতে ছিল। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে সিনানথ্রোপাস্ গোষ্ঠীর, আরেকজন আটলানথ্রোপাস্ গোষ্ঠীর। আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রান্তে এবং মরক্কোয় আটলানথ্রোপাসের কিছু কিছু জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। আর সিনানথ্রোপাস্ গোষ্ঠী বাস করত চীনে। এদের যুগটা ছিল একেবারে জংলী যুগ। বন্য জন্তুদের সঙ্গে সব সময় লড়াই করে এদের বাঁচতে হ'ত।

অশ্রু ভয়ে ভয়ে বললে, কী বীভৎস দেখতে লোক-দুটোকে। রাক্ষসের মতো।

বললাম, তুমি কি সেই যুগের মানুষের মধ্যে আজ-কালকার সিনেমা আর্টিস্টের রূপ দেখতে চাও?

—আহা, আমি বুঝি তাই বলেছি? অশ্রু আঁচলে মুখ ঢাকল।

আমাদের কথা শুনে মহর্ষি হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর অশ্রুর দিকে ফিরে বললেন, এস মা আমরা আর একটু এগিয়ে যাই।

খানিকটা এগিয়েই ভরদ্বাজ বললেন, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ডুবর সাহেব ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পিথেকানথ্রোপাস্ নামে এক জাতীয় মানুষের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন জাভায়। দেখবে তার চেহারা? ওই দেখ।

গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। দেখেই খিলখিল করে হেসে উঠল অশ্রু। বললে, ওমা, এর মুখটা যে ঠিক ঘোড়ার মত!

ভরদ্বাজ বললেন, হাঁ মা, ঘোড়ার মতই লম্বা মুখ ছিল ওদের। ওরা কোনো রকমে দু-পায়ে ভার দিয়ে দাঁড়াতে পারত। অনেক সময় গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে চলত। অর্থাৎ গাছের ডাল ছিল ওদের 'ওয়াকিং স্টিক্'।

জিজ্ঞেস করলাম, এরা কতদিন আগে পৃথিবীতে বাস করত গুরুদেব?

ভরদ্বাজ একটু চিন্তা করে বললেন, ছয় থেকে দশ লক্ষ বছর আগে এরা ছিল পৃথিবীতে।

—কি খেত এরা?

—গাছের পাতা আর ফলমূল।

—কি কাজ করত?

—কাজ বলতে ছিল সারাদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো এবং আহার অন্বেষণ করা।

অশ্রু বললে, এখনকার বেকার ছেলেরা চাকরির সন্ধানে যেমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, সেইরকম?

মহর্ষি ভরদ্বাজ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, কতকটা সেই রকমই বটে। তবে এ-যুগের বেকার ছেলেরা যেমন বাপের পকেট কেটে সিনেমা দেখার জন্যে লাইন লাগায়, তখনকার দিনে সেটা ছিল না।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা গভীর জঙ্গলের প্রান্তে এসে মহর্ষি দাঁড়ালেন। বললেন, এবার তোমরা

মানুষের আদি-পুরুষকে দেখতে পাবে। ইনিই আমাদের পিতামহ। আজ থেকে আঠার লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে ইনিই প্রথম মানুষের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘোষণা করেন।—ওই দেখ গাছের তলায় বসে আছেন পিতামহ।

পিতামহের মাহাত্ম্য শুনে অশ্রু গলায় আঁচল জড়িয়ে ভক্তিভরে এগিয়ে গেল তাঁকে প্রণাম করতে। পিতামহ কিন্তু অশ্রুর ভক্তি গদগদ চিত্তের কোনো মূল্য দিলেন না। তিনি 'হুপ' করে একটা আওয়াজ করে অশ্রুকে কামড়াতে এলেন।

আমি আর মহর্ষি ভরদ্বাজ হৈ হৈ করে চীৎকার করতেই পিতামহ এক লাফে গাছে উঠে গিয়ে আমাদের দিকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগলেন।

অশ্রু ছুটে এসে ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। থর‌্থর‌্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, কি আশ্চর্য! পিতামহকে আমি প্রণাম করতে গেলাম, আর উনি আমায় কামড়াতে এলেন!

মহর্ষি ভরদ্বাজ একটু রসিকতা করে বললেন, নাতি-নাতনীদের উনি ঠিক চিনতে পারেন নি বোধহয়। অনেকদিন পরে দেখা হল তো!

অশ্রু বললে, তা হলেও, একটু দয়ামায়া থাকতে নেই? মানুষ তো উনি?

ভরদ্বাজ বললেন, না মা, ওঁকে ঠিক মানুষ বলা চলে না। ওঁর গোষ্ঠী ছিল এক জাতীয় বানর, যাদের নাম 'শিব্‌পিথেকাস্‌'। এই জাতীয় বানরই মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ।

জিজ্ঞেস করলাম, এরা কোথায় থাকত গুরুদেব?

ভরদ্বাজ বললেন, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস যে, শিব্‌-পিথেকাস্‌ জাতীয় বানর প্রথম জন্মলাভ করে উত্তর আমেরিকায়। পরবর্তী যুগে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর আমেরিকা থেকে ভারতে এলো! তা সম্ভব হলো কি করে? মাঝ-খানে যে অকূল মহাসাগর!

মহর্ষি বললেন, সম্ভব হয়েছিল একটা কারণে। সে-যুগে উত্তর আমেরিকার আলাস্কা দেশের সঙ্গে এশিয়ার সাইবেরিয়া একটা যোজকের সাহায্যে যুক্ত ছিল। এবং সেই সেতুরূপ পথে বহু জীবের এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যাতায়াত ছিল।

যাই হোক, আমরা দূর থেকেই পিতামহকে প্রণাম জানিয়ে অগ্রসর হলাম। গভীর জঙ্গল। প্রকাণ্ড গাছ আর লতাপাতায় ঢেকে আছে চতুর্দিক। একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

মহর্ষি তাঁর খড়মের খট খট আওয়াজ করতে করতে আগে আগে চলেছেন। আমি আর অশ্রু তাঁর পেছনে।

হঠাৎ মনে হলো, একটা যেন পাহাড় হেঁটে আসছে। দেখলাম, একটা প্রকাণ্ড জন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ভয়ঙ্কর চেহারা।

অশ্রু কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, আমরা আর জঙ্গলের ভেতর যাব না। চল, ফিরে যাই।

মহর্ষি পেছন ফিরে বললেন, কি হয়েছে মা?

অশ্রু প্রকাণ্ড জন্তুটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, ওটা কি?

মহর্ষি বললেন, ওটা হচ্ছে হাতীর পূর্ব্বপুরুষ 'মোয়ে-রিথেরিয়াম্‌'। কয়েক কোটি বছর আগে এই জাতীয় জীব পৃথিবীতে রাজত্ব করত।

আশ্বস্ত হয়ে বললাম, আমি ভেবেছিলাম ইনি বোধ হয় মানুষেরই কোনো প্রপিতামহ অথবা বৃদ্ধপ্রপিতামহ। এদের সঙ্গে মানুষের কোনো যোগ নেই তাহলে?

মহর্ষি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীরই অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বিবর্ত্তনগত যোগাযোগ খানিকটা আছে।

—সেটা কিরকম?

মহর্ষি তাঁর জটা-শ্মশ্রুর মধ্যে উকুনের উপদ্রবে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধ করছিলেন। জটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ মাথা চুলকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বললেন, যেমন ধর, হাতী, ঘোড়া, গরু, ছাগল, বাঘ, সিংহ, কুকুর, বানর, মানুষ ইত্যাদি প্রাণীরা সকলেই স্তন্যপায়ী। একটা বিশেষ যুগে এদের

আবির্ভাব হয়েছে। শৈশবে মাতৃস্তন্যই এদের প্রধান উপজীব্য।

অশ্রু লজ্জায় ফিক্ করে একটু হেসে মহর্ষির অলক্ষ্যে আমার জামা ধরে টানল।

মহর্ষি তাঁর কথার সূত্র ধরেই বললেন, স্তন্যপায়ী জীবদের যুগটিই হচ্ছে সবচেয়ে নবীন। তাই এই যুগটিকে বলা হয় নবজীবীয় যুগ। এ-যুগের শুরু হয়েছে সাত কোটী বছর আগে এবং এখনও চলছে।

—এদের আদি জন্মস্থান কোনটি?

—সব প্রাণীর আদি জন্মস্থান জানা যায়নি। মহর্ষি বললেন, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস, কয়েক কোটী বছর আগে শিবালিক যুগে হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে ডাইনোথেরিয়াম, টেট্রোলফোডন্, ইষ্টেগোডনগণেশ প্রভৃতি বহু জীবজন্তুর প্রাদুর্ভাব ছিল। তবে তাদের মধ্যে সকলেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেনি। মিশর, আরব, মধ্য এশিয়া, এমনকি সুদূর উত্তর আমেরিকা থেকেও অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবজন্তু প্রবাসযাত্রা করে ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়। পিলগ্রিম সাহেবের মতে এ-যুগের জলহস্তী, শুয়ার এবং হাতির পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল মধ্য-আফ্রিকায়, এবং সেখান থেকে তারা ভূ-তত্ত্বের তৃতীয় যুগের শেষভাগে আরব এবং ইরাণের মধ্যে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

জিজ্ঞেস করলাম, স্তন্যপায়ীদের আগে কারা ছিল পৃথিবীতে?

—দেখতে চাও তাদের? মহর্ষি ভরদ্বাজ বললেন, তবে এস আমার সঙ্গে।

পরমেশ্বরের নাম কীর্তন করতে করতে মহর্ষি এগিয়ে চললেন। তাঁর খড়মের আওয়াজ গাছের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

অশ্রু আমার কানে কানে বললে, আমার আর এসব দেখতে ভাল লাগছে না। চল, বাড়ী ফিরে যাই।

বললাম, এত দূরে এসে এগুলো না দেখে ফিরে যাওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না; অশ্রু। একটু ধৈর্য ধর। সৃষ্টির রহস্যটা যদি জেনে যেতে পারি এই বুড়োর কাছ থেকে: তাহলে পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে কিছু টাকা রোজগার করা যাবে।

অশ্রু গদগদ হয়ে বললে, সেই টাকা থেকে আমাকে একখানা ভাল শাড়ী কিনে দিতে হবে কিন্তু।

—তা আর বলতে।

ভরদ্বাজ যে-জায়গায় আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন সেখানে জঙ্গল হালকা হয়ে এসেছে। কিছু দূরেই ধূ-ধূ করছে বালির চর। বোধহয় কাছেই সমুদ্র আছে। জঙ্গল হালকা হয়ে এলেও গাছপালা একেবারে কম নয়। বড় বড় গাছের সংখ্যা অল্প, কিন্তু লতা জাতীয় গাছ এবং ঝোপ-ঝাড় সেখানে প্রচুর। মাটিতে এখানে ওখানে গর্ত। দেখলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরীসৃপ, সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি আর ওই ধরণের বিভিন্ন জন্তু বুকে হেঁটে চলেছে মাটির ওপর দিয়ে। তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বাতাস ভরপুর।

মহর্ষি বললেন, এটা ছিল মধ্যজীবীয় যুগ। এই যুগে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীই ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী।

—অর্থাৎ এরা স্তন্যপায়ী জীবদের পূর্বপুরুষ?

—হাঁ। মহর্ষি বললেন, উনিশ কোটী বছর আগে শুরু হয়ে এগারো কোটী বছর আগে এই যুগটা শেষ হয়ে গেছে। সরীসৃপরা লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।

অশ্রু বললে, কিন্তু সাপ তো এখনো আছে পৃথিবীতে? সাপের কামড়ে কত মানুষ মরছে প্রতি বছর।

ভরদ্বাজ বললেন, হাঁ মা, সাপ এখনও আছে। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এক-একটি বিশেষ যুগে এক-এক বিশেষ ধরণের জীবের অস্তিত্ব ছিল, এবং যুগ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ধরণের জীব একটি যুগ পার হয়ে তার পরের যুগেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আবার কোনো কোনো জীব যুগে যুগে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই

সিদ্ধান্ত থেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের উদ্ভব হয়েছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অবশ্য ডারউইনের অনেক আগেই ভারতের মুনিঋষিরা বিবর্তনবাদের কথা বলে গেছেন। হিন্দু শাস্ত্রের মতে, চুরাশী লক্ষ জন্মের পরে জীব মানব-জন্ম লাভ করে।

বললাম, তাহলে বিবর্তনবাদ অনুসারে আজকের মানুষ বিবর্তিত হতে হতে একদিন অন্য জীবে পরিণত হতে পারে?

—নিশ্চয়ই। মহর্ষি বললেন, বিবর্তনবাদ তো সেই কথাই বলে। মানুষের মধ্যেও বিবর্তন চলছে। তাই দেখা যায়, একই বাপ-মায়ের সন্তানরা তাদের বাপ অথবা মায়ের মত না হয়ে খানিকটা পৃথক্ হয় আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। তোমাদের যখন সন্তানাদি হবে তখন তোমরা এই ব্যাপারটা আরো ভাল করে বুঝতে পারবে।

মহর্ষির শেষ কথাটির ইঙ্গিতে অশ্রু লজ্জায় লাল হয়ে বললে, সরীসৃপদের আগে কারা ছিল সংসারে?

মহর্ষি বললেন, এস মা, আমরা আর একটু এগিয়ে গেলেই তাদের দেখতে পাব।

খানিকটা এগোতেই নীল অনন্ত জলরাশি দেখা দিল। সমুদ্র বটে, কিন্তু ঢেউ খুব ছোট ছোট; কোনো কোনো অংশে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ বললেও চলে।

শান্ত, সমাহিত সমুদ্রের ধারে এসে মহর্ষি বললেন, দেখতে পাচ্ছ?

তাঁর বলার আগেই আমাদের নজরে পড়েছে, সমুদ্রের জলে কিলবিল করছে মাছ—বড়, ছোট নানান ধরণের অসংখ্য মাছ।

মাছ দেখেই আমাদের জিভে জল আসতে লাগল। মনে হলো, প্রেতলোকেই খানিকটা জমি কিনে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে পারলে ভারতবর্ষের চেয়ে এখানে অনেক সুখে থাকা যায়। অন্ততঃ প্রত্যেকদিন মাছের-ঝোল-ভাত খাওয়ার বড় সুবিধে।

মহর্ষিকে বললাম, এখানে এতো মাছ অথচ কলকাতার বাজারে সামান্য পুঁটি মাছ আট টাকা কিলো, মশায়।

অশ্রু বললে, একটা বড় মাছ ধরে নিয়ে চল না গো? বাড়ীতে গিয়ে তিন-চার দিন ধরে খাওয়া যাবে।

বললাম, তুমি পাগল হয়েছ? অতবড় মাছ রান্না করতে কত তেল লাগবে তা জানো? কম-সে-কম পাঁচ কিলো। আর বাজারে এক কিলো ভেজাল সরষের তেলের দাম দশ টাকা। অত টাকা আমার নেই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, এটা ছিল পুরাজীবীয় যুগ। তখন সংসারের প্রাণকেন্দ্র ছিল সমুদ্র। সমুদ্রের জলে ছিল অসংখ্য মাছ আর ওই জাতীয় জলজন্তু। তারা সবাই সমুদ্রে থাকত মিলে-মিশে। কিন্তু একদিন তাদের মধ্যে দেখা দিল রেষারেষি এবং দলাদলি। একদল তাড়া করল আরেক দলকে। যারা দুর্বল তারা জল ছেড়ে উঠে এলো ডাঙায়।

—তারপর?

—মাছ জাতীয় যে-সব জন্তু ডাঙায় উঠে এসেছিল; তাদের মধ্যে একটা অংশ আকাশের দিকে ডানা ঝাপটাল। তারা হয়ে গেল পাখী।

অশ্রু আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, ওই তো সেই পাখীগুলো উড়ছে। দেখ, দেখ, কী সুন্দর রঙ-বেরঙের পাখী! আমাকে একটা রঙীন পাখী ধরে দাও না গো? আমি পুষব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ অশ্রুর দিকে ফিরে বললেন, আকাশের পাখীকে খাঁচায় বন্দী করলে ওদের যে কষ্ট হয়, মা?

অশ্রু জিদ করে আব্দারের সুরে বললে, না, ওদের কষ্ট হয় না। আমি ছোলা খেতে দেব, ছাতু খেতে দেব।

মহর্ষি হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, মেয়েদের কথায় কান দেবেন না, ওরা যা দেখে তাই চায়। আপনি বলুন তারপরে কি হলো? একদল পাখী হয়ে গেল। কিন্তু যারা পাখী হতে পারল না?

—তারা ডাঙায় বাস করতে লাগল। মহর্ষি বললেন, এবং অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যুগে যুগে বিবর্তিত হতে হতে তারা ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুতে পরিণত হল।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনি বলছেন কি গুরুদেব। তাহলে মানুষেরও আদি পুরুষ হচ্ছে মাছ?

—হাঁ, তাই বটে। মহর্ষি বললেন, সেইজন্যে মাতৃ-গর্ভস্থ মানব-শিশুকে প্রাথমিক অবস্থায় মাছের আকার ধারণ করতে দেখা যায়; তারপর নানাবিধ উভচর এবং স্তন্যপায়ী জীবের আকৃতিতে পরিবর্তিত হতে হতে প্রায় দশ মাস পরে নরদেহ ধারণ করে সে ভূমিষ্ঠ হয়। তাই নারী-গর্ভস্থ ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় লেজ থাকে।

অশ্রুর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম, ও আমার পেছনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেছে। ওর অবস্থাটা অনুমান করতে আমার অসুবিধে হলো না। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, পুরাজীবীয় যুগের আগে কি কিছুই ছিল না সংসারে?

মহর্ষি বললেন, পুরাজীবীয় যুগের আগেও কোটী কোটী বছরের ইতিহাস আছে। সেই কোটী কোটী বছরে শুধু শ্যাওলা আর সামুদ্রিক গাছপালার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং সবার আগে যে-সূক্ষ্ম এক-কোষী জীবের মধ্যে প্রাণের প্রথম স্পন্দন জেগে উঠেছিল তাদের নাম 'এমিবা'। এরা এতছোট যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। একমাত্র শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই এদের দেখা সম্ভব।

জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এমিবার ভিতর প্রাণ এল কোত্থেকে? প্রাণ জিনিসটাই বা কি?

মহর্ষি উকুনের উপদ্রবে আবার তাঁর জটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, এ অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন, বৎস। প্রাণের সঠিক সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিকরা আজও দিতে পারেন নি। আমরা তাদেরই 'প্রাণী' বলতে পারি, যারা খাদ্য গ্রহণ ক'রে নিজেদের শরীরের পুষ্টি সাধন করতে পারে এবং বংশ বিস্তার করতে পারে। একটা বিশেষ শক্তি প্রাণীকে এই দুটো কাজ করতে সক্ষম করে। এই শক্তিই হচ্ছে প্রাণ।

—এই প্রাণ জিনিসটি পৃথিবীতে এল কোত্থেকে?

মহর্ষি বললেন, অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাণ উদ্ভূত হয় কতকগুলো বস্তুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে। দুধ, দই অথবা অন্য কোনও খাদ্য কয়েকদিন খোলা জায়গায় রাখলে দেখা যায় যে, প্রথমে তার ওপর ছাতা পড়ে, তারপর সেটা পচতে আরম্ভ করলে তার মধ্যে ছোট ছোট পোকা হয়। প্রথম যুগে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে ওই পোকাগুলি জন্মলাভ করে।

—কিন্তু তাঁদের এই ধারণা কি ভুল?

—হাঁ। মহর্ষি বললেন, পরবর্তী যুগে পাস্তুর, টিণ্ডল, লিস্টার প্রভৃতি পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন যে, ওই পোকা-গুলো খাদ্যের মধ্যে জন্মলাভ করে না। প্রকৃতপক্ষে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণারূপী জীবাণু থেকে এদের উৎপত্তি। বায়ুমণ্ডলে আমরা যে ধূলিকণা দেখতে পাই, তারা আসলে সর্বাংশে ধূলিকণা নয়। তাদের স্থূল অংশ ধূলিকণা হলেও সূক্ষ্ম অংশ জৈব পদার্থ, অর্থাৎ ছোট ছোট প্রাণী।

অশ্রু জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ধূলিকণার মধ্যে ওই জীবাণুগুলোই বা এল কোত্থেকে?

মহর্ষি বললেন, হাঁ, মা, একই প্রশ্ন তুলেছিলেন বৈজ্ঞানিক জোলনার। এর উত্তরে রিকটার সাহেব বলেন, শুধু বায়ুমণ্ডলে নয়, মহাকাশের সর্বত্রই অতি সূক্ষ্ম জীবাণু-অঙ্কুর ছড়িয়ে আছে। তারা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, বায়ু, তাপ এবং আর্দ্রতা পেলেই বড় হয় এবং বিভিন্ন জীব রূপে দেখা দেয়। আবার বৈজ্ঞানিক আরেনিয়াস্ বলেছেন, পৃথিবীতে প্রাণ এসেছে মহাশূন্য থেকে নয়, অন্য কোনো স-জীব জ্যোতিষ্ক থেকে। তাঁর মতে মহাজাগতিক আলোক-রশ্মির চাপে জীবাণুগুলো এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগের বেকুইরেল সাহেব এই মতের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, মহাজাগতিক আলো[illegible] জীবাণু-

বাধক রশ্মি আছে যে, জীবাণু-অঙ্কুর কখনই এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে সজীব অবস্থায় পৌঁছতে পারে না।

জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি এই প্রশ্নের কোনও সমাধান নেই?

মহর্ষি একটু হাসলেন। বললেন, আধুনিক যুগে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র। তিনি বলেছেন, 'প্রাণ' বা চেতনাশক্তি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এবং অবস্থা বিশেষে তা প্রকাশ পায়। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, উদ্ভিদের স্নায়ু-গুলোও উত্তেজিত হলে সাড়া দেয়। জগদীশচন্দ্র আরো দেখিয়েছেন, শুধু উদ্ভিদ নয়, প্রাণহীন ধাতব-বস্তুতেও অল্প পরিমাণ বিষ প্রয়োগে সাড়া জাগে এবং বিষের অধিক মাত্রায় সে-অনুভূতি লুপ্ত হয়। জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'ভেক্সিন থেরাপি' মেনে নিয়েছেন, কারণ বসন্ত রোগ ছাড়া অন্যান্য সব রোগের 'ভেক্সিন' অর্থাৎ টীকা প্রস্তুত হয় মৃত জীবাণু থেকে। এই মৃত জীবাণুগুলোই মানুষের শরীরে রোগের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ ক'রে আবার তাদের জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। অর্থাৎ, যাকে আমরা প্রাণহীন বলি, তার মধ্যেও প্রাণশক্তি বা চেতনাশক্তি সুপ্তভাবে নিহিত থাকে। তার মানে, যে-বস্তুটা আজ আপাত দৃষ্টিতে জড় পদার্থ সেটাই হয়তো একদিন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে উপযুক্ত পরিবেশে। জগদীশ-চন্দ্রের মতে, পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন কোনো বাইরের জগৎ থেকে আসেনি। আলো, বাতাস, উষ্ণতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপযুক্ত পরিবেশে পৃথিবীর জড় পদার্থ-ই একদিন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, সৃষ্টি করেছে জীবজগৎ।

একটু থেমে মহর্ষি বললেন, প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিরা কিন্তু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁরা বলে গেছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ দুনিয়ার যেখানে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। 'ঈশ্বর' বলতে তাঁরা সেই মহাশক্তিকেই বুঝিয়েছেন যে-শক্তি জড় এবং চেতন সকল বস্তুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যদিও তার অবস্থার প্রকারভেদ আছে। যে-চিন্ময় শক্তি মানুষের মধ্যে পূর্ণ জাগ্রত, ইতর প্রাণীতে অর্ধ-জাগ্রত, সেই শক্তিই উদ্ভিদে স্বপ্নগত এবং জড়ে সুপ্ত; কিন্তু সুপ্ত হলেও 'নাস্তি' নয়।—বলতে বলতেই মহর্ষির দুচোখ আনন্দ-অশ্রুতে ভরে এল। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কোন্ পরম অজানার প্রতি প্রণাম জানিয়ে যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন, মহাশক্তির এই বিচিত্র লীলাই তো দেখছি যুগ যুগ ধরে। তার আদি নেই, অন্তও নেই।

আমরা বাড়ী ফেরার জন্যে প্রস্তুত হলাম। মহর্ষিকে প্রণাম করে বললাম, আপনার উপকার কখনো ভুলব না। আপনার মত এত বড় পণ্ডিত বোধহয় ত্রিভুবনে আর নেই।

মহর্ষি আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন।

প্রণাম সেরে সবে পেছন ফিরেছি, হঠাৎ একটা আর্তনাদে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, মহর্ষি ভরদ্বাজ অরুন্ধকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

অরুন্ধর আর্তনাদে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ড্যাং করে একটা গুলি চালিয়ে দিলাম।

গুলিটা পায়ে লাগতেই ভরদ্বাজ হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর বুকের ওপর চেপে বসে বললাম, কী ব্যাপার মশায়? বুড়ো বয়েসেও আপনার এত শখ? আমার বউটাকে নিয়ে আপনি পালিয়ে যেতে চান? আপনি মানুষ, না পশু? এত জ্ঞানলাভ করেও আপনার সত্যিকারের শিক্ষা হয়নি?

ভরদ্বাজ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এটাই তো মানুষের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তার বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, তবু সে তার মন থেকে পশুত্বকে বর্জন করতে পারে না, কারণ সে পশু থেকেই তার উৎপত্তি। বিবর্তনের ফলে মানুষ পশুর চাইতে

প্রায় সব দিক্ থেকেই উন্নত, কিন্তু হিংস্রতায় এবং আদিম প্রবৃত্তিতে সে পশুর চেয়েও অধম।—সব শেষে এই কথাটাই তোমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তাই আমি তোমার স্ত্রীকে—

আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। মহর্ষিকে মুক্তি দিতেই তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা পাহাড়ের গুহায় ঢুকলেন। আসনে বসে দেহশুদ্ধি করে আবার সমাধিস্থ হলেন তাঁর সাধনায়।

"মহর্ষি ভরদ্বাজ, যুগ যুগ জিও" বলতে বলতে আমরা বাড়ী ফিরলাম। রাত কেটে তখন সবে সকাল হচ্ছে।

একটা বিশেষ কাজের তাগিদে ব্যস্ত হয়ে কাপড় পেতে জড়াতে জড়াতে অশ্রুকে বললাম, শীগগির ভাতে ভাত চড়াও। আমাকে তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। আজ আবার মন্ত্রীমশায় আসছেন দিল্লী থেকে।

—তাই নাকি? অশ্রু বললে, দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করো, এত মাছ থাকতেও বাজারে মাছ এত আক্রা কেন?

—তুমি এখনও মাছের কথাটা ভুলতে পারনি?

—না। অশ্রু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

—কিন্তু এই আর্জি তো মন্ত্রীমশায়ের কাছে পেশ করা যাবে না?

—কেন?

বললাম, পাগল হয়েছ? গণতন্ত্রের যুগে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করে চাকরিটা খোয়াব?

যদি সত্যি হত

শিদ্ধেশ্বর মাইতি

ল্যাজামুড়ো নেই যে সময়ের, তার সামনের বা পিছনের যদি কিছুটা বাদ দেওয়া যায় এবং তার মাঝখানে কলকাতা সহরকে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে যা মনে হ'তে পারে, প্রণববাবুর কলকাতার বুকে পা দিয়ে ঠিক তাই মনে হতে লাগল।

রাস্তাগুলো এমন ঝক্-ঝক্ তকতক্ করছে যে আয়নার দরকার হবে না, শ্রীমুখকে অবাঞ্ছিত শ্মশ্রুমুক্ত করতে হলে, সাবান, জল, ক্ষুর নিয়ে বসে পড়লেই কাজ চলে যেতে পারে।

শ্রীমতীরাও রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঝটাপট পাউডার পাফ্ বুলিয়ে, মুখচন্দ্রমাকে মালিন্যমুক্ত ও লালিত্যযুক্ত করে হন্ হন্ করে চলে যেতে পারবেন।

ফুটপাথের উপর জনস্রোত যেন সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা করে চলেছে, আর রাস্তার উপর যানবাহন সুমধুর বৃন্দবাদ্যের ঐক্যতান নিখরচায় শুনিয়ে যাচ্ছে।

চাঁদে যাওয়া বা হিমালয়ের চূড়ায় উঠার মত তিনটে খুব শক্ত কাজ তাঁকে হাতে নিয়ে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। সেগুলো যে ভোজবাজির মত এত সহজে সারা হল, তাতে তাঁর মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কলকাতাকে কোন জিন্ বা হুরীপরী পেয়ে বসেছে, নয়ত তাঁকেই কেউ তুক্ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

তাঁর তালিকার এক নম্বর শক্ত কাজ ছিল, সরকারী দপ্তরখানার লাল ফাঁস থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কতকগুলো কাগজপত্র বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শিলমোহর ও স্বাক্ষরের বেগুনী বর্ণাঙ্কিত করে উদ্ধার করা। কয়েকবার সাধু প্রয়াস চালিয়ে তাঁকে দীর্ঘশ্বাস সম্বল করে চলে যেতে হয়েছে।

এবারে অসাধ্য প্রয়াসের সাধ সংকল্প নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন। যথাস্থানে হাজির হয়ে, তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজের পকেট তল্লাসী চালাচ্ছিলেন। মহাকারণিক মহাশয় সবিনয়ে সবেগে হাত নেড়ে বলে উঠলেন, আহা কি করেন, কি করেন। আমাকে আর ছোট করবেন না। এতদিন এখানে যা হয়েছে তার জন্য লজ্জা পাচ্ছি। নিঃস্বার্থ সেবায় বাকী কটা দিন বাঁচতে দিন। এই নেন আপনার কাগজপত্র। সব রেডি।

অগত্যা প্রণববাবু মৌখিক ধন্যবাদে তাঁকে আপ্যায়িত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মহাকারণিক মহাশয় এই মৌখিক বস্তুটাকে যথার্থ আন্তরিক করে বলে উঠলেন, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি যথাসময়ে হাজির হয়ে আমাকে দায়মুক্ত করলেন।

প্রণববাবুর তালিকার দু'নম্বর শক্ত কাজ ছিল,—একজন আইন-জীবীর সঙ্গে দেখা করা। একটি জটিল মামলার ফয়সালা হচ্ছিল না, তিনি কেবলই দোহন করে যাচ্ছিলেন। শেষকালে তাঁর এমন অবস্থা হয়েছিল যা মাইকেলের কবিতার 'মরীচীকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে' এই কথাগুলো দিয়ে নিশেষিত করা যেত।

আজও তিনি ভেবেছিলেন, বুক-ভরা পিপাসায় সেই মরীচিকার পিছনে ছুটে যাচ্ছেন, কিন্তু নাঃ, উকীলবাবু তাঁকে দেখা মাত্র বলে উঠলেন, আপনাকে চিঠি দেব ভেবেছিলাম। শুনানী হয়ে গেছে, রায় বেরিয়েছে। আপনি মামলা পেয়ে গেছেন।

উকীলবাবুকে যথারীতি ফি দিয়ে চলে আসবেন, উকীলবাবু হা হা করে বলে উঠলেন, সে কি মশায়, আমার কি ধর্মজ্ঞান নেই? এ্যাদ্দিন আপনি আমাকে ঢের ঢের দিয়েছেন, টাকা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান;

সামিষ্টি কিনে বউমা ছেলেমেয়ে সবার মুখে হাসি ফুটাবেন —তবেই আমার তৃপ্তি।

এবার তালিকার তিন নম্বর শক্ত কাজ, ভাগনার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করা। হতভাগা ময়দানে ফুটবল খেলতে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে।

হাসপাতালে হট্ করে রুগীর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া যে কি সেটা হাড়ে হাড়ে জানা আছে। কিন্তু তালিকার দু নম্বর কাজটিও যেভাবে পান চিবুতে চিবুতে বাগে এনে ফেললেন, তাতে এটির সম্বন্ধেও অন্দরে ভরা-পালে ভাসতে ভাসতে এসে দেখেন, ভাগনা তাঁর হাসপাতালের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হস্টেলে ফিরবার জন্ম রাস্তায় পা বাড়িয়েছে।

—কি রে ;আজ ছাড়া পেলি ?

—হ্যাঁ, মামা।

—কেমন কাটালি ? মন কেমন কেমন করছিল নিশ্চয়ই ?

—মন কেমন কেমন ? এখানে ? মামা, তুমি ত আর পা ভাঙনি। ভাঙলে বুঝতে পারতে, কেন পা ভেঙে বারে বারে এখানে আসতে ইচ্ছে হয়।

—বলিস কি রে, এতটা উন্নতি হয়েছে হাসপাতাল-গুলোর ?

– উন্নতি হয়েছে মানে ? কী চাই তোমার এখানে ? এক কথায় ষোলর উপর সতের আনা হোম কম্‌ফর্ট'স। জননীর স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসা, জায়ার প্রেম —জায়ার প্রেম বলেই জিভ কেটে ফেলল সে।

—হুম, বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রণববাবু।

মনে মনে বললেন, তাহলে মুণ্ড ঘুরে গেছে তোমার, বাড়ী চল হতভাগা. মুণ্ড ঘুরাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা না করব এমন কাঁচা ছেলে আমি নই।—

যাই হ'ক, ভাগনাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে, তিনি তাঁর 'স্বর্গ-সুরভি' হোটেলে ফিরে এলেন। ফোয়ারায় সুবাসিত জলে স্নান সেরে স্নিগ্ধতনু হয়ে তিনি হোটেলের বয়কে ডিনারের আদেশ দিলেন।

হোটেলের এক শয্যাকক্ষে তিনি আরামে দুই চক্ষু বুজে যা দেখলেন, তাতে তাঁর প্রাণের ভেতরটা আনন্দে গুর গুর করে ডেকে উঠল।

একটি বেশ বড় সাইজের থালার মাঝখানে সুগন্ধি ভাতের স্তূপ, আর তার চারদিক ঘিরে নানা পদের আমিষ নিরামিষ ব্যঞ্জন। আমিষেরই বা বাহার কত ? মাছের ফ্রাই, চিংড়ির কাটলেট,আস্ত রুইমুড়োর মুড়িঘণ্ট, ঝাল, ঝোল, দই মাছ, উঃ, রসনা-তৃপ্তির কি পরিপাটী অসম্ভব ভালো আয়োজন ? সব তাঁরই জন্য এনে হাজির করেছে হোটেলের হরিদাস ঠাকুর।

তাঁর ভোজন-রসিকতার সুখ্যাতি কারুরই অজানা ছিল না। আনন্দে সব চেটেপুটে খেয়ে উঠতে, তাঁর মন হঠাৎ পকেটমুখী হয়ে পড়ল—'এই রে, যে'কটা টাকা বাঁচিয়ে ছিলাম, হোটেলে সব খরচা দিয়ে ফতুর হতে হল দেখছি।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, যাক গে, এযাত্রায় নিট্ লাভের সামান্য ভগ্নাংশ অপাত্রে ঝরে গেল।

কিন্তু ম্যানেজারের সামনে হাজির হতে, ম্যানেজার ঈষৎ হেসে বিশেষ কায়দায় মাথাটা একটু কাৎ করেই বললেন, হ্যাঁ. মাত্র পঞ্চাশ পয়সা।

শোনা মাত্রই প্রণববাবুর মাথাটা কেমন ঝাঁ করে ঘুরে গেল। তিনি ম্যানেজারের সামনে ধপ্ করে ব'সে পড়লেন। তারপর এ আনন্দের আঘাতটা সামলে একটু সুস্থ হয়ে বলে উঠলেন, ব্যাপার কি বলুন ত ? মনে হচ্ছে, কলকাতার সময়টাকে কেউ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে কে সে তা বলতে পারব না, আজ পর্যন্ত কেউ সে চোরকে ধরতে পারে নি।

—কি হয়েছে, সেইটেই যদি আপত্তি না থাকে বলুন, আমি শুনি।—

—সে মশায়, এক আশ্চর্য ব্যাপার। গাড়ী, মশায়, ভুতুড়ে গাড়ী।—

—ভুতুড়ে গাড়ী ? কলকাতার বুকে ভুতুড়ে গাড়ী ?

—হাঁ, কলকাতার বুকে ভুতুড়ে গাড়ী। ঠিক ভোরের কাক-অন্ধকারে কোত্থেকে উড়ে আসে এক মস্ত ট্রাক। সে ট্রাক থেকে নামে ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ। আবার সে মাছের গাড়ী চলে যেতে না যেতে আসে তেলের গাড়ী। নামে টিন টিন তেল। আবার ঠিক তার পিছনে আসে তরকারীর গাড়ী,—ঝুড়ি ঝুড়ি আলু, কপি, বেগুন, মটরশুঁটী, পেঁয়াজ, বরবটী, শিম, কাঁচালঙ্কা, ঠিক এমনি ভাবে আসছে ডাল, নুন, মসলাপাতি এনতার মশায়, এনতার,—জলের স্রোতের মত। আর জলের দামে এইসব খাদ্যবস্তুর অধুরান চালান, মশায়, গোটা কলকাতা সহরের মার্কেটের পাঁজিচড়া মেজাজ একেবারে নামিয়ে দিয়েছে। পোশাক-আসাক কাপড়-চোপড় যা খুশি কিনে আনুন না, আপনার ভারী পকেটের ভারটা কিছুতেই কম মনে হবে না।

—আচ্ছা, এ নিয়ে কাগজে কিছু সম্পাদকীয় বা অসম্পাদকীয় লেখা বা মন্তব্য ছাপে নি?

—হ্যাঁ, বিস্তর, বিস্তর। একদল সম্পাদক যা বলেন, আর একদল তার উল্টোটাই বলেন। এই দেখুন না, জনবন্ধু কি বলেছে।

সরকার এত সুলভমূল্যে নিত্য প্রয়োজনের সর্বকিছু যোগান দিয়া অতীতের সকল পরিকল্পনার উপর টেক্কা দিতে পারিয়াছেন। জিনিসপত্রের গগনচুম্বী ঊর্দ্ধগতি জনজীবনে যে নাভিশ্বাস আনিয়াছিল, তাহা মন্ত্রবলে দূর হইয়া, যে নবজীবনের জয়যাত্রা সূচিত হইল, উহার জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মত যজ্ঞোপবীত হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সরকার যদি সাকার হইয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে স্বতঃই উহার মস্তকের উপর ধানদূর্ব্বাপাত হইবে।

আবার দেখুন নগরবন্ধু কি লিখেছে।

কোথা হইতে এই ভুতুড়ে গাড়ীগুলি এত সুলভে মাল সরবরাহ করিতেছে, গাড়ীর ভূতস্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্য- ব্যবহার্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে কি না, অবিলম্বে তাহার সমীক্ষা কার্য চালান হউক। আর উহা মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে যে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করিতেছে না তাহা কে বলিবে? সুলভে প্রচুর খাদ্যগ্রহণ করিয়া, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, বিলাসদ্রব্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া দেশবাসী তৈলচিক্কণ সুস্থ স্বাস্থ্য ও বপুর অধিকারী হইয়া ক্রমেই অকর্মণ্য ও বিলাসী হইয়া পড়িবে। বিলাসী ও অকর্মণ্য জাতির পরিণাম যে কী. ইতিহাসের ফলাফল দেখিয়া কি তাঁহাদের টনক নড়িতেছে না?

অতএব সরকারকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা বাজারে এই ভুতুড়ে গাড়ীগুলি চালান দেওয়া অচিরাৎ বন্ধ করুন। দেশবাসীকে জীবনযুদ্ধে ভাগ্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষিয়া মজবুত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে দিন। একটি কঠোর যুযুধান জাতিকে অভাব ও অনটনের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে দিন।

প্রণববাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, নিকুচি করেছে ওসব কাগজী প্রলাপের। এখন আপনার কিংবা আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মতামত কি বলুন?—

—খুব ভাল, মশায়, খুব ভাল। নইলে দেখছেন না, সারা কলকাতাটা কেমন খুশির খৈ ছড়াচ্ছে, কলকাতার জীবন নয় ত যেন গানের সুর, কাব্যের ছন্দ। তা আপনি একবার বাজারটা যাচাই করে আসুন না?

—যাব, মশাই, নিশ্চয়ই যাব। তবে একবার থিয়েটারে যাব ভাবছি। কোন থিয়েটারে যাই বলুন ত?

—থিয়েটার? ও দেখে আপনার লাভ নাই, তার চাইতে আরও থ্রিলিং আর এক্সাইটিং দৃশ্য দেখতে চানত চলে যান আলিপুর চিড়িয়াখানায়।

—চিড়িয়াখানায়? ও ত বাচ্চারা যায়। কতকগুলো জানোয়ার, পাখী, সাপ, কুমীর, বানর দেখবার সবুজ জীবনটায় ত কবে থেকে ছাতা ধরে গেছে।

—আরে মশায়, যান যান। দেখে এসে পরে বলবেন।

বলতে গেলে এক রকম ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ম্যানেজারের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাটি ছেড়ে দিয়ে, তিনি আলিপুর চিড়িয়াখানায় এসে হাজির হলেন।

জানোয়ারগুলোর খাঁচার সামনে দিয়ে ঘুরপাক দিয়ে যেতে যেতে প্রণববাবু ভাবতে লাগলেন, কোথায় সেই আশ্চর্য বস্তুটি যা দেখতে ম্যানেজার তাঁকে একরকম জোর করে চিড়িয়াখানায় পাঠালেন।

কিন্তু খুব বেশী ভাবতে হল না তাঁকে, ওই ত ওখানে প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটার ছায়ায় ছেলে, মেয়ে, বুড়ো; দেশী, বিদেশী, সব বয়সীর, সব বেশীর, সব দেশীর, সব ভাষাভাষী মানুষের একটা দর্শনীয় আন্তর্জাতিক সমাবেশ হয়েছে। গাছের ডালের দিকে উর্ধ্বমুখ হয়ে প্রবল উৎসাহে কি দেখছে এতগুলি মানুষ ?

প্রণববাবু ক্ষিপ্রপদে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দুই চক্ষুকে উর্ধ্বগতি করে, স্বগতোক্তি করে উঠলেন, বাদুড়! বেশ বড় আকারের বাদুড় ত ? ভাঁজ করা প্যারাশুটের মত প্রকাণ্ড দুই ডানা গুটিয়ে মাথাটি ঢেকে রেখেছে। মনে হচ্ছে যেন বিশ্বের লজ্জা চক্ষুলজ্জা হয়ে ওদের ডানার আড়ালে ঢেকে রেখেছে।

ওগুলো কি ভ্যাম্পায়ার ? কোথা থেকে এতগুলো ভ্যাম্পায়ার আসিপর চিড়িয়াখানায় আমদানী হল ? কি সাংঘাতিক ব্যাপার ? তাহ'লে এতগুলো জানোয়ারের প্রাণ বাঁচবে কি করে ? মানুষেরই বা নিরাপত্তা কোথায় ? রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের শরীরের রক্তবাহী শিরাটি ফুটো করে সব রক্ত শুষে নিয়ে যদি পালায় ?

প্রণববাবু আর ভাবতে পারলেন না, ভাবনার এই চূড়ান্ত মুহূর্তে পাশের এক ভদ্রলোক তাঁকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই, ওই দেখুন।

ঝুলন্ত প্রাণীগুলির লজ্জানিবারণী ডানা দুটি হঠাৎ দুদিকে সরে গেল। প্রণববাবু মনের ভেতর থেকে একটি গুরু ধরণের গোঁত্তা খেলেন, আঁৎকে উঠলেন, কি সর্বনাশ। ওগুলো ত বাদুড় নয়, ভ্যাম্পায়ারও নয়। অবিকল মানুষের মাথা, মুখ, চোখ, কান, নাসা ? বিধাতার সৃষ্টিলীলায় এই আশ্চর্য বস্তু কবে সৃষ্টি হল ?

পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, মশায়, এগুলো কোন্ দেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে ? জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এ প্রাণীগুলির ত কোনও হদিস নেই ?

পাশের ভদ্রলোকটি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। এদের সৃষ্টির রহস্য চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত ঘোষণায় এখুনি শুনতে পাবেন।

ঠিক তখুনি লাউড্‌স্পীকারে শোনা গেল, মাননীয় দর্শকগণ, আপনারা শিরীষগাছের তলা থেকে সরে আসুন। এখুনি আপনাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে, দেখবেন এমন একটি আশ্চর্য ব্যাপার, যা ইতিপূর্বে দুনিয়ার কোন মানুষ কখনও দেখেন নি।

ঢং ঢং করে চিড়িয়াখানার ঘড়িতে তিনটে বাজল। পুলিস আর স্বেচ্ছাসেবকের দল নির্দিষ্ট স্থান থেকে বেরিয়ে এল। এই আন্তর্জাতিক জনতাকে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

হঠাৎ গাছের তলায় একটি বিস্ফোরণ হ'ল। একজন পুলিস একটি নির্দোষ বোমা মেরে ফাটালেন। শব্দের সঙ্গে সামান্য ধোঁয়ার সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু ওদিকে শিরীষ গাছের চারদিক ঘিরে ডানা ঝটপটানি আর চেঁচামেচি শুরু হ'ল। তারপর সবাই আশ্চর্য হয়ে শুনল, হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড় সব ভাষায় এক ভয়ার্ত আবেদন যেন আকাশ থেকে জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে। প্রণববাবু এই অসংখ্য কণ্ঠের মধ্যে থেকে একটি মাত্র কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। সেটি হ'ল ভড়মশায়ের, যাঁর মস্ত চালের আড়ৎ ছিল। সেই কণ্ঠস্বরটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কয়েকটি শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করল, ওহে মানবগণ, তোমরা কি আমাদের বিনাশ করতে চাও ?

নীচ থেকে বাংলা ভাষায় লাউড স্পীকারে কর্তৃপক্ষ জানালেন,—না, তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তোমরা প্রায়শ্চিত্ত কর।

সেটি আবার সবরকম ভাষায় অনুবাদ করে তাদের শোনান হ'ল।

এবার তাদের চোখ দিয়ে টপাটপ্ বৃষ্টি দানার মত জমাট কান্নার জল ঝরে পড়তে লাগল।

সে কান্নায় না মুক্তো, না পান্না, না হীরে, এমনকি সোনা, রূপা, তামা, দস্তা কোন কিছুই সৃষ্টি হ'ল না, মাটিতে পড়ে সেগুলো অসংখ্য অগণ্য কাঁকর হ'য়ে জমে রইল।

এবার লাউড স্পীকারের ধ্বনি-তরঙ্গে যে কথাগুলো ভেসে এল, তা হ'ল—

বন্ধুগণ, আপনারা মাদুড়ের নিঃশব্দ কান্না-ঝরা দেখলেন, তারপর আশ্চর্য কিছু ঘটতে দেখলেন। আপনাদের মনে নিশ্চয়ই হাজার রকমের প্রশ্ন জেগেছে এই বাদুড় কি জাতীয় প্রাণী, এরা কিরূপে সৃষ্টি হ'ল? মাদুড় হচ্ছে মানুষ আর বাদুড়ের এক যৌগিক বিক্রিয়ার আশ্চর্য সৃষ্টি।

আপনারা জেনে রাখুন, ইদানীং রহস্যময় গাড়ীগুলি যে অঢেল পণ্যসম্ভার বাজারে বয়ে আনছে, এইগুলি সমাজের চোরাকারবারী, মজুতদার, মুনাফা-খোরদের মাথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত করে বসে। বেচারাদের বাড়া ভাতে হঠাৎ ছাই পড়ে। তাই দারুণ মনোকষ্টে এরা একদিনে প্রায় লক্ষাধিক, বিষপানে পাইকারী আত্মহত্যা করে বসে। কিন্তু বিষে ভেজাল থাকলে কে ঠিক ঠিক মরতে পারে বলুন? আর যারা অনেক প্রাণ মেরে মেরে, প্রাণে কড়া ফেলেছে, তাদের জীবন থেকে প্রাণ পদার্থ কিছুতেই বের হতে চায় না। এই হতভাগারা বিষে ভেজাল মিশিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করে শেষে নিজেরা ভেজাল বিষপান করে যখন অৰ্দ্ধেকটা মরে ছিল, তখন মহানগরীর জীববিজ্ঞানী, দেহবিজ্ঞানী ও শল্য চিকিৎসকগণ তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। বহু শ্রমে ও অর্থব্যয়ে জাভার জঙ্গল থেকে কয়েক হাজার ভ্যাম্পায়ার সংগ্রহ করে, তাঁদের ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডুগুলি গেঁথে, এ হতভাগাদের অর্ধমৃত জীবনগুলি রক্ষা করেন। এইভাবে ভারতীয় চিকিৎসকগণ জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করেন।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরই বড় জাতভাই। তাই ভ্যাম্পায়ার ও মানুষের যুগ্মফলে যা হ'ল, তারই নাম হ'ল মাদুড়।

মাদুড়ের জন্মবৃত্তান্ত আপনারা শুনলেন, এবার আপনারা খুশী হয়ে হাততালি দিয়ে খুব জোরে জোরে হাসতে থাকুন। আর আপনারা না হাসলে, চিড়িয়াখানার এই আশ্চর্য বিস্ময়কে বাঁচান যাবে না। কারণ এদের এই কান্নার একমুখী গতি, বিপরীত এক ভাবতরঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত না হলে, কিছুতেই বন্ধ হবে না। বন্ধ না হ'লে এরা বাঁচবে না। এরা না বাঁচলে, রপ্তানী বাণিজ্য 'হিমালয়ান' লোকসানের খাদে পড়ে যাব। ইতিমধ্যে আমেরিকায় একটিকে রপ্তানী করে একশ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছি আমরা।

অতএব, হাসুন আপনারা, প্রাণ খুলে দেদার হা হা করে হাসুন আপনারা।

জনতার সঙ্গে প্রণববাবু হা হা করে হেসে উঠলেন।

তাঁর ছাদ ফাটান হাসির শব্দে হোটেলের বন্ধ দরজায় ঘা পড়ল, বাবু, বাবু, ও বাবু!

প্রণববাবু তড়াক্ করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। উঃ, যা দেখলেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, তা যদি সত্যি হ'ত?

শুশুনিয়া ও সংস্কৃতি ধারা

প্রফুল্লকুমার সরকার

আদিবাসীদের তীর্থ শুশুনিয়া পাহাড়ে মেলা দেখতে যাওয়ার সুযোগ আমার ঘটে নি। তবে অন্য সময়ে পাহাড় দেখতে গিয়ে তার প্রাচীনত্বের উপলব্ধি করি। পাহাড়ের মধ্যেকার কোন জলস্তর থেকে জল আসায় পাহাড়ের বুক দিয়ে একটি ঝর্ণা আসছে—ঝর্ণার জল সুপেয় ও শীতল, প্রচণ্ড খরার মাঝেও সরস।

শুশুনিয়ার প্রস্তর-লিপিতে আমরা রাজা চন্দ্রবর্মার কথা জানতে পারি। পঞ্চকূট দিয়ে মারাঠা অনুপ্রবেশ ঘটে, আর শুশুনিয়ার ওধার দিয়ে আসেন দূর অতীতে বর্মবংশীয়েরা—তারপরে আসেন সেন রাজারা। রাজ-মাতার শ্রাদ্ধে অন্নগ্রহণ করেন নি বলে কর্ণাট রাজ-পুরোহিত বীরসেন দেবাদিদেবের পূজা হতে বঞ্চিত হন। রোরুদ্যমান বীরসেন গভীর রাতে প্রত্যাদেশ পেলেন "আর কাঁদিস নে তুই, তোর জন্য চন্দ্রবংশীয় কুমারেরা রাঢ়ে অপেক্ষা করছে—তারা সব ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে সেখানে আছে।—তারা বিমল চরিত্র ও সদাচারের জন্য সারা রাঢ় অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করেছে; পরে তাদেরই অভ্যর্থিত সেনবংশীয়দের সম্বন্ধে পরম-শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিতে আছে "তাদের অমলধবল কীর্তিমেখলা রাঢ়ের আকাশ বিধৌত করে। বাঁকুড়া—পূর্বনাম বিক্রমপুর, পরে তা বিক্রমপুরার মধ্যদিয়ে তুপড়েতাপড়ে বাঁকুড়া হয়েছে। লক্ষ্ণৌএর 'কল্যাণ' পত্রিকায় পণ্ডিত যমুনাবল্লভজীর লেখা নিবন্ধে একথা মিলে। সেনেরা বর্মদের সদ্ব্যব-হারে কৃতজ্ঞতাপাশে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁরা রাজধানীর নাম বদলালেন না। যা কিছু পরিবর্তন তা ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝেই ঘটেছে। হয়তো বা তাঁদের সুহৃৎ চন্দ্রবংশীয়েরা রাজকুলতিলক বিক্রমাদিত্যের সহিত বিশেষ ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। এদিকে কাটোয়ার কাছে মঙ্গলকোট উজানী বা উজ্জ-য়িনীর বিক্রমকেশরীর চন্দ্রবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রেই বোধ করি বিক্রমবর্মার বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভারও অনুকরণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেও ভারতচন্দ্র, উদ্ভটসাগর, রামপ্রসাদ, গোপালভাঁড়, তপস্বী প্রভৃতি রত্নসমাবেশ দেখা যায়। গৌরবোজ্জ্বল বিক্রমকেশরী নামধারণ ও বাংলা কালিদাসের পদপ্রাপ্তি হয়তো একই মানসিকতার ফল।

ধ্বংসস্তূপ প্রাচীন মন্দির ও সৌধরাজির ভগ্নাবশেষে সমাকীর্ণ দিগন্তবিস্তৃত বিষ্ণুপুরের মাঠ জ্ঞান ও সংস্কৃতির কত না অমূল্য সম্পদ হৃদয়ে ধারণ করে কোন এক অনাদৃত অশ্রুত ধ্বান শ্রবণ সুরু। কেউ কেউ বলেন, কালিদাস বিষ্ণুপুরের টোলের ছাত্র ছিলেন; সম্রাট্ বিজয় সেনের জয়স্কন্ধাবার ভাগীরথীর সমীপে তপনতনয়া আকাশ গঙ্গা (বর্তমানে অলকানন্দা বলে পরিচিত) এই তেমোহনীতেই। বিজয় সেনের নৌবহর এখান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে প্রাণচঞ্চল রাখত; ত্রিবেণীর বর্ণাঢ্য তটরেখায় তখন সাগরলহরী এসে খেলত।

ভাগীরথী হতে তপনতনয়া, আকাশ গঙ্গা—অলকা-নন্দা যেখানে বাহির হয়ে গিয়েছে, সেখানেই বিজয়পুর জয়স্কন্ধাবার।

নদীয়া বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের অপর পারে কাটোয়া। সে অঞ্চলের কালোপাথরের শিল্প অনিন্দ্য-সুন্দর, কাঠের পুতুলের ধাঁজধরণ অনেকটা মিশরীয় মামীর মত, তবে তা ছোট আকারে। এই ভাস্কর্য্য

পাল ও সেন আমলে গিয়ে বিশেষ বিকাশ লাভ করে। সেখানে পরমশ্রদ্ধেয় মদ্‌গুরু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ও কুমার শরৎকুমার রায়ের সাহচর্য্য সংগৃহীত বরেন্দ্রভাস্কর্য্য মিউজিয়মটি এখন নববাংলার আওতায়। সেখানকার অমূল্যসংগ্রহ সম্পদের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা যোগাযোগ-স্থাপন একটা বিশেষ ও আশু প্রয়োজন। "তদনু বিজয়সেন প্রাদুর্বাসীৎ বরেন্দ্রে" লিপি হতে আমরা সম্রাট্‌ বিজয়সেনের উত্তরবঙ্গে রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে জানতে পারি। তা ছাড়া খালিমপুর তাম্রশাসন হতেও অনেক কথা জানা যায়।

বাঁকুড়া বিক্রমপুরের প্রবাহিত সংস্কৃতিধারা নদীয়ার বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হয়ে পূর্ববঙ্গে রামপালে এসে পৌঁছল। সেখানে পরম সৌগত, পরমভট্টারক লক্ষ্মণ সেন দেব দেব এসে বাস করতে লাগলেন।

স্বর্ণগ্রামে বার্গাবহা প্রাসাদে সুমনোহরে রমমান সহস্রাভির্দিবিব ত্রিদিবেশ্বরঃ।—প্রাচীন লিপি হতে পাওয়া যায়। উদ্ধার করেছেন প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির শিশুদোলনা—সেনযুগের বিবর্ত্তন ও বিকাশের অনুবর্তন আজ এখানেই শেষ করি।

মাঝে মিথিলাতে মহাকবির একটা স্মৃতিফলক আছে শোনা গিয়েছিল। মিথিলা বৃহত্তর বঙ্গকের অংশই ছিল। আটশ বছরের পুরাণো সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত কুলজী গ্রন্থে আছে "অস্তি বঙ্গকে দেশে পাটলীপুত্রনাম রাজধানী।" কোনো কোনো রসিক জনের ধারণা এই বঙ্গকভূমেই হয়তো বা মিথিলা ঘেঁসেই কালিদাসের বিবাহ হয়েছিল। যাই হোক। মহাকবির রচনায় নীলজলা সরসীর ধারে নিদাঘের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াতলে; প্রকৃতির স্নেহময় আহ্বান যেন বাংলারই বলে মনে হয়। কালের গতিতে—বাঁকুড়া হয়ে হাবুডুবু খাওয়া বিক্রমপুও আবার দেদীপ্যমান ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হল—নদীয়ার দেবগ্রাম বিক্রমপুরে। সেনেদের সংস্কৃতিধারা প্রাচীন বিষ্ণুপুর বিক্রমপুর (বাঁকুড়া, যারাকেই জাগিয়ে তুলল, কেবল একটু উত্তর পশ্চিম ধারে চন্দ্রের বংশধর কুমারদের সমাদৃত বীর রাজার প্রাচীনত্বের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ শ্রীবাড়ীকে (সিউরী গোলাবাড়ী) কেন্দ্র করে বীরভূমের পত্তন হল।

কাটোয়ার অপর পারে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পত্তন হল—এর মধ্যে বেলপুকুর, বামুনপুকুর কেঁদুয়া (চৈতন্য দেবের জন্মভিটার নিকটে), বলালদীঘি, বিষ্ণুনগর, প্রভৃতি সুবিস্তীর্ণ এলাকা বিক্রমপুর বলে পরিচিত হয়। কেঁদুয়ার ছাড়গঙ্গা গর্ভের এক পুষ্করিণীর সানবাঁধা ঘাটের উপর এক বটবৃক্ষমূলে একদিন দু'হাজার উদ্বাস্তুর এক তুমুল কীর্ত্তন হয়। তাতে ক্যালিফর্নিয়া নিবাসিনী ম্যাডাম মেরী ম্যাক্‌ষেয়ার ছিলেন—তাঁর সঙ্গে উদ্ধারণদা, উপেনদা প্রভৃতি প্রভুর ভক্তেরা এসেছিলেন। গভীর রাতে মহা কীর্তনের মধ্যে ম্যাডাম আবিষ্ট হয়ে পড়েন—আবেশ-বাণীতে বলেন "গৌরাঙ্গ তখন বারো বছরের ছেলে, তিনি ঐ পথ দিয়ে রোজ পুঁথি কাঁধে করে স্কুলে যেতেন। এখানে বটতলায় দাঁড়িয়ে চুল শুকাতাম—পরে আমি বিষ্ণুপ্রিয়া হই।"

নবদ্বীপে তেমোহনীতে তৃণ-গুল্ম-রাজি-মণ্ডিত পরত্ন প্রমাণ স্তূপ বিজয়পুর জয়স্কন্ধাবারের সাক্ষ্য দেয়—

ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্রনির্বাতি দেবী
স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং।
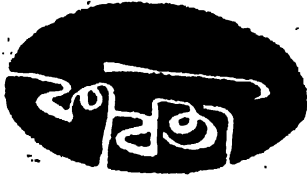
সেই কথা

মনোরমা সিংহরায়

পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে নক্ষত্রের আলো দেখে দেখে
কতো শান্তি পেয়েছি হৃদয়ে
সেই কথা জানবে না কেউ। শুধু হেঁটে হেঁটে আজ
যদি ক্লান্তি আসে তাই চেয়ে চেয়ে দেখে
আর লোকে নির্বোধের মতো শুধু হাসে॥
তারা কেউ কখনো জানে না আকাশের ভালোবাসা।
তারা কেউ বোঝেনি কখনো খোলা মাঠ শস্যভরা
কখনও ভরা মেঠো ফুলে কী যে গান গায়।
নদীর ধারের কাছে যদি এসে কখনও বসে
চুপি চুপি সেই নদী কতো কথা বলে।
সেই কথা জানে শুধু শিশুরাই। তারা বোঝে
কতো কথা বলে নদী আর বয়ে যায়।
এ জীবন তাই শুধু শিশুদের মতো হতে চায়॥
পৃথিবীতে এখনও অজানাই আছে সেই ভাষা
অর্থ তার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেনি এখনো।
এখনো বোঝেনি কেন সবচেয়ে নম্র নক্ষত্রের আলো,
কেন সবচেয়ে বড় আকাশের ভালোবাসা॥

কল্পনা

মেঘমালা দত্ত

আমার কল্পনার এক সাহিত্যিক,
সদা গাম্ভীর্যময় উদাসীন,
হয়ত বা কিছু সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ
এক বাঙ্গালী পোষাক পরিহিতা।
ভালবাসায় পরিপূর্ণ মানুষটি—
মনের দ্বারটা থাকবে সবসময় খোলা
কিন্তু কেন যেন সব পাল্টে গেল—
আমার কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল,
ব্যক্তিত্বময়ী উদাসীন মানুষটির
গায়ে সেই বাঙ্গালী পোষাক;
মনটা যেন বিষন্ন, জানি না উদার কিনা,
গায়ে তার অবাঙ্গালী পোষাক
হয়ত বা এযুগের সাথে
তাল মিলিয়ে চলেছেন—
কিছুটা সৌন্দর্য্যের খাতিরে।
কিন্তু বাঙ্গালী পোষাক কেন এত
অবহেলিত সাহিত্যিক
প্রশ্ন আমার?

পৃথিবী মায়া জানে

নীহারকণা দাস দে

এই পৃথিবী ছাড়তে আমার
লাগছে বড় দুখ
যদিও আমি তোমার লাগি
হয়েছি উন্মুখ।
চরণ তোমার দেখি ধ্যানে
কথা তোমার শুনি কানে,
রসময় তোমার প্রেমে
পাই যে বড় সুখ।
তবুও আমার ছাড়তে ধরা
লাগছে বড় দুখ।
এই ধরণীর সবুজ বুকের
টান যে আমার বড়
থাক্‌না সেথা অনেক অভাব
হোক্‌না দুঃখ জড়;
দু'বেলা ভাত না যদি জোটে
ভয়ত আমি পাইনে মোটে
ভেজাল-পুষ্ট শরীরটাকে
বাঁচাতে আমি দড়,
এই ধরণীর সবার সাথে
টান যে আমার বড়।
এই পৃথিবীর মানুষগুলো
মায়া বড়-জানে
মিলন বেলা তোমার সাথে
আমায় পিছু টানে;
লজ্জাবতী লতার মত
হলেম যখন নম্র নত
তোমার পরশ পেয়ে, হৃদয়
তাকায় তব পানে,
এই ধরণীর মানুষগুলো
মায়ায় মোরে টানে।

সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্র

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

এটা চাও সেটা চাও দাম দিতে পারবে?
লেখা চাও পড়া চাও, বেদনাটা বাড়বে।
হতে চাও দারোগা কি, এমেলে কি এম্পি,
দাম আছে পকেটে তো ভাবনাটা আর কি?
চাও যদি পারমিট লাইসেন্স কিছু আর,
নিয়ে এসো মালকড়ি, পেয়ে যাবে অর্ডার।
পেতে চাও প্রমোশন, নিতে চাও ট্রান্সফার,
দাম নিয়ে এসো কাছে, হবে তবে কারবার।
পকেটেতে নেই কিছু, মনে শুধু আশা ভার?
বুয়ে থাক্ গর্দভ, সেবা কর সবাকার।

মুসলীমের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ

উদ্বোধন পত্রিকায় আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী উপরোক্ত বিষয়ে লিখিতেছেন—

আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাই একজন মুসলীমের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর শিক্ষাকে এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। একজন মুসলমান হিসাবে আমরা মহাত্মা বুদ্ধকে দুইভাবে দেখতে পারি। প্রথমতঃ সাধারণ ইতিহাসে এবং প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে যে রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে এতটুকু বলা যায় যে, বুদ্ধদেব একজন দার্শনিক ছিলেন, আর তাঁর দর্শনকে কোনক্রমেই ধর্ম বলা যেতে পারে না। কেননা ধর্মের প্রাণ হল আল্লার অস্তিত্ব। প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে আল্লা বা ঈশ্বরের কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে আছে, 'লাকাদ বায়াছনা ফিকুল্লে উম্মাতির রাছুলান, অর্থাৎ—প্রত্যেক জাতিতে নবীর আবির্ভাব হয়েছে।' অন্যত্র আছে 'লিকুল্লে কাউমিন হাদ, অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়েই পথ-প্রদর্শকের আগমন হয়েছে।' অন্য এক জায়গায় আছে, 'ওমা আরছলনা মির রাছুলিন ইল্লা বিলিছানী কাউমিহি অর্থাৎ—যুগে যুগে আগত এইসব নবী তাঁদের জাতীয় ভাষায় নিজ নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষাদান করেছেন।' বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে আগত এইসব লক্ষ লক্ষ নবীর মধ্যে পবিত্র কোরআনে ত্রিশজন নবীর নামও উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লা বলেন, ওয়া রাছুলান কাদ কাছাছনা হুম আলাইকা। মিন কাবুল ওয়া রুছুলাল্লাম নাকছুছ হুম আলালাইকা। অর্থ :—কোন কোন রছুলের সংবাদ ইতিপূর্বে প্রদান করেছি আর বহু রছুল রয়েছেন যাদের খবর আমি তোমাকে দেই নাই।' (মেছা, ৬৫)। অতএব কোরআনের এই মহান শিক্ষা অনুযায়ী আমরা যুগে যুগে আগত সকল নবী রছুলকে মান্য করতে বাধ্য। যেহেতু পৃথিবীর সকল দেশেই নবীর আবির্ভাব হয়েছে অতএব আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশেও নবীর পদস্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকে নাই। এই উপমহাদেশে যেসব মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। যিনি দীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসর পরও কোটি কোটি মানবের মনে শ্রদ্ধার আসনে আসীন রয়েছেন। তিনি যে শুধু একজন শুষ্ক দার্শনিক অথবা কল্পনা বিলাসী ছিলেন একথা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। নবী ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে এহেন সম্মান লাভ সম্ভবপর নয়। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাহলে মহাত্মা গৌতম কি নবী ছিলেন? যিনি নাস্তিক ছিলেন অথবা আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব ছিলেন তিনি কি করে নবী হতে পারেন। অতএব সর্বপ্রথম আমাদেরকে দেখতে হবে যে শাক্যসিংহ গৌতম আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন কি না।

আমরা ইতিহাস পাঠ করে এবং বর্তমান বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রন্থগুলি পাঠ করে এমন একটি বাক্যও পাই না যার দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গৌতম বুদ্ধ আল্লায় অবিশ্বাসী ছিলেন। বরং এমন বহু প্রমাণ আমরা দেখতে পাই যার দ্বারা একথা বলা যায় যে বুদ্ধদেব স্বয়ং আল্লায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লার বাণীকেই তিনি জীবনভর প্রচার করে গিয়েছেন। কথিত আছে যে একদা কতিপয় ব্রাহ্মণের মধ্যে তাদের মত ও পথের

প্রাধান্য নিয়ে তর্ক চলছিল। তাদের মধ্যে কে মানুষকে ঈশ্বর প্রাপ্তির সঠিক পথ দেখাতে পারেন তাই নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই ঝগড়া চলছিল বহুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত হতে না পেরে তারা ফয়সলার জন্য গিয়ে উপস্থিত হল মহাজ্ঞানী গৌতমের কাছে। মহাত্মা বুদ্ধ সবকিছু শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখেছ?" ওরা বলল, "না।" বুদ্ধ বললেন, "তাহলে তোমাদের পিতা, পিতামহ এবং গুরুদেবরা কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" ব্রাহ্মণরা জবাব দিল, "দেখেছেন বলে ত জানি না।" তখন বুদ্ধ বললেন, "যাকে তোমরা দেখ নাই, তোমাদের পিতা পিতামহরা এমনকি তোমাদের গুরুদেবরা পর্যন্ত দেখে নাই, তাঁর কাছে পৌঁছবার পথ তোমরা কি করে অন্যকে দেখাবে? এই ঘটনার মধ্যে অনেকে নাস্তিকতার গন্ধ আবিষ্কার করতে চান, কিন্তু আমরা দেখছি এর মধ্যে নাস্তিকতা ত দূরের কথা বরং এর মধ্যে আস্তিকতারই সুর ধ্বনিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি কখনও অন্যকে জাগ্রত করতে পারে না, যে অন্ধ সে অন্যকে পথ দেখাতে পারে না। তেমনি যে ঈশ্বরের সন্ধান লাভ করে নাই সে কখনও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ দেখাতে পারে না। গৌতম ঈশ্বরকে লাভ করেছিলেন তাই সেই যুগে একমাত্র তিনিই মানুষকে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করতে পারেন। একথাই ইঙ্গিতে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। অপর একস্থানে তিনি বলেছিলেন "অত্থি ভিক্খবে! অজাতম্, অভূতম্, অকতম্, অসঙ্খতম্, অর্থাৎ—হে ভিক্ষুগণ! এমন কিছু আছে যা অজাত, অভূত, অকৃত এবং অযৌগিক।" (ইতিবুত্তকম—৪৩)। এখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় অজাত, অভূত শক্তি আল্লাতালার কথা বর্ণনা করেছেন। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি মহাত্মা গৌতমের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর লিপিবদ্ধ হয়। তাই এর মধ্যে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার কোন কোন অংশ বাদ পড়া এবং নূতন কিছুর সংযোজন মোটেই অসম্ভব নয়। এদিক দিয়ে সম্রাট অশোকের শিলালিপিগুলির মূল্য অনেক বেশী। কেননা অশোক বুদ্ধদেবের নিকটবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর শিক্ষাকে প্রচার এবং সংরক্ষণ করার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা সম্বলিত শিলালিপিগুলি আজো বহুস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। জগন্নাথক্ষেত্র থেকে কুড়ি মাইল দূরে ধাওলিতে এমনি এক প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ এবং স্বর্গের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তর লিপিতে যে 'ইসানা' শব্দ রয়েছে তার অর্থ হল, ঈশ্বর, প্রভু। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে বৌদ্ধধর্মে আল্লাকে সাধারণতঃ কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে বৌদ্ধধর্মে আল্লাকে "বুদ্ধ" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, আরবীতে যাকে বলে আলীম। আলীম আল্লাতালার অন্যতম নাম। মহাত্মা গৌতম যখন 'বোধিসত্বকে' লাভ করেন তখন রূপকভাবে তিনিও বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে পরম বুদ্ধ (আলীম) হলেন আল্লাতালা স্বয়ং। বোধিসত্বকে লাভ করার পর গৌতম পরম বুদ্ধ আল্লার মজহার বিকাশরূপে বুদ্ধ বা আলীম নামে অভিহিত হন। আমাদের সমাজেও জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আলীম নামে আখ্যায়িত করা হয়, প্রকৃত অর্থে তারা সত্যিকার আলীম নহেন। বরং মূল আলীম আল্লাতালা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তারা রূপকভাবে আলীম নামে অভিহিত হন।

সাময়িকী

সূর্য্যমুখী ফুলের তেল

আধুনিক জগতে বহু দেশেই তৈল উৎপাদনের জন্য সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ করা হইয়া থাকে। সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ হইতে উৎকৃষ্ট তৈল বাহির হয় এবং বীজের ওজনের হিসাবে সেই তৈল প্রায় শতকরা ৪০।৬০ অংশ হইয়া থাকে। চীনাবাদাম হইতে তৈল বাহির হয় মাত্র শতকরা ২০।২৫ ভাগ। রুশদেশে সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ প্রচুর করা হইয়া থাকে এবং রুশদেশ হইতে ভারতবর্ষ এই ফুলের বীজ আনিয়া উহার চাষ আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ২৫০০০০ হেক্টার জমিতে সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ করা হইতেছে। ইহার জন্য বিশেষ করিয়া লইয়া আসা হইতেছে সোভিয়েট দেশের বাছাই করা সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ। মনে হইতেছে যে এই চাষ যথাযথভাবে বৃদ্ধি হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতের খাইবার তৈলের অভাব দূর হইবে। বনস্পতি প্রস্তুত করিতে যে তৈলাভাব ঘটিয়া থাকে তাহাও ক্রমশঃ দূর হইবে এবং বনস্পতির অভাবও আর থাকিবে না। সূর্য্যমুখী ফুল নব্বই হইতে একশত দশ দিনের মধ্যে পূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠে এবং চীনাবাদাম গজাইতে লাগে একশত ষাট দিন। সূর্য্যমুখী ফুলের চাষ এই দিক দিয়াও অধিক লাভজনক। জমিতে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করার দিক হইতে এই ফুলের চাষ বিশেষ সুবিধা সৃজন করে। ইহা অপর ফসল থাকিতে থাকিতে বপন করা চলে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পজলে বাড়িয়া উঠিতে পারে। সর্বশেষে বলা যাইতে পারে যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এই ফুলের তেল বিশেষ উপকারী। যাহাদের হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা দোষ আছে তাহাদের পক্ষে সূর্য্যমুখী ফুলের বীজজাত তৈল মহা উপকারী। ইহা মানুষের রক্ত হইতে অনিষ্টকর চর্বিজ ভাগ ক্রমশঃ কমাইয়া দেয় ও তাহার ফলে হৃদরোগ সম্ভাবনা হ্রাস হইয়া যাইতে থাকে। সুতরাং সকল দিক

দিয়াই দেখিলে এই ফুল চাষ করা দেশের পক্ষে লাভের বিষয় বলিয়াই মনে হয়।

সোভিয়েটদেশে রামায়ণ অভিনয়

মস্কোতে পাঁচটি অল্পবয়স্কদিগের জন্য বিশেষ করিয়া চালিত রঙ্গমঞ্চ আছে। ইহা ব্যতীত রবিবারে ২৫টি অন্য অন্য রঙ্গমঞ্চে অল্পবয়স্কদিগের জন্য বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে সকল অভিনয় করা হয় তাহার মধ্যে রামায়ণের অভিনয়ের কথা সর্বাগ্রে বলা উচিত। এই নাটকের অভিনয়ে যে অভিনেতা রামচন্দ্রের ভূমিকায় মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার নাম গেন্নাডি পেচনিকভ। ইনি রামচন্দ্র সাজিয়া অভিনয় করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রথম যখন এই অভিনয় হয় তখনও গেন্নাডি পেচনিকভ ভারতবর্ষ কখনও সাক্ষাৎভাবে দেখেন নাই। পরে তিনি এক সময় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পরে টেলিভিশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা তিনি বলেন, "আমি ভারতবাসীদিগের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য গঠন প্রয়াসের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া পারিতেছিনা। তাহারা ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল ও নিজেদের সফলতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী। আমি নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামায়ণের বহু অভিনয় দেখিয়াছি। দিল্লীতে বোম্বাই-এর একটি দল যে অভিনয় করে তাহা অত্যন্তই দর্শকমনমুগ্ধকর হইয়াছিল। তাহাদের মূক-অভিনয় ও ভাবব্যঞ্জক নৃত্য ইত্যাদিও সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়ান্তে যখন শিল্পীগণ নিজেদের মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন তখন দেখিলাম রামচন্দ্র যিনি সাজিয়াছিলেন তিনি স্ত্রীলোক! আমাকে তাঁহারা বলেন সোভিয়েটদেশে যে রামায়ণ অভিনয় হইয়াছিল তাহার কিছু নমুনা প্রদর্শন করিতে। আমি তখন সীতাহরণ অংশ অভিনয় করিয়া দেখাই। আমি তাঁহাদের তখন রুশদেশে লেনিনের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত বাল-রঙ্গমঞ্চের কথা বলি ও তাঁহারা সেকথা শুনিয়া খুবই আনন্দিত হ'ন।"

শ্রীপেচনিকভ বলেন, তাঁহার ভারত ভ্রমণ অত্যন্তই লাভজনক হইয়াছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধারা যখন জার্মানী গিয়েছিলেন

আগ্রম পত্রিকায় আজকের জার্মানী থেকে উদ্ধৃত :—

একথা সম্ভবতঃ খুব বেশী লোকের জানা নেই যে, দানীন্তন ইউরোপে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা ১০৭ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিম জার্মানীর ষ্টুগারটেই প্রথম উড়েছিল। সোস্যালিষ্ট কংগ্রেস পলক্ষেই ঐ ঐতিহাসিক তাৎপর্য মণ্ডিত ঘটনাটি ঘটেছিল। সেই সোস্যালিষ্ট কংগ্রেসে প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী ম্যাডাম কামা ভারতের পূর্ণ স্বাতন্ত্রের দাবী করে ক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সে সময় ম্যাডাম ... প্যারিসস্থ তাঁর সদর কার্যালয় থেকেই ভারতের ...ীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করতেন। এটি এবং ...রতের স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত আরও বহু গুরুত্ব... ...না জার্মানীর মাটিতেই সংঘটিত হয়েছিল। ... বিপ্লবীদের অনেকেই জার্মানী সফর করে... ...লেন এবং সেখানে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য পূর্তির জন্য ...তা পেয়েছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ...য় জার্মানী সফর করেন। জার্মানীতে থাকাকালীন ...য়ে নেতাজীর কার্যকলাপ এখনো পুরোপুরি জানা ... হয়নি। তবে একথা বলা যায় যে, সেখানে তিনি ...জনক কাজ করেছিলেন এবং বহু জার্মান-এর ...ঙ্গে ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন জার্মানদের ...াছে ভারত সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশনায় প্রয়োজনীয় কাজ করছেন। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন এমনই একজন জার্মান আজকের প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং লেখক। ইনি ডঃ গিজেলহের ভিরসিঙ। ভিরসিঙ ১৯৪৯ সালে একটি সাপ্তাহিক এবং একটি ত্রৈমাসিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ইন্দো-এশিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। আজও তিনি ঐ পত্রিকা দুটির সম্পাদনা করে চলেছেন।

ডঃ ভিরসিঙ বহুবার ভারত সফর করেছেন। ভারত সম্পর্কে তাঁকে একজন বোদ্ধা বলেই গণ্য করা হয়। তাঁর স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশ যে, নেতাজীই তাঁর মধ্যে ভারত সম্পর্কে আগ্রহের ভাব জাগিয়ে তোলেন। ১৯৪১ হইতে ১৯৪২-এ সময় কালে তিনি জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ হতে বার্লিনে নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। নেতাজী ১৯৪২ সালে বার্লিনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর ভারতীয় রাজনৈতিক কেন্দ্র খোলেন। পরে তিনি জার্মানীর সহায়তায় জাপান চলে যান। সানফ্রান্সিস্কো-এর রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ভারতীয় গোষ্ঠী, যারা গদর (বিদ্রোহী) পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে জানুয়ারী মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কো থেকে মৌলানা বারকাতুল্লা নামক জনৈক অধ্যাপককে জার্মানী পাঠিয়েছিলেন।

তারই প্রায় কাছাকাছি সময়ে জার্মানীতে কুমার মহেন্দ্র প্রতাপের নাম শোনা গিয়েছিল। কুমার মহেন্দ্র প্রতাপ উচ্চ বংশোদ্ভব ভারতীয় ছিলেন। ইনি, হাথরাস এর রাজা ইংরাজ সিংহাসনচ্যুত করেছিল, তাঁরই পুত্র এবং মুরসান মহারাজার পালিত পুত্র। কুমার মহেন্দ্র

প্রতাপ ছিলেন বহু শিখ রাজার ঘনিষ্ট আত্মীয়। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি জার্মানীতে আশ্রিত ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে বিশেষ স্থান অর্জন করেছিলেন।

মহাযুদ্ধের সময়ের বছরগুলিতে যে সমস্ত ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক জার্মানীতে থেকেই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ত কাজ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা খুব কম হবে না। ঠিক সেই পর্যায়ের না হলেও, প্রখ্যাত পণ্ডিত তারকনাথ দাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকেই তাঁর ঘর করেছিলেন। এবং তিনিও ক্রমে শক্তিশালী রাজনীতিবিদ হিসাবে জার্মানীতে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরে তিনি ভারত-জার্মান রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উপর গবেষণা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-এর ছোট ভাই ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেগেলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক রাজনীতি ব্যাখ্যার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনিও সে যুগে জার্মানীর উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ব্যক্তিত্ব সমূহের অন্ততম ছিলেন। চেমপাকরমন পিল্লাই ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরবাসী—বর্তমানে কেরালা—প্রথম সারির একজন ভারতীয় সাংবাদিক। ইনি জনৈক অষ্ট্রীয়, মহিলাকে বিবাহ করেন। পরে বার্লিনে বসে তিনি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর একখানি বই লেখেন। আশ্রয়প্রাপ্ত অন্যতম শিখ রাজনীতিবিদ্ মজিথার সরদার উমরাও সিংএর গিল অষ্ট্রীয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার ফন গোটেসমান-এর এক মহিলাকে বিবাহ করে বুদাপেষ্টে সংসার পাতেন। সেই সংসার ছিল ভিয়েনা এবং অমৃতসরের সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন। এদের কন্যা অমৃতা শের গিল ভারতের মহিলা আধুনিক চিত্রকর।

১৯২০ এর সময়কালে জার্মানীতে ভারত প্রীতির মনোভাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বহু রাজনীতিবিদ্দের জার্মানীতে আকৃষ্ট করে নিয়ে এসেছিল। ১৯২৭-এর ১৪ই নভেম্বর তারিখে জার্মানীর পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা হেলাস জাতীয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন :

আজ আমি ভারতের মুক্তি বাহিনীর নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে মিলিত হই। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরই পুত্র এবং বার্লিনবাসী পিল্লাই।

মতিলাল নেহরু ও তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহরুর এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় কংগ্রেসকে, জার্মানী সাহায্য করতে কি ভাবে ইচ্ছা করতে পারে তারই পথ অনুসন্ধান করা। এঁরা জার্মানীর বার্লিনে ভারতের বাইরে প্রথম ভারতীয় তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরে তাঁরা জার্মানী থেকে মস্কোর পথে রওনা হয়ে যান। পরে বার্লিনের ঐ তথ্যকেন্দ্রটি এ, সি, এস, নাম্বিয়ার এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ তারিখে কাজ শুরু করেছিল।

থাম্বা

কেরল প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত থাম্বা নামধেয় জনপদটি এখন একটি বিরাট কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমির উপর অনেকগুলি অনন্তশূন্যে রকেটাদি সমন্বিত বিরাটাকার হাউই উৎক্ষেপ ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্র বিক্রম সারাভাই দূর শূন্য কেন্দ্রে (Vikram Sarabhai Space Center) নামে পরিচিত। পাঁচটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই কেন্দ্রের অন্তর্গত। ১৯৭০ হইতে প্রতি বুধবার এইখান হইতে রাত্রি ৮টার সময় রুশ দেশ হইতে প্রাপ্ত এম—১০০ নামক হাউইটি আকাশ মার্গে নিক্ষেপ করা হয় এবং ঐ হাউই ৬৫ কিলোগ্রাম ওজনের যন্ত্রাদি বহন করিয়া দশ মুহূর্তের মধ্যে ৮০/৯০ কিলোমিটার উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। হাউইটির দৈর্ঘ ২৭ ফুট এবং উহার উৎক্ষেপ ব্যবস্থার কলকব্জা কার্য্য হইবার পরে জ্বলিয়া যায় ও সমুদ্রে গিয়া পড়ে। এই হাউই পাঠাইয়া সুদূরশূন্যের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্য আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহ করা। অন্যান্ত অনেক দেশও এই ভাবে হাউই ছুঁড়িয়া আকাশ পর্যবেক্ষণ কার্য্য করে এবং সকলের মিলিতভাবে সংগৃহীত খবর

ইতে তখন কোথায় আবহাওয়ার কি পরিবর্তন হইবে তাহা বলা সম্ভব হয়। হাউই নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও ভারতবর্ষে ঠিকমত করা সম্ভব হইতেছে না কিন্তু শুনা যইতেছে যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই এদেশে বৃহৎ বৃহৎ হাউই ও আকাশ ভ্রমণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ নির্ম্মিত হইবে ও তাহা দিয়াই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে। এখন যে রুশ দেশে নির্ম্মিত হাউইটি প্রতি সপ্তাহে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা নব্বই কিলোমিটার উপরে পৌছাইলে তাহার প্যারাশুট খুলিয়া যায় ও উহা তখন ধীরে ধীরে হাওয়ায় ভাসিয়া প্রায় পৌণে একঘন্টা সময় লইয়া নিচে নামিয়া আসে। এই সময় নানান্ যন্ত্রে নানাপ্রকার মাপজোক করা হইতে থাকে ও সেই সকল ফলাফল বিচার করিয়া পরে আবহাওয়ার অবস্থা বিচার করা হয়।

ভারতবর্ষ বলিতে কি বুঝা যায়

অনেকেরই ধারণা যে ভারতবর্ষ নামটা অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভিত্তিক দেশ ও জাতিদিগের নিবাসভূমির সমষ্টিগত বর্ণনাকর পরিচয় দেয় মাত্র; তাহার ভৌগোলিক নিজত্ব বলিয়া পৃথক কিছু নাই। বস্তুত কথাটা কিছুমাত্র সত্য নহে। বর্ত্তমানে যে সকল প্রদেশগুলি দিয়া ভারতবর্ষ গঠিত বলা হয় তাহার মধ্যে প্রায় কোনটিরই এখনকার সীমানার অভ্যন্তরের স্থানগুলি অতি প্রাচীনকালে এখনকার নামে পরিচিত হইত না। কোন কোনটি মধ্যযুগে এখানকার পরিচয় অর্জ্জন করিয়াছিল, কোন কোনটির সেই পরিচয় বৃটিশদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ভারতবর্ষ নামটির মূলে কোনও ভাষাগত অথবা জাতিগত বৈশিষ্ট্য নাই। ঐ নামটি বহু পুরাতন এবং উহার মূলে আছে এই উপমহাদেশের কৃষ্টিগত একতা। ভারতবর্ষের সকল অংশেরই ভাষার বা বংশ পরিচয়ের পার্থক্য থাকিলেও সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক হইতে এই বিরাট দেশ অতি গভীরভাবে একতার বন্ধনে বাঁধা। জাতির হিসাব করিলে কাহারও আর্য্যরক্ত, কাহারও দ্রাবিড় বা মঙ্গলীয়; ধর্মে কেহ বৌদ্ধ, কেহ জৈন, কেহ বা শিখ মুসলমান খৃষ্টান হিন্দু এবং ভাষার বিচারে দেখা যায় যে অনেকগুলি ভাষাই এই দেশে কথিত হয়। কিন্তু ঐ সকল নানা পার্থক্য থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে আদিবাসী, দ্রাবিড়, আর্য্য প্রভৃতি জাতি বাস করিয়া আসিয়াছেন, যে সকল ভাষায় কথোপকথন চালাইয়াছেন তাহার মধ্যে অনেকগুলিই সংস্কৃতের দ্বারা পুষ্ট ও যে সকল সভ্যতা ও কৃষ্টি বৈচিত্র সকলের মধ্যেই লক্ষিত হইয়াছে সেগুলিও মূলতঃ অরণ্যবাসী কোলেরিয়ান, বহু গুণাধার দ্রাবিড় অথবা আর্য্যদিগের ভাব ও চিন্তার ঐশ্বর্য্যে পরিপুষ্ট। বহু রীতিনীতি আচার ব্যবহার জীবনযাত্রা পদ্ধতি একই উৎস হইতে উত্থিত ও একই দার্শনিকভাব প্রণোদিত। বেদ-বেদান্ত উপাখ্যান, শিল্পশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, কাব্য সাহিত্য, সঙ্গীত, অর্থশাস্ত্র, ভেষজ, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, ইত্যাদি বহু কিছুই সর্ব্বভারতীয় এবং সেই কারণেই ভারতবর্ষ সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নিজের বিশেষত্ব ও একতা রক্ষা করিয়া জীবন্তভাবে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে।

"চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা"

প্রবাসীর একজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় আমরা বর্ত্তমান বৎসরে চারুশীলা দেবী সাহিত্য প্রতিযোগিতা নামে একটি গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা ঘোষনা করিতেছি। এই প্রতিযোগিতাতে নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গল্প ঃ

প্রথম পুরস্কার	১৫০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৫০ ,,

প্রবন্ধ ঃ

প্রথম পুরস্কার	১২৫ টাকা
দ্বিতীয় ,,	১০০ ,,
তৃতীয় ,,	৭৫ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	৪০ ,,

কবিতা ঃ

প্রথম পুরস্কার	১০০ টাকা
দ্বিতীয় ,,	৭৫ ,,
তৃতীয় ,,	৫০ ,,
চতুর্থ হইতে দশম (৭টি, প্রতিটি)	২৫ ,,

পুরস্কার দিবার জন্য প্রবাসী সম্পাদকের অভিমতই সকল সময় গ্রাহ্য হইবে। গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠাইবার সময় এখন হইতে ১৫ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিল। পৌষের প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হইবে। লেখকদিগকে নিজ নিজ লেখার প্রথম পৃষ্ঠায় উপরে বাম কোণে "চারুশীলা দেবী প্রতিযোগিতা" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। লেখকের নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। অমনোনিত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

—প্রবাসী সম্পাদক